মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্র

প্রকাশক :
মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়
বিংশ শতাব্দী
২২এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৫

অনুবাদ :
অশোককুমার সিংহ

প্রচ্ছদ :
অ. ঘোষ

মুদ্রাকর :
বিংশ শতাব্দী প্রিণ্টার্স
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

আমার শৈশব ও যৌবন কেটেছিল প্রাচ্যে। সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে ফরঘানার কথা, কারণ সে দেশের প্রায় সর্বত্রই আমি ভ্রমণ করেছি। অনেক দিন আগের কথা, কিন্তু আজ এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমার মনে হয় এ দেশ পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানগুলির অন্যতম।

আমার সাহিত্য জীবনে প্রথম দোলা দেয় *প্রাভদা ভোস্তকা* (প্রাচ্য-বাণী) নামে সংবাদপত্র, কারণ আমার প্রবন্ধ ও গল্প ছাপার অক্ষরে এতেই প্রথম বেরিয়েছিল।

আমার প্রথম বই *লেনিন ইন ইস্টার্ন ফোক আর্ট*—মধ্য এশিয়ার বিপ্লবোত্তর লোকগাথার সংকলন—১৯৩০ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝের সময়ে আমার লেখা বই ও চিত্রসংলাপ বাদ দিলে সোজা খোজা নাসিরুদ্দিনের কথায় আসতে হয়।

উজবেকিস্তানে তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প শুনেছিলাম, পরে খোজা নাসিরুদ্দিনের উপর অ্যাকাডেমিসিয়ান ক্রিমস্কির গবেষণার কাগজপত্র আমার হাতে এসে পড়েছিল। প্রাচ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এই রসিক ও প্রতিভাবান ব্যক্তির চরিত্র আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল ও মনে হয়েছিল তিনি একজন উজবেক এবং হয়তো বোখারায় জন্মেছিলেন। এইভাবেই খোজা নাসিরুদ্দিনের দুঃসাহসিক গল্প নিয়ে লেখা আমার প্রথম বই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৪০ সালে *ডিসটার্বার অব দি পীস* (অথবা *খোজা নাসিরুদ্দিন ইন বোখারা*) শিরোনামায় বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই বই সোভিয়েত পাঠক এবং বাইরের পাঠকদের কাছেও বেশ পরিচিত।

যুদ্ধ ও পরবর্তী ভয়াবহ দিনগুলিতে আমার এই নায়ককে নিয়ে লেখা আর

হয়ে ওঠেনি এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ঘটনা নিয়ে লেখা দ্বিতীয় বই *দি এনচ্যানটেড প্রিন্স* ১৯৫৪ সালের আগে শেষ হয়ে উঠেনি।

এই দুটো বই-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমার পাঠকদের মতামত পরস্পর বিরোধী। তরুণ পাঠকরা প্রথম ভাগের জন্য হাত তোলেন, উঠতি তরুণেরা দ্বিতীয় ভাগ পছন্দ করেন। প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় খোজা নাসিরুদ্দিনের উপর গল্প লিখে যাব কিনা। এর উত্তর এই বই-এর শেষ লাইনগুলিতে দেওয়া আছে।

লিওনিদ সোলোভিওভ

মার্চ ১৯৫৭

অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি এবং অনেক শস্যক্ষেত্রের মঞ্জরি চয়ন করেছি, কারণ টান জুতো পরার চেয়ে খালি পায়ে হাঁটা অনেক ভাল, ঘরে বসে থাকার চেয়ে দেশ ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করা অনেক ভাল......এবং আমি বলব : ফিরে আসা প্রতি বসন্তে মানুষের নতুন প্রণয়ী বেছে নেওয়া ভাল—কারণ গত বছর যে ছিল আমার বন্ধু, আজ তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে!

সাদি

প্রাচীন মুনি ঋষিরা পৃথিবীতে বই-এর এক অমূল্য ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, যাতে তাঁদের জ্ঞানের শিখা, আমরা আজ যারা পৃথিবীতে বাস করি, তাদের জীবনের জটিল ও বিপজ্জনক পথ আলোকিত করতে পারে। এই বইগুলিতে আমরা প্রায় সব কিছুই পাই : যেমন যুদ্ধ এবং ভূমিকম্প, আশ্চর্যজনক বস্তু এবং ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে; প্রতি পাতা শেখ এবং খলিফা, অজেয় যোদ্ধা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে অলংকৃত, কিন্তু কেবল একজনের ব্যাপারে এই বইগুলি কিছুই বলেনি যদিও তিনি সারা পৃথিবীতে প্রখ্যাত। তিনিই খোজা নাসিরুদ্দিন।

প্রাচীন পণ্ডিতদের এই ভুল আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। সেইসব প্রাচীন দিনগুলিতে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটত যখন দু'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের বইয়ে ভাগ্য ও যশের বীজ বপন করলেও বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে পেতেন অসংখ্য দুঃখ। সেইজন্যেই দূরদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁদের কথা ও চিন্তায় অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন যেমনটি দেখা যায় পরম ধার্মিক মহম্মদ রসুল ইবন-মনসুরের বেলায়. দামাস্কাসে বাসা নেওয়ার পর তিনি *এ ট্রেজার-হাউস অব দি রাইটিয়াস* এই শিরোনামায় একটি বই লিখতে *সুরু* করলেন এবং যখন মহাপাপী উজির আবু ইসখাকের জীবনী লিখছিলেন তখন সহসা জানতে পারলেন যে দামাস্কাসের তদানীন্তন শাসক মাতৃকুলের দিক থেকে সেই উজিরের প্রত্যক্ষ বংশধর। "সময়মত বুদ্ধির জন্য আল্লার জয় হোক!" পণ্ডিত আনন্দ প্রকাশ করে বললেন এবং প্রায় এক

জন সাদা পাতা গুনে প্রত্যেকটির উপর লিখলেন "স্বেচ্ছায়" এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উজিরের ইতিহাস লিখতে সুরু করলেন। যাঁর বংশের পরাক্রমশীল লোকেরা দামাস্কাস থেকে বেশ কিছু দূরে বাস করত। এত সাবধানতার জন্য এই পণ্ডিত অনেক বছর শান্তিতে দামাস্কাসে বাস করতে পেরেছিলেন এবং হাতে লণ্ঠনের মত নিজের মুণ্ডু নিয়ে জোর করে ভবনদী পার হওয়ার পরিবর্তে স্বাভাবিক মৃত্যুর কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

এই বইগুলো খোজা নাসিরুদ্দিনের ব্যাপারে নীরব। সে সব দিনে নিষেধের জগদ্দল পাথর তাঁর নামের উপর ঝুলত। কারণ এই ছিল সে সব দিনের প্রবল পরাক্রমশালী ব্যক্তি যথা খলিফা, সুলতান ও শাহের আদেশ যাঁরা আশা করতেন যে তাঁকে মরণোত্তর যশ থেকে বঞ্চিত করে অনাগত দিনগুলিতে তাঁর উপর তাঁরা প্রতিশোধ নিতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন করার অবকাশ আছে—তাঁদের উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছিল? বিভিন্ন যুগে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেলমান সাভেজি বলেন, "যদি সব প্রতিকূল অবস্থা এক সঙ্গে চক্রান্ত করে তবুও যোগ্য ব্যক্তি তাঁর যশ অর্জন করবেন।"

অন্ততঃ একটি বই আছে যার উপর খলিফাদের কোন হাত নেই—সে হচ্ছে জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি। এই মহাকাব্যে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর নাম অমর করে রেখেছেন।

·

খোজেণ্ট শহরে শির্-দরিয়া নদীর তীরে একটা খোলা মাঠ আছে যেখানে কেউ বাস করত না বা বাগান করেনি, কারণ সেখানে নদী হঠাৎ বাঁক নিয়ে এবং চুপে চুপে তীরের মাটি কেটে প্রতি বছর প্রায় তিন থেকে চার হাত মাটি ধুয়ে নিয়ে যেত। নদী ইতিমধ্যেই প্রায় অর্ধেক জমি কেটে নিয়েছে ও বিশাল সেগুন গাছের কাছাকাছি চলে এসেছে; এই গাছটা এখানে আপনা আপনি জন্মেছিল; এর খোলা শিকড়ের গাঁটগুলো ঢালু জমির কাদামাটির ভিতর দিয়ে জলে এসে পড়েছে। সূর্যের আলোতে অনাবৃত থাকায় ও প্রচুর জল পাওয়ায় সেগুন গাছটা অনেক দূর পর্যন্ত শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছিল, এর ঘন সবুজ পাতা একটু দূরে ধুলো ভরা পথের দু'পাশে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য গাছগুলোকে প্রায় আড়াল করে রেখেছিল। পিপাসায় ক্লান্ত ও গরমে দগ্ধ হয়ে এই গাছগুলো তাদের দুর্বল পাতা নেড়ে মর্মর ধ্বনি তুলত এবং অনেকে সাধারণ মানুষের মত তাদের এই সুখী ও অহংকারী প্রতি-

নদীর দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। "ঠিক আছে", তারা মনে করত, "নদী যখন তীরের মাটি আরও কিছুটা কেটে ফেলবে তখন দাঁড়িয়ে থাকার মত আশ্রয় না পেয়ে, সেগুন গাছটা জলের উপর উল্টে পড়বে ও স্রোতে কোনও বালির চরে ভেসে এসে পচে মরবে। আমাদের সৌভাগ্য যে তীর থেকে এত দূরে জন্মানর জন্য আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকব; আমাদের শাখা-প্রশাখা পাতলা, দেখতেও সুন্দর নয়, এবং পথিকদের শীতল ছায়া দেবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়, তখন আমাদের পাতা হয়তো পথের গরম ধুলোয় ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, আমাদের শিকড় শক্ত শুকনো মাটিতে শুকিয়ে যাবে তবু আমরা তৃপ্ত হব এবং অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তখন থাকবে না কারণ তখন সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান হবে।"

তারা ভুল করেছিল। সেগুন গাছটা উল্‌টে পড়বে না এবং স্রোতেও ভেসে যাবে না। চারপাশের আলগা অংশ ছাড়া জল কিছুই ধুয়ে নেবে না এবং এই বিশাল শিকড়কেও জয় করতে পারবে না; শিকড় নদীর ভিতর বেশ গভীরে গিয়েছিল। সেগুন গাছটা তীরের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যে নদী এটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সেটাই এর চারপাশে উর্বর পলি ফেলবে এবং সেগুন গাছ তীরের উপর আরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আরও মাথা উঁচুতে তুলবে ও চারপাশে শাখাপ্রশাখা আরও ছড়াবে আর রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো উনুনের জ্বালানী হয়ে তাদের জীবনের শেষ ঘনিয়ে আনবে। কিন্তু যখন সেগুন গাছের ছাল ছাড়ানো হবে, যখন শাঁস শুকিয়ে যাবে এবং গুঁড়ির ভিতর রস যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে যাবে তখন এটাকে কাটা হবে না বা জ্বালানীর জন্য করাত টানা হবে না বরং এটাকে সুন্দর বেড়ার মাঝে রেখে পথচারীদের উদ্দেশ্যে লিখে রাখা হবে: "এই সেগুন গাছ খোজা নাসিরুদ্দিন রোপণ করেছিলেন!"

পথচারীরা আরও জানতে পারবে যে খোজেন্ট শহরের শহরতলি রাজ্জোক (যার অর্থ রুটি-খানা), যেখানে রুটিওয়ালারা বাস করে—তার সাধারণ লোকের মাঝে প্রচলিত আর একটি নাম আছে—"খোজা নাসিরুদ্দিনের মহল্লা," কারণ প্রবাদ আছে পুরাকালে তাঁর বাড়ী এখানে ছিল। খোজেন্ট শহরের অধিবাসীরা পথচারীকে জানিয়ে দেবে যে আশত্ শহরে যাবার পথে উত্তরের পাহাড়গুলিতে খোজা নাসিরুদ্দিনের হ্রদ আছে; সেই হ্রদের তীরে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে নাম চোরাক; সেই গ্রামে আছে নাসিরুদ্দিনের সরাইখানা এবং সেই সরাইখানার ঘুলঘুলিতে বাস করে নাসিরুদ্দিনের চড়ুই পাখীরা—

একটি বিখ্যাত চড়ুই পাখীর বংশধর। সেখানে একটি গুহা আছে যার বিচিত্র নাম হল "সাধু চোরদের আবাস", আর আছে "নাসিরুদ্দিনের ঝরণা" এবং "নাসিরুদ্দিনের পায়ে চলা সেতু" ; যেখানে সব কিছুই ছড়িয়ে আছে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যেন মাত্র গতকাল তিনি তাঁর গাধায় চেপে এখান হতে গিয়েছেন।

প্রবল উৎসাহ ও ধৈর্য নিয়ে আমরা এইসব জায়গা দেখেছি। অনেক আচ্ছাদনের নীচে রাত কাটিয়েছি, অনেক অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের গরম করেছি এবং অনেক লোকের সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে কথা বলেছি। ভাগ্য আমাদের অনুসন্ধানে সাহায্য করেছে, আর আজ আমরা তাঁর জীবনের আর এক অধ্যায়ে এসেছি। ইবন-তুফায়েলের ভাষায় বলতে হয়, "যাঁদের হৃদয় আছে আর যাঁরা দেখতে চান ও শুনতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে এই গল্প আদর্শ হয়ে থাকুক।"

প্রথম খণ্ড

সেখান থেকে বণিক ও তাঁর স্ত্রী দূর দেশের উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। তাঁরা পাহাড় ও সমতলভূমি, সমুদ্র ও মরুভূমি, মধ্যাহ্ন সূর্যে ও সূর্যাস্তে পার হয়ে অনেক দূর গেলেন। আল্লা যাত্রাপথে তাঁদের রক্ষা করলেন এবং ত্রয়োদশ দিনে তাঁরা বসরা শহরে এলেন......

হাজার ও এক রাত্রির গল্প

প্রথম অধ্যায়

বোখারা ত্যাগ করে খোজা নাসিরুদ্দিন স্ত্রী গুলজানকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ইস্তানবুল ও পরে আরবে গেলেন। একের পর এক তিনি বাগদাদ, মদিনা, বেইরুট এবং বসরায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, দামাস্কাসে হৈ-হুল্লোড়ের সৃষ্টি করলেন ও পরে এলেন কায়রো শহরে; এখানে তিনি কিছুদিনের জন্য শহরের প্রধান কাজী ছিলেন। কার এবং কেমন ভাবে বিচার করেছিলেন আমরা জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে তার পর প্রায় দু'বছর ধরে মিশরে তাঁর খোঁজ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি অনেক দূরে, অন্য দেশের ভিন্ন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চির পথিক, কোথাও বেশি সময় থামতেন না; সূর্যোদয়ে দেখা গেল সাদা গাধায় গুলজান ও ধূসরটায় নিজে চেপে জিনে পা রেখে যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছেন এবং প্রতি রাত্রে নতুন আশ্রয় খুঁজে বার করেছেন। সকালে হিমে হয়তো কাঁপছেন এবং তুষারাবৃত গিরিপথে হয়তো তুষার-ঝড়ে পড়েছেন, আবার কখনও পাথর-ভরা পাহাড়ের গভীর খাদের পাশে নিথর সূর্যালোক তাঁর মুখ রুক্ষ করে দিয়েছে, আর সন্ধ্যাবেলায় উপত্যকার ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে পাহাড়ী ঝরণার ঘোলা জল তৃপ্তির সঙ্গে পান করছেন, যে ঝরণার উৎস সেদিনই কোন উঁচু পাহাড়ে হয়তো তিনি দেখেছেন।

দেশ ভ্রমণ থেকে কোন দিনও নিবৃত্ত হবেন না এবং এইভাবে পথ চলতে চলতে তাঁর গাধার খুরের সংকীর্ণ রেখায় একদিন সারা পৃথিবী পরিবেষ্টন করবেন এটা চিন্তা করতে তিনি সমর্থ ছিলেন। কিন্তু যে মানুষের বৌ আছে

তার ছেলেও থাকবে এবং খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেননি ; বিয়ের চার বছর পর গুলজানের কোলে তাঁর চতুর্থ পুত্র এল। খোজা নাসিরুদ্দিন আনন্দ করলেন, গুলজান আনন্দ করলেন, নবজাতকের ভাইরা প্রচণ্ড আনন্দ প্রকাশ করল ও হাততালি দিতে লাগল এবং সাদা গাধাটা জয়োল্লাসে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে পৃথিবীতে নতুন প্রভুর আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। তাদের চীৎকারে জানল পালকযুক্ত ও পালকহীন সকল দ্বিপদ জন্তু, সকল চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য জন্তুরা যারা সাঁতার কাটতে পারে বা হামাগুড়ি দিতে পারে। ধূসর গাধাটা শুধু আনন্দ করল না। সে কান দুটো ঘন ঘন নাড়া দিয়ে ও চারপাশের অপরিচিত আনন্দের দিকে পিছন ফিরে মুখ ভার করে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

মাসখানেক পরে আবার তাঁদের পথে দেখা গেল—গুলজানকে সাদা গাধা ও খোজা নাসিরুদ্দিনকে তাঁর ধূসর গাধার উপর। সামনে গাধার কাঁধের কাছে বসল তাঁর বড় ছেলে ; পিছনে গাধার লেজের কাছে বসল দ্বিতীয় ছেলে লেজ থেকে একটু দূরে, কারণ লেজ ধরলে বা টানলে চোরা কাঁটাগুলো গায়ে লেগে লেজের গোছা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে ; তৃতীয় ছেলে ঘোড়ার জিনের ডানদিকের থলেতে ছিল আর চতুর্থজনকে জিনের বাঁ দিকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"গুলজান, আমার গাধাটাকে নিস্তেজ বলে মনে হচ্ছে", খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমার বিশ্বাস তার অসুখ হয়নি, দয়াময় আল্লা আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন।"

"বাজার থেকে একটা ভাল বেত কিনে নাও, দেখবে ঠিক সতেজ হয়ে উঠবে," গুলজান উপদেশ দিলেন।

মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে গাধাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং মনে মনে মনিবের বিরুদ্ধে গুমরিয়ে উঠল।

আর এক বছর কেটে গেল। বসন্ত ফিরে এল এবং দখিনা বাতাসে আপেল ফুল আবার পাপড়ি মেলল ; গোলাপি ও সাদা ফুলের মেলায় বাগান আবার ভরে উঠল, চারদিকে পাখীদের কিচির মিচির আবার শোনা গেল, ছোট্ট ঝরণা দু'কূল ভাসিয়ে দিল, আর জলের শব্দ মাঝরাতে মাদলের গম্ভীর শব্দের মত শোনা গেল। একদিন বিশ্রামের সময় ধূসর গাধাটা যখন বসন্তের নতুন ঘাস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল তখন গুলজানের দিকে চাইতেই লক্ষ্য করল যে তাঁর শরীর

আবার গোল হয়ে যাচ্ছে। তার চরম সন্দেহ যখন সত্য বলে মনে হল তখন হতাশায় খুঁটি উপড়ে ঝোপের দিকে ছুটে পালাল।

সেইদিনই খোজা নাসিরুদ্দিন এই লম্বা কানের জন্তুটার মন-মরা ভাবের কারণ বুঝতে পারলেন।

"সুন্দরী গুলজান," তিনি বললেন। "তুমি যদি তোমার সাদা গাধাটার উপর এই শেষ ছেলে দুটোকে তুলে নাও তবে ভাল হয়।"

সেদিন থেকে সাদা গাধাটা মন-মরা হয়ে চলতে লাগল এবং ধূসর গাধাটা কান খাড়া করে পাক দিতে দিতে ও ঘন ঘন লেজ নাড়া দিয়ে খট খট শব্দ করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

আরও দু' বছর পেরিয়ে গেল এবং দুটো গাধাই মন-মরা হয়ে পড়ল।

"সম্ভবতঃ আমাদের আর একটা গাধা কিনতে হবে?" গুলজান পরামর্শ দিলেন।

"ওগো আমার গোলাপরাণী, এভাবে চলতে হলে পিছনে একটা বিরাট দলের সৃষ্টি হবে!" খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "হায় কপাল, আমার ভয় হয় আমার ঘুরে বেড়ানর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং রোজা-নামাজ নিয়ে দিন কাটাবার সময় হয়ে এসেছে।"

"আল্লার জয় হোক।" আনন্দে গুলজান বললেন। "শেষে তোমার জ্ঞান হল যে এই বয়সে এত বড় একটা পরিবার নিয়ে ঘরছাড়া ভবঘুরের মত ছোটাছুটি করা কত অবাস্তব। আমরা তাড়াতাড়ি বোখারায় গিয়ে বাবার সঙ্গে বাস করব।"

"তাই থাক," তাঁকে থামিয়ে নাসিরুদ্দিন বললেন। "ভুলে যাচ্ছ যে সেই নাম-করা আমির এখনও বোখারায় রাজত্ব করছে এবং নিশ্চয়ই সে রাজদরবারের জ্যোতিষী হুসেন হুসলিয়াকে ভোলেনি। তার চেয়ে বরং কাছাকাছি কোকান্দ বা খোজেণ্ট শহরে বাস করা যাক।"

পাহাড়ের পাশে যেখানে তাঁরা রাতের জন্য তাঁবু খাটিয়েছিলেন সেখান থেকে দেখলে দুটো রাস্তা দেখা যাবে। একটা কোকান্দে যাবার জন্য বড় বাণিজ্য-পথ অন্যটা খোজেণ্টে যাবার সরু পথ। কোকান্দে যাবার বড় রাস্তা ধরে ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে বিভিন্ন পোশাক পরা কাল উটের দল, দু চাকা গাড়ী, ঘোড়-সওয়ার এবং পথিকের দল; খোজেণ্টের পথ নির্জন ও পরিত্যক্ত এবং পথের উপর উন্নত আকাশে সূর্যাস্তের গোলাপি আভা এসে মিশেছে।

আমরা তাড়াতাড়ি কোকান্দে যাব," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"না, বরং খোজেণ্টে যাব," গুলজান বললেন। "বড় শহরের বাজারের গণ্ডগোলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমি বিশ্রাম ও শান্তি চাই।"

দেরীতে হলেও তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কোকান্দ যাবার ইচ্ছা থাকলেও এবং স্ত্রীর মেজাজ জানা থাকায় তাঁর প্রথমেই খোজেণ্ট যাবার প্রস্তাব করা উচিত ছিল। "কি বিশ্রী নির্জন জায়গা!" তিনি বিস্মিত হয়ে হয়তো বলতেন এবং পরদিন সকালেই হয়তো পাহাড়ী পথ ধরে তাঁরা কোকান্দের পথে এগিয়ে যেতেন। যাইহোক, এখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে এবং তর্ক করাও বিপজ্জনক; পণ্ডিতেরা সত্যিই বলে গিয়েছেন, "যে বৌ-এর সঙ্গে তর্ক করলে আয়ু অযথা কমে আসে।"

সুতরাং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন:

"আমি খোজেণ্টে একবার গিয়েছিলাম এবং সেখানকার আঙুরের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা যখন তখন তাই হবে।"

সুতরাং শির-দরিয়া নদীর তীরে খোজেণ্ট শহরের শহরতলি রাজোকে রুটিওয়ালাদের সঙ্গে তাঁরা বাস করতে সুরু করলেন। সরু খাদের মধ্যে থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে এসে বড় নদীটা—যা যুগ যুগ ধরে উপত্যকার অসংখ্য উপকারে এসেছে, হলুদ রং-এর পাক খাওয়া জলের গতি সামনের দিক থেকে বাঁক নিয়ে খোজেণ্ট শহরের পাশ দিয়ে ধীর গতিতে বয়ে চলেছে অসংখ্য গাছ, জন্তু ও মানুষের জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে এবং নদীতীরের কাদা মাখা মাটির গায়ে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ-এর কলধ্বনি তুলে যেন খোজা নাসিরুদ্দিনের ছেলেদের তারা ঘুম পাড়াচ্ছে।

যেদিনের কথা বলছি তখন খোজেণ্টের আগের যশ ও ঐশ্বর্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। এখন এটা একটা ছোট নিঝুম শহর যেখানে ছোট দোকানদার, বাগানের মালি এবং পাগড়ী পরা অসংখ্য বুড়োর দল বাস করে—যাদের মধ্যে আছে অবসরপ্রাপ্ত মোল্লা, মৌলভী, উলেমা প্রভৃতি। বুড়োরা মসজিদে নামাজ পড়ে, সরাইখানায় বসে গল্প করে এবং রাস্তা, গলি ও পার্কগুলিতে টলতে টলতে ঘুরে বেড়ায়; তাদের কম্পিত পায়ের মেলামেশা ও তাদের খকখক কাশির শব্দে সারা শহর ভরে উঠত। একটা শহরে এত বুড়োর সংখ্যা সত্যিই আশ্চর্যজনক। মনে হত যেন তারা অন্য দেশের মাটিকে বঞ্চিত করে কেবল খোজেণ্টের হলুদ মাটিতে

তাদের অস্তিত্ব রাখবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র মুসলিম জগৎ থেকে এখানে এসে জমা হয়েছে।

পরিপূর্ণ পাহাড়ী নদীতে চারদিকে বেষ্টিত হয়ে এবং সামনের পাহাড়ের জন্য উত্তুরে বাতাস থেকে রক্ষা পেয়ে, খোজেণ্ট শহর তার বাগান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র নিয়ে জীবনের ঝড়ঝাপটায় পরিশ্রান্ত মানুষের কাছে স্বর্গ বলে মনে হত এবং সেই জন্যই খোজেণ্টের অধিবাসীগণ ভগবানের আশীর্বাদী এই স্থানের জন্য আল্লার ভজন থেকে কখনও বিরত হতেন না।

সমস্ত শহরে মাত্র একজন লোক ছিল যে একটু ভিন্ন ধরনের—উজাকবাই নামে একজন লোক, যে আগে ছিল সমরখন্দের বাজার সরকার। কিন্তু উজাকবাই ছিল রসকষহীন এক বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ, যে সব সময় বেশ বড় কালো চশমা পরে ঘুরে বেড়াত, চশমায় তার আধখানা মুখ ঢেকে থাকত, কখনও বন্ধুত্ব করত না, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলত না, কখনও কারও বাড়ী যেত না বা কোনও অতিথিকে আপ্যায়িত করত না। তার এই অসামাজিক মনোভাবের জন্য প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করতে সুরু করেছিল যে তার মধ্যে ছিল এক অতি নিষ্ঠুর মন। ছোট ছেলেরা তাকে দেখলেই ছুটে পালাত ও চীৎকার করত, "পেঁচা, চশমা পরা পেঁচা!" কিন্তু সে একটিও শব্দ উচ্চারণ করত না। সে কেবল মাথা নাড়ত এবং তার এই নতুন নামকরণে আনন্দে অল্প হাসত।

হ্যাঁ, উজাকবাই-এর ছদ্মনামের আড়ালে যে মানুষটি ছিলেন তিনিই খোজা নাসিরুদ্দিন। তিনি জানতেন যে এই ছোট শহরে সকলেই সকলকে চেনে এবং তাঁর হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া কথার জন্য বা কোন ভুল পদক্ষেপের জন্য তাঁর পরিবারের উপর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে পারে। সেইজন্য তিনি কাল চশমায় মুখ ঢেকে রাখতেন, ছদ্মনামে দিন কাটাতেন, প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চলতেন এবং এই সবের জন্য খোজেণ্ট শহরকে এক ভয়ানক কয়েদখানা বলে এবং নিজেকে হতভাগা ও ছন্নছাড়া বলে তাঁর মনে হত।

তাঁর মনে দুটি বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী সত্তার জন্য আল্লার কাছে প্রায়ই তিনি অভিযোগ করতেন: ভবঘুরের মত ছোটাছুটি করার দুর্বার ইচ্ছা এবং পরিবারের জন্য অগাধ ভালবাসা। এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির মাঝে বিদীর্ণ হয়ে তিনি যেন এক শহীদ, যিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট হৃদয়ের মাঝে বন্ধ করে রেখেছেন। সত্যিই কার কাছে তিনি অভিযোগ করবেন, কার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করবেন? তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রাণাধিক স্ত্রী গুলজানের সঙ্গে? কিন্তু

আসলে গুলজান এই দুটির একটিকে আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যটির প্রতীক ছিল গাধাটা, যে আস্তাবলে মনের আনন্দে ঢুলত ও ক্রমশঃ মোটা হচ্ছিল। গাধাটা যদিও মানুষের মত কথা বলতে পারত না, কিন্তু সেই একমাত্র প্রাণী যে রাতের বেলায় দুঃখ কষ্টের জন্য মন খুলে চীৎকার করত।

পরের দিনটি আগের দিনের মতই ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন আবার চশমা পরে নিলেন যখন সূর্য আবছা ও অন্ধকার লাগছিল এবং কেনাকাটা করতে বাজার গেলেন। ফিরে এসে উঠোনে, বাগানে বা কাঠের ঘেরা জায়গাটায় বসে সংসারের নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা কিন্তু একান্তই তাঁর। পরিবারের অন্য লোকদের প্রায়ই বাড়ীর কর্তা ছাড়াই নৈশভোজ করতে হয়। তাঁকে হয়তো তখন শির-দরিয়া নদীর তীরে কোন গোপন সরাইখানায় দেখা যাবে। খোজেণ্টের সরাইখানাগুলির মধ্যে এইটিই ছিল সবচেয়ে নোংরা ও কুখ্যাত যেখানে প্রায়ই ভিখারী, চোর, ভবঘুরে ও শহরের অন্যান্য কুখ্যাত লোকেরা আসত। খোজা নাসিরুদ্দিন কিন্তু সেখানে নিরাপদ মনে করতেন।

উনুনে ভেড়ার চর্বি ভরা পাত্র থেকে ঘন ধোঁয়া বার হচ্ছিল। মুখে বসন্তের দাগ ভরা সরাইখানার রক্ষক চোরাইমাল গ্রহণ করত; তার নাকটা ছিল ভাঙ্গা এবং ফুটো দুটো বিশ্রীভাবে উপর দিকে উঠান। উনুনের ফুটন্ত পাত্রের চারপাশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন অতিথিরা ক্রমশঃ আসতে সুরু করেছে। কুঁজো, ঠুঁটো, অন্ধ, বিবশদেহী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কারও সমস্ত শরীর দাদ বা ঘায়ে ঢাকা, কেউ বা লাঠি বা ক্রাচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল এবং তাদের কাপড় জামা থেকে দুর্গন্ধ, বাতাস ভরিয়ে তুলেছিল; এত গন্ধ হচ্ছিল যে লুলির জিপসি উপজাতির সর্দারও তা অনুমান করতে পারত না। মাথায় খুলির টুপি—যাতে ভাজবার মত যথেষ্ট চর্বি ছিল—পরে অতিথিরা সেদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও গালাগালি করতে করতে ও তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার কথা বলতে বলতে বিভিন্ন দিক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরাইখানায় এসে উপস্থিত হচ্ছিল। ধোঁয়া ওঠা আলোর আবছা অন্ধকারে ঝাঁকে ঝাঁকে এই ভিখারীদের জনতার দিকে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বিষণ্ণভাবে চিন্তা করছিলেন: "এই বিরাট ও সুন্দর পৃথিবীর এই অংশটুকুই আমার জন্য রাখা হয়েছে!"

তাঁর সামনে ছিল এক পৃথিবী—বিরাট, বিস্তৃত এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুক্ত। সূর্যাস্ত আবছা হয়ে এলে গোধূলি ঘনিয়ে আসে এবং একটা

শীতল বাতাস শান্ত নদী থেকে ভেসে আসে—রাতের অন্ধকারের কাছে পৃথিবী আত্মসমর্পণ করে এবং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার ঝলমলে তারাগুলো আকাশের অন্ধকার আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর উপর যেন এক স্বচ্ছ স্ফটিকের মত সুতো বুনে চলেছে, হাফিজের কথায় "পরীদের সুতো।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের বাড়ী ফেরার কোন তাড়া ছিল না। আগন্তুকদের প্রায় অর্ধেক তখন নোংরা মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে গাদাগাদি করে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল এবং রক্ষক তখন পাত্রগুলির নীচের আগুন নিভিয়ে দিচ্ছিল; শহরের চারদিকে মোরগেরা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রতিদিনের মত ডাকছিল কিন্তু তিনি তখনও সেখানে বসে ভাবছিলেন ও তাঁর মনের ভিতরের দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তার মাঝে একটা সমঝোতা আনবার ও খোজেণ্ট শহরের অসহ্য বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি জানতেন না যে তাঁর বন্ধন তখন কেটে গিয়েছিল: তাঁর চিন্তাধারা মনের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং যুক্তির মধ্যে দিয়ে কার্যকরী হবার জন্য অপেক্ষা করছিল; ঠিক যেন একটা ঝুলন্ত হিমবাহ, একটু ঠেলা দিলেই চলতে সুরু করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবশেষে ভাগ্য এক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হল যখন অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ঘটে গেল।

সন্ধ্যাবেলা সরাইখানা যাওয়ার পথে খোজা নাসিরুদ্দিন প্রতিদিন এক মূক ও বধির দরবেশকে দেখতে পেতেন যিনি গুহর-শাদের ভাঙ্গা মসজিদের প্রবেশ পথে নলখাগড়ার এক চালার নীচে বসে থাকতেন। বাইরে থেকে তিনি একজন সাধারণ দরবেশ এবং বাজারে, পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে যারা ঘুরে বেড়াত বা মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে জমায়েত হত এবং যাদের সংস্পর্শে এসে ভক্তদের হৃদয় ভক্তিতে ভরে যেত ও টাকার থলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসত সেইসব জাত ভাই দরবেশদের থেকে তিনি একটু পৃথক ছিলেন। আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে তিনি যে মসজিদটা পছন্দ করেছিলেন সেটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় কেউই সেখানে আসত না এবং ভালভাবে তাঁর ব্যবসা চালাবার পক্ষে এই স্থান উপযুক্ত ছিল না। খোজা নাসিরুদ্দিন প্রতিদিন যে আধুলিটা দিতেন দরবেশ নীরবে মাথা নেড়ে এবং বুড়ো বয়সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে

গ্রহণ করতেন ; তাঁর চোখ ছুটো দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যেন আবার শিশুসুলভ সরলতা ফিরে পেয়েছে ; পরে মাছুরটা তুলে নিয়ে তিনি মসজিদে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন যেখানে ভগ্নস্তূপের মাঝখানে তিনি বাছুড় ও পেঁচাদের সঙ্গে নির্জনতা ভাগ করে নিতেন।

একদিন এই মূক ও বধির দরবেশ হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। শীতের শেষে এক আবছা গোধূলিতে এই ঘটনা ঘটল ; মেঘে সূর্যাস্তের আকাশ ঢাকা পড়েছিল, ঝিরঝিরে বৃষ্টি বাঁকাভাবে পড়ছিল এবং প্রচণ্ড বাতাস গাছের শাখা প্রশাখায় হিস হিস শব্দ করছিল, জলাশয়ের জলে ঢেউ তুলেছিল ও বুড়ো দরবেশের মাথার উপরের চালার নলখাগড়াগুলো উল্টেপাল্টে পতপত শব্দ করছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর সামনে থামলেন, আগের মত আধুলি বার করতে পকেট হাত পুরলেন কিন্তু বার করবার আগেই বৃদ্ধ দরবেশ তাঁর হাড় জিরজিরে হাত বার করে আন্তরিকতার স্বরে বললেন, "ছুঃখ করো না খোজা নাসিরুদ্দিন, আর কত দিন পর তুমি তোমার কাল চশমা ছুঁড়ে ফেলবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর চোখ ছুটো হঠাৎ বড় হয়ে গেল ও ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে গেল, হাত পকেটে ঢুকে গেল। দরবেশগিরির সব কিছুই তিনি জানতেন, তাই এই মূক ও বধিরকে কথা বলতে দেখে তিনি অবাক হননি কিন্তু এই বুড়ো কি করে তাঁর নাম জানলেন?

খোজা কি ভাবছেন তা দরবেশ বুঝতে পারলেন।

"ভয় পেও না, খোজা নাসিরুদ্দিন!" তিনি বললেন, তাঁর ছুর্বল চোখ ছুটোর গভীরে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা খেলে গেল। "তোমার সাহায্য পাবার আশায় অনেকদিন আগে থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত সফল হইনি, যদিও আমি তোমাকে আগে অনেকবার দেখেছি। আমি তোমাকে বোখারায় দেখেছি, তখন আমি লাবি-হাউজের পিপের পাশে পাত্র নিয়ে বসেছিলাম। আমি তোমাকে সমরখন্দে দেখেছি......"

"থামুন!" খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন, দরবেশের বলা প্রতিটি কথায় তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে যাচ্ছিল। "কেমন করে আপনি আমার এখানে থাকার কথা জানলেন? আপনি আমার মন অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুললেন।"

"মন থেকে ভয় দূর করে ফেল! আমি ছাড়া এই অঞ্চলে আর কেউ তোমার অজ্ঞাতবাসের কথা জানে না। আমাদের মূক সাধু সমাজের এক গুরু ভাই আমাকে এই কথা বলেছে। প্রথম শীত পড়ার সময় একদিন যখন সে বাজার

দিয়ে যাচ্ছিল তখন এক মুটে তার মাথার বোঁচকার ধাক্কায় তোমার চোখের চশমা ফেলে দেয় সেই সময় সে তোমাকে চিনতে পারে।"

"মনে পড়েছে!" খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "কিন্তু আপনার গুরুভাই-এর দৃষ্টি খুব প্রখর কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাকে চিনতে পেরেছে। আপনি কি নিশ্চিত যে সে মূক ও বধির সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছাড়া 'বেশী শোনা ও বেশী বলা' কোন সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয়?"

"পাপ কথা বলবে না!" দরবেশ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন। "তিনি এক-জন ধার্মিক গুরুভাই, যার স্মৃতি আমার কাছে পবিত্র, যিনি এই নশ্বর জগৎ থেকে ইতিমধ্যেই অন্য জগতে চলে গিয়েছেন।"

"আমাকে ক্ষমা করুন, মহর্ষি," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন, মনে মনে ইতি-মধ্যেই দরবেশের প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং তাঁকে বিশ্বাস করতে সুরু করেছেন। "এখন বলুন, কেন আজ আপনি কথা বললেন এবং আগে কেন বলেননি?"

"আমাদের প্রথা অনুযায়ী আমাকে বছরে তিনশো তিষট্টি দিন মৌন হয়ে থাকতে হবে," বৃদ্ধ দরবেশ বললেন। "তুমিই হচ্ছ প্রথম লোক যার সঙ্গে আমি এক বছরের নীরবতার পর কথা বললাম। এই দুটো দিনের আজই প্রথম দিন যেদিন আমি ঠোঁটের উপর থেকে সব বাধা সরিয়ে নিয়েছি। আগেও অনেকবার এ রকম দিনে আমি চুপ করে থাকতাম যদিও আমার মন তোমার দিকে সর্বদাই আকৃষ্ট হত এবং আমার প্রাণ চোখের জলে ভরে যেত।"

"বলুন, আপনার কি দুঃখ, আপনি আমার কাছে কি সাহায্য চান!" বৃদ্ধের কথায় বিচলিত হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "সম্ভবতঃ আপনার অর্থের প্রয়োজন? আমার কাছে এখন প্রায় দেড়শো টাকা এক জায়গায় লুকানো আছে যা আমার স্ত্রীও জানে না।"

"আমি একজন দরবেশ, আত্মিক উন্নতি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই," সম্ভ্রমের সঙ্গে বৃদ্ধ বললেন। "না, আমি তোমার কাছে অর্থ চাইছি না। যাই হোক্ এই শীতে পথের উপর এসব কথা বলা যায় না। আমার সঙ্গে এস।"

তাঁরা ভাঙ্গা মসজিদের ভিতর ঢুকলেন।

বৃদ্ধ তাঁর অতিথিকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এলেন যেটা ভূমিকম্পের হাত থেকে আশ্চর্য্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছে; তিনি চকমকির সাহায্যে একটা প্রদীপ জ্বালালেন। খোজা নাসিরুদ্দিন দেখলেন ঘরের কোণে কিছু খড় পড়ে

আছে— সম্ভবতঃ বৃদ্ধের বিছানা—এবং পানীয় জলের জন্য একটা মাটির কলসী ও একটা মাটির পাত্রে কিছু পচা রুটির টুকরো যার ধারগুলো ইঁদুরে ঠুকরে খেয়েছে। ঘরে আর কিছু ছিল না; অবশ্য দরবেশ জীবনের জ্ঞান ও গভীর সাধনায় অনুসন্ধানরত বৃদ্ধের এর বেশী কিছু প্রয়োজন ছিল না।

বৃদ্ধ রুটির টুকরোটা হাতে তুলে নিয়ে ইঁদুরের ঠোকরান অংশ ভেঙে হাতের তালুর উপর রাখলেন ও গুঁড়োগুলো এক কোণে ইঁদুরের গর্তের সামনে ছড়িয়ে দিলেন। পরে তিনি রুটিটা ভেঙে দু' টুকরো করে একটা অংশ অতিথিকে দিয়ে বললেন, "কথা বলার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

বাইরে বাতাস গর্জন করছিল এবং ভাঙ্গা অংশের ভিতর দিয়ে ঘরে এসে প্রদীপের শিখা কাঁপিয়ে তুলছিল; ছায়াগুলো দেয়ালে ও ঘরের ছাদে নাচছিল, এবং বৃদ্ধের খড়্গের মত নাক সমেত মুখটা কখনও আড়াল হচ্ছিল আবার কখনও বা দেখা যাচ্ছিল।

সেখানে সেই ছোট ঘরটার মধ্যে, গর্জনরত বাতাস, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দ এবং খড়ের গাদায় ইঁদুরদের ছোটাছুটি ও চিঁ চিঁ শব্দের পরিবেশে তাঁরা কথা বলতে সুরু করলেন। বৃদ্ধ এক কোণে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর খড়ের গাদার নীচে থেকে একটা পুঁটলি বার করলেন এবং সেটা খুলে মেঝের উপর গাদা করে রুপোর টাকা রাখলেন।

"আমার পাত্রে তুমি প্রতিদিন যে টাকা রাখতে এগুলি সে সব টাকা। আমি সমস্তই জমিয়েছি এমন কি কালকের টাকা পর্যন্ত। এগুলো নাও এবং তোমার স্ত্রীর না-জানা দেড়শো টাকা এর সঙ্গে রাখ।"

"আমি কখনও ভিক্ষার টাকা ফিরিয়ে নিইনি", খোজা নাসিরুদ্দিন প্রতিবাদ করে বললেন। "আপনার কাছে টাকা রাখুন এবং যদি সময় আসে তবে বিরাট পরিবারের চাপে জর্জরিত কোন দরিদ্রকে দান করে দেবেন। এখন বলুন আপনি আমার কাছে সাহায্য চান?"

বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন, দীর্ঘশ্বাস থেকে বোঝা গেল তাঁর চিন্তাধারা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল; প্রদীপের সলতে কালিতে ঢাকা পড়ে পতপত করে উঠল ও দপ দপ করে কয়েকবার জ্বলে শিখা বেশ ছোট হয়ে এল।

খোজা নাসিরুদ্দিন কাঠি দিয়ে সলতের কালি ফেলে দিলেন এবং প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হয়ে বৃদ্ধের মুখ আলোয় ভরে তুলল।

তিনি উপর দিকে চাইলেন।

"আগে আমার কথার উত্তর দাও, খোজা নাসিরুদ্দিন, তুমি কি তোমার ধর্মে বিশ্বাস আনতে পেরেছ ?"

"আমার ধর্ম-বিশ্বাস ?" খোজা নাসিরুদ্দিন পুনরায় উচ্চারণ করলেন, পরে অবাক হয়ে বললেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। ইসলাম আমার ধর্ম, যদিও আমি স্বীকার করব যে আমি ধর্মের বিরুদ্ধেও কাজ করেছি।"

"এটা সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাস", বৃদ্ধ উত্তর দিলেন। "প্রত্যেক জাগ্রত মানুষের আর একটা বিশ্বাস থাকে, যা নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমি তোমার নিজস্ব বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

খোজা নাসিরুদ্দিন সবিনয়ে স্বীকার করলেন যে তাঁর কোন নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস নেই।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম", বৃদ্ধ বললেন। "যে সব বিপদে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি সেইখানেই থাকে মুক্তির পথ। নিজের ধর্ম-বিশ্বাসকে জান, ঘোর অন্ধকার আলো হয়ে উঠবে, হতাশা হবে আশা এবং বিশৃঙ্খলা হবে শৃঙ্খলা। তোমার জীবন, খোজা নাসিরুদ্দিন, কর্মময় কিন্তু এতদিন তা বাইরের জগতের কাজেই লেগেছে, তোমার আত্মা উদ্দেশ্যহীন হয়ে সাধারণ জ্ঞান ও জাগতিক মোহে তৃপ্ত ছিল। তোমার কর্মজীবন এখন অন্তর্মুখী, আত্মাকে স্পর্শ করেছে, যেন তার নিজের বাহনকে খুঁজে পেয়েছে এবং যার দুই পাশে পা ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে বোখারা থেকে ইস্তানবুলে—যেন বোখারা হচ্ছে কারণ এবং ইস্তানবুল হচ্ছে ফল অথবা বাগদাদ হতে দামাস্কাস—যেখানে বাগদাদ সন্দেহ এবং দামাস্কাস হচ্ছে অস্বীকার। নিজের ধর্ম-বিশ্বাসকে জান, খোজা নাসিরুদ্দিন, যদি না পাও তবে আমি তোমাকে পেতে সাহায্য করব।"

"হে দরবেশ, আপনি আমার আত্মার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন। আপনি আমার মনের পোষণ করা সমস্ত ইচ্ছাই জানেন।"

"ঠিক তাই," বৃদ্ধ বললেন। "জেনে রেখ তোমার যাত্রাপথের সকল চিন্তাধারারই আমি সঙ্গী, এবং তোমার জীবনের সব কাজেই অংশ গ্রহণ করি। তুমি যেখানেই থাক বা যাই কর, তোমার প্রতিটি কাজ এমন কি তোমার উচ্চারণ করা প্রতিটি শব্দ আমার কাছে আসে এবং আমার মনে খোদাই হয়ে থাকে, পরে তোমার হিতার্থে প্রতিফলিত হয়। আমার ভিতর তুমি এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা হয়ে

বিরাজ কর, যে এই পার্থিব জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে এসেছে এবং যখন ক্রোধ ও কাম পরিণত হয়েছে শান্তি ও জ্ঞানে।

"মহান আল্লা! সত্যিই আশ্চর্যের যে পথের উপর তাঁকে দেখা যাবে এক বৃদ্ধের রূপে ও দরবেশের ছদ্মবেশে!"

খোজা নাসিরুদ্দিনের মাথা অল্প ঘুরছিল কারণ দরবেশের আশ্চর্য কথাগুলো তাঁকে বিহ্বল ও হতবুদ্ধি করে তুলেছিল।

যাইহোক, এই হচ্ছে আরম্ভ। তাঁকে হয়তো আরও অনেক আশ্চর্য কথা শুনতে হবে।

"কি কাজের জন্য আপনি আমাকে খুঁজে বার করেছেন?"

দরবেশ তাঁর পাকা চুলে ভরা মাথা নোয়ালেন।

"সময় হয়ে এসেছে, বেশ কাছেই, যখন কথা বলা ও নিঃশ্বাস নেওয়ার বদলে আমি কবরের ভিতর নিজেকে শায়িত করব," গলায় বেশ খানিকটা দুঃখের আভাস ফুটিয়ে তিনি বললেন। "দূরদৃষ্টি আমাকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলেছে এবং চোখের জলে আমি অনুনয় করছি: আমাকে সাহায্য কর!"

"কি করে? কবর থেকে আপনাকে তুলে আনব?"

"না, আমার আত্মাকে আবার মরজগতে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা কর, যে জগৎ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি যুগ যুগ কষ্ট করেছি। এই অনন্ত সময়ে আমার আত্মা কত বার অবতীর্ণ হয়েছে, পরিপূর্ণ নির্বাণের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছে আর আজ আমার অবহেলার জন্য আমার আত্মাকে আবার সেই প্রথম অপবিত্র দশা থেকে চক্রাকারে সমস্ত পর্যায় পরিক্রমা করতে হতে চলেছে।"

"দয়াময় আল্লা!" মাথা নাড়তে নাড়তে বিস্ময়ে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন। "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিছুই না। সোজা ভাষায় বলুন—আপনি আমার কাছে কি চান?"

"আমার আত্মার মুক্তি তোমার হাতে!" বৃদ্ধ আবার বললেন। "বুঝতে পারছি যে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না মূক ও বধির সমাজের জানা কিছু গোপন তথ্য আমি তোমাকে বলি।"

"ঠিক আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন স্বীকৃতি স্বীকার করলেন কারণ বৃদ্ধের জন্য এর চেয়ে আর কোন যোগ্য উত্তর ছিল না। "ঠিক আছে, আমি আপনার গোপন কথা শুনব।"

"তাহলে এস সত্যের নামে সুরু করা যাক!" দরবেশ গম্ভীর সুরে বললেন।

"প্রথমে স্থান বদল করা যাক কারণ আমার ইঁদুরগুলো রাতের খাবারের জন্য গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন স্থান বদল করলেন এবং ইঁদুরগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে নৈশভোজ সুরু করল। পরে বৃদ্ধ প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত দিয়ে দাড়ি মসৃণ করতে লাগলেন ও বললেন :

"শুভবুদ্ধি আমাদের আলোচনা পরিচালনা করুক, তোমাকে বোধশক্তি দিক ও আমাকে সরলভাবে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা দিক।"

তিনি চোখ বন্ধ করে বেশ কয়েক মিনিট নীরব রইলেন, তাঁর মুখে একটা পবিত্র ভাব ফুটে উঠল যেন তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কোন গোপন বাণী শুনছেন। পরে তাঁর মুখ পরিষ্কার হয়ে উঠল এবং একটা আঙুল উপর দিকে তুললেন যেন অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

আত্মার অবতীর্ণ হওয়ার গোপন খবর বৃদ্ধের আগেই খোজা নাসিরুদ্দিন ভারতীয় দরবেশদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কিন্তু সৌজন্যের জন্য তিনি চুপ করে রইলেন। অকারণে তাঁর মন তাঁর পরিবারের ও আগামী বসন্তের কথা ভাবছিল এবং বৃদ্ধের বক্তৃতা অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা একঘেয়ে শব্দের মত শোনাচ্ছিল, যেন চরখার একটানা গুনগুন শব্দ এবং কথাগুলোও যেন অস্পষ্ট। এক সপ্তাহ পরেই দখিণা বাতাস বইবে ভেবে খোজা নাসিরুদ্দিন গুন গুন করে উঠলেন; রাস্তা গরম হয়ে উঠবে এবং গিরিপথে বরফ ছড়িয়ে পড়বে। আরও এক সপ্তাহ পরে সারি সারি গাড়িগুলো দূর পথে এগিয়ে চলবে এবং যাযাবররা দলবল নিয়ে যাত্রা করবে।

চরখার মত শব্দটা তখনও চলছিল এবং মিনিটখানেক পরে হালকা নাক ডাকার শব্দের মাঝে মাঝে নাক থেকে বেরিয়ে আসা একটা মৃদু শব্দ ঘর ভরে তুলল।

খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে পড়ল, তাঁর মাথার টুপি বাঁ চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, তাঁর মাথা ঢলে পড়ল ও কাঁধ দুটো নীচের দিকে ঝুলে পড়ল। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি ছায়ায় বসেছিলেন এবং বৃদ্ধ তাঁর এই অসৌজন্যমূলক ঘুম খেয়াল করেননি। কিন্তু যে গোপন তথ্যের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে ফেলা হল তা তাঁর কাছে এবং সেই কারণে আমাদের কাছেও অজ্ঞাত থেকে গেল।

তিনি ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর দেখা স্বপ্ন যে কোন সম্ভাব্য ঘটনার কাছাকাছিও ছিল না। তিনি রাস্তার স্বপ্ন দেখছিলেন, যে রাস্তা জাগ্রত অবস্থায় তাঁর চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখত, তাঁর প্রিয় বাজারগুলির শব্দ, মরুপথে সারি সারি উট এবং গিরিপথে ভ্রমণকারীরা যেতে যেতে কেমন করে একই দড়ি ধরে ঘন বাষ্পপূর্ণ মেঘ পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তারই স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি দেখছিলেন দক্ষিণা সমুদ্রের উপর নীল দাগ, মসৃণ স্ফটিক-শুভ্র ঢেউ জাহাজের সামনে নীচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, জাহাজের পাশে হালের শিকলের শব্দ, ছোট তুর্কী বাণিজ্য-পোতগুলির পালে বাতাসের ঝটপট শব্দ……

মাথার টুপি খোজা নাসিরুদ্দিনের মাথা থেকে গড়িয়ে কোলের উপর এসে পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠলেন।

দরবেশ কথা বলে চললেন :

"প্রশ্ন করা যেতে পারে : পৃথিবী ত্যাগ করে আমাদের আত্মা কোথায় আশ্রয় পেতে পারে এবং পুনরায় পৃথিবীতে আসার আগে কোথায় বাস করে? এর উত্তরে আমি বলব : আকাশের নক্ষত্র যথা তারাদের কি হয়? আমরা পৃথিবীতে আসি তারা থেকে এবং তারাতেই ফিরে যাই। আমরা নক্ষত্রলোকের যাযাবর, খোজা নাসিরুদ্দিন! সেই জন্যই নক্ষত্রখচিত আকাশ আমাদের প্রলুব্ধ করে এবং ভাবাবেগে ভরিয়ে তোলে, কারণ আমরা যা দেখি তা অনন্ত ও অসীম এবং আমাদেরই আশ্রয়স্থল যেখানে আমরা অমরত্ব পাই।"

খোজা নাসিরুদ্দিন ঠিক করলেন যে তাঁর নির্লজ্জ ঘুমকে চাপা দেবার জন্য বৃদ্ধ দরবেশকে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে।

"হে তপস্বী, আমি প্রায়ই আকাশ থেকে তারা পড়তে দেখেছি। এ ঘটনাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করব? যে তারা ভেঙ্গে এসে পড়ল সেটাতে যদি আত্মা আগের কোন অবতার অবস্থায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তবে ভাল, কিন্তু যদি আত্মা সেই তারাতেই আশ্রয় নিতে যেতে চায় তবে কি হবে? তাহলে আমার আত্মা পার্থিব সংসারের ওপারে কোথায় আশ্রয় নেবে এবং যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মা সেই তারাকে দেখতে না পায় তবে কি করবে?"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

"তুমি মূর্খের মত যুক্তিহীন প্রশ্ন করে আমার চিন্তার জাল না ছিঁড়ে যে নিষ্ঠার সঙ্গে আমার কথা বুঝবার চেষ্টা করছিলে তার জন্য এই মাত্র তোমার

প্রশংসা করতে যাচ্ছিলাম," তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন। "কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, মাঝরাতে মুরগী ডাকতে সুরু করেছে, প্রহরীরা ঢোল বাজিয়ে অধিবাসীদের আগুন নেভাতে নির্দেশ দিচ্ছে। নিরাপদে বাড়ী যাও এবং আমি যে গোপন তথ্য তোমার কাছে প্রকাশ করলাম তা ভেবে দেখবে ; আজ সন্ধ্যেবেলায় আবার এস যাতে আমরা আবার আলোচনা করতে পারি।"

খোজা নাসিরুদ্দিন উঠে নীচু হয়ে দরবেশকে নমস্কার করলেন এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বাইরের রাত ঠাণ্ডা বাতাসে ভরা ও ঘুটঘুটে অন্ধকার এবং অলস আত্মা ও মন যেমন অজ্ঞানতায় ডুবে থাকে সেই রকম দুর্ভেদ্য। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে এবং মেঘ হালকা হয়ে এসেছে, পশ্চিমের একটা ভাঙ্গা মেঘের মাঝখান থেকে একটা তারা উঁকি মারছিল ভয়ে ও অশ্রুসজল নয়নে। ভিজে চোখের পাতা মেলে অবাক দৃষ্টিতে নীচের ঠাণ্ডা কাল পৃথিবীর দিকে চেয়েছিল ও তার সুন্দর সৌজন্যমূলক দৃষ্টির মত আলোর কিরণ দেখে খোজা নাসিরুদ্দিন বিচলিত হয়ে উঠলেন ও ইচ্ছা করলেন যে যদি মহাজাগতিক তারকামণ্ডল জীবনের চরম পরিণতি হয় তবে তাঁর আত্মাও যেন সেখানে আশ্রয় নেয়। "হে সুন্দর ছোট্ট নীল তারা, যখন আমার দিন ঘনিয়ে আসবে সেদিন আমাকে কৃপা করিও!" তিনি মনে মনে সম্বোধন করলেন ; তাঁর অমর আত্মা যখন আকাশচুম্বী উচ্চতায় উঠেছে, নশ্বর দেহ তখন অনেক নীচে একটা জরাজীর্ণ দুই থাম সমেত পায়ে-চলা সেতুর উপর পিছলে পড়ে ছলাৎ করে বরফ-ভরা একটা ঝরণার জলে এসে পড়েছে। "শয়তানই জানে এই ঘন অন্ধকারে তুমি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে!" গুলজান আগুনের উপর কাপড় মেলতে মেলতে তিরস্কার করে বললেন ; তিনি চুপ করেছিলেন ও মনে মনে সেই বৃদ্ধকে ও তার আধ্যাত্মিক বক্তৃতাকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর জন্যই এক রাতের বেলায় তিনি এই শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়েছেন⋯ ⋯

যাইহোক পরের দিন সন্ধ্যায় আবার তাঁকে সেই ঘরে বসে দরবেশের দ্বিতীয় উপদেশাবলী শুনতে দেখা গেল।

এবার তিনি জানলেন যে প্রতি বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর দেহের পবিত্রতা অর্জনের জন্য এবং দেহের ভাবী উচ্চ মার্গে প্রবেশের জন্য আত্মাকে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম পালন করতে হয়।

"নশ্বর দেহের জন্য," বৃদ্ধ বললেন, "এর নিয়ম হচ্ছে কার্যকরী শুভ কামনার

নিয়ম। জেনে রেখ পৃথিবীর আগামী সুখী দিনগুলি পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে আমি বলব এঁরা হচ্ছেন সচেষ্ট এবং উদ্যোগী দরবেশ, কারণ এঁরাই পৃথিবী থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যায় দূর করবেন। খোজা নাসিরুদ্দিন, তুমি এই মহান সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন, সেজন্য পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব এমন কিছু যেন করে যা কয়েক পুরুষের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী গভীর কৌতুহলের সঙ্গে শুনছিলেন যদিও এই পৃথিবীতে যে স্বর্গীয় পারিবেশের কথা তিনি বলছিলেন তা আগামী পাঁচ লক্ষ বছরের আগে হচ্ছে না। বৃদ্ধ ফকির তাঁর নিজের অমরত্বের সঠিক তথ্য জানতেন এবং সেইজন্য শতাব্দী ও হাজার বছর নিয়ে অত সহজ ভাষায় কথা বলতে পারতেন, যদিও সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধান খোজা নাসিরুদ্দিনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। পৃথিবীকে নিজের বাড়ীর মত মনে করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন এবং কখনই পৃথিবীর পথে পথে শুধু পথিক হিসাবে নিজেকে মনে করতেন না; সেইজন্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীতে তিনি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। পাঁচ লক্ষ বছর! এই দীর্ঘ সময় চিন্তা করতেই মনের দৃষ্টি আবছা হয়ে উঠছিল।

মাঝ রাত ঘনিয়ে আসছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন বৃদ্ধ ফকিরকে স্বর্গীয় আলোচনা থেকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে চাইছিলেন এবং সেই কারণেই আজ এই ঘরে তাঁরা মিলিত হয়েছেন।

"হে দূরদ্রষ্টা, আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছি," তিনি সসম্ভ্রমে বললেন। "আমার ধারণা……আমার নিশ্চিত ধারণা, সবিনয়ে জানাচ্ছি আমি বর্তমানে এমন একটা অবস্থায় আছি যে আপনি যে সাহায্য আমাব কাছে চান তা করতে আমি সমর্থ। ভয়ে ভয়ে বলছি যে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে, সময় চলে যাচ্ছে—সুতরাং দয়া করে আপনার বক্তব্য আমায় বলুন।"

বৃদ্ধ মাথা নোয়ালেন।

"এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।"

"বলুন! মানুষের করার ক্ষমতা থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা করতে চেষ্টা করব। যদি মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অল্প বাইরেও হয় তাহলেও আমি তা করব।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বৃদ্ধ বলতে সুরু করলেন।

"তখনকার দিনে, যখন আমি মৌন সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম, যখন

আমি ধনী ও দুর্নীতি পরায়ণ ছিলাম এবং ভোগ ও পাপে দিন কাটাতাম, যখন আমার পার্থিব সম্পদ দীন দরিদ্রকে বিলিয়ে দিয়ে অর্ধনগ্ন হয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াবার চিন্তা মনে আসেনি—সেই সব দিনে আমার ধন সম্পদের মধ্যে কারাখানায় পাহাড়ের উপর আমার একটি হ্রদ ছিল। একদিন,—উঃ সেদিন ছিল আমার সবচেয়ে দুর্দিন—পাশা খেলতে গিয়ে আগাবেক নামে একজনের কাছে সেই হ্রদ হারালাম, যে লোকটির মধ্যে ছিল ড্রাগনের মত পৈশাচিকতা ও মাকড়সার মত নিষ্ঠুরতা। সেই হ্রদের অধিকার পেয়ে আগাবেক তার তীরে বাড়ী তৈরি করল ও জমিতে জলসেচের জন্য হতভাগা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এত বেশী খাজনা আদায় করতে লাগল যে তাদের অনেকেই দরিদ্র হয়ে পড়ল এবং কেউ কেউ সর্বস্ব হারাল……।"

একটা চাপা কান্না বৃদ্ধের কণ্ঠ কয়েক মিনিটের জন্য রুদ্ধ করল। ভাবাবেগ দমন করে তিনি বলে চললেন :

"প্রতি বছর বসন্ত আসার সময় সেই লোকটার লোভ ও অত্যাচারের খবর আমার কানে আসতে লাগল। আমার কষ্ট হল, কান্না পেল, বিমর্ষ হয়ে পড়লাম, কিন্তু আমি যা করেছি তা সংশোধন করতে পারলাম না। এই অন্যায় আমার উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে এবং যখন আমার পার্থিব অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য কোন ভাবী উচ্চলোকে আমার যাওয়া ব্যাহত হবে, কারণ কোন আত্মা চরম পবিত্রতা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না পৃথিবীতে তার ফেলে আসা কোন অন্যায় সংশোধিত হয়……।"

"বুঝতে পারছি !" খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন, মনে হল অন্য কোন উচ্চলোকে যাবার জন্য বৃদ্ধ যেন পাখা মেলেছেন। "আপনার ইচ্ছা আমি আগাবেকের কাছ থেকে সেই হ্রদটা নিয়ে নিই ? আপনার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা না শুনলে আমার যাযাবর মন কিছুতেই এ কাজ করত না। তাহলে, শুনুন : আমি এই আগাবেককে আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই বছরের শেষেই তার আয় যথেষ্ট কমিয়ে দিব। এখন বলুন, আপনার এই হ্রদ কোথায় ?"

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতায় খোজা নাসিরুদ্দিন মাঝ রাতের মুরগিদের গান শুনতে পেলেন।

বৃদ্ধের দ্বিতীয় এবং শেষ দিন শেষ হয়ে এল এবং তাঁর প্রতিজ্ঞামত তাঁর ঠোঁট আগামী বসন্তের আগে আর একবারের জন্যও খুলবে না।

"একটা কথা!" খোজা নাসিরুদ্দিন ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। "আর একটি কথা—কোথায়?"

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না।

"হে সাধু, আপনি সবকিছুই বললেন, বিরাট বক্তৃতা দিলেন ভ্রাম্যমান তারা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলো নিয়ে, কিন্তু একটি মাত্র কথা যেটি সবচেয়ে দরকারী সেটিই উচ্চারণ করতে পরেলেন না। আপনি একটু দেরী করে ফেললেন।"

বৃদ্ধ ফকির দুই হাতে মুখ ঢেকে কোন শব্দ উচ্চারণ না করার ভঙ্গিতে দুঃখ ও ও হতাশা প্রকাশ করলেন।

একটা উষ্ণ সান্ত্বনার স্রোত খোজা নাসিরুদ্দিনের হৃদয়ে বইতে লাগল, একটা লজ্জার ঢেউয়ে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আমাকে ক্ষমা করুন!" ফকিরের কাঁধ দুটো স্পর্শ করে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "সান্ত্বনা নেবেন—আপনার হ্রদ ফরঘানার পর্বতে অবস্থিত, এই-টুকুই যথেষ্ট; আমি সেই হ্রদ ও আগাবেককে খুঁজে বার করব। আমার আত্মার লক্ষ্য তারার শপথ নিয়ে বলছি! আমার ছোট বাগানে পেস্তার ফুল ফোটা মাত্রই আমি যাত্রা সুরু করব। আপনি আপনার আত্মার মুক্তি সাধনায় ধ্যান করুন ও বাকীটুকু আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

রাতের অন্ধকারে বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা মনে করতে গিয়ে তিনি একবার হাসলেন, পরের মুহূর্তে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। "এই দরবেশ কি একজন সাধু, অথবা পাগল?" মনে মনে প্রশ্ন করলেন। রাত্রি অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও ভ্যাপসা ছিল, কিন্তু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ও তারাদের উজ্জ্বল আলো দেখে বসন্ত যে এগিয়ে আসছে বেশ সহজেহ বোঝা গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর ছোট রাস্তাটায় বাঁক নিলেন। এখানে রাস্তার ধারে অতি পরিচিত একটা ফাঁপা পপলার গাছ আছে—যেটা অনেক দিনের, বোঝা যায় গাছের ছালের উপর দাগ দেখে। ঠিক সেই সময় গাছটা দেখা যাচ্ছিল না, কারণ জমি, বাড়ী, বেড়া সমস্তই অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল; কিন্তু গাছটার শাখা প্রশাখা সমেত মাথাটা গোছা গোছা তারায় ভরা আধো-অন্ধকার আকাশের সামনে, ঢেউয়ের মত তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। খোজা নাসিরুদ্দিন লাফ দিয়ে পপলার গাছের নীচের একটা ডাল ধরে সযত্নে বাঁকালেন যাতে ডালটা ভেঙ্গে না যায়। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই গাছটা প্রাণহীন

ছিল, দারুণ শীতে মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ ছিল, কিন্তু এখন কুঁড়িহীন গন্ধভরা পাতাগুলো তাঁর হাতের ফাঁকে বেরিয়ে আসছিল। দাগ ভরা গাছের ছালের কাছে কান পাততেই তিনি একটা ক্ষীণ, কোন রকমে শোনা যায় এই রকম একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন ; মনে হল যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। এটা হয় মাঝ রাতের বাতাসের গুন গুন শব্দ নয়ত গাছের রস চলাচলের শব্দ যা গাছটার শিকড় থেকে মাথা পর্যন্ত সবেমাত্র বইতে সুরু করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সেদিনের মনে রাখার মত কথাবার্তার পর খোজা নাসিরুদ্দিন আর কোন-দিনও বৃদ্ধ ফকিরের পাত্রে কোন টাকাপয়সা দেননি, কিন্তু প্রতিদিনই এক খণ্ড সাদা কাপড়ে ঢেকে এক টুকরো যবের রুটি বৃদ্ধ ফকিরের জন্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আগের মতই বৃদ্ধ নীরবে মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন ও খানিকটা আশা নিয়ে চেয়ে থাকতেন।

"তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি !" খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিতেন। "যখন পাহাড় আবার গরম হয়ে উঠবে এবং রাস্তা শুকিয়ে যাবে, আমি তখন হ্রদ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ব।"

আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও নীল হয়ে উঠল এবং কম মেঘাচ্ছন্ন হতে লাগল। দুপুরে জামা ছাড়াই রোদে বসা সম্ভব হল। বসন্ত আসতে থাকায় খোজা নাসিরুদ্দিনকে ক্রমশঃ লম্বা দেখাচ্ছিল ও তাঁর চোখ দুটো যৌবনের আনন্দে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং সেই দিনগুলিতে তাঁর ঘুমও বেশ কম হতে লাগল।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। এক রাতে অনিদ্রায় ছটফট করতে করতে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর ছোট্ট বাগানে এসে দাঁড়ালেন ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। একটা হালকা নীল আলোয় যেন পৃথিবী ভাসছিল, এবং উপরের কালো পরিষ্কার বাতাস উড়ে যাওয়া রাজহাঁসদের আবেদনে ও পাতিহাঁসদের পাখার ঝটফট শব্দে ভরে গিয়েছিল। পাখীরা উত্তরে উড়ে যাচ্ছিল। "সামনে, সামনে !" অনেক উঁচুতে আকাশের তারার নীচে দিয়ে যখন রাজহাঁসেরা উড়ে যাচ্ছিল তখন যেন পাখার শব্দ তুলে বলছিল। "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি !" এদিক সেদিক থেকে দলে দলে হাঁসেরা উড়ে এসে যেন উত্তর দিচ্ছিল, কেউ বা দলে দলে, কেউবা জোড়ায় জোড়ায়, অনেকে আবার একা একা ঠিক গাছের মাথার উপর দিয়ে একে অন্যকে তাড়া করে উড়ে যাচ্ছিল। বাগানের ভিতর

বাতাস যেন একটা দীর্ঘশ্বাস তুলে সাদা ফুলের পাপড়ি বৃষ্টির মত ঝরাচ্ছিল এবং টাটকা জলে কানায় কানায় ভরা ঝরণা যেন গান গাইছিল। আস্তাবলে ঘোড়ার বাচ্চা অধীর হয়ে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করছিল এবং তার খুর দিয়ে মাটির মেঝেতে আঘাত করে একটা ফাঁপা শব্দ তুলছিল। উপরের আকাশে আলোড়ন ও একটা মৃদু শব্দ শুনে খোজা নাসিরুদ্দিন অনেকটা ধ্যানমগ্ন হয়ে বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন।

পরদিন দিনের আলোয় তাঁকে গাধার পিঠে দেখা গেল।

"রাগ করো না, আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে এল!" বন্ধুর মত বড় কান-ওয়ালা জন্তুটার গলা জড়িয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "এখন থেকে প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমরা ঐ উঁচু পাহাড়ী পথটা ধরে গোলমালে ভরা বাজারটার পাশ দিয়ে যাব। কিন্তু গুলজানের কি হবে? তাকে কি সব কথা বলব, সত্যি কথাটা কি প্রকাশ করব? কিন্তু তার মন যা বিকৃত, আল্লা না করুন, হয়তো সে হঠাৎ নদীতে ডুবে মরতে যাবে! তার মৃত দেহটা খুঁজতে নদীর স্রোতের দিকের বদলে হয়ত উল্টো দিকে ছুটতে হবে।

তিনি ভাবতে লাগলেন। বিদ্যুতের মত অনেকগুলো চিন্তা তার মাথার মধ্যে দিয়ে খেলে গেল কিন্তু একের পর এক সবগুলোই তিনি বাতিল করে দিলেন।

"আমি কি একেবারে বোকা হয়ে গেছি? ওহে গাধা, কেন চুপ করে আছ? ভেবে আমাকে সাহায্য কর!"

গাধাটা পেট নাড়িয়ে এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল। ঠিক সেই সময় সূর্যের হালকা গোলাপি-আভা ঘরের মধ্যে এসে পড়ল এবং একটা উত্তর খোজা নাসিরুদ্দিন মাথায় এল।

"তাই তো!" তিনি আনন্দে বললেন, "যদি আমি পরিবারের সকলের থেকে দূরে যেতে না পারি, তবে পরিবারের লোকেরা আমার কাছ থেকে দূরে যাক না কেন?"

সেদিন বাজার থেকে ফিরে এসে তিনি স্ত্রীকে বললেন:

"আজ বাজারে বোখারার একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে তোমার বাবা বুড়ো নিয়াজের বেশ পরিচিত। সে প্রায় দু'মাস আগে বোখারা ছেড়েছে এবং এখন একটা দলের সঙ্গে সেখানে ফিরে যাচ্ছে। সে বলল যে তোমার বাবা ভাল আছেন এবং সবকিছু ফিরে পেয়েছেন কিন্তু বেশ একাকী বোধ করছেন।

কি কষ্টের কথা যে বোখারায় যাওয়া আমার যাওয়া নিষেধ এবং তাঁকে একবার দেখতেও পাব না।"

গুলজান কোন উত্তর দিলেন না, বেশ নীচু হয়ে সেলাই করে চললেন। খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর দিকে দুঃখ ও করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলেন। এই লাল মুখো কর্কশ-কণ্ঠি মোটা স্ত্রীলোকটার মধ্যে কে সেদিনের তন্বী গুলজানকে খুঁজে পাবে? কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিনের যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ছিল এবং যখনই ইচ্ছা করতেন তখনই পুরানো দিনের মত ভালবাসা ভরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকতেন। "ও আমার কপোতী, ছলনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর;" তিনি মনে মনে বললেন। "তুমি তো জান তোমার মন কত বিকৃত—এখন বিবেক থেকে বল আমি কি অন্য ভাবে কিছু করতে পারতাম।"

পরের দিন আবার তিনি বোখারার লোকটাকে নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন।

"আমি তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু বোখারার দলটা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে," নৈশ ভোজের সময় গুলজানের দৃষ্টি এড়িয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কারণ সত্যিই তিনি বোখারার কোন লোককে কাল অথবা আজ দেখেননি এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটাই মন-গড়া।

"এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা বোখারায় পৌঁছে যাবে," আশার ভঙ্গীতে তিনি বললেন। "তারা দক্ষিণের তোরণ দিয়ে প্রবেশ করবে, যে জায়গা তোমাদের ছাদ থেকেও দেখা যায়। আশ্চর্য হব না যদি বুড়ো নিয়াজ ছাদ থেকে সেই দলটাকে দেখতে পান। তখন বোখারার লোকটা হয়তো তাঁকে আমাদের কথা বলবে—বলবে যে আমরা ভাল আছি এবং বোখারা থেকে মাত্র এক সপ্তাহের পথ সেই খোজেণ্ট শহরে বাস করছি। সে হয়তো নিয়াজকে আরও বলবে যে আল্লা আমাদের সাতটি সন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন এবং তাদের সকলেই তাদের দাদুকে ভালবাসে যদিও কেউই তাঁকে দেখেনি……।"

গুলজান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠল। খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন যে তাঁর মনটা অনেকটা নরম হয়ে এসেছে কুমোরের চাকার মত নিজের ধূর্ত ইচ্ছাটা চালিয়ে দেওয়ার এখন সময় হয়েছে যাতে মনের মত ফল পাওয়া যায়।

"সত্যি বলতে কি বুড়ো মানুষটাকে একবার তার নাতিদের দেখান দরকার,"

গলায় একটা বিষণ্ণ ভাব এনে তিনি বললেন। "আল্লা যেন সেই দস্যু আমিরটার চোখ অন্ধ করে ও শরীরটা পচা ঘায়ে ভরিয়ে দেয়; আমি নিজে তাঁকে বোখারায় দেখা দিতে চাই না। যদিও সেই নিষেধাজ্ঞা আমার উপর প্রযোজ্য এবং তোমাকে বা ছেলেদের সেখানে যেতে কোন বাধা নেই। এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি সেই বুড়ো মানুষটাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে। কিন্তু কি দুঃখের যে আমাদের যাবার মত কোন টাকা পয়সা নেই।"

"কি করে?" গুলজান উত্তর দিলেন। "সিন্দুকে যে আটশো টাকা আছে তার কি হল?"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর মুখ থেকে আটশো টাকার কথা বার হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। বাকী কথাবার্তা একই ধাঁচে এগিয়ে চলল যা তাঁর অভ্যস্ত পরিচিত; ঠিক যেন একটা নদী—যার আছে অনেক বাঁক, বালি ভরা পাড় এবং ভয়ংকর চর যেগুলোর সঙ্গে এই নদীতে জন্ম-নেওয়া কোন মাঝি অত্যন্ত পরিচিত।

তিনিও তাঁর নৌকা সাহসের সঙ্গে বেয়ে চললেন।

"না!" তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "সেই টাকা ছোঁয়া চলবে না, এ টাকা বাড়ীর কাজে লাগবে। আমি ইতিমধ্যেই আলাদা ভাবে এ টাকা রেখেছি।"

"তাই বুঝি?"

ভয়ংকর চরটা যেন এগিয়ে আসছিল। জলের অশুভ ঘূর্ণির শব্দ তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর গলায় শুনতে পেলেন।

দাঁড়ের আর একটা টানে তাঁর নৌকা যেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মাঝ দরিয়ার শান্ত জলে এসে পড়ল।

"প্রথমেই বাগানে একটা পুকুর কাটতে হবে এবং পাশে পাথরের ফলক দিয়ে খানিকটা বাঁধিয়ে নিতে হবে যার উপর আমাদের ছেলেরা গরমের দিনে স্নান করতে পারে।"

"ঠিকই বলেছ," গুলজান বললেন। "পুকুর ছাড়া আমাদের চলবে কি করে, কারণ বাগানের পাশে কয়েক পা দূরেই নদীর খাল বেশ স্রোত নিয়ে বয়?"

নৌকাটা বেশ জোরে মাঝ-স্রোতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে জলকে সাদা ফেনার টুপি পরে ফুলে ফুলে উঠতে দেখা যাচ্ছিল।

"পুকুরে লাগবে দুশো টাকা," দুই আঙুল দেখিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"এ ছাড়া, আমি বাগানে একটা কুঞ্জবনের মত করব যার ভিতরটা কার্পেট দিয়ে সাজাব। ছুতোরে বলে কুঞ্জবনের জন্য আরও দুশো লাগবে। ঠিক একই পরিমাণ কার্পেট কিনতে লাগবে।"

"মোট ছ'শো হল," গুলজান বললেন। "আরও দুশো বাকী আছে।"

"এটাও আমাদের প্রয়োজনে লাগবে," খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি বললেন। "আমার ইচ্ছা সদর দরজায় এখন যে সাধারণ তক্তার দরজা আছে তার বদলে ওয়ালনাটের তক্তার দরজা বানাই। আমি বাড়ীর ভিতর ও বাইরেটা নীল ফুল দিয়ে সাজাবার জন্য মিস্ত্রিদের ডেকে পাঠাব।"

"বাইরেটা কেন?" গুলজান প্রশ্ন করলেন।

"সৌন্দর্যের জন্য," খোজা নাসিরুদ্দিন ব্যাখ্যা করে বললেন।

হঠাৎ যেন দাঁড় ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে গেল এবং নৌকা পাথরে লেগে ডুবে গেল। খোজা নাসিরুদ্দিন ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খেতে লাগলেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তর্জন, গর্জন ও চোখের জল ফেলতে শোনা গেল।

"একটা বুড়ো মানুষ একা পড়ে আছে তাকে দেখতে যাবার জন্য কোন টাকা-পয়সা নেই, এদিকে বাড়ী নীল ফুলে সাজাবার মত তোমার পয়সা আছে!" গুলজান কেঁদে কেঁদে বললেন। "কেন বাইরেটা সাজাচ্ছ? বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই সব কিছু ধুয়ে যাবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিনেয় চুপ করে রইলেন। দু' দিন ধরে তাঁর ভর্ৎসনা খোজা নাসিরুদ্দিনের মাথার উপর বৃষ্টির ধারার মত পড়তে লাগল এবং তৃতীয় দিন সদর দরজায় একটা টাঙ্গা দেখতে পাওয়া গেল। জয়ের আনন্দে গুলজান ছেলেদের নিয়ে সোজা বোখারায় বাপের বাড়ী চলে এলেন।

"সাঁকো ও উৎরাইগুলোতে সাবধানে যাবে," গাড়োয়ানকে উপদেশ দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "ঘোড়াকে লাফ দিয়ে চলতে দিও না।"

গরমে ক্লান্ত হয়ে গাড়োয়ান বসে বসে ঢুলছিল। দুই রং-এর মাদি ঘোড়াটা পিছনের পায়ের উপর সমস্ত শরীরের ওজন চাপিয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছিল। খোজা নাসিরুদ্দিনের উপদেশ ছিল নিরর্থক, কারণ গাড়োয়ান ও ঘোড়া এই দুই মাণিক জোড় বেশ কয়েক বছর ধরে লাফিয়ে চলেনি।"

টাঙ্গার মেঝেতে ধানের নরম খড় বিছিয়ে দিয়ে এবং সামনে একটা কম্বল টাঙিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বাড়ী থেকে পোঁটলা-পুঁটলি ঝুড়ি ও থলি আনতে

লাগলেন ; শেষে গুলজান দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, পিছনে পিছনে আকৃতি অনুযায়ী সারি দিয়ে বেরিয়ে এল সাতটি ছেলে।

গাড়োয়ান নড়েচড়ে উঠে বসল, পাদানিতে পা রাখল ; সে যে তৈরী দেখাবার জন্য চাবুকটা আস্ফালন করল এবং পরে আবার আগের মত মাথা নাড়িয়ে ঢুলতে লাগল। অভিজ্ঞতায় সে জানত যে "দয়াময় আল্লা উপরে আছেন—এবার যাত্রা স্থরু করা যাক," এই কথা শোনবার আগে বেশ কিছু সময় কাটাতে হয়। ঘোড়াটা কিন্তু একেবারেই জাগল না, কেবল পা বদল করল এবং ডান পায়ের উপর ভর চাপাল।

টাঙ্গায় চাপতে খোজা নাসিরুদ্দিন স্ত্রীকে সাহায্য করলেন ; গুলজান গাড়ীর চাকার দাঁড়গুলোয় পা রেখে উপরে উঠলেন, পরে নাসিরুদ্দিন একে একে ছেলেদের তুলে দিলেন এবং তুলবার সময় প্রত্যেকটি ছেলেকে বিদায়ের আগে একটা চুমু খেতে লাগলেন। টাঙ্গার মাঝখানটা কিচির মিচির শব্দের অনেকগুলো মানব-শিশুতে ভরে গেল এবং তার মাঝখানে ডিমের উপর তা দিতে থাকা মুরগীর মত গুলজান বেশ উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন।

"ওগো শুনছ, তুমি কি আমার উপদেশগুলো মনে রাখবে ?"

"হ্যাঁ গো আমার গোলাপরাণী, নিশ্চয়ই ! প্রথমতঃ তোমার রান্নার বাসনটা ঝাল দেবার জন্য কাঁসারীর কাছে নিয়ে যাব। দ্বিতীয়তঃ লণ্ঠনটা পরিষ্কার করতে হবে এবং তৃতীয়তঃ কসাই-এর ষোল টাকা ধার শুধতে হবে।"

"বাগানের পাঁচিলটার কথা ভুলবে না," দেয়ালে খানিকটা ফাঁকা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে গুলজান বললেন। "পাঁচিলটা সারাতে ভুলবে না।"

"যে মুহূর্তে দেখব তুমি নিরাপদে যাত্রা স্থরু করেছ আমি তখনই কাজে হাত দেব। বোখারায় বেশি দিন থাকবে না, বুঝেছ গো চোখের মণি !"

"ঠিক তিন মাসের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।"

বিদায় নেবার পালা আর একবার আলিঙ্গন, চুম্বন, কান্না ও ফোঁপানির মধ্যে স্থরু হল ; হট্টগোলের মধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে করতে পারলেন না কোন ছেলেটাকে দুবার চুমু খেয়েছেন আর কোনটাকে একবারও খাননি ; সেইজন্য সবছেলেগুলোকে আর একবার চুমু খেতে স্থরু করলেন—এটা হল দশবার।

সূর্য আকাশের বেশ উঁচুতেই ছিল, সকালের আবছা ছায়াগুলোর জায়গায় এখন দিনের পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছিল, গাড়োয়ান বেশ ধড়মড় করে জেগে উঠেছে, মাদী ঘোড়াটারও বেশ ঘুম হয়েছিল—যাত্রার সময় হয়ে এল।

"উপরে আল্লা আছেন—এখন যাত্রা করা যাক!" গলা কাঁপিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"আল্লা মহান!" গাড়োয়ান উত্তর দিল, সঙ্গে সঙ্গে হেলতে দুলতে ও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে টাঙ্গাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

খোজা নাসিরুদ্দিন এর পিছনে হাঁটতে লাগলেন। তাঁরা রাস্তার মোড় পার হলেন, পরিচিত পপলার গাছটা পেরিয়ে চললেন; গাছটার নতুন পাতা গজিয়েছিল এবং রাস্তার উপর একটা হাল্কা সবুজ টুকরো মেঘের মত ডাল-পালাগুলো ঝুলছিল।

তাঁরা বাজারের চক পার হলেন; শহরের তোরণ আর খুব বেশি দূর ছিল না।

গুলজান তাঁর স্বামীকে বললেন:

"বিদায় জানাবার জন্য যদি বোখারা পর্যন্ত গোটা পথটাই হাঁটতে সুরু কর তাহলে বরং আমার সঙ্গে ভিতরে উঠে এস।"

তিনি তাঁর রসিকতা হাসিমুখে শুনলেন, টাঙ্গা থামিয়ে শেষবারের মত গুলজান থেকে ছোট্ট বাচ্চা পর্যন্ত পরিবারের সকলকে আর একবার চুমু খেলেন। রাস্তার ধারে অপস্রিয়মান গাড়ীটাকে লক্ষ্য করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে রাস্তার বাঁকে গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও থেমে গেল এবং তিনি একা পড়ে রইলেন।

বেদনা ও দুঃখ নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন; মনে পড়ল ইবন-হাজমের কথা: "বিদায় বেলায় যিনি পিছনে পড়ে থাকেন দুঃখের তিন ভাগ তিনি পান, আর যিনি বিদায় নেন তিনি পান কেবল এক ভাগ।"

ঝলমলে রোদে ভরা ছোট্ট উঠানটা শান্তভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল; বাগানে একটা শালিক পাখীর চীৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না—ছেলেদের অবিরাম চীৎকার ও ছোটাছুটির জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন অবশ্য আগে কখনও পাখীটার ডাক শোনেননি।

পরিত্যক্ত বাড়ীটায় না ঢুকে তিনি আস্তাবলের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন, দরজাটা আস্তে খুললেন ও একটা চাপা শিস দিলেন। রাতের অন্ধকার যেন নীরবে সাড়া দিল। তিনি আর একবার শিস দিলেন; ভিতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস, জোরে নিশ্বাস ও নড়াচড়ার মেশানো শব্দ ভেসে এল এবং গাধাটা সামনে এগিয়ে এল—মোটা, ঘুম ঘুম চোখ ও বিষণ্ণ, সূর্যের আলোয় অনভ্যস্ত ও

সেজন্য আলোয় অস্বস্তির সঙ্গে চোখ পিট পিট করছিল। সে দুই কান খাড়া করে হতবুদ্ধি হয়ে চারদিকে চাইছিল।

"তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন?" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "চারদিক এত চুপচাপ। বুড়ো নিয়াজকে দেখতে সকলে বোখারায় গিয়েছে; তুমি আর আমি এখন আকাশের পাখীর মতই স্বাধীন।"

গাধার জন্য জিন ও থলি জড় করতে খোজা নাসিরুদ্দিনের কিছু সময় লাগল।

"ওহো, তুমি হিসারের ভেড়ার মত মোটা হয়েছ?" লাগাম টান করতে করতে তিনি বললেন। "দিব্যি করে বলতে পারি যে এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি শিকারী কুকুরের মত রোগা হয়ে যাবে! আমাদের অনেক কিছু করবার আছে, বুঝেছ কমরেড; সময়ও খুব অল্প। এগিয়ে চল! দীর্ঘ পথ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছে।"

তিনি বাড়ীর দরজায় একটা বিরাট পিতলের তালা ঝুলিয়ে দিলেন, দুটো খুঁটি পুঁতে গেটটা পিছন থেকে বন্ধ করলেন এবং নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে অপেক্ষা কিছুমাত্র চিন্তা না করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে গাধায় চেপে বেরিয়ে পড়লেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাজারের চত্বরটা পেরিয়েই তিনি শুহর-শাদ মসজিদের দিকে গাধার মুখ ফেরালেন।

সাধু তাঁর নিজের জায়গায় বসেছিলেন, তাঁর মাথা অল্প পিছন দিকে হেলান ছিল, শান্ত হাসি-মুখে নীল আকাশের দিকে চেয়েছিলেন; মনে হচ্ছিল যেন আলোয় ভরা এই অতলস্পর্শী খাদ থেকে উড়ে যাবার স্বপ্নে তিনি মশগুল।

খোজা নাসিরুদ্দিন গাধা থামালেন।

"হে প্রণম্য সাধু, আমায় আশীর্বাদ করুন! আশা করি তিন মাসের মধ্যেই ফিরে আসব ও আপনাকে হ্রদ এবং আগাবেকের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব; সম্ভবতঃ আমার ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধেও সেদিন আপনাকে কিছু বলতে পারব।"

বৃদ্ধের মুখে সুন্দর আশীর্বাদের ভঙ্গি ফুটে উঠল! তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও সামনের মাটি স্পর্শ করে খোজা নাসিরুদ্দিনকে অভিবাদন করলেন। তাঁর ঠোঁট নীরব প্রার্থনার ভঙ্গিতে নড়ে উঠল।

শহরের তোরণ পেরিয়ে রাস্তা নদীর দিকে এগিয়ে গিয়েছে। খোজা নাসিরুদ্দিন প্রথমে নদীর ধারের বাগান ধরে চললেন, পরে একটা মেঠো গলি

বরাবর মাঠের দিকে বাঁক নিলেন। চারপাশে শুধু লাঙ্গল-চষা মাঠ আর লোক। সময়টা ছিল মাঠে বসন্তকালীন কাজের সময়।

নীচু ধানের মাঠটায় তিনজনে কাজ করছিল। একটা শক্তিশালী কুঁজো ষাঁড় জলে হাঁটু ডুবিয়ে ধীরে ধীরে একটা কাঠের লাঙ্গল টানছিল; লাঙ্গলের পিছনে তার কুঁজো পিঠটা রোদে চক্‌চক্‌ করছিল ও কৃষককে অনুসরণ করছিল। তার পিছনে একটা সারস পাখী লাল রং-এর লম্বা পা দুটো ফেলে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও কাদা-জল থেকে বেঙাচি ও পোকা খুঁটে খাচ্ছিল। "আল্লা তোমার পরিশ্রম সার্থক করুন!" খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে বলে উঠলেন। সকলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে রাস্তার দিকে ঘাড় ফেরাল। কৃষক কপাল থেকে ঘাম মুছে বলল, "ধন্যবাদ, আল্লা তোমার যাত্রা সফল করুন!" পরে আবার সকলের মন্থর গতিতে কাজ সুরু হল: ষাঁড়টা প্রথমে, তার পিছনে চাষা আর সব পিছনে সারস পাখীটা।

সময়টা ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি; গাছের যে ছায়াগুলো কিছুদিন আগেও ছিল সরু ও হাল্কা, এখন সেগুলো মোটা ও চওড়া হয়ে রাস্তার উপর গিয়ে পড়েছে —কারণ বসন্ত গাছগুলোকে শাখা-প্রশাখায় দারুণভাবে ভরিয়ে তুলেছে। দয়ালু ও অকৃপণ বসন্তের কাছে বিরাট কাঠ-বাদাম গাছ ও স্তেপ অঞ্চলের কাঁটা-ভরা চারা গাছের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—পার্থক্য নেই দ্বিপদ ও চতুষ্পদে, পাখী ও সরিসৃপে—সে তার দান সবার মাঝে সমানভাবে বিতরণ করেছে, কারণ তার চোখে সকলেরই বাঁচবার ও ভোগ করবার সমান অধিকার আছে। পাখীরা কিচির মিচির শব্দে, ব্যাঙেরা কোঁক কোঁক করে, টিকটিকিরা টিক্‌ টিক্‌ করে বসন্তকে অভিবাদন জানাল আর পিঁপড়ে, ছারপোকা, গুবরে পোকা ও অন্যান্য হামাগুড়ি দেওয়া প্রাণীরা জানাল নীরবে; প্রকৃতি তাদের শব্দ করার শক্তি দেয়নি, সেজন্য এখানে সেখানে নড়ে, লাফিয়ে ও হিস হিস শব্দ করে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিল।

এই আনন্দ ও জয়োল্লাসের মাঝখানে খোজা নাসিরুদ্দিন কি চুপচাপ থাকতে পারেন? বসন্তের আবহাওয়া, সূর্যের আলো ও স্বাধীনতার মাতাল হয়ে তিনিও সকলের মিলিত সংগীতে গলা মেলালেন।

তিনি যে গান করছিলেন তা হল:

ঝরণা আমার জন্য ছুটছে,
মৌমাছিরা আমার জন্য গুনগুন করে,

বাগানে ফুলেরা ফোটে আমারই জন্য,
কারণ আমি মানুষ !

গায়কেরা আমার জন্য গান ধরে,
তোম্বুরা আমারই জন্য বাজে,
আমার ভিতরে হৃদপিণ্ড যেন আগুনের শিখা নিয়ে জ্বলছে,
কারণ আমি মানুষ !

চারপাশের মাঠগুলো আমারই,
আমার গাধাটা যেন আমার বন্ধু,
পথ আমাকে হাতছানি দিচ্ছে,
কারণ আমি মানুষ !

একদল প্রাণী জলা জায়গায় যাচ্ছে বুঝতে পেরে তিনি গাইলেন :

জল ঝলমলিয়ে ওঠে আমার জন্য,
পশুরা আমারই জন্য সেখানে যাচ্ছে,
বছর আসে কিন্তু আমার বয়স বাড়ে না,
কারণ আমি মানুষ !

চারপাশে যে দিকেই চাইছিলেন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর গানের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন ; ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন গোল করে আর সেজন্য পৃথিবীর রাস্তাগুলো একে অন্যকে অতিক্রম করে গেলেও কোথাও তাদের শেষ নেই। সেই রকম খোজা নাসিরুদ্দিনের গান হয়েই যাচ্ছিল তার যেন কোনরকম শেষ ছিল না ; সারা পৃথিবী ঘুরে এলেও তিনি যেমন একই জায়গা থেকে আবার বার হয়ে আসতে পারতেন তেমনি যে গান গাইতে গাইতে বার হয়ে আসতে পারতেন তাও ছিল এক :

পৃথিবীটা আমারই জন্য গোল,
কিন্তু আমার পক্ষে খুব ছোট,
আবার আমি ঘরে ফিরে এসেছি,
কারণ আমি একজন মানুষ !

গুলজান আমাকে দেখল,
সে আমাকে বকছে,
সে অভিযোগ করছে,
পরে জড়িয়ে আমাকে চুমু খাচ্ছে,
কারণ আমি মানুষ !

ইতিমধ্যে মেঠো গলিটা ক্রমশঃ বেশ চওড়া হচ্ছিল, রাস্তার উপর গাড়ার চাকার দাগও ছিল বেশ গভীর এবং প্রায়ই তিনি টাঙ্গা, ঘোড়সওয়ার ও পথচারীদের দেখতে পাচ্ছিলেন।

দুপুরের দিকে বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই খোজা নাসিরুদ্দিন সামনে শুনতে পেলেন একটা চাপা অবিরাম গর্জন যেন দূরের কোন জলপ্রপাতের শব্দ। এটা ছিল সামনের উঁচু রাস্তার হট্টগোল ও চাপা গুঞ্জন।

গাধাটাও অবাক হয়ে শুনল এবং সামনের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলল। "সামনে! সামনে!" গাধার পেটে পা দিয়ে খোঁচা মেরে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন, যদিও প্ররোচনা ছাড়াই জন্তুটা তার চার পায়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। চশমাটা খোজা নাসিরুদ্দিনের নাকের উপর নাচছিল; তিনি সেটা টেনে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেললেন, সেখানে একটা পাথরে লেগে কাঁচের টুকরোগুলো ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে উঁচু রাস্তাটা সামনে দেখা গেল। আগের মতই ধুলোর একটা মেঘ রাস্তার উপর ভাসছিল, যার ভিতর দিয়ে মানুষ, ঘোড়া, গাধা এবং উটের অবিরাম যাওয়া-আসা দেখা যাচ্ছিল, কেউ কেউ কোকান্দের বাজারের দিকে যাচ্ছিল, কেউ বা আবার আসছিল। সব মিলে হট্টগোলে ভরা একটা জনতার সৃষ্টি হচ্ছিল যার মধ্যে থেকে বিভিন্ন সুরে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, গাধার চীৎকার, মানুষের শব্দ মিলে কানে তালা-লাগা একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হচ্ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর গাধাকে ভীড়ের দিকে নিয়ে চললেন যেখানে রাস্তায় জনতার স্রোতের জোয়ারে গিয়ে পড়লেন ও ভেসে চললেন। এদিকে ধাক্কা খেয়ে ওদিকে গেলেন আবার ওদিকে গুঁতো খেয়ে ফিরে এলেন, একটা ষাঁড় বেশ জোরেই লেজ দিয়ে মুখে আঘাত করল এবং একটা উট তাঁর মাথার ঠিক উপরে হেঁচে দিল। "সাবধান!" একজন গাড়োয়ান চারপাশের চীৎকার ও

গরমে উত্যক্ত হয়ে তাঁর কানের কাছে এসে বলল ; ভয় দেখাবার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন যেই হাতের বেতটা নাচিয়েছেন এমন সময় ঠিক মাথার উপর একগাদা গালিগালাজের মধ্যে একজন শকট-চালকের হুংকার শুনতে পেলেন যে এমন কি তার গাড়ীর মাল-পত্র ফেলে দিয়েও তার গাড়ী সময় মত চালিয়ে বাজীরাখা পুরস্কার পাবার জন্য নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে খোজা নাসিরুদ্দিন সম্বিত ফিরে পেলেন। "সাবধান, সাবধান !" সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে তিনি গাড়োয়ানের চেয়েও জোরে চীৎকার করতে লাগলেন। ধাক্কা দিতে দিতে যারা সামনে ছিল তাদের পেরিয়ে গেলেন, যারা উল্টো পথে আসছিল তাদের ধাক্কা দিলেন, দুটো টাঙ্গার মাঝখান দিয়ে গলে পার হলেন, শকট-দলের উটগুলোকে বাঁধা শিকলের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হলেন এবং বাদামী রং-এর তাগড়া তাগড়া ভেড়ার পালের মধ্যে দিয়ে বেশ সাহসের সঙ্গেই গাধা চালিয়ে গেলেন।

রাতটা পথের ধারের এক সরাইখানায় কাটালেন এবং পরদিন আবার ঘোড়ার জিনের উপর তাঁকে দেখা গেল। শান্ত রোদে ভরা সকালে রাস্তা বেশ নির্জন ও পরিত্যক্ত ছিল ; রাতের আশ্রয় থেকে গাড়ী ও টাঙ্গাগুলোকে তখনও বার করা হয়নি। গাধাটা খেয়াল খুশীমত রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছিল ; খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে ইচ্ছামত চলতে দিচ্ছিলেন ও লাগামেও হাত দেননি ; তিনি নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। "এক রাতের যাত্রার পর কাল কোকান্দে পৌঁছাব। সেখানে, বাজারে আগাবেকের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানতে পারব," তিনি চিন্তা করছিলেন কোকান্দের বাজারের চক ও মসজিদগুলো কেমন হবে ; ধারণা করছিলেন খানের রাজপ্রাসাদের উঁচু পাঁচিল তোলা হারেম কেমন হবে, যেখানে গুজব অনুসারে প্রায় দুশো ত্রিশ জন অবসাদগ্রস্ত বিবি আছে—রোজার দিন বাদ দিলে প্রায় প্রতি রাতের জন্য একজন। খোজা নাসিরুদ্দিন একবার কোকান্দ এসেছিলেন এবং সেখানকার একটা স্মৃতি তাঁর মনে আঁকা ছিল ; আগস্ট মাসের এক রাত্রির স্মৃতি তাঁর মনে পড়ল, হারেমের দেওয়ালে একটা দড়ি, হারেমে যাবার পথের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, নির্জন ঘর এবং পরে.........। কিন্তু এখানেই খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর স্মৃতির বলগা ধরে টান দিলেন। "ও আমার গুলজান সোনা, একবার তোমায় পছন্দ করে সর্বদা এবং সব সময় এমন কি দূর স্মৃতিতেও তোমার প্রতি বিশ্বস্ত আছি !" নিজের উদারতায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ও বুকের মাঝে

একটা পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করে—যেন সমস্ত শরীরটা অল্প গরম জলে ডুবিয়ে রেখেছেন—বাষ্পে ভরা চোখ দুটো চারদিকে মেলে চাইলেন এবং অবাক হলেন গাধার পিঠ থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন দেখে।

সেখানে কোন পথ ছিল না ; গাধার খুরের নীচে টাটকা শিশির ভরা ঘাসের কার্পেট বিছান ছিল, যার ভিতর দিয়ে একটা ছোট পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে ; নীচে ছোট পাহাড়ের ধারে একটা উন্মত্ত ঝরণা ছুটছিল চারপাশে ফেনা ও আবর্তের সৃষ্টি করে, আর ওপাশে ছিল ফুল ফোটা উইলো গাছের সবুজ দেওয়াল। সামনে বরফে ঢাকা চূড়া আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—মেঘে ঢাকা যেন বিমর্ষ একটা পাহাড় যেটা ঘণ্টাখানেক আগেই রাস্তার ধারে সোজাভাবে দাঁড়িয়েছিল।

"এই শয়তান, শেয়াল ও টিকটিকির বেজন্মা বদমাস গাধা, আমাকে কোথায় নিয়ে আনলি ?" চীৎকার করে উঠলেন খোজা নাসিরুদ্দিন। "আগে কখনও এখানে আসিনি, জানি এ রাস্তা কোথায় গিয়েছে এবং ঝরণাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে। বড় রাস্তা থেকে কেন হঠাৎ বাঁক নিলি ? তোর মাথায় কি মতলব আছে ?"

উত্তেজনাবশে তাঁর প্রথম কাজ ছিল বেত তুলে নেওয়া ও তার সদ্ব্যবহার করা ; কিন্তু এমন একটা শান্ত ও নিরুদ্বেগ আবহাওয়া চারদিকে বিরাজ করছিল যখন উইলো গাছে মৌমাছিরা গুনগুন করছিল, মোটা ভোমরাগুলো বন্ধুর মত চারদিকে ঘুরছিল, বাতাসে বুনো মধুর মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল, সূর্য শান্তভাবে আলো দিচ্ছিল ও উন্নত আকাশ প্রসন্নভাবে হাসছিল যে তাঁর বেত গাধার পিঠ স্পর্শ না করে নিজের থেকেই পড়ে গেল।

"সম্ভবতঃ সেই হ্রদের খবরাখবর তোমার কোন জাত ভাইয়ের কাছে জানতে পেরেছ যার সঙ্গে রাস্তায় কোথাও তোমার দেখা হয়েছে ?" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "যদি তাই হয়, তাহলে রাস্তায় চলার দায়িত্ব তোমার ; তুমিই প্রভু আর আমি তোমার ভৃত্য ; যেখানে ইচ্ছা যাও, আমি তোমাকে অনুসরণ করব।"

তখন কি তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে তাঁর কথা দৈববাণীর মত ফলে যাবে এবং তিনি শীঘ্রই গাধাটার চাকরে পরিণত হবেন আর গাধাটা হবে তাঁর একমাত্র প্রভু ? কিন্তু ঘটনা আগে থেকেই অনুমান করা ঠিক নয় এবং মনে করা যাক মুজঃফর ইউসুফ রজবীর কথা, "কুকুরছানা যেভাবে নিজের লেজের ডগা ধরবার জন্য কেঁউ কেঁউ করে ও পাক খায় সে রকম করবে না।"

আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়া যাক যেখানে বলা আছে খোজা নাসিরুদ্দিন কিভাবে নিজের নামের সঙ্গেই লড়াই করেছিলেন ও তার জন্য তাঁকে কি ফলভোগ করতে হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি আবার গাধার পিঠে চাপলেন, লাগামটাকে শিথিল হয়ে ঝুলতে দিলেন এবং নিজের গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বাহনকে খুশিমত পথ চলতে দিলেন।

পথ ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছিল যতক্ষণ না ঝরণাটা এক গভীর খাদে হারিয়ে গেল যেখানে এটা লোকচক্ষুর আড়ালে গর্জন করছিল; অসংখ্য ছোট ছোট প্রবল স্রোতের জলের ধারা পথ অতিক্রম করছিল; এখানে সেখানে ছোট ছোট নালা কেটে কাঠের সেতুর মত তৈরী করা হয়েছিল যার উপর দিয়ে জল ধীরে ধীরে গভীর খাদে এসে পড়ছিল। এখানে পথ এসে অল্প পাতায় ভরা উইলো গাছ, বুনো লতা ও বুনো আঙ্গুরের গন্ধভরা ঝোপে এসে পড়েছে; চুমকির মত গরম লাল সূর্যের আলো খোজা নাসিরুদ্দিনের মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল; তাঁর চিন্তা, বরং বলা চলে চিন্তার রেশ, এত দ্রুতগামী ও প্রহেলিকাময় যে তারা তাঁর মনের উপরতলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পিছনে কোন ঢেউ-এর চিহ্ন না রেখে।

সবচেয়ে নিকটতম গ্রাম দেখে মনে হল প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ এবং বসন্তের সূর্য বেশ উত্তাপ দিচ্ছিল; খোজা নাসিরুদ্দিন আলখাল্লা খুলে নিয়ে জামা পরেই চলতে লাগলেন এবং প্রতি মিনিটেই হাতের রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। আরও আনন্দের হচ্ছে গ্রামের সরাইখানার নীরব অভ্যর্থনা; সরাইখানাটা পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল ও প্রতি দিক থেকেই পাহাড়ের বাতাস পাচ্ছিল।

সরাইখানার রক্ষক অতিথি দেখে খুব আনন্দিত হল এবং উনুনের উপরে রাখা রান্নার পাত্রের নীচে আগুন ধরাবার জন্য বাতাস দিতে ছুটল। ঘরের বাতাস শীঘ্রই ফরঘানা পাহাড়ের সুগন্ধী সাবাইন কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন ছাড়া সরাইখানায় আরও চারজন অতিথি ছিল একজন ছিল বৃদ্ধ যার ছিল পুরনো ধরনের হলুদ ছোপা ধূসর দাড়ি ও শুভ্র ভুরু—সম্ভবতঃ একজন স্থায়ী অধিবাসী ও চাষী; দুজন ছিল মেষপালক যারা নরম কিন্তু

অপরিষ্কার চামড়ার জুতো ও মোটা ফেল্টের টুপি ও একই ধরনের অমসৃণ ফেল্টের লম্বা জামা পরেছিল ; চতুর্থ জন ছিল ফ্যাকাসে ও রোগা ভবঘুরে শিল্পী, হয় মুচি নয় দর্জি, যার কাঁধ থেকে কনুই-এর নীচে পর্যন্ত ঝোলান ছিল একটা থলি। তারা একটা ছোট্ট বৃত্তাকারে বসে একই চায়ের পাত্র ও কাপ হাত বদল করে ব্যবহার করছিল ও নিজেদের মধ্যে নিষিদ্ধ জিনিস নিয়ে আলোচনা করছিল এবং খোজা নাসিরুদ্দিন আসতে তারা তাঁর দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চাইল।

তাদের কথাবার্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না চেয়ে তিনি তাদের দিকে পিছন ফিরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নীচে দেখা যাচ্ছিল ফুলে ভরা এক উপত্যকা যেখানে ছিল মাঠ, বাগান ও গ্রাম যেগুলি ঢালু অঞ্চল বেয়ে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত এসেছে এবং যাদের ওধারে ছিল পাহাড়ের সারি আর তাদেরও ওপারে ছিল ভারতবর্ষ। সকালের কুয়াশা দূর হয়ে পাহাড়গুলো আরও কাছে কাছে দেখাচ্ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন তুষারাবৃত মাঠ, পাহাড় ও খাদের নির্জনতা ও তাদের উপর এসে পড়া বেগুনে রং-এর ছায়া ; আরও নীচে পাটকেল রং-এর পাহাড়ের ঢালু অঞ্চল বেয়ে রূপালি শিরা উপশিরার মত নদীর স্রোত পাক খেয়ে খেয়ে এসে পড়েছে। পাহাড়ের হিম ভরা বাতাস উড়ে এসে তাঁর মুখে পড়ছিল।

কোণের দিকের কথাবার্তা এবার বেশ উত্তেজনার সঙ্গে হচ্ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন যে চার জোড়া চোখ তাঁর পিঠে এসে পড়েছে। "তারা আমার সম্বন্ধেই বলছে এবং শীঘ্রই উঠে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবে।"

তারা তাই করল। বুড়ো লোকটা উঠল এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে এল।

"পথিক, তুমি আমাদের গ্রামগুলোও ঘুরে বেড়িয়েছ, তোমার জয় হোক। তোমার জুতোর উপর হলুদ রংএর ধুলো দেখে আমরা তা বুঝেছি, কিন্তু আমাদের দেশের পথ পাথরে ভরা এবং তা থেকে শুধু সাদা ধুলো ওড়ে। আমরা তাই মনে করি যে তুমি এ দেশে নতুন এবং এখানে উপত্যকা থেকে এসেছ। তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ, আমি উপত্যকা থেকে এসেছি," খোজা নাসিরুদ্দিন বুড়োর দিকে তাঁর কাপ বাড়িয়ে এবং আহ্বানের ভঙ্গিতে তাতে একটা নখ দিয়ে টোকা দিয়ে বললেন।

"তাহলে পথিক, আমাদের বল," কাপটা হাতে নিয়ে ও বিপরীত দিকে বসে

বুড়ো লোকটা গুনগুন করে বলল, "গত কয়েক দিনে উপত্যকায় কি কি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে? সম্ভবতঃ খোজেন্টের রুটিওয়ালারা বিক্ষোভ করেছে? অথবা কানিবাদামের মাখনওয়ালারা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে? তা না হলে উরা-টিউবিতে কিছু একটা ঘটেছে?"

"না, আমি এসব কিছু শুনিনি," প্রশ্নগুলি শুনে অবাক হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বুড়ো চোখ টিপল।

"আমিও শুনিনি," সে চালাকির স্বরে বলল। "আমি কেবল জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমরা পিছনের জংলী দেশে বাস করি, উপত্যকা থেকে আসা লোকের সংখ্যাও বেশ কম—সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"ঠিকই," খোজা নাসিরুদ্দিন হেসে বললেন। "তাহলে মশায়, শুনুন, কানিবাদামের মাখনওয়ালারা রাজকর দিচ্ছে না এ প্রশ্ন কারা জিজ্ঞেস করছে? আমি আপনাকে শুধু জানাতে পারি, যদি অবশ্য আপনি না জানেন—যে খোজেন্ট শহর যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এবং এখনও মাটি চাপা পড়েনি; আগুনের নিশ্বাস ছড়াতে কোন ড্রাগনকে সে অঞ্চলে দেখা যায়নি। এ ধরনের আর কি কিছু জানতে চাও?"

বিদ্রূপ বুঝতে পারলেও বুড়ো চুপ করে রইল। সে তার তামাটে ভুরু দুটো একত্র করে চোখ দুটো তার নীচে লুকিয়ে রাখল। সে আগন্তুককে ভয় পাচ্ছিল যদিও অনুচ্চারিত প্রশ্ন তাকে পীড়া দিচ্ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে সাহায্য করতে মনস্থ করলেন।

"বুড়ো, আমার মুখের দিকে তাকাও, আমার চোখের গভীরে চাও—আমাকে কি গুপ্তচরের মত দেখাচ্ছে?"

"তুমি আমার মনের গভীরে প্রবেশ করেছ," বুড়ো উত্তর দিল। "যাইহোক আমি তোমাকে একটা বিস্ময়কর ও দায়িত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে দ্বিধা বোধ করছি। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায়পরায়ণ শাসককে চেন, এই রক্তচোষার দল···অর্থাৎ আমি বলছি, ন্যায়ের ঐসব আলোকবর্তিকা,—আল্লা তাঁদের স্বর্গীয় সুখে ভরা জীবন রক্ষা করুন এবং তাঁদের নীতিপরায়ণ সরকারের হাত শক্ত করুন।"

"আমার সামনে তোমার শাসকদের প্রশংসা করো না, মশায়। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে আমি গুপ্তচর নই!"

"তোমার মুখ দেখেই বিশ্বাস আসে, সুতরাং আমি তোমার সঙ্গে খোলাখুলিই

কথা বলব। আমাদের ইচ্ছা তোমাকে প্রশ্ন করি,"—বুড়োর গলা ফিস ফিস করে উঠল ও অন্য তিনজন কাছে সরে এল—"আমাদের ইচ্ছা তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে এই অঞ্চলে খোজা নাসিরুদ্দিন এসেছেন সে সম্বন্ধে তুমি কি কিছু শুনেছ?"

খোজা নাসিরুদ্দিন যে কোন প্রশ্নের জন্যই তৈরি ছিলেন কিন্তু নিজের নাম শুনবার জন্য নয়। চা গলায় লেগে গেল এবং তিনি কাশতে লাগলেন।

"অ্যাঁ, খোজা নাসিরুদ্দিন এসেছেন!" সব থেকে তরুণ মেষপালক বেশ জোরের সঙ্গেই ফিস ফিস করে বলে উঠলেন। "একজন মেষপালক খোজেন্টের কাছে উঁচু রাস্তায় তাঁকে নিজের চোখে দেখেছে!"

"সেই মেষ-পালক এক সময় বোখারায় থাকত এবং খোজা নাসিরুদ্দিনকে চেনে," দ্বিতীয় মেষপালক বলল—"বেশ লম্বা কাল পাহাড়ী, ছোট কাল দাড়ি এবং জলজলে চোখ আছে, চোখ দুটো রুক্ষ দাড়ির নীচে জলছে।"

এই সব কথা শুনে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে ভাবলেন যে তাড়াতাড়িতে তিনি তাঁর কাল চশমা খুলে ফেলেছেন। তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন; ছোট্ট সরাইখানায় বসে তিনি বুঝতে পারছিলেন, কোকান্দ, আন্দিজান এবং উপত্যকার অন্যান্য বাজারে তাঁর নামে কেমন আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

"অসময়ে এই সব উৎপাত!" তিনি গুন্ গুন্ করে উঠলেন। "এই সব গুজব এখনই বন্ধ করা উচিত।"

"তোমরা ভুল শুনেছ," সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন। "শকট চালক ও মেষ পালক ভুল করেছে। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে খোজা নাসিরুদ্দিন এই সব অঞ্চল থেকে এখন অনেক দূরে আছেন।"

"একজন ফেরিওয়ালাও তাঁকে দেখেছে!" শিল্পী মৃদু প্রতিবাদ করল, উত্তেজনার একটা লাল আভা তাঁর মুখে দেখা গেল।

"ফেরিওয়ালাও!" খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে চীৎকার করে উঠলেন। "নিশ্চয়ই শয়তান আমাকে দিয়ে কাল চশমা খুলিয়েছে।"

"খোজা নাসিরুদ্দিনের মত দেখতে আর একজন নিশ্চয়ই ফারঘানায় আছে," তিনি বললেন। "আমি বারবার বলছি—আসল এবং সত্যিকারের খোজা নাসিরুদ্দিন এদিকের রাস্তায় কিছুতেই আসতে পারেন না।"

"কেন, পথিক? কিসের উপর ভিত্তি করে তুমি বলছ?" বৃদ্ধ প্রশ্ন করল। সরাইখানার রক্ষক রান্নার বাসনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেও বলল:

"যদি এক সপ্তাহ আগে খোজা নাসিরুদ্দিন অনেক দূরে থাকতে পারেন তবে

আজ কেন তিনি এখানে থাকতে পারবেন না?" যেখানে সকলে বসেছিল রক্ষক সেই টেবিলের কাছে সরে এসে চায়ের খালি পাত্রটা বদলে দিল। "দূরত্ব তাঁর কাছে কিছু নয়। একবার কি তিনি চার দিনে হেরাট থেকে সমরখন্দে যাননি?"

"বিপদ হচ্ছে তিনি এখন আর ঘুরে বেড়ান না," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "শুনুন, ভদ্রলোকেরা, আগের দিনের খোজা নাসিরুদ্দিন আর নেই। তিনি এখন একটা বিরাট পরিবারের পিতা, একটা বাড়ী কিনেছেন এবং এবং আগেকার মত ঘুরে বেড়ান একেবারে ভুলে গিয়েছেন। তাঁর ধূসর রং-এর গাধাটা দিনে দিনে বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে এবং খোজা নাসিরুদ্দিনও শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করার জন্য মোটাসোটা হয়েছেন। খানিকটা বোকা ও কুঁড়ে হয়েছেন এবং ধরা পড়বার ভয়ে কালো চশমা না পরে কখনও বাড়ীর বাইরে যান না।"

"এর পরেই বলবে যে খানিকটা কাপুরুষও হয়ে পড়েছেন," বেশ উদ্বেগের সঙ্গে দাড়িওয়ালা মেষপালক বলল। "সকলেই জানে যে তিনি কখনও কাউকে বা কোন কিছু ভয় করেন না।"

"গর্ব করবার মত," খোজা নাসিরুদ্দিন ভর্ৎসনার স্বরে বললেন। "তাঁর সম্বন্ধে শোনা গল্পের তিন-চতুর্থাংশই গালগল্প।"

"গালগল্প?" শিল্পী চীৎকার করে উঠল। "খোজা নাসিরুদ্দিনের সম্বন্ধে শোনা গল্প যদি গালগল্পই হয় তবে অত্যাচারী শাসকদের মনে কে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল?"

মেষ পালক, সরাইখানার রক্ষক এবং বুড়ো লোকটা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে চোখের ইসারা করল।

"আমি জানি না," এই সব অশুভ দৃষ্টি বিনিময়ের ব্যাপারে কিছু না জেনেই খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমি কিন্তু জানি তিনি এখন নাম পালটেছেন। এখন তাঁর নাম উজাকবাই, তিনি এখন······"

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না: সরাইখানার রক্ষক দাঁত কটমট করে হাত তুলিয়ে এক বিরাশী সিক্কার ঘুঁষি তাঁর পিঠের কাছে নিয়ে এল; ঠিক সেই সময় ছোকরা মেষপালক আশ্চর্যজনক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর পাঁজরার দুই দিকে আঘাত করতে লাগল, এদিকে বুড়ো লোকটা তার দুর্বল হাত দিয়ে তাঁর দাড়ি ধরে চিৎকার করতে লাগল:

"আমাদের খোজা নাসিরুদ্দিন আর খোজা নাসিরুদ্দিন নেই—এই বলতে চাও, হতভাগা গুপ্তচর !"

"এই গুপ্তচরদের চারদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে খোজা নাসিরুদ্দিন সম্বন্ধে যা-তা বলা ও তাঁর কুৎসা করার জন্য !" শিল্পী চিৎকার করে উঠল এবং তার থলির মধ্যে একটা ভারী, শক্ত ও ত্রিকোণাকার জিনিস দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনকে মারতে গেল।

"থাম !" কখনও মাথা, কখনও বা পাঁজরা আবার কখনও ঘুঁষির বর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে খোজা নাসিরুদ্দিন চিৎকার করে উঠলেন। "খোজা নাসিরুদ্দিনের নামে তোমরা কাকে মারছ ? তোমরা মারছ······"

তাঁর হাড়গুলো গুঁড়ো হতে না দেবার জন্য তিনি আত্ম পরিচয় দিতে রাজী ছিলেন (যা প্রকাশ করলে এরা সহজে নিত কিনা সন্দেহ), কিন্তু সরাইখানার রক্ষক তাতে বাধা দিল। এক বিরাট লাথি মেরে সে খোজা নাসিরুদ্দিনকে তার গাধার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল।

"দূর হও, বদমাস শেয়াল, আর কখনও এ গাঁয়ে মুখ দেখাবে না ! যদি দেখাও তবে দিব্যি করে বলতে পারি বেড়ার খুঁটিগুলো তোমার মাথায় ভাঙব।"

কোন কথা না বলে খোজা নাসিরুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন, গাধার পাদানীতে উঠে বসে গাধার পেটে খোঁচা দিয়ে নীচের রাস্তা ধরে গাধা ছোটালেন। সরাইখানার দরজা থেকে অভিশাপ মাথায় করে এবং প্রতি আঘাতে গোঙাতে ও দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এইভাবে নিজের নামের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ইতি হল—এটা তাঁর কাছে একটা উদাহরণস্বরূপ যা অনুশাসন রূপে নেওয়া যেতে পারে। সদা প্রফুল্ল ভবঘুরে ও মাতাল হাফিজের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করলে অসঙ্গত হবে না যিনি হাফিজের গজল নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য সিরাজের বাজারে এক জনতার হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন : 'ও আমার প্রখ্যাত নাম—একদা তুমি ছিলে আমার, এখন আমি তোমার ; অতীতে পর্যটনের সময় তুমি আমার নামের বেশ কয়েকদিন আগে আগেই ছুটতে সেজন্য আমার আনন্দ হত, আর আজ আমি তোমার পায়ের বোঝা স্বরূপ ; আমি তোমার টাট্টু ঘোড়া আর তুমি ভারী একটা বেত হাতে

নিয়ে নিষ্ঠুর অশ্বারোহী! এই বেদনাময় পৃথিবীতে এইভাবেই নিয়তি কাজ করে যেখানে এমনকি যশ, খ্যাতিও নিয়ে আসে আঘাত আর দুঃখ!"

প্রায় রশি পাঁচেক পার না হওয়া পর্যন্ত খোজা নাসিরুদ্দিন লাগামে হাত দিলেন না। গাধার পিঠ থেকে নেমে রাস্তার ধারের এক পাথরে এসে বসলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে হাত, পা, গলা ও মাথার ব্যথা অনুভব করছিলেন। "সেই বদমাস শিল্পীটাকে আল্লা পক্ষাঘাত দিন!" ক্ষতস্থানে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি অভিযোগ করতে লাগলেন। "আশ্চর্য হচ্ছি সে তার থলির মধ্যে কি নিয়ে বেড়ায়—যাঁতা, ইস্ত্রির লোহা অথবা মুচির লোহা?"

একই অবস্থায় পড়ে এবং হাফিজের বিলাপ মনে করতে করতে তিনি কাঁকর-ভরা ও রোদে উত্তপ্ত পথ ধরে চলতে লাগলেন। উইলো গাছের ফুল বুনো মধুর তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছিল; তিন রকম রং-এর টিকটিকি—নীলচে সবুজ, ইন্দ্রনীল ও পান্নার মত সবুজ বা ঠিক ধূসর—প্রথম দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত হলেও, কাছ থেকে ভালভাবে দেখলে বেশ সুন্দর ও পিঠের উপর সুন্দর কারুকাজ দেখাচ্ছিল; তারা নুড়ির উপর শুয়ে রোদে পিঠ শুকাচ্ছিল; ভরত পাখীরা টিঁ টিঁ করে আকাশে উড়ছিল, মৌমাছিরা সূর্যের আলোয় চকচক করছিল ও ভোমরাদের অভ্রের মত পাখা দুটো ঝিলিক দিচ্ছিল—এক কথায়, খোজা নাসিরুদ্দিনের চারপাশের পরিবেশ এক ঘণ্টা আগেও যেসব আনন্দে ভরা ছিল এখনও সেই রকম, যেন তাঁর যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার মত কিছু ঘটেনি, এবং পাহাড়ের পাশে কোন সরাইখানা ছিল না যেখানে কিছুক্ষণ আগেও তাঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রয়োজন হলে তিনি সমস্ত ঘটনা বেশ গুছিয়ে মনে করতে পারেন আবার ইচ্ছা হলে সমস্ত ভুলে যান। এছাড়া তাঁর শরীর ও পিঠের যন্ত্রণাও কিছুটা কমে এসেছিল তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তাঁর পুরু আলখাল্লার মত জামাটাকে কারণ ঘুঁষি পড়বার সময় এটা গদির মত কাজ করেছিল। শীঘ্রই তাঁর আঘাত পাওয়ার অনুভূতি সম্পূর্ণ উবে গেল—তিনি মৃদু হাসলেন, জিভ দিয়ে চকচক শব্দ করলেন পরে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

"এই প্রভুভক্ত গাধা, শুনতে পাচ্ছিস, খোজা নাসিরুদ্দিনের নামে ইতিমধ্যেই আমাকে মারা হয়েছে; আমার এখন প্রয়োজন খোজা নাসিরুদ্দিনের নামে আমাকে ফাঁসি দেওয়া!"

একটা গোঙানির শব্দে তাঁর হাসিঠাট্টার কথাবার্তায় বাধা পড়ল।

গাধাটা চীৎকার করে কান দুটো উপরে তুলল ও পরে থেমে গেল।

ডানদিকে চাইতে খোজা নাসিরুদ্দিন একটা ঝোপের নীচে একজন মানুষ দেখতে পেলেন, তার মুখ তার জামা দিয়ে ঢাকা ছিল।

"কেন কষ্ট পাচ্ছ? এখানে শুয়ে কেন? এত করুণভাবে কেন গোঙাচ্ছ? মনে হচ্ছে তোমার আত্মা যেন এখনই দেহ ছেড়ে পালাবে?"

"সত্যিই ছেড়ে পালাচ্ছে," শুয়ে থাকা লোকটি তার জামার নীচে থেকে করুণ সুরে গোঙাতে গোঙাতে বলল। "আল্লার কাছে প্রার্থনা করি যেন শীঘ্রই ছেড়ে পালায় কারণ আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, যন্ত্রণাও অসহ্য।"

খোজা নাসিরুদ্দিন নেমে এলেন।

"কতক্ষণ ধরে এই ভয়ানক অসুখে যন্ত্রণা পাচ্ছ?" অসুস্থ লোকটার উপর ঝুঁকে পড়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"গত পাঁচ বছর ধরে অসুখ হয়েছে," কাতরাতে কাতরাতে অসুস্থ লোকটা উত্তর দিল। "প্রতি বসন্তে, ঠিক এই সময়ে রোগটা একটা হিংস্র পশুর মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার চেয়েও নির্দয়ভাবে প্রায় এক মাস ধরে আমাকে কষ্ট দেয়। এর তীব্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য যা করতে হয় আমি সময়মত তা করে উঠতে পারিনি—এবং এখন আমি এখানে রাস্তার উপর কোন সেবা বা সহানুভূতি ছাড়াই অবহেলা ও বিস্মৃতির মধ্যে পড়ে আছি।"

"শান্ত হও!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তুমি এখন সেবা ও সহানুভূতি দুইই পাবে। আমরা এখন সবচেয়ে কাছের গ্রামে যাব এবং সেখানে একজন চিকিৎসক খুঁজে বার করব; তার সাহায্যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"ডাক্তার? এর জন্য আমার কোন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই।"

অসুস্থ লোকটা উঠে বসল এবং মাথা থেকে জামাটা ছুঁড়ে ফেলল; একটা চওড়া চেপটা নগ্ন মুখ বেরিয়ে এল,—কোন গোঁফ বা চুলের চিহ্ন ছিল না; একটা ছোট্ট নাক ও একজোড়া বিবর্ণ চোখ শোভা পাচ্ছিল,—তাদের একটা ফ্যাকাসে নীল, ছানি পড়া ও ঘোলাটে, অন্যটা হলদে ও গোল এবং দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে সেই দৃষ্টির সামনে খোজা নাসিরুদ্দিন অস্বস্তি বোধ করলেন।

"আমাকে তাহলে গাঁয়ে নিয়ে চলুন," অসুস্থ লোকটা জামার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বেদনা-ভরা দীর্ঘশ্বাস ও কাতরানির মধ্যে বলল।

"আমাকে গাঁয়ে নিয়ে চলুন, সম্ভবতঃ সেখানে লোকের মধ্যে আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করব।"

বেশ কষ্টের সঙ্গেই সে গাধার পিঠে উঠল। একজন অসুস্থ লোককে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গাধাটা ঢালু পথ বেশ যত্নের সঙ্গে নামল এবং ঝরণা পার হবার সময় লাফ না দিয়ে জল কেটে পার হল। খোজা নাসিরুদ্দিন পাশে পাশে হেঁটে চললেন ও আড়চোখে যন্ত্রণা কাতর সঙ্গীর দিকে দৃষ্টি রাখছিলেন। "নিঃসন্দেহে সে একজন অতি নিকৃষ্ট ধরনের প্রতারক ও দুর্বৃত্ত, তা না হলে ওর এক চোখে এত তীব্র দৃষ্টি এল কি করে?" তিনি মনে মনে ভাবলেন। "কিন্তু আমি ভুল করতেও পারি এবং আমার সন্দেহ একজন ধার্মিক লোকের পক্ষে অপমানজনক হতেও পারে কারণ তার বাইরের চেহারা দিয়ে তার ভিতরের গুণ বুঝতে পারা নাও যেতে পারে?" অসুস্থ লোকের কিছু একটা ছিল, কোন সুপ্ত গুণ, যার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন তাকে একজন প্রতারক অনুমান করতে পারলেন না; অন্যদিকে তাঁর অসুস্থ সঙ্গীর কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করলেন, তার হলুদ রংএর দৃষ্টি তাঁকে বিচলিত করে তুলল এবং তিনি উল্টোটা ভাবতে চেষ্টা করলেন।

রাস্তা খাড়া নীচে নেমে গিয়েছে। দুটো বাঁক ঘোরার পর খোজা নাসিরুদ্দিন একটা গাঁয়ের হলুদ রংয়ের ছাদের বাড়ী দেখতে পেলেন। স্বতঃস্ফূর্ত ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখে তিনি বুঝলেন এটা একটা সরাইখানা কিন্তু কিছুদিন আগের অভিজ্ঞতা মনে করে তিনি ঠিক করলেন যে আর কোন কথা-বার্তায় যোগ দেবেন না, তাঁর আশে পাশে যে কোন কথাবার্তাই হোক না কেন।

কিন্তু নিয়তি যাকে দুর্বার আঘাত দেবে ঠিক করেছে তাকে দুর্বার আঘাত পেতেই হবে এবং তিনিও তা পেলেন।

সরাইখানায় তিনি একটা কম্বল চাইলেন, যত্ন করে অসুস্থ লোকটাকে ঢেকে দিলেন এবং পরে রক্ষককে একজন চিকিৎসকের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

"ডাক্তার পেতে হলে পাশের গাঁয়ে খোঁজ নিতে হবে," রক্ষক বলল; সে একজন মোটাসোটা লোক, বিরাট গোল মাথা, চুলে ভঁরা ঘাড় এবং অনেকটা কসাই-এর মত লাল। "ইতিমধ্যে রুগীকে খানিকটা চা খাওয়াও, সে অনেকটা সুস্থ বোধ করবে।"

দুই পাত্র চা খাওয়ার পর রুগী একটা বালিশে ঠেস দিয়ে মাথাটা রাখল এবং হালকাভাবে ঘুমিয়ে পড়ল ; ঘুমের মধ্যেও সে কাতরাতে লাগল।

খোজা নাসিরুদ্দিন অন্য অতিথিদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং আগাবেকের পাহাড়ী হ্রদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবেন এই আশায় কথাবার্তা সুরু করলেন।

না, তাদের মধ্যে একজনও এ ধরনের হ্রদের কথা শোনেনি। একজনের মতে আগাবেক একজন পর্যটনকারী নয়, একজন ঘাঁতাওয়ালা যে তার খোঁড়া গরুটা বছরখানেক আগে খদ্দেরের কাছে দোষগুলো চেপে গিয়ে বেশ চড়া দামেই বিক্রী করে লাভ করেছিল। অথবা সে কি কামার আগাবেক ? অথবা যার বড় ছেলের কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে ?"

"ধন্যবাদ, মশায়, আমি যে আগাবেককে খুঁজছি সে অন্য লোক।"

ভিন্ন লোক ? তবে নিশ্চয়ই সেই লোক যে মালবোঝাই ষাঁড়ে চেপে নদী পার হতে গিয়ে ঝুলন্ত সেতু থেকে পড়ে গিয়েছিল ? অথবা ঘোড়ার ডাক্তার আগাবেক ? তারা খোজা নাসিরুদ্দিনকে খুশি করতে এতই ব্যগ্র ছিল যে প্রায় বার ডজন আগাবেকের নাম করল কিন্তু তাদের একজনও কোন পাহাড়ী হ্রদের মালিক ছিল না।

"কিছু যায় আসে না, অন্য কোথাও তাকে খুঁজে বার করব," খোজা নাসিরুদ্দিন সঙ্গীদের বাচালতায় বিরক্ত হয়ে বললেন।

"আল্লা তোমাকে আশীর্বাদ করুন," তাঁকে সাহায্য করতে না পেরে বেশ আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েই তারা উত্তর দিল।

পিছন থেকে একজন হালকাভাবে খোজা নাসিরুদ্দিনের কাঁধ স্পর্শ করল ; তিনি ভেবেছিলেন সরাইখানার রক্ষক কিন্তু পিছন ফিরতেই প্রায় বোবা হয়ে গেলেন ; তাঁর সামনে আনন্দে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে অসুস্থ লোকটা যে ঘণ্টাখানেক আগেও এই নশ্বর পৃথিবী থেকে অন্য কোন লোকে যাবার অবস্থায় ছিল (খোজা নাসিরুদ্দিন দিব্যি করে বলতে পারেন যে এ ধরনের দুর্বৃত্তের একমাত্র আশ্রয় সবচেয়ে নিম্নলোক—নরক)। সে দাঁত বার করে দাঁড়িয়েছিল, তার চেপটা মুখ ছিল হাসিতে ভরা, এবং তার গোল চোখটা বিড়ালের মত দৃষ্টি নিয়ে জ্বলছিল।

"তুমি কি আমার সেই পথের কষ্ট-পাওয়া লোক ?"

"হ্যাঁ, আমি সেই," বেশ আনন্দের সুরে লোকটা উত্তর দিল। "আমি

বলতে চাই যে এই সরাইখানায় আমাদের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু রোগ থেকে উপশম পাওয়ার কি হবে? আমরা ডাক্তারের অপেক্ষা করছি।"

"ইতিমধ্যেই সব কিছু করা হয়েছে। অন্যের অপেক্ষা করতে হলে সব কিছু পিছিয়ে যাবে। আমি সব সময় ডাক্তার ছাড়াই নিজের চিকিৎসা নিজে করি।"

তার আরোগ্য লাভে কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন সরাই-খানার রক্ষকের সঙ্গে হিসাব-পত্র মিটিয়ে নিলেন এবং গাধার দিকে হাঁটলেন। এক-চক্ষু লোকটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি গাধার লাগাম টান করতে সুরু করল। "সে অকৃতজ্ঞ নয়,' খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন।

"এখন কোথায়?" তিনি এক চোখো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন। "সম্ভবতঃ পথ একই—আমি কোকান্দে যাব।"

"আমিও সেই পথে, মশায়, ধন্যবাদ," এক চোখো লোকটা আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল এবং এক মুহূর্ত নষ্ট না করে পাদানীতে চেপে বসল; খোজা নাসিরুদ্দিনের সম্বন্ধে নিজের কাছে এই বলে ব্যাখ্যা করল যে সে সর্বদা গাধার পিঠে চেপে চলবে এবং তার হিতকারী হাঁটবে।

"তুমি বরং আমার পিঠে এসে চাপ না কেন?" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

ঠাট্টায় লজ্জা পেয়ে এক চোখো লোকটা ক্ষমা চাইতে সুরু করল এবং বলল যে সে কেবল গাধার পেটি পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। "সে তাহলে লজ্জা ও বিবেকশূন্য নয়," খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে বললেন।

তাঁরা পথ ধরে এগিয়ে চললেন। গ্রাম পেরিয়ে, পথ বরাবর, যেন ঢালু অঞ্চল বেয়ে ছুটে আসছে, এই রকম বিস্তৃত বাগান ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরে তৈরি কোমর উঁচু দেওয়াল। এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে বসন্ত দেরীতে এসেছিল, যেন দেরী হচ্ছিল বেশ কষ্টকর উতরাই ও পথের বাঁকের জন্য এবং গাছগুলো সবে মাত্র ফুল দিতে সুরু করেছে।

সংকীর্ণ কাঁকর ভরা পথ প্রায় নির্জন ছিল, গাড়ীর চাকার দাগ প্রায় অদৃশ্য; মালবাহী গাড়ী যাবার পথ এখানেই শেষ হয়েছে এবং মালবাহী জন্তু যাবার চিহ্ন গিরিপথ পর্যন্ত দেখা যায়। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়া থেকে ভেসে আসা বাতাস ঠাণ্ডা ও টাটকা লাগছিল, বরফ জলে ভরা ঘোলাটে ঝরণাগুলো

ছিল পরিপূর্ণ এবং নীল আকাশ ছিল আরও বিস্তৃত। আকাশ ছিল গাঢ় নীল এবং বাতাস ছিল এত হাল্‌কা ও অঘনীভূত যে খোজা নাসিরুদ্দিনকে বেশ কষ্টেই শ্বাসযন্ত্র পূর্ণ করতে হল।

একচোখো লোকটিও বেশ কষ্টেই নিশ্বাস নিচ্ছিল, কিন্তু একই তালে চলছিল যদিও খোজা নাসিরুদ্দিন দয়াপরবশ হয়ে প্রায়ই গাধাটাকে ধরছিলেন।

"মনে হচ্ছে তোমার বেশ তাড়া আছে ?" তিনি বললেন।

একচোখো উত্তর দিল না। সে কেবল তার কাঁধের উপর দিয়ে রাস্তার দিকে চাইল।

"সে হয়তো একেবারেই দুর্বৃত্ত নয় ?" খোজা নাসিরুদ্দিন চিন্তা করে বললেন, তাঁর সঙ্গীর হলুদ রংয়ের এক চোখ থেকে বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেসে আসছিল তিনি তা ভুলতে চাইলেন। "সম্ভবতঃ সে তাড়াতাড়ি তার পরিবারের সঙ্গে মিলতে চাইছে অথবা কষ্টে পড়েছে এমন কোন বন্ধুর সাহায্যে যেতে চাইছে ?"

কিন্তু তাঁকে বেশীক্ষণ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকতে হল না।

তাঁদের পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

একচোখো লোকটি তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল এবং প্রতি মিনিটেই পিছন ফিরে চাইতে লাগল।

"ঐ ওরা আসছে," শেষে সে বলল।

"আসতে দাও, রাস্তায় সকলের জন্য অনেক জায়গা আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন বিচলিত না হয়ে বললেন।

হাত দশেক দূরে একচোখো বলল, "অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি। রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পিছনে কোথাও বিশ্রাম নেওয়া যাক।"

"কি জন্যে আমরা রাস্তা ছেড়ে যাব," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমরা এখানেই বিশ্রাম নিতে পারি।"

"কিন্তু পাহাড়ের পিছনটা অনেক ভাল—সেখানে কোনও বাতাস নেই." বিশ্রীভাবে কাঁপতে কাঁপতে একচোখো বলল, তার হলুদ চোখটা বেশ বুড় এবং কাল হয়ে উঠেছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ বেশ কাছে শোনা গেল; একচোখো অত্যন্ত অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল এবং সেই সময় রাস্তার এক বাঁক থেকে ঘোড়সওয়ারীরা বেরিয়ে এল। সামনে খালি পায়ে ঘোড়ার খালি পিঠে চেপে এল সরাইখানার

রক্ষক এবং তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফাতে লাফাতে এল অন্য ঘোড়সওয়াররা।

"থাম!" রক্ষক ভয় দেখিয়ে চীৎকার করে উঠল। "চুপ, বদমাস চোর!"

সে তীব্র বেগে এগিয়ে গেল, খোজা নাসিরুদ্দিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এগিয়ে গেল এবং তাঁর মুখে কাঁচের গুঁড়ো ভর্তি কাদা মাটি ছিটকে এসে পড়ল ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে ; পরে ঘোড়ার লাগাম ধরে জোরে টানল ও রাস্তার দিকে তেরছা ভাবে দাঁড় করাল।

অন্যেরাও ছুটে এল, ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল এবং খোজা নাসিরুদ্দিন ও তাঁর সঙ্গীকে ঘিরে দাঁড়াল।

"তুই!" রাগে গরগর করতে করতে ও জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে রক্ষক বলল। "উরা-টিউবির কাজ করা আমার নতুন তামার বাসন কোথায়?"

"তোমার রান্নার বাসন?" হতবুদ্ধি হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তোমার জিনিস কোথায় তুমিই ত ভাল করে জান হে। কেন আমার বোঁচকা খুঁজে বেড়াচ্ছ? তোমার রান্নার বাসনের কি পা গজিয়েছে যে আমার বোঁচকার মধ্যে লাফ দিয়ে এসে পড়েছে?"

"পা গজিয়েছে?" সরাইখানার রক্ষক রাগে মুখ ও ঘাড় নাচাতে ও থুতু ছিটাতে লাগল। "নিজে থেকে তোমার বোঁচকার ভিতর লাফ দিয়েছে, তাই না বদমাস চোর?"

এই বলে গাধার ডান দিকের রেকাবীতে হাত দিয়ে ও খোজা নাসিরুদ্দিনকে অবাক করে সে একটা নতুন ও চকচকে রান্নার বাসন বার করে আনল।

ভীষণ রেগে গিয়ে রক্ষক লাফ দিয়ে তার বুকে খুব জোরে এক ঘুঁষি মারল। অন্যদের পক্ষে এটা যেন এক সংকেত চিহ্ন। পর মুহূর্তেই খোজা নাসিরুদ্দিন ও এক চোখো লোকটা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাদের উপর অবিরাম গালিগালাজ, ঘুঁষি ও লাথির বর্ষণ হতে লাগল। তাঁর মোটা ও পুরু জামায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কৃতিত্বকে খোজা নাসিরুদ্দিন আর একবার প্রশংসা করলেন।

"আগাবেক সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্তা আমাদের শুধু ঠকাবার জন্য!"

"এদিকে অন্য জন চুরি করছে!"

"কি সুচতুর ভাবে সে ভণ্ডামি করেছে!"

ঘুঁষি ও লাথির নতুন করে বর্ষণ শুরু হল।

শেষে সরাইখানার রক্ষক ও তার সঙ্গীরা পরিপূর্ণভাবে প্রতিশোধ নিল। ঘামতে ঘামতে ও হাঁফাতে হাঁফাতে খোজা নাসিরুদ্দিনকে অপমানজনক অবস্থায় ফেলে তারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করল।

আর একবার কাঁকরের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল এবং ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন নিজে থেকে উঠে বসলেন। গাধাকে উদ্দেশ্য করে প্রথম কথা বললেন:

"এখন বুঝতে পারছি কেন আজ সকালে বড় রাস্তা থেকে নেমে এসেছিলি, দুশ্চরিত্র বাপের বেজন্মা বাচ্চা! তুই ভেবেছিলি আমার জামা ধুলোয় ভর্তি? কিন্তু মনে রাখিস লম্বা কানওয়ালা আবর্জনার ডিপো, আমার কাঁধ থেকে জামা না খুলে কেউ কোথাও তৃতীয়বারের মত যদি ধুলো ছিটোবার চেষ্টা করে তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে! প্রয়োজন হলে আমি নিজেই একশো রশি তোর পিঠে চেপে ছুটব যতক্ষণ না একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখতে পাচ্ছি যেখানে মরচে পড়া রক্তমাখা হুক, শিকল থেকে তৈরি বাঁকানো ছুরি এবং দেবদারু গাছের ডালে বিছান গাধার চামড়া দেখতে পাচ্ছি! মনে রাখিস!"

গাধাটা দুটো সাদা চোখ মেলে সরল দৃষ্টিতে পিট পিট করতে লাগল যেন এইসব সাংঘাতিক ভয় তাকে দেখান হয়নি।

এক চোখো লোকটা মাটিতে সটান পড়ে রইল এবং হাত পা নাড়ল না।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন।

এক চোখো ভয়ে ভয়ে মাথা তুলল।

"ওরা চলে গিয়েছে?" সে প্রশ্ন করল। "আমি ভেবেছি ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে।" সে তার জামা কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে বলল, "সুখবর যে ওদের পা খালি ছিল।"

"তাতে কি লাভ হয়েছে বুঝতে পারছি না।"

"যখন কোন মানুষ খালি পায়ে থাকে তখন সে গোড়ালি দিয়ে লাথি মারে," ব্যাখ্যা করে এক চোখো লোকটা বলল। "পায়ের গোড়ালির আঘাত পায়ের সামনের আঘাতের চেয়ে অনেক কম।"

"তোমার সে সব জানা উচিত......।"

"বুকে পাঁজরার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে কানিবাদামের জুতো," এক

চোখো বলে চলল। "দেখতে সুন্দর করার জন্য সেখানকার মুচিরা গোড়ালিতে শক্ত পুরু চামড়া লাগায়; তাই একজনের সৌন্দর্য হচ্ছে অন্যের দুঃখের কারণ।"

"আমি কখনও আমার পাঁজরায় কানিবাদামের জুতো মেরে দেখিনি এবং ভবিষ্যতেও দেখার ইচ্ছা নেই," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "খুব ভাল হয় যদি আমরা এখানে এখনই চিরদিনের জন্য বিদায় নিই।"

তিনি গাধার উপর চেপে বসলেন এবং তার কান দুটো হালকাভাবে নাড়া দিলেন—এটা হচ্ছে যথারীতি চলা শুরু করার লক্ষণ।

এক চোখো লোকটা হঠাৎ পথ অবরোধ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং কান্নায় ফেটে পড়ল।

"শুনুন!" সে করুণভাবে কাঁদতে লাগল। "সারা পৃথিবীতে একজনও আমার বিষয়ে সত্যি কথা জানে না। আমার অনুরোধ, দয়া করে আমার কথা শুনুন, তখন অনেক কিছুই অন্য দৃষ্টিতে দেখবেন।"

তার উত্তেজনা একই রকম রইল, তার চোখের জলও সত্যিকারের; একটা হালকা কাঁপুনিতে সে কেঁপে কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, আমি একজন চোর!" সে বলল, চোখের জলে তার গলা ধরে এল এবং ঘুঁষি মেরে বুক চাপড়াতে লাগল। "আমি মহাপাপী, আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার পাপের জন্য আমি যত কষ্ট পাই অন্য কেউ পায় না। এই পৃথিবীতে একজনও নেই যে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করবে।"

এ সব ছিল এত অপ্রত্যাশিত যে খোজা নাসিরুদ্দিন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

কিছুটা কৌতূহলবশতঃ, কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি চোরের গল্প শুনতে রাজী হলেন।

সপ্তম অধ্যায়

একটা পাথরের উপর তাঁরা দুজনে পাশাপাশি বসলেন এবং একচোখো লোকটা তার জীবনের দুঃখময় আশ্চর্যজনক গল্প শুরু করল।

"চুরি করবার একটা অদম্য ইচ্ছা খুব ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। যখন মায়ের দুধ খাই, তখন একদিন আমার মায়ের বুকের রূপোর কাঁটা চুরি করেছিলাম এবং মা যখন এটার খোঁজে উপর নীচ করছিলেন আমি তখন চুপে চুপে আমার দোলনার ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলাম; তখনও আমি কথা বলতে শিখিনি, তবুও চুরি করা এই মূল্যবান জিনিসটা একটা কাপড় দিয়ে

ঢেকে রেখেছিলাম। যখন বড় হলাম ও হাঁটতে শিখলাম, আমাদের সংসারে আমি এক মূর্তিমান গ্রহ হয়ে দাঁড়ালাম। সামনে যা পেতাম চুরি করতাম : টাকা, কাপড়, আটা, রুটি। এত নিপুণভাবে চুরি করা জিনিস লুকিয়ে রাখতাম যে আমার বাবা, মা কেউ খুঁজে পেতেন না। পরে সুযোগ পেলেই, দূরে ভাঙ্গা কবরখানা ও আধবোজা ফলকগুলোর মধ্যে বাস করত এক ঘরছাড়া কুঁজো ভবঘুরে, তার কাছে চুরির মাল নিয়ে ছুটে পালাতাম। সে আমাকে এই বলে অভ্যর্থনা জানাত, "আমার সামনে আর একটা কুঁজ গজাবে যদি তুমি দুধের বাচ্চা হয়ে ফাঁসিকাঠে বা ঘাতকের ছুরিতে তোমার জীবন শেষ কর!" আমরা পাশা খেলতে সুরু করলাম—সেই কুঁজো লোকটার মুখের পুরু চামড়ায় যেন পৃথিবীর সমস্ত পাপের কথা লেখা ছিল আর আমি ছিলাম চার বছরের গোলাপ ফুলের মত টাটকা বাচ্চা যার গাল দুটো ছিল ফুলো আর চোখে ছিল নির্মল দৃষ্টি।"

ছোটবেলার দুর্দান্ত দিনগুলো মনে করে চোরটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, পরে জোরে নিশ্বাস টেনে ও চোখের জল মুছে ফেলে বলতে সুরু করল।

"পাঁচ বছর বয়সে আমি ছিলাম অতি নিপুণ পাশা-জুয়াড়ী; এই সময়ে আমাদের পরিবারের অবস্থাও খারাপ হতে লাগল। আমার মা না কেঁদে আমার দিকে চাইতে পারতেন না, আর আমার বাবা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলতেন, 'যে বিছানায় তোর জন্ম দিয়েছি সেটা চুলোয় যাক!' আমি তাঁদের আদর বা ভর্ৎসনা কোনটাই শুনতাম না এবং মার থেকে ছাড়া পেলেই আমার নিজের পথে চলতাম। আমার সপ্তম জন্মদিনের মধ্যেই আমাদের পরিবার প্রায় ভিখারীর পর্যায়ে এসে দাঁড়াল; কুঁজো লোকটা বাজারের মধ্যে একটা নিজের সরাইখানা খুলল যার মধ্যে ছিল জুয়া ও গাঁজার গুপ্ত আড্ডা। বাড়ীতে আর কিছু পাওয়া যাবে না ভেবে আমার লোভী-দৃষ্টি ও দুষ্ট চিন্তা প্রতিবেশীদের উপর গিয়ে পড়ল। আমাদের বাড়ীর বাঁ দিকে বাস করত গাড়ীর চাকা-তৈরি করা এক কামার; তার বাড়ীর কুয়া থেকে সারা জীবনের সঞ্চিত টাকা ভর্তি মাটির একটা কলসি চুরি করায় সে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল; পরে প্রায় দু' মাসের মধ্যে আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশীকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনলাম তার সমস্ত পার্থিব জিনিস চেঁচেমুছে চুরি করে। ছোট বা বড় তালায় আমার অসুবিধা হত না—একটা খিল খোলার মত অতি সহজেই আমি তাদের খুলতে পারতাম। আমার বাবার ধৈর্যও শেষ হয়ে এল, তিনি একদিন গালাগালি দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমিও তাঁর শেষ জামা কাপড় ও শেষ সঞ্চয়

ছাব্বিশ টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি তখন সাড়ে আট বছরের। আমার ভবঘুরে জীবনের গল্প বলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, শুধু এইটুকু বলব যে আমি মাদ্রাজে ছিলাম, সেখান থেকে হেরাট, পরে কাবুল এবং এমন কি বাগদাদেও ছিলাম। প্রতি জায়গাতেই আমি চুরি করতাম— এটাই ছিল আমার জীবিকা এবং এতে আমি অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলাম। এই সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার কৌশল শিখেছিলাম ও যে দয়া দেখাত তার সর্বস্ব চুরি করতাম। আমি গর্ব না করে বলব যে এই চৌর্য বিদ্যায় আমার সমতুল্য শুধু ফারঘানায় নয় সমস্ত মুসলমান জগতে আর একজনও ছিল না।"

"থাম, থাম!" বাধা দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "বিখ্যাত বাগদাদের চোরের তা হলে কি হল, যাকে নিয়ে অনেক আশ্চর্য গল্প আছে?"

"বাগদাদের চোর?" একচোখো হেসে উঠল। "তাহলে শোন আমিই সেই বাগদাদের চোর!"

খোজা নাসিরুদ্দিনের অবাক মুখে তার কথার কি প্রভাব হয় দেখবার জন্য সে কিছুক্ষণ থামল, পরে তার হলুদ চোখ আবার স্মৃতির আবরণে ভরে উঠল।

"আমার দুঃসাহসের বেশীর ভাগ গল্পই অলস পরিকল্পনা, কিন্তু তাদের কিছু কিছু সত্যি। যখন আমি প্রথম বাগদাদে এলাম তখন আমার বয়স আঠার; বাগদাদ ছিল কথামালার শহর, কিন্তু বোকায় ভর্তি। আমি বাগদাদের বণিকদের দোকান বা কোষাগারে চাকরী নিতাম যার শেষ ছিল, এমন কি, খলিফারও কোষাগার ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়া। সত্যি কথা বলতে গেলে কোষাগারের ভিতরে ঢোকা মোটেই কঠিন নয়। কোষাগারে পাহারা দিত দৈত্যের মত তিনজন নিগ্রো, যাদের প্রত্যেকেই একজন ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে পারে; সেইজন্য মনে করা হত কোষাগার চোর ও ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদ। কিন্তু আমি জানতাম যে নিগ্রো তিনজনের একজন গাছের গুঁড়ির মত কালা, দ্বিতীয় জন গাঁজা খেয়ে আধো-ঘুমে আচ্ছন্ন থাকত আর তৃতীয় জন ছিল অসম্ভব ভীরু; একটা রাতের ব্যাঙ ডাকলে সে এত ভয় পেত যে কি করবে ভেবে পেত না। আমি একটা লাউ-এর খোল নিয়ে তাতে ফুটো করেছিলাম যেন দুটো চোখ এবং দাঁত বার করা মুখ, খোলটাকে একটা কাঠিতে বেঁধে ভিতরে একটা মোমবাতি জেলে দিয়েছিলাম এবং সেটাকে জামা-কাপড় পরিয়ে ভীরু নিগ্রোটার ঠিক সামনের ঝোপের উপর রাতের বেলায় রেখে এসেছিলাম। সে হাঁফাতে হাঁফাতে মরার মত অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যেটা সব সময় নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে

থাকত সেটা ঘুমাতেই থাকল আর কালাটা কিছুই শুনতে পেল না। তালা-খোলা চাবি দিয়ে আমি কোষাগারে প্রবেশ করলাম বিনা বাধায় এবং যত পারলাম সোনা নিয়ে পালালাম। সকাল বেলায় সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ল যে খলিফার কোষাগারে চুরি হয়ে গিয়েছে; তখন থেকে সমগ্র মুসলিম জগতে আমিও বিখ্যাত হয়ে গেলাম।

"কিন্তু বাগদাদের চোর তো পরে খলিফার মেয়েকে বিয়ে করেছিল," খোজা নাসিরুদ্দিন সঙ্গীকে মনে করিয়ে দিলেন।

"নির্জলা মিথ্যা! আমাকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে এই সব গল্প অর্থহীন ও অসত্য। আমি মেয়েদের সব সময়েই শিশুদের মত অবজ্ঞা করি; আল্লার জয় হোক, লোকে যাকে ভালবাসা বলে আমার সে ধরনের পাগলামি কোন দিনই ছিল না।" শেষ কথাগুলো সে এমন ঘৃণাসূচক জোরের সঙ্গে বলল যেন সে তার চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে গর্ব বোধ করছে। "এ ছাড়া যদি কোন মেয়ের অতি সামান্য টাকাও চুরি করে নাও তাহলে এমন অস্বাভাবিক ভাবে সে চেঁচামেচি করবে যে আমার মত জীবিকার লোকদের তাদের প্রতি শুধু ঘৃণা জন্মাবে। পৃথিবীতে কোন জিনিসেরও পরিবর্তে আমি কাউকে বিয়ে করতে রাজী নই, রাজকুমারী হলেও না এবং যত সুন্দরীই হোক না কেন।"

"কোন চৈনিক বা ভারতীয় রাজকুমারী সম্বন্ধে তোমার ধারণা পাল্টায় কিনা দেখা দরকার," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তাহলে আমি বলব অর্ধেক কাজ হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু রাজকুমারীকে রাজী করান বাকী।"

চোর বিদ্রূপ বুঝতে পারল; তার একটা সাদা চোখ ও অন্য চোখটার নীচের বিরাট নীল ক্ষত ভরা চেপটা বদমায়েসী মুখটা দাঁত কড়মড়ির সঙ্গে জ্বলে উঠল।

"অনেকে ভাববে যে খোজা নাসিরুদ্দিন তোমাকে এই ধরনের সূক্ষ্ম ও বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিতে পরামর্শ দিয়েছিল।"

নিজের নামের উল্লেখে খোজা নাসিরুদ্দিনের কান দুটো জ্বালা করে উঠল ও তিনি ভয়ে চারদিকে চাইলেন। কিন্তু বসন্তের ঝলমলে নির্জনতা ছিল জনহীন; দখিন-মুখো মেঘের ছায়া পাহাড়ের ধূসর পাশগুলোর উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল; ভোমরাগুলো তাদের ঝকঝকে পাখা মেলে রোদ ভরা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছিল: পান্না-রংয়ের একটা টিকটিকিটা খোজা নাসিরুদ্দিনের পাশে একটা গরম পাথরের উপর বসে ঢুলছিল এবং মাঝে মাঝে তার সোনালি রংয়ে মোড়া চোখ দুটো মেলে তাঁর দিকে চাইছিল।

"জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াবার সময় তুমি কি কখনও খোজা নাসিরুদ্দিনের সংস্পর্শে এসেছ ?"

"মাঝে মাঝে," এক চোখো চোরটা উত্তর দিল। "অজ্ঞ লোকেরা তাঁর কাজকর্ম অনেক সময় আমার ঘাড়ে চাপায় আবার উল্টোটাও হয়। কিন্তু সত্যি বলতে আমাদের মধ্যে কোন মিল নেই, থাকতেও পারে না। খোজা নাসিরুদ্দিনের মত না হয়ে আমি সমস্ত জীবনটা পাপে কাটিয়েছি, পৃথিবীতে অন্যায় ছাড়া অন্য কিছু করিনি এবং আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য কোন কিছুই করিনি, যা না করলে—তুমি নিশ্চয়ই জান—এই নশ্বর পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বলোকে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পাপ কাজ আমার সর্বনাশ করেছে, আমাকে আবার এই নক্ষত্রলোকে বিচরণ করে বেড়াতে হবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই একচোখো চোর খোজেণ্ট শহরের গুহর-সাদ মসজিদের সেই বৃদ্ধ দরবেশের মত একই ভাষায় কথা বলছে। এটা কি সম্ভব যে এই চোরও সেই মৌনী সমাজের একজন সদস্য ?—খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চিন্তা অসংলগ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন।

অনুমান—একটা আর একটার চেয়ে আরও বেশি অবাস্তব—তাঁর মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

"আমি এমন," কান্নার স্বরে একচোখো বলে চলল, "যে মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ আমার ও খোজা নাসিরুদ্দিনের মধ্যে মিল খুঁজতে চেষ্টা করবে না ; তাঁর সমস্ত জীবন মানুষের শুভ কাজে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং আগামী বংশধরদের কাছে সে সব উদাহরণ হয়ে থাকবে।"

সমস্ত সন্দেহেরই অবসান হল—এই লোকটি বৃদ্ধ দরবেশের কথাগুলো আবার বলে চলল। "সে কি আমার নাম জানে ?" খোজা নাসিরুদ্দিন অবাক হয়ে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকের চেয়ে রইলেন এবং সেখানে কৃত্রিমতার এতটুকু চিহ্ন আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলেন।

"কোথায় খোজা নাসিরুদ্দিনকে দেখেছিলে, বল তো ?"

তাঁর সন্দেহ অমূলক মনে হল, কারণ চোরের বিবেক একবার মাত্র পরিষ্কার হয়েছিল ; সে সত্যিই জানত না তার সামনে পাথরের উপর বসে লোকটা কে !

"আমি তাঁকে সমরখন্দে দেখেছিলাম। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি সমস্ত ঘটনাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার এক দুষ্কার্যের জন্য। বসন্তের এক দিনে

আমি যখন বাজারে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তখন একটা চাপা শব্দ শুনতে পেলাম : 'খোজা নাসিরুদ্দিন, খোজা নাসিরুদ্দিন !' ফিসফিস শব্দটা এল দুজন শিল্পীর কাছ থেকে। তারা যেদিকে চেয়ে আছে সেদিকে আমার এক চোখটা স্থির রেখে দেখলাম একজন মাঝবয়সী সাধারণ পোশাকের লোক একটা ধূসর রং-এর গাধার লাগাম ধরে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা একটা পোশাক কিনছিল ও তার দাম দিতে যাচ্ছিল। আমি শুধু তার ভাসা-ভাসা মুখটা দেখেছিলাম। 'এই তাহলে বিখ্যাত খোজা নাসিরুদ্দিন, শান্তির প্রতিরোধক, যার নামে অনেকে আশীর্বাদ করে আবার অনেকে গালিগালাজ দেয় !' আমি ভাবলাম। তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করার একটা শয়তানী ইচ্ছা আমার মনে জেগে উঠল। শুধু লাভের জন্য নয়, কারণ তখন আমার সঙ্গে প্রচুর টাকাপয়সা ছিল, কেবলমাত্র শয়তানী প্রবৃত্তি ও চৌর্য ইচ্ছার জন্য। "পৃথিবীতে আমি অন্ততঃ একমাত্র চোর যেন হতে পারি যে গর্ব করে বলতে পারবে যে খোজা নাসিরুদ্দিনের অর্থ চুরি করেছি," আমি মনে মনে বললাম এবং এক মুহূর্ত দেরী না করে কার্যসাধনে এগিয়ে চললাম। হাতে একটা জলন্ত তীব্র গন্ধ ভরা ডাল নিয়ে চুপে চুপে গাধার পিছনে এলাম এবং একটা লাঠির সাহায্যে তার লেজের ঠিক নীচে খোঁচা দিলাম। পিছনে জ্বালা বোধ করে গাধাটা সমস্ত শরীরটা মোচড় দিতে লাগল এবং তার মাথা ও লেজ ঘোরাতে লাগল, পরে লেজের নীচে আগুন জ্বালানো হয়েছে ভেবে ভয়ে চীৎকার করতে করতে খোজা নাসিরুদ্দিনের হাত থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালাল ; যাবার পথে রুটি, অ্যাপ্রিকট ও চেরি ফলের ঝুড়ি উলটিয়ে দিল ; খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়া দিলেন ও সেখানে হৈ-হুল্লোড়ের সৃষ্টি হল ; এই সুযোগে আমি বিনা বাধায় দোকান থেকে নতুন পোশাক নিয়ে পালালাম।''

"ও তুই তাহলে সেই পাপী, বেশরমের বাচ্চা," খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "আল্লার কশম, আগে কেউ কখনও আমার উপর খোদকারী করতে আসেনি ! তুই আমাদের দুজনকেই প্রায় পাগল করে দিয়েছিলি—আমাকে প্রায় দশ বার ঘাম ফেলতে হয়েছিল তাকে শান্ত করতে ও তার হাত পা ছোঁড়া বন্ধ করতে ; পরে তার লেজের নীচে চেয়ে দেখলাম ! আমি যদি তখন তাকে ধরতে পারতাম তাহলে কানিবাদামের জুতোও বোধহয় এর তুলনায় নরম মনে হত।"

বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বোকার মত ধরা দিলেন ; তিনি যখন

বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ; চোর বুঝতে পারল ভাগ্য তাকে কার কাছে নিয়ে এসেছে ।

ভাষা দিয়ে একচোখো লোকটার মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয় । সে হাঁটু মুড়ে খোজা নাসিরুদ্দিনের সামনে বসে তাঁর পোশাকের নীচেটা ধরে মুখে ছোঁয়াল, যেমন একজন অতিথি পবিত্র শেখকে দেখে করে ।

"আমাকে যেতে দাও," জামায় টান দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন । "কি হচ্ছে—তোমরা সবাই আমাকে সাধু বানাতে চাও ? আমি পৃথিবীর একজন অতি সাধারণ লোক—কতবার সে কথা বলব ! আমি কিছুই হতে চাই না—শেখও না, দরবেশও না, আবার যাদুকরও না বা নক্ষত্রলোকে বিচরণকারীও না ।"

"যে রাস্তার উপর আমি আপনাকে দেখতে পেলাম তার জয় হোক," একচোখো বলেই চলল । "হে খোজা নাসিরুদ্দিন আমাকে সাহায্য করুন, আমার মুক্তি আপনার হাতে ।"

আমাকে যেতে দাও !" রাগে জামায় এমন একটা টান দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন যে জামাটা ছিঁড়ে গেল । "কোথায় লেখা আছে যে আমি পৃথিবীর সব ফকির ও চোরকে সাহায্য করব যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় ? আমি জানতে চাই কে আমাকে তোমার হাত থেকে উদ্ধার করবে ?"

কিন্তু আপাততঃ নিয়তি তাঁর খাতায় হয়তো লিখে রেখেছিল যে চল্লিশ পার হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন সেই সব আত্মার মুক্তি সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করবেন যারা ভিন্ন পথে ঘুরে বেড়ায় ; তিনি আবার পাথরে এসে বসলেন ও একচোখো চোরের গল্প শুনতে রাজী হলেন ।

অষ্টম অধ্যায়

"তারপর আমার জীবনের স্রোত বেশ জোরেই বইতে লাগল," চোর বলে চলল । "অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাব তবে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো শুধু বলব । আমি এই শোচনীয় পাপ ও নীতিভ্রষ্ট পথে চলতে লাগলাম যতদিন না একজন বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তির দেখা পেলাম যাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলো আমার বুকে সুলেমানের শিখার মত জ্বলছিল । সেই বৃদ্ধ ঋষি আমাকে পাপের নীচতা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছিলেন এবং আমাকে সে পথ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এতই বোকা যে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে-

ছিলাম। কি ভাবে এটা ঘটেছিল আমি আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলব। বছর পাঁচেক আগে শীতের শেষে রেশম কাপড়ের শহর মারগেলানে এসেছিলাম। একজন আফগানের বোঁচকায় হাত দিয়েছিলাম শয়তানের তাড়নায় এবং ধরা পড়েছিলাম। আফগান আমাকে ধরে ফেলল, আমি এক ঝটকায় পালালাম এবং সমস্ত বাজারের লোক আমাকে তাড়া করল। ফাঁদে পড়া খরগোশের মত এখানে সেখানে ছুটে বেড়ালাম এবং নিঃসন্দেহে সেদিন আমার জীবনের শেষ দিন হতে পারত যদি না আমি এক গলিতে ছুটে যেতাম ও এক কম্পিত স্বর শুনতে পেতাম, 'এখানে লুকাও!' এই গলার স্বর ছিল রাস্তার পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধ দরবেশের। 'ছদ্মবেশ পরে নাও,' তিনি বললেন। আমরা পোশাক বদল করলাম। আমি তাঁর জায়গায় বসলাম ও মুখ লুকাবার জন্য নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখলাম, এদিকে দরবেশ রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকে বসলেন। আমার অন্বেষণকারীরা রাস্তার দিকে ছুটে এল কিন্তু দুজন অতি দীন ভিখারীর দিকে তারা দৃকপাতও করল না এবং উঠোনের এদিকে ওদিকে ছুটতে লাগল। এই সুযোগে বৃদ্ধ আমাকে গলি থেকে বার করে নিয়ে এলেন এবং তাঁর কুঁড়েঘরে লুকিয়ে রাখলেন।"

"থাম," খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন। সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। "সেই বৃদ্ধ তোমাকে ধর্মের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এবং তোমার কাছে আমাদের আত্মার স্বর্গলোকে বিচরণের কথা নিশ্চয়ই বলেছে এবং এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর পরে সত্যের আবার জয় হবে, কিন্তু যেই মাঝ রাতের মুরগি ডাকতে সুরু করল তিনি মৌনী হয়ে গেলেন ও আর একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।"

"সেও কি আপনি ছিলেন?" ভয়ে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে একচোখো বললেন। "আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়—তাহলে আপনি ইচ্ছামত যে কোন রূপ নিতে পারেন?"

"নিজের গল্প বলে চল। বৃদ্ধের কথামত কেন তুমি সৎ পথ ধরে চললে না?"

"উঃ, কি কষ্ট!" একচোখো চীৎকার করে উঠল। "আপনার প্রশ্ন একটা বিষাক্ত কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধছে! তবে শুনুন, আমি যে বৃদ্ধের উপদেশ কানে তুলিনি তা নয়। তাঁর বাণী একটা জ্বলন্ত শিখার মত আমার ভুলগুলো গলিয়ে দিল। মাঝরাতের মুরগি ডাকার আগে এবং বৃদ্ধের মৌনী হওয়ার আগে আমি চোখের জলে ভেসে গিয়েছিলাম ও অনুতপ্ত হয়েছিলাম। তক্ষে

কেঁপে আমি দিব্যি করে বলেছিলাম আমি নিজেকে সংশোধন করব ও সোজা পথে চলব এবং কখনও এ পথ থেকে বিচ্যুত হব না। তখনও পর্যন্ত ফকির আপনার নাম বলেননি বা আপনার পার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানাননি। 'খোজা নাসিরুদ্দিনকে দেখ!' তিনি বললেন। 'অন্ততঃ একজন আছেন যিনি সমস্ত জীবন ধরে না ভেবে বা না বুঝে পৃথিবীকে সৎকাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন, কারণ তিনি অন্যভাবে জীবনধারণ করতে শেখেননি। যদি তুমি অতি অল্পভাবেও তোমার কাজকর্ম তাঁর মত করে তুলতে পার তাহলে অন্য পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।' আশার পাখা মেলে আমি বৃদ্ধ ফকিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ও বুকের মধ্যে আমার হৃদয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দিব্যি করে বলছি আমি অনেক আগেই ধর্মের পথে প্রবেশ করতাম যদি না সেই বদমাস, মানুষের প্রবল শত্রু, আমাদের সকল শুভ প্রেরণার নিবারক, তাড়াতাড়ি আমার পায়ের নীচে অন্যায়, কর্দমাক্ত ও নোংরা লেজ বিছিয়ে দিত যার উপর দিয়ে চলতে গিয়ে আমি পা পিছলে আবার পড়ে গেলাম। নতুন অধ্যায় সুরু করার জন্য অধৈর্য হয়ে আমি তাড়াতাড়ি কোকান্দে গেলাম, যেখানে আমি অন্য শহরের তুলনায় অখ্যাত ছিলাম। আমার প্রায় চার হাজার টাকা ছিল; আমি আমার সামনে এক লোভনীয় ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরলাম যা ছিল ধর্মে পরিপূর্ণ ও যেখানে পাপের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না।' আমি কোকান্দে একটা সরাইখানা খুলব ঠিক করেছিলাম যেখানে কার্পেট বিছান থাকবে এবং গায়ক পাখী ভর্তি খাঁচা ঝুলিয়ে রাখা হবে, সেখানে শান্ত ও নীরব পরিবেশে ও ফোয়ারার জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মাঝে অতিথিদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করা হবে এবং ফকির আমার কাছে সত্যের যে আলো জ্বালিয়েছেন তাতে তাদের হৃদয় পূর্ণ করা হবে। নিজের জন্য আমি অত্যন্ত সাধারণ ও তুচ্ছ জীবন বেছে নিয়েছিলাম এবং লাভের অঙ্ক অনাথ ও বিধবাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। সরাইখানা, বাসন-পত্র, কার্পেট এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে যে টাকা লাগবে হিসাব করতে গিয়ে দেখলাম যে, আমার সঞ্চিত টাকা সব কিছুর জন্য যথেষ্ট, কেবল গায়কদের ছাড়া—যারা নহবতখানায় বাজনা বাজাবে ও উঁচু গলায় গান গাইবে। আমার অল্প কিছু টাকা কম ছিল—মাত্র তিন থেকে চারশো টাকা। এইখানেই শয়তান আমার পথে লোভের এক ফাঁদ পাতল এবং কোকান্দের পথে এক কুশলী জুয়াড়ীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। 'শেষ খেলা একবার

খেলব', মনে মনে বললাম। 'এই পাপের জন্য ক্ষমা পাব, কারণ জেতা টাকা একটি ভাল ও সৎ কাজের জন্য খরচ করা হবে; যদি এর উপরেও কিছু টাকা বাঁচে তবে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব।' স্বভাবতঃই এইরূপ সদিচ্ছা নিয়ে কোন লোক স্বর্গীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাবে আশা করে, কিন্তু ফল হল উল্টো।"

"বাকীটা আমি জানি," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। তুমি সারা রাত ধরে খেললে এবং সকালে তোমার পকেটে আর একটিও তামার পয়সা রইল না। তোমার সরাইখানা ও সেই সঙ্গে কার্পেট, পাখীর খাঁচা, ফোয়ারা, গায়ক, গম্ভীর ধর্মালোচনা ও উপদেশ মূলক গান সমস্তই পাকা জুয়াড়ীর পকেটে চলে গেল। তাছাড়া তুমি তোমার জুতো, জামা-কাপড়, টুপি এবং যদি ঠিকমত মনে থাকে তবে তোমার জামা কাপড়, কেবল মাত্র অন্তর্বাস ছাড়া বাকী সবই তাকে দিয়েছিলে।"

"পয়গম্বরের নামে বলছি!" একচোখো উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল। "আপনি সব জান্তা! আপনি জামার খবরও জানেন! আপনি তাহলে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ তার চোখে পড়তে পারেন?"

"তোমার একচোখে আমি অতীত ছাড়া অন্য কিছু পড়তে পারব না, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার অন্ধ চোখের পিছনে লুকান আছে। এখন বলা সুরু কর।"

"এই বিপদের পর আমি কি করব? পুণ্যের পথে চলার স্বপ্ন কি ছেড়ে দেব? এইসব চিন্তা আমার সামনের পৃথিবীকে কাল ধোঁয়ায় ভরিয়ে তুলল। 'না' আমি স্থির করলাম, 'সৎপথে চলার পথে আমি অবিচল থাকব। এসব শয়তানের কাজ—তার কবল থেকে বেরিয়ে আসছি এই ধারণায় বেপরোয়া হয়ে আমাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে চায়। ফকিরের নির্ধারিত পথে আমি নিশ্চয়ই প্রবেশ করব এমন কি এর অর্থ যদি হয় আরেকটা পাপ!' এই সিদ্ধান্তে স্থির থেকে আমি কোকান্দে পৌঁছালাম এবং সেখানে যা খবর পেলাম তাতে আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। প্রকাশ পেল যে একজন নতুন খান সম্প্রতি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন এবং সেই শহর যেটা একদিন চোর ও বদমায়েসের সমৃদ্ধ উদ্যান ছিল এখন তাদের কাছে এক অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। নতুন খান কঠিন নিয়ম চালু করে দিলেন যাতে চোরেদের হয় শহরের মাটি থেকে পা সরিয়ে নিতে হবে নতুবা তাদের কারবার বন্ধ করতে হবে। বেশ অমর্যাদার সঙ্গেই অনুসন্ধান বিভাগের প্রধানকে খান বরখাস্ত করলেন, কারণ

তার জন্ম শহরের যত চোর অনেক বছর ধরে মসজিদে নামাজ পড়ে আসছিল এবং তার জায়গায় কামিলবেক নামে একজন উৎসাহী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অত্যাচারী যুবককে নিয়োগ করলেন। খানের অনুগ্রহ পাবার জন্য নতুন প্রধান শহরে একেবারে গোড়া সমেত চুরি বন্ধ করার শপথ নিয়েছিলেন এবং আমার শহরে প্রবেশ করার সময় তিনি সে উদ্দেশ্য প্রায় সফল করে এনেছিলেন। সমস্ত শহর চতুর গুপ্তচর ও ভয়াবহ প্রহরীতে ভরে গিয়েছিল ; এমন কি তাদের হাতে ধরা না পড়ে কারও বোঁচকা থেকে একটা মটর দানা চুরি করাও সম্ভব ছিল না। ধরা পড়লে প্রত্যেকটি চোরের ডান হাত কেটে নেওয়া হত এবং কপালে গরম লাল লোহা দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হত ; কেউ কোন তুচ্ছ জিনিস চুরি করতে সমর্থ হলেও পাচার করতে পারত না, কারণ চোরাই মালের খদ্দেররা একই শাস্তি পেত এবং প্রত্যেকেই ভয় পেয়েছিল। সুতরাং আমার পুণ্যের পথে এক নতুন বাধার সৃষ্টি হল—সেই নিষ্ঠুর যুবক ও তার নির্দয় আইন। কি করব না জেনে ও কিভাবে সুরু করতে হবে এই চিন্তায় বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। মে মাস ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তুরাখন বাবার উৎসব এগিয়ে আসছিল—যার দরগা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোকান্দ থেকে বেশি দূরে নয়। সেই পাপী শয়তানটা আমার আত্মাকে দখল করার প্রচেষ্টায় আমাকে অসৎ চিন্তায় উৎসাহ দিচ্ছিল—পুণ্যের পথে প্রবেশ করার জন্য আমার যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার জন্য মেলার সুযোগ নেওয়া……।"

কিছুক্ষণ একচোখো চোর ও খোজা নাসিরুদ্দিনের কথা বাদ দিয়ে পাঠকদের সঙ্গে বাবা তুরাখনের বসন্ত উৎসবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক, তা না হলে পরের গল্পে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য হয়ে থাকবে।

প্রাচীন প্রবাদ অনুযায়ী তুরাখন ছিলেন কোকান্দের অধিবাসী, পাঁচ বছর বয়সে মা ও বাবাকে হারান এবং বাজারের পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতেন। তিনি অবাক জীবনের বিস্বাদময় সুরা পান করেছিলেন ; এই ধরনের প্রচেষ্টা হয় কোন মানুষকে উত্যক্ত করে তার হৃদয়কে পাথরে পরিণত করে, নতুবা মানুষের জ্ঞানের উচ্চ শিখরে তাকে তুলে দেয় যদি তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলে তাঁর নিজের আঘাত ও তিক্ততাকে নতুন করে সকলের আঘাত ও তিক্ততায় পরিণত করেন। তুরাখনের বেলায় তাই ছিল। তিনি মনুষ্যত্বে পৌঁছেছিলেন তাঁর প্রজ্বলিত হৃদয় নিয়ে, যা হৃদয়-হীন ধনীদের প্রতি ক্রোধোন্মত্ত ছিল এবং

গরীবদের জন্য ছিল সহানুভূতিপূর্ণ বিশেষ করে শিশুদের প্রতি যারা নিজেদের নিজেরাই সাহায্য করতে পারত না।

বাইরে যাওয়া শকট-দলের সঙ্গে তিনি কোকান্দ ছেড়েছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে এবং ফিরে যখন আসেন তখন বয়স চল্লিশ। এই সময়টার বেশীর ভাগ তিনি ছিলেন ভারত ও তিব্বতে এবং চিকিৎসাবিদ্যার রহস্য নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ও উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছিলেন। কথায় আছে তিনি ছোঁয়া মাত্র লোকে উপশম পেত এবং সব সময় ধনীদের কাছে এ চিকিৎসার জন্য বেশী টাকা আদায় করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা গরীব ছেলেদের জন্য ব্যয় করতেন।

যখনই বাইরে এধার ওধার যেতেন বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা তাঁকে ঘিরে থাকত; টাকা থাকলে তিনি কোন খেলনা বা মিষ্টির দোকানে গিয়ে সব জিনিস তাঁর ছোট বন্ধুদের জন্য কিনে নিতেন। যদি টাকা না থাকত এবং কোন অর্ধনগ্ন ছেলেকে খালি পায়ে দেখতে পেতেন, কিছু না বলে তিনি প্রথমে তাকে একটা কাপড়ের দোকানে নিয়ে যেতেন, পরে যেতেন জুতোর দোকানে, তার পর কোমর বন্ধনী ও সবশেষে টুপির দোকানে এবং প্রত্যেক জায়গায় তিনি মাত্র দুটো কথা উচ্চারণ করতেন, "দয়া করুন"। দোকানদারেরা বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভয়ে—বয়স্কদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন—শিশুকে কাপড়-জামা ও জুতো পরিয়ে দিত এবং টাকার ব্যাপারে কিছু বলতে সাহস পেত না, কারণ তারা মনে করত তুরাখন বাবা যেমন রোগের উপশম করতে পারেন তেমনি রেগে গেলে বিভিন্ন রকম অসুখ বিসুখ দিয়ে শাস্তি দিতে পারেন।

যখন তিনি মারা গেলেন হাজার হাজার ছেলে ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে কবর স্থান পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহের পিছন পিছন গেল। মৌলভী ও মোল্লারা তাঁকে আল্লার প্রিয়জন হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করল, কারণ তারা বলল, তিনি রোজা রাখতেন না, ইসলামের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতেন এবং সারা জীবনে কখনও দরগাগুলো সাজাতে এক পয়সাও খরচ করতেন না। তাঁর মতে মৃত শেখদের চেয়ে জীবিত গরীবদের অর্থের প্রয়োজন অনেক বেশি। সাধারণ লোকে, যাইহোক, তুরাখন বাবাকে মুনি ঋষির আসনে বসিয়েছিল এবং তাঁর খ্যাতি কোকান্দের সীমানা ছাড়িয়ে সমস্ত পূবদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর নামের যে উৎসব ছিল শিশুদের পবিত্র দিন।

জনপ্রিয় প্রবাদ আছে যে তুরাখন বাবা উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায়

অভাবগ্রস্ত ছেলেদের উপহার বিলিয়ে দেবার জন্য উঠোনের চারপাশে ঘুরে বেড়ান এবং সেই উদ্দেশ্যে মাথার টুপিতে উপহার রেখে ঝুলিয়ে দেন। বসন্তের অনেক আগে থেকেই ছেলেরা এই উৎসবের জন্য তৈরি হতে থাকে। ঠাণ্ডা উগ্র বাতাস তখন বইছিল, শুকনো কনকনে তুষার ভারী আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল. বাগানগুলো তখনও কাল ও নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মাটি জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে টাঙ্গার চাকার নীচে বেজে উঠছিল এবং প্রতিদিন সকালে ছেলেরা ছোট ছোট দলে জড় হয়ে দেওয়াল, বেড়া ও অন্যান্য আশ্রয়স্থলে জড় হতে লাগল; সেখানে নীল বোঁচা নাক নিয়ে, তাদের ছোট্ট পোশাকে কাঁপতে কাঁপতে এবং কানের উপর তাদের হাত রেখে তারা গম্ভীরভাবে ও অনেকক্ষণ ধরে তুরাখন বাবাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। তারা অবশ্য জানতো যে তুরাখন বাবাকে খুশী করা খুব শক্ত এবং তাঁর কাছ থেকে উপহার পাওয়া খুব সোজা ব্যাপার নয়। সর্তগুলিও ছিল ভয়ানক। উৎসবের প্রায় পঞ্চাশ দিন আগে থেকেই সর্ত পালন করার দরকার হত; প্রথম, কোন সময়েই মা বাবার মনে দুঃখ দেবে না, প্রতিদিনই কিছু ভাল কাজ করবে—উদাহরণস্বরূপ, একজন অন্ধকে পায়ে হাঁটা সেতু পার হতে সাহায্য করবে অথবা একজন বুড়ো মানুষকে তার বোঝা বইতে সাহায্য করবে; তৃতীয়তঃ, এই পঞ্চাশ দিন ধরে হকারের ডালায় মিষ্টি সাজান থাকলেও কেউ মিষ্টি খাবে না যাতে সেই পয়সা বাঁচিয়ে একটা সুন্দর নতুন টুপি কেনা সম্ভব হয় (সকলেই জানে যে তুরাখন বাবা পুরোনো তেলচিটে টুপি পছন্দ করেন না এবং সাধারণতঃ তাদের এড়িয়ে চলে যান যদি না তারা খুব গরীব ছেলে হয়)।

এই পঞ্চাশ দিন ধরে প্রতি পরিবারেই শান্ত ও ভাল ব্যবহার বিরাজ করে। ছেলেদের যা বলা হয় তাই তারা করে, বেশ ছিমছাম হয়ে ঘোরাফেরা করে এবং ফিসফিস করে কথা বলে যাতে তুরাখন বাবার বিরক্তিভাজন না হয়। এমন কি সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেরাও এই সময়ে ভেড়ার মত শান্ত হয়ে পড়ে; কোন কান্না বা চীৎকারের শব্দ শোনা যায় না, কোন মারামারি, মার্বেল নিয়ে কোন খেলা বা চীৎকার ও শিস দেওয়ার মধ্যে ঢিলে জামা পরে পিকাপ্যাক খেলা নেই।

উৎসবের আগের দিনের সন্ধ্যায় ছিল বেশ উত্তেজনা ও হুড়োহুড়ি, গোপন শলাপরামর্শ, ভীত ফিসফিস শব্দ, উত্তেজিত ছোট ছোট হৃদপিণ্ডে আরও বেশি ধকধক শব্দ। আসল কথা হচ্ছে মোল্লারা এই উৎসব দেখে ভুরু কোঁচকাতে এবং কোন কোন জায়গায় একেবারে নিষেধ করে দিয়েছিল, ফলে তুরাখনের

কচি কচি ভক্তদের কাছে এই উৎসব আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। মাথার টুপিতে তিনটে সুতো সেলাই করতে হবে; সাদা হচ্ছে মঙ্গলের চিহ্ন, সবুজ বসন্তের এবং নীল হচ্ছে স্বর্গের চিহ্ন; পরে ভোরে হামাগুড়ি দিয়ে বাগান বা আঙুর খেতের দিকে যেতে হবে—যেখানে টুপিগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, মুখটা তুরাখনের দরগার দিকে এবং চোখ দুটো সব সময়েই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চেয়ে আছে। পরে তুরাখনের উদ্দেশ্যে গোপন কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে ও মাটির দিকে নীচু হয়ে তিনবার সেলাম করতে হবে—এবং এইসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাড়ী ফিরতে বা শুতে যেতে পারবে না। রাতে লাফ দিয়ে ওঠা বা ছুটে টুপি দেখতে যাওয়া একেবারে বারণ—এবং সেই কারণেই অনেক ছোট্ট হৃদয়ের কাছে সেই রাত হচ্ছে দারুণ বেদনার রাত।

কিন্তু উৎসবের সকালে সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়। প্রতি বাড়ীতেই আনন্দের শব্দ শোনা যায়। কারও জন্য তুরাখন বাবা রেশমের জামা-কাপড় রেখে যান, আবার কারও জন্য লাল বা সবুজ ফিতের জুতো, এখানে খেলনা ও মিষ্টি, ওখানে জুতো, আংটি ও ছোট মেয়েদের জন্য জামা-কাপড়। তুরাখন বাবা কত দয়ালু ও চিন্তাশীল! সমস্ত দিন ধরে বাগানের সবুজ গাছপালার অস্পষ্ট উড়ে যাওয়া পাতার মধ্যে রঙীন আংটি পরে ছেলেরা আনন্দে নাচে এবং গান করে যে গান তারা তাদের বন্ধু ও রক্ষাকারীর জন্য ছড়া বেঁধেছিল:

মিষ্টি মধুর বইছে বাতাস দখিন হতে,
পরশ পেয়ে শুভ্র হ'ল চেরির বাগান।
দিন সুরু হয় উজল আলোর ঝলকানিতে,
উঠল রে ঐ হাজার প্রাণে আনন্দ-গান।

শিস্ দিয়ে গায় নীলকণ্ঠ পাখা মেলে,
বজ্র যেন তুলছে আওয়াজ পরম সুখে
যাদুর রাজা ঐ তুরাখন দু' হাত তুলে,
ঘুমটি ভেঙ্গে উঠবে বসে বেদির বুকে।

মখমল আর রেশম কাপড় সারি সারি
রাখল বুড়ো; রঙীন কাপড় পুলক জাগায়,
ছুঁচ তুলে নেয় বুড়ো হাতে তাড়াতাড়ি,
করবে সেলাই তাই ত নাকে চশমা লাগায়।

বসন্তেরই পাখীর মত দিন চলে যায়।
বুড়ো চোখে নেই কো বিরাম, নেই কোন ঘুম,
ছোট বড় সবার তরে করছে সেলাই।
একা একা, কেউ কোথা নেই বড়ই নিঝুম।

খায় না কিছু, ছোঁয় না বালিশ, নেই বিছানা
মাথা তুলে বসে বসে কাজ করে যায়
খোকাখুকু সবার তরেই চাই খেলনা,
কেকের প্যাকেট, ফলের ঝুড়ি, প্যাস্ট্রি, মিঠাই।

ছেলেমেয়ে আজকে রাতে দুঃখ ভুলে
দুপুর রাতে স্বপ্ন দেখে পরম সুখে
যাদুর রাজা ঐ তুরাখন দু' হাত তুলে,
ঘুমটি ভেঙ্গে উঠল বসে বেদির বুকে।

দেখতে পাবে চাঁদের আলোর স্বপ্ন মায়ায়
নরম পায়ে ধরতে ছুটে ইঁদুর ছানায়
ঝুলিয়ে কাঁধে উপহারের বস্তা বোঝাই,
বিলাতে যায় সব বাড়ীতে সব ঠিকানায়।

খুশীর হাওয়ায় উঠছে মেতে সব শিশুরাই,
আনন্দ আজ উথলে উঠে কচি প্রাণে।
আজকে এস, সবাই মিলে জয়গাথা গাই
মে মাসের এই আলোয় ভরা প্রথম দিনে।

আগামী কাল ঘুমিয়ে বুড়ো পড়বে সুখে,
রইবে না কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে শব্দ তুলে,
মিষ্টি হাসি রইবে লেগে বুড়োর মুখে,
যাদুর রাজা মাটির নিচে পড়বে ঢুলে।

এবার আমাদের খোজা নাসিরুদ্দিন ও তার একচোখো সঙ্গীর দিকে ফেরা যাক, যাদের আমরা পথের ধারে বসা অবস্থায় ফেলে এসেছিলাম। আমাদের অনুপস্থিতিতে এখানে কোন পরিবর্তন হয়নি; তারা তখনও পাথরের উপর বসে ছিল, সূর্য ঝলমল করছিল, পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে মেঘের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভোমরারা গরম বাতাসে ঝলমলে পাখা মেলে যেন ঝুলছিল এবং টিকটিকিরা পাথরের উপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল।

একচোখো তার গল্প বলে চলল।

"প্রলোভনকারীর কপট চাটুবাক্যের কাছে আমি পরাজিত হলাম। তুরাখনের উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায় সোজা আমি গেলাম ও পাশের উঠোন, বাগান ও আঙুরখেতের চারপাশে ঘুরে বেড়ালাম। সর্বত্র আমি উপহার সমেত টুপি সংগ্রহ করলাম। অনেকবার আমি একটা পরিত্যক্ত গম্বুজের আড্ডায় ফিরে এসে আমার থলি খালি করে আবার ফিরে গেলাম লুঠ করার জন্য। সকাল বেলায় দেখলাম আমার কাছে জমা হয়েছে কয়েক হাজার টুপি, অসংখ্য ছেলেদের জামা-কাপড়, ফিতে পরা জুতো, পোশাক, চটি, ব্রেসলেট, নেকলেস এবং আরও অনেক জিনিষ। প্রচুর জিনিষের বিরাট স্তূপের দিকে চেয়ে ভাবলাম, "গায়ক সমেত দুটো সরাইখানার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট! কোন দ্বিধা না করে অবিলম্বে আমি সব কিছু বিক্রী করে দিতে পারি, তখন কে আর তার নিজের জিনিষ চিনে নিতে পারবে? কোকান্দে তুরাখান বাবার স্মৃতি উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ এবং ছেলেদের কয়েকটা তুচ্ছ পোশাক ও টুপির জন্য কে আর জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে? দেখুন আমি কত নীচ হয়ে পড়েছিলাম! রাতের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।"

আমার জেগে উঠা ছিল ভয়ংকর! সমস্ত ঘরটা দুলছিল ও কাঁপছিল, একটা আধিভৌতিক মলিন কেঁপে উঠা আলো জ্বলে উঠল। এই বিচ্ছুরিত আলোয় দেখলাম যেন তুরাখন বাবা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ রাগে জ্বলছিল, তাঁর চোখ দুটো আমার সমস্ত শরীরটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল; তাঁর কণ্ঠস্বর একটা জলপ্রপাতের শব্দের মত গর্জন করছিল। "এই পাপী", ভয়ংকর গলায় তিনি বললেন। "এই বেজন্মা পাপী দুরাত্মা। তুই ছেলেদের নিষ্পাপ আনন্দ চুরি করতে এসেছিস; ছেলেদের আনন্দের চীৎকার ও শব্দ যা আমার হৃদয়ের এত প্রিয়, তার বদলে আমি সর্বত্র শুনতে পাচ্ছি ছেলেদের চোখের জল ও কান্না! আমার নিষ্কলঙ্ক নামকে তুই কালি মাখাতে এসেছিস—ছেলেরা আমার

নামে এখন কি বলবে যখন তারা দেখবে যে আমার কাছ থেকে প্রত্যাশিত উপহার অথবা তাদের নতুন টুপি কোনটাই নেই? ওরা বলবে তুরাখন বাবা মিথ্যাবাদী, ঠগ এবং চোর। শুনতে পাচ্ছিস, নীচতা ও পাপের দুর্গন্ধ ভরা জাহাজ!" বিস্ময় ও সন্ত্রাসে হতবুদ্ধি হয়ে আমি ফকিরের ক্রোধোন্মত্ত বক্তৃতা শুনছিলাম। "তাহলে তোর শাস্তি শোন্, বিশ্বাসঘাতক বদমাস্, তুই মরা হায়েনার মাংস খেয়ে জীবনধারণ করার যোগ্য। আমি তোকে শাস্তি দিচ্ছি তুই সর্বদা ও সর্বত্র চুরি করে জীবনধারণ করবি, চুরিবিদ্যা তোর কাছে যতই ঘৃণ্য হোক্ না কেন কিছুই যায় আসে না। তুই চুরি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবি কিন্তু তোকে চুরি করতেই হবে। প্রতি বছর আমার উৎসবের আগের দিন তোর পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হবে, একটি উপায় ছাড়া তোর যন্ত্রণার উপশম হবে না—তা হচ্ছে চুরি করা। তোর যন্ত্রণা দূর হলেও প্রতি বার চুরি করার সময় তোর বিবেক ভয়াবহ নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে। একটা পুরো বছরের সংযম, সারা বছরের নৈতিক উৎকর্ষ লাভের চেষ্টার পর শেষে তোকে চুরি করতে হবে এবং অন্যায় থেকে ভাল এবং সংযমের প্রতি তোর আশা আকাঙ্ক্ষার সৌধ একটিমাত্র আঘাতেই নষ্ট হয়ে যাবে। তুই এইভাবেই চলবি যতদিন না পাপ পরিশোধ করিস এবং কিভাবে পরিশোধ করবি তা তোকে নিজেকেই বার করে নিতে হবে।" তুরাখনের শেষ কথার পর আবার বাজ পড়ার মত শব্দে ঘরের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। কিছু অংশ দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ল এবং ইঁট কাদা আমার মাথার উপর এসে পড়ল। ভয়ে দিগভ্রষ্ট হয়ে চোখ বিস্ফারিত করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আর তখনই গম্বুজটা ধ্বসে পড়ল আর ধ্বংসাবশেষের নীচে আমার চুরি করা সব জিনিষ চাপা পড়ল।"

"এটা হচ্ছে পাঁচ বছর আগের মে মাসের প্রথম দিকের ঘটনা," খোজা নাসিরুদ্দিন মাঝখানে বললেন। "এক ভয়ংকর ভূমিকম্প, সেই সঙ্গে সাধারণতঃ শোনা যায় না এ ধরনের বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড় কোকান্দের অনেক বাড়ী ধ্বংস করেছিল; এমন কি খোজেণ্টেও এর প্রভাব দেখা গিয়েছিল; সেখানে প্রাচীন শুহর-শাদ মসজিদ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল—সেই মসজিদ, যেখানে বৃদ্ধ ফকির এখন বসে···।"

এখানে অবশ্য তিনি থামলেন, ভাবলেন তাঁর একচোখো সঙ্গীকে বৃদ্ধ ফকিরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা কিছু বলবেন না।

"তাহলে তুমিই সেই ভূমিকম্প করিয়েছিলে!" তিনি বললেন।

"হ্যাঁ আমি, কি দুর্ভাগ্য !" স্বীকার করে একচোখো বলল। "পরে আমি জানলাম তুরাখনের সমাধির পাথরের ফলকও সেদিন ফেটে গিয়েছিল। ফেটে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ফকির ভয়ানক রেগে গিয়ে সমাধি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। সেইদিন থেকে আমি এক নিকৃষ্ট ও দুঃখময় জীবনযাপন করছি। প্রতি বছর এই সময় তুরাখনের উৎসবের আগের দিন এক ভয়ানক যন্ত্রণায় ছটফট করি যার সাক্ষী আপনি ছিলেন। চুরি করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমি স্বস্তি পাই না। এখন বুঝতে পারছেন রোগের উপশম বলতে আমি কি বোঝাতে চেয়েছিলাম যা ডাক্তারের চিকিৎসায় ভাল হয় না এবং কেমন করে রান্নার বাসন আপনার গাধার জিনের মধ্যে এসেছিল।"

"এখন বুঝতে পারছি। যখন তুমি ধরা পড় ও তোমার চুরির জিনিস কেড়ে নেওয়া হয় তখন কি তোমার কষ্ট আবার সুরু হয় ?"

এই প্রশ্ন করার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিনের যথেষ্ট যুক্তি ছিল, কারণ তিনি একজন বিজ্ঞ লোক এবং সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

"না তা হয় না। তবে যখন ধরা পড়ি তখন আমাকে নির্দয়ভাবে মারা হয়। আজ রান্নার বাসনের জন্য মার খেয়েছি......।"

"আমিও।" খোজা নাসিরুদ্দিন মনে করিয়ে দিলেন।

"এক বছর আগে আন্দিজানের প্রহরী, নামাজের কার্পেট চুরি করার জন্য মেরেছিল।"

"প্রহরী তোমাকে ছেড়ে দিল ? সেখান থেকে কেন তোমায় জেলে পাঠায়নি ?"

"আপনি কি বোকা বিড়ালের গল্প শোনেননি ?" হেসে একচোখো বলল। "একজন লোকের বাড়ীতে ইঁদুর দেখা দিল। এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে রাস্তার এক লোম ওঠা বিড়াল নিয়ে এল। বোকা বিড়ালটা এক রাত্রেই সমস্ত ইঁদুর মেরে ফেলল। পরদিন সকালে ভাঁড়ার ঘর উপদ্রবকারীদের হাত থেকে মুক্ত দেখে বাড়ীর মালিক বিড়ালটাকে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল এবং বাড়ীর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল ভিতরের নরম গদী, উনুনের গরম ধার এবং গামলা ভর্তি দুধ সমেত। প্রহরী অবশ্য বিড়ালটার চেয়ে চালাক ছিল !"

তার গল্প শুনে খোজা নাসিরুদ্দিন হাসলেন, পরে প্রশ্ন করলেন কেন সে কোকান্দে যাচ্ছে এবং সেখানে তার কি কাজ আছে। চোর উত্তর দিল প্রতি বছর বসন্তে সে তুরাখনের দরগায় তীর্থযাত্রায় যায় এবং সেখানে চোখের জলে কেঁদে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে কবরের পাশে কয়েক ঘণ্টা কাটায়। যাইহোক আজ

পর্যন্ত সে তার প্রার্থনার কোন উত্তর পায়নি। ফকির আজ পর্যন্ত অনমনীয় আছেন।"

"তুমি পরে আর কি করতে চাও ?"

"আমি আপনার উপদেশ শোনার অপেক্ষা করছি।"

খোজা নাসিরুদ্দিন চিন্তা করছিলেন। একচোখোর সঙ্গ ত্যাগ করার জন্ত তাঁর প্রাথমিক ইচ্ছা নাড়া দিয়ে উঠল। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে খোজেণ্টের পুরোনো ফকির যিনি তাঁদের দুজনের ভাগ্যকে এক সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। "দুয়েকজনকে নরক যাওয়া থেকে রক্ষা করলে কিছুই যায় আসে না," খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। "তাছাড়া সে আমার নাম জেনেছে সেজন্যে তার উপর নজর রাখা অনেক নিরাপদের।"

"ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমরা দেখব আমাদের দুজনে তুরাখন বাবাকে তুষ্ট করতে ও তাঁর ন্যায়সঙ্গত রাগ দূর করতে পারি কিনা। কিন্তু তোমাকে দিব্যি করে বলতে হবে ভবিষ্যতে আর কোনদিনও আমাকে না জানিয়ে রোগ উপশমের এই পথ ধরবে না।"

একচোখো স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিল; তাঁর প্রতি তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা ছিল না।

ইতিমধ্যে সূর্য অনেক আগেই দিনের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, পিছনে পাহাড়ের উপর তুষারাবৃত চূড়াগুলোকে গৈরিক রঙে রাঙ্গিয়ে তুলেছে আর তাদের ধূসর ছায়া এসে পড়েছে পাহাড়ের ধারে। বাতাস হয়ে উঠেছে সতেজ, ভোমরা ও মৌমাছিরা অদৃশ্য হয়েছে আর টিকটিকিরা পাহাড়ের মাঝে নিজেদের লুকিয়েছে। খোজা নাসিরুদ্দিন পেটে খিদের জ্বালা অনুভব করলেন, তাছাড়া রাতের আশ্রয়ের কথাও চিন্তা করতে হল।

"সামনে!" গাধায় চেপে তিনি বললেন। "আমরা এখানে বেশ সময় কাটিয়েছি এবং কোকান্দ এখনও অনেক দূরে।"

অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর গাধা মাথা নেড়ে ও লেজ খাড়া করে ছুটল এবং তাঁরা আবার যাত্রা সুরু করলেন।

নবম অধ্যায়

কোকান্দের নিকটবর্তী অঞ্চলে এক গর্ত ছিল যেখানে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা ধান চাষ করত; তখনকার দিনে সেখানে একটা গরম হ্রদ ছিল যেটা

জল পেত মাটির নীচের গরম উৎস থেকে। বসন্তকাল এখানে এক সপ্তাহ আগে থেকেই সুরু হত। পাহাড়ের পাশের বাগানগুলো তখনও কাল দেখাত আর হ্রদ দেখতে সবুজ ও ফুলে ভরা ; উপরের সূর্যের রোদ ও নীচের উষ্ণ প্রস্রবণের জন্যে হ্রদ গরম হত।

সেখানে জানা যায় যে তুরাখন বাবা তাঁর দরগার জন্য বেশ বিবেচকের মত এই নীচু জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন, কারণ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের সেলাই-এর কাজ, জুতো তৈরি, খেলনা তৈরি ও হালুয়া রান্না করতেন। তাঁর অতি সাধারণ দরগা কেবলমাত্র দুটো কাল ঘোড়ার লেজ দিয়ে সাজান হত এবং প্রবেশ পথে দুটো খুঁটিতে বেঁধে রাখা হত ; চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সারি দিয়ে গ্রন্থি বিশিষ্ট বুড়ো সেগুন গাছ, যাদের নীচের শাখা থেকে ঝুলছিল পুরোনো রেশমের ফিতার প্রান্তভাগ যেগুলো ফকিরের ভক্তরা সেখানে নিয়ে এসেছিল। প্রচুর পরিমাণে রেশমের ফিতা জড় হওয়া থেকে বোঝা যায় যে তাঁর স্মৃতি মুসলমানদের হৃদয়ে আজও সজীব হয়ে আছে।

দরগার সামনে খোজা নাসিরুদ্দিন নামলেন এবং সসম্ভ্রমে তুরাখনকে সেলাম করলেন ; তাঁকে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর এক চোখো সঙ্গী অনেক পিছনে পড়ে রইল। সে রাস্তার উপর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, মাথার উপর ধুলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল ও কাঁদছিল। "হে দয়াময় তুরাখন, আল্লার নামে আমাকে ক্ষমা কর!" তার অনুতপ্ত বিলাপ সেগুন গাছের মধ্যে দিয়ে প্রায় শোনা যাচ্ছিল না।

দরগার রক্ষক সামনে এল—কম্বল গায়ে এক বুড়ো মানুষ, যার মুখটা শুকনো আপেলের মত হলদে ও কোঁচকান, কিন্তু চোখ দুটোর ভিতর যেন লুকোন আগুনের শিখা দপ দপ করছিল। একটা কাল, বেঁকে যাওয়া ও পোকায় কাটা দরজা খোলা হল। ঠাণ্ডা আধো অন্ধকার থেকে একটা মাতাল করা প্রাচীন ধরনের গন্ধ বেরিয়ে এল—একটা অদ্ভুত গন্ধ যা প্রাণে সেঁধিয়ে যায়। খোজা নাসিরুদ্দিন জুতো খুলে বুড়োর দেওয়া নরম চটি পায়ে দিলেন এবং দরগায় প্রবেশ করলেন। সাদা দেওয়াল এবড়ো খেবড়ো ভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি, কোন সাজ বা ছবি ছিল না ; দুটো জাফরি কাটা জানালা সমেত দেওয়ালটা একটা গম্বুজ ধরে রেখেছিল। আলোর দুটো সরু রেখা আধো অন্ধকার নষ্ট করে সমাধির পাথরের উপর এসে পড়েছিল ও পরে মাঝখানে এসে ভেঙ্গে পড়েছিল। দু'হাত চওড়া একটা উঁচু পাথরের রাস্তা প্রবেশ পথ

থেকে সমাধির প্রান্ত পর্যন্ত এসেছিল এবং এর দু ধারের মেঝে যুগ যুগান্তর ধরে জমা সবজে ধূসর ধুলোয় ঢাকা ছিল। প্রথা অনুযায়ী এই ধুলো ছোঁয়া হয় না। ধুলোর উপর পায়ের ছাপ ফেলা একে অপবিত্র করা বলে গণ্য করা হয়। সমাধি এতই নিস্তব্ধ ছিল যে খোজা নাসিরুদ্দিন যেন নিজের রক্ত চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি বেদির দিকে এগিয়ে গেলেন, যে পাথরের নীচে এক দয়ালু হৃদয় লুকিয়ে আছে, যে হৃদয় একদিন ওঠা-নামা করত এই পৃথিবীতে, সেই পাথর চুম্বন করলেন।

"হে দয়াময় তুরাখন, আমি কি কোন দিন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব?" একচোখোর কান্নার শব্দ তিনি বেশ কাছে শুনতে পেলেন, একটু পরেই সে ভিতরে প্রবেশ করল। তার মাথা ধুলোয় ধূসর হয়ে গিয়েছিল, তার চেপটা মুখ ছড়ে গিয়েছিল ও রক্ত পড়ছিল। মুখ নীচু করে সে বেদির পাথরের উপর আছড়ে পড়ল ও সেখানে চুপ করে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

তুরাখনের কাছে তাকে একলা রেখে খোজা নাসিরুদ্দিন বেরিয়ে এলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল কিন্তু একচোখো সমাধির ভিতর থেকে তখনও বেরিয়ে আসেনি। খোজা নাসিরুদ্দিন একটা সেগুন গাছের ছায়ার নীচে একটা ছেঁড়া আসনের উপর ধৈর্য ধরে বসে রইলেন ও বুড়ো রক্ষকের সঙ্গে দরবেশ-জীবন ও অন্যান্য জীবনধারণ পদ্ধতির উপর এর সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

"কিছু পেতে হবে না, কিছু চাইতে হবে না, কিছুর পিছনে ঘুরতে হবে না, কাউকে ভয় করতে হবে না, সবশেষে কায়িক মুক্তি," বৃদ্ধ বলে চলল। "এই দুঃখে ভরা পৃথিবীতে আর কিভাবে মানুষ বাস করতে পারে, যেখানে মিথ্যার উপর মিথ্যা স্তূপাকারে জমা আছে এবং যেখানে সবাই একে অন্যকে সাহায্য করবে বলে দিব্যি করে, কিন্তু একে অন্যকে কেবল মরতে সাহায্য করে?"

"কিন্তু সেটা জীবন নয়, ওটা হচ্ছে জীবনের ধড়হীন ছায়ামাত্র," প্রতিবাদ করে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "জীবন হচ্ছে সংগ্রাম, জীবন্ত কবর নয়।"

"পথিক যতক্ষণ পার্থিব দেহময় বহির্জগতের কথা বলছ ততক্ষণ তোমার কথা সত্যি," বৃদ্ধ বলল। কিন্তু ভিতরে আর একটি জিনিস আছে যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন, যা একমাত্র আমাদের অধিকারে এবং যার উপর অন্য কারও অধিকার নেই। মানুষ বেছে নিতে পারে সারাজীবনের দাসত্ব অথবা মুক্তি; দ্বিতীয়টা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনে ও চরম আত্মোৎসর্গে পাওয়া যায়।"

"তুমি কি এ জীবন পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ। কারণ আমি বাইরের পৃথিবীর সমস্ত ফাঁদ ত্যাগ করতে পেরেছি। আমি আর মিথ্যা বলি না, মাথা নোয়াই না বা ছল করি না ; কারণ আমার কাছ থেকে নেবার মত আর কিছুই নেই, যতদিন না আমার জীবন আবার প্রাচীন পার্থিব জীবনে ফিরে যায়। এই হচ্ছে তুরাখনের সমাধি—মোল্লারা তাঁকে ভালবাসে না, প্রহরীরা ভক্তদের উপর অত্যাচার করে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রকাশ্যে এবং নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সেবা করতে ভয় পাই না, কারণ এতে আমার মন তৃপ্তিতে ভরে উঠে।"

"তুমি যে নিঃস্বার্থভাবে কর তা তোমার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে," বুড়ো লোকটার বর্ণনার অতীত ছেঁড়া পোশাকের দিকে ইসারা করে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন ; পোশাকটা পুরানো দিনের মত তালি দেওয়া এবং নীচের অংশের চারপাশে বার বার ফিতা দিয়ে বাঁধা, মনে হচ্ছিল যেন সমাধির পাশের গাছে যে কাপড় ও ফিতা ঝুলছিল তাই দিয়ে পোশাক তৈরি।

"আমি জীবনে খুব কম জিনিসই আশা করি," বুড়ো আবার আরম্ভ করল। "এই কম্বলের পোশাক, পানীয় হিসাবে কিছু জল, যবের তৈরী এক খণ্ড পিঠা বা রুটি—ব্যস। কিন্তু আমার স্বাধীনতা আমার চিরসাথী, কারণ আমি তা আমার আত্মার মধ্যে বহন করি।"

"তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না, বুড়ো, কিন্তু একজন মরা লোক তোমার চেয়েও স্বাধীন, কারণ সে জীবনে কিছুই আশা করে না, এমন কি পানীয় জলও না। তাহলে স্বাধীনতার পথ কি মৃত্যুর পথ ?"

"মৃত্যু ? আমি তা জানি না। কিন্তু নির্জনতা—হ্যাঁ নির্জনতা।"

বুড়ো কিছুক্ষণ থামল, পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

"আমি দীর্ঘ দিন একাকী।"

"এটা সত্যি নয়!" খোজা নাসিরুদ্দিন আবার যোগ দিলেন। "আমি তোমার গলায় শুনতে পাচ্ছি অনুকম্পা, সান্ত্বনা ও মানুষের প্রতি ভালবাসার সুর। তোমার সান্ত্বনা অনেক লোকের হৃদয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে তাদের জাগিয়ে তুলে—সেজন্যে এই পৃথিবীতে তুমি একাকী হতে পার না। একজন জীবন্ত লোক কখনই একাকী হতে পারে না। মানুষ কখনই একা হতে পারে না, তারা এক সূত্রে বাঁধা ; এখানেই রয়েছে আমাদের যৌথ অস্তিত্বের গভীর সত্য।"

"স্বপ্ন ভালবাসেন! কল্পনা! শীত, বাতাস ও বৃষ্টি থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে দেওয়াল তুলে আর নিষ্ঠুর সত্য থেকে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে। আত্মরক্ষা করুন পথিক, আত্মরক্ষা করুন, কারণ জীবনের সত্য হচ্ছে ভয়ংকর!"

"নিজেকে আত্মরক্ষা করব? না, মশায়, আমি কখনও আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াই না। আমি আক্রমণ করি। সর্বদা এবং সর্বত্র আমি আক্রমণ করি, পৃথিবীর অন্যায় যে কোন ছদ্মবেশেই আমার সামনে আসুক না কেন। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সব সময়ই লড়াইয়ে হেরে যাই, কিন্তু কেউ বলবে না আমি পালিয়েছি। আমার অস্ত্র সব সময়েই পরের হাতে চলে যায় আর আমি তাকে রক্ষা করি!"

খোজা নাসিরুদ্দিনের উদ্দীপনাময় বক্তৃতা একচোখোর আবির্ভাবে বাধা পেল; সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখ ছিল ফ্যাকাসে ও নীচের দিকে নামানো। যখন সে চৌবাচ্চা পরিষ্কার করছিল, বুড়ো বলল:

"প্রতি বছর এই হতভাগা লোকটা সমাধির পাশে একটা গোলাপের ডাল পোঁতে শিকড় গজাবে এই আশায়; এটা হবে তার প্রতি দয়ার প্রতীক। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও ডালে শিকড় গজায়নি। এই লোকটাকে দেখে আমার চোখে জল আসে; পথিক, আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমার সহকর্মীদের জন্য আমার মনে একটা সহানুভূতি জাগে। আমি স্বার্থপরতা, অহংকার, কৌতূহল, লোভ ও ভয় মুক্ত, কিন্তু সহানুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। আল্লা আমাকে নরম মন দিয়েছেন এবং এটা কখনই কঠিন হবে না।"

একচোখো, এই সময়ে, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার জামার ভিতর থেকে ভিজে ন্যাকড়ায় মোড়া একটা কাটা ডাল বার করল এবং ছুরি দিয়ে মাটি পরিষ্কার করে সমাধির প্রবেশ পথে মাটিতে পুঁতল।

"এর শিকড় গজাবে না," খোজা নাসিরুদ্দিন ফিসফিস করে বুড়োকে বললেন। "এভাবে চারা পোঁতে না।"

"সম্ভবতঃ শিকড় গজাবে," বুড়ো উত্তর দিল। "আমি যত্ন নেব এবং দিনে তিন বার করে জল দেব।"

খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন বুড়োর চোখের কোণে জল ঝকঝক করছে।

সমাধিতে তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেল। বুড়ো রক্ষকের কাছে বিদায় নিয়ে

আমাদের দুই ভ্রমণকারী তুরাখনের সেগুন গাছের বাগানের তলায় শীতল ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

কোকান্দে তাঁরা দেখতে পেলেন গরম ধুলোর মেঘ, শহরের তোরণ দ্বারে ঢেউয়ের মত মানুষের ভীড় আর তাদের চাপ। বসন্তকালের বিরাট বাজার আরম্ভ হতে সুরু হয়েছে, ফটকে ফটকে ভিতরমুখী জনতার ভীড়। শহরের পাঁচিলের বাইরে শোনা যাচ্ছিল ব্যঞ্জনাময় গুন্‌গুন্ শব্দ; নলখাগড়ার মাদুরের টুকরো দিয়ে তৈরি ছাউনি, ঘোড়ার চামড়ার তাঁবু, ভাটিখানা এবং সরাইখানা-গুলো বেশ জমকালো ব্যবসা করছিল। রাস্তার দুই পাশের নীচু গর্তগুলোতে বসেছিল ভিখারীর দল, তাদের মুখ শুকনো, মাটির মতই হলদে ও শুকনো; দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন পৃথিবীর গলগণ্ড, পৃথিবীর উপরে উঠছে অথবা উল্টোভাবে বলতে গেলে আস্তে আস্তে পৃথিবীর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। একটু ওপাশে ভাঁড়, বাজীকর, সাপুরে, নর্তকী, দড়ির ওপর যারা হাঁটে, মুসলমানদের প্রিয় গান যারা গায় সকলেই—ঢাকের গোলমাল, পিতলের শিঙ্গার ভঁ্যা ভঁ্যা শব্দ ও বাঁশীর কর্কশ শব্দের মাঝে তাদের ছোটখাটো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই বহু ভাষাভাষী হৈ-হট্টগোলের জনতার উপরে ঝিকমিকে আকাশে জ্বলন্ত সূর্য যেন ঝুলছিল—চেপটা, অনুজ্জ্বল ও কিরণহীন; ধুলো ছিল সর্বত্র—বাতাসে উড়ে এসে জোরে দাঁত ঘষে দিচ্ছিল, নাক, চোখ ও কানে এসে ঢুকছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালবাসতেন, সেইজন্য একটুও সময় নষ্ট করলেন না। এক হাতে পাঁউরুটি ও অন্য হাতে চেরি ফল ভর্তি টুপি নিয়ে মেলার ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; আরম্ভ করলেন বাজীকরকে দিয়ে। শুকনো কালো চামড়ার এক বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়ালেন যার নাকের মাঝখানে একটা লাল দাগ ছিল যেটা হচ্ছে তার উপজাতির চিহ্ন; নীচের দিকে মুখ নামিয়ে হিন্দু লোকটা খুব কোমল ও করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল, এদিকে ঠিক তার সামনে বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে দুটো সাপ আস্তে ও ঢুলু-ঢুলু চোখে শরীর দোলাচ্ছিল; বাঁশীতে ঠোঁট রেখে শক্ত ডালা সমেত দুটো ঝুড়িতে পৃথক পৃথকভাবে সাপ দুটোকে রেখে সে ঢাকা দিল এবং যতক্ষণ না তার কাজ শেষ হল ততক্ষণ সে ক্লান্ত ঠোঁটকে বিশ্রাম দিল না। বাঁশীর সুর বন্ধ হলে ঝুড়ির ভিতর থেকে জোর খসখস শব্দ শোনা গেল ও শরীর হিম করে দেওয়া হিসহিস শব্দ অনেকটা বিপজ্জনক বাঁশীর মত শোনাচ্ছিল। উপর দিক

থেকে ঢাকের একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছিল ; উপরে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত খোলা একটা বেঁটে মানুষ একটা চওড়া পাজামা পরে—যেটা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছিল—বেশ উঁচুতে একটা সরু টানা দড়ির উপর পা ঘষে ঘষে হাঁটছিল ; কখনও বসছিল আবার কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে আকাশে ফেলে আবার ধরছিল, এক মুহূর্ত হাতে ধরে কোমর-বন্ধনী থেকে সামনের দিকে ঝুলান ঢোল বাজাচ্ছিল ; নীচে মুখর জনতা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল এবং ধুলোর ঝড়ে এসে মিশছিল ঘাম, গোবর এবং রান্নার দোকান থেকে ভেসে আসা তেলতেলে ধোঁয়ার গন্ধ—এদিকে আকাশে অত উঁচুতে সে ছিল একা, সঙ্গী ছিল বাতাস আর তাকে মৃত্যু থেকে আলাদা করে রেখেছিল সরু সুতোর মত দেখতে তার দড়িটা।

কাছেই ছিল নাচিয়ে মেয়েদের সাদা তাঁবুগুলো। তাদের একটায় বেশ ভাল রকমের উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল, খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি সেখানকার ভীড়ে মিশে গেলেন।

ফিতে লাগানো দুজন বাজিয়ে, যাদের কোমর পর্যন্ত মিশমিশে কাল রং-এর বিনুনী ঝুলছে, তাঁবুর ভিতর থেকে কলের যাঁতার মত চওড়া একটা চেপ্টা ঢাক গড়াতে গড়াতে নিয়ে এল ; পরে তাদের একজন মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে একটা লম্বা ও সরু লাউ-এর খোলের শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে বোলতার গুন্ গুন্ শব্দের মত একটা করুণ সুর তুলল। এটা হচ্ছে 'ক্রুদ্ধ বোলতা' নামে একটা পুরোনো কাশগর নাচের সুর। তীক্ষ্ণ বিষাদের গুঞ্জন বেশ কিছুক্ষণ রইল কখনও বা বেশ জোরে বাজছিল আবার কখনও মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল এবং নর্তকী মেয়েটা ছুটে বাইরে এল।

সে ছুটে বেরিয়ে এসে তারপর থামল, যেন এত লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে, তার দীঘল কনুই দুটো শরীরের উপর চেপে আছে, তার ছোট্ট হাত দুটো পাশে ছড়ান। সে সতেরর বেশী হবে না। তার সোনালি রং-এর কচি মুখে কোন কাজল, রং বা পাউডার ছিল না—তার সে সবের কোন প্রয়োজনও ছিল না। তার নমনীয় শরীরটা রঙীন রেশমের কাপড়ে জড়ান ছিল—নীল, হলুদ, লাল এবং সবুজ ; অপরাহ্ন সূর্যের তির্য্যক আলোয় সেগুলো জ্বলছিল, গরম উজ্জ্বল আলো একসঙ্গে মিশে যেন রামধনুর সৃষ্টি করেছিল। ভুরুতে ঢাকা তার জ্বলজ্বলে চোখের বাঁকা দৃষ্টি জনতার পানে হেনে সে তার জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক লাফ দিয়ে ঢাকের

উপর উঠে দাঁড়াল। তার ছোট্ট পা দুটোর ছোঁয়া পেয়ে ঢাকটা ঘর্ ঘর্ করে উঠল। শিঙ্গাবাদক তার শিঙ্গা আরও উঁচুতে তুলল, তার মুখ পরিশ্রমে লাল হয়ে উঠল। তার যন্ত্র করুণ স্বরে বেজে উঠল; ভয়ে মেয়েটা চারদিকে চাইতে লাগল; কাছেই একটা বোলতা হুল ঢুকাবার ভয় দেখিয়ে মেয়েটার চারপাশে উড়ছিল। ক্রুদ্ধ বোলতাটা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করল—পাশ, নীচ ও উপর থেকে। হাত ছুঁড়ে ও শরীর দুমড়ে সে তাকে তাড়াতে লাগল। তার ছোট গোড়ালী দুটো আরও দ্রুত ও জোরে ঢাকের গায়ে আঘাত করতে লাগল যার শব্দ একটানা জোরে শব্দ তুলে তাকে মরিয়া করে তুলছিল; তারা দুজনে যেন একাত্মা হয়ে একে অন্যকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। বোলতাটাকে এক পাশে সরাতে গিয়ে মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং তার জামার ভাঁজে বোলতাটাকে খুঁজবার চেষ্টা করল, এদিকে তার রঙ্গীন রেশমের কাপড় খুলে খুলে ঢাকের উপর এসে পড়ছিল; তার শরীর প্রায় অনাবৃত হয়ে পড়েছিল। যখন তার শরীর প্রায় কোমর পর্য্যন্ত নগ্ন তখন বোলতাটা হঠাৎ নীচের দিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল; মেয়েটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল এবং ঢাকের উন্মত্ত বাজনার মাঝে লাট্টুর মত বন্ বন করে ঘুরতে লাগল; তার চারপাশে যেন একটা রঙ্গীন আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। গোলাপি রং-এর শেষ আবরণটাও তার খুলে পড়ল ও মেয়েটা জনতার সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! হঠাৎ তার শরীরটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তার শরীর বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল, মাথা পিছন দিকে হেলে পড়ল এবং একটা কাঁপুনি সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে চলল। বোলতাটা আসলে শেষে তাকে কামড়েছে। সে তাঁবুতে ছুটল; জনতা কানফাটানো চীৎকার করে উঠল; এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা ছোট ছোট পা-ওয়ালা পারসী ব্যবসায়ী কাল দাড়ি ও তেলতেলে ঢুলুঢুলু স্ফীত-চোখ নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ও হেলতে দুলতে তার পিছনে ছুটল।

খোজা নাসিরুদ্দিন ও তার সঙ্গী রাতটা এক জরাজীর্ণ সরাইখানায় কাটালেন এবং পরদিন সকালে কোকান্দে প্রবেশ করলেন।

শহরের ভিতরে যতই তারা প্রবেশ করলেন ততই বিভিন্ন পদমর্যাদার কোতোয়ালের দেখা পেলেন যারা রাস্তায়, চকে, গলিতে সর্বত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বভাবতঃই কোকান্দে চোরেদের কোন কাজ নেই।

"আশ্চর্য হচ্ছি এই শহরের গরীবদের কত টাকাই না খরচ করতে হয় এই

রাজপুরুষদের জন্য ?" খোজা নাসিরুদ্দিন চিন্তা করলেন। "কোন চোর একশ বছর ধরে অবিরাম চুরি করলেও তাদের এত ক্ষতি করতে পারত না।"

কোকান্দের ধর্মভীরু লোকদের জমায়েতের জায়গা পুরোনো মাদ্রাসা তাঁরা পেরিয়ে চললেন—পরে অগভীর সাই নদীর উপর পাথরের সেতু পেরিয়ে তাঁরা শহরের প্রধান চকে এলেন যেখানে সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরের ভিতর খানের প্রাসাদ।

এইখানেই বাজার সুরু হল।

দশম অধ্যায়

অতীতের সেই সব দিনে প্রাচ্যের প্রতিটি বড় শহরের যেমন একটি নাম ছিল তেমনি একটি উপাধিও ছিল। যেমন বোখারা সুন্দর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ 'বোখারা-ই-শেরিফ' নামে পরিচিত ছিল যার অর্থ 'মহান রাজকীয় বোখারা', সমরখন্দ উপাধি বহন করত 'প্রতাপশালী, বিজয়ী ও জমকাল', এদিকে কোকান্দ, এক সমৃদ্ধিশালী উপত্যকায় অবস্থিতির জন্য এবং অধিবাসীদের আনন্দময় খামখেয়ালী চরিত্রের জন্য 'কোকান্দ-ই-লিয়াতিফ' নামে পরিচিত ছিল, যার অর্থ ছিল 'আনন্দময় সুন্দর কোকান্দ'।

এক সময় ছিল—এবং সে সময় খুব বেশি দিন আগের নয়—যখন এই উপাধি ছিল সম্মানের, কারণ এমন আর একটি শহরও ছিল না যা বেশি সংখ্যক উৎসবের জন্য এবং চপলমতি নাগরিকদের রসিকতার জন্য কোকান্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত। ইদানীংকালে অবশ্য কোকান্দের উপর এক বিষাদের ছায়া এসে পড়েছে এবং নতুন খানের কঠোর হাতে এর প্রফুল্ল মেজাজ নিঝুম হয়ে এসেছে।

অভ্যাসমত এখনও উৎসব হয়, ঢোল ও শিঙ্গাবাদকরা সরাইখানার সামনে এখনও প্রচণ্ড উৎসাহে বাজায়, কোকান্দের হালকা মনের অধিবাসীদের আনন্দ দেবার জন্য ভাঁড়েরা এখনও বাজারের সামনে ভাঁড়ামি করে কিন্তু সে উৎসব আর নেই, আনন্দও তেমন ঝলমলে নয়। খানের প্রসাদ থেকে মাঝে মাঝে উদ্বেগজনক গুজব ছড়িয়ে পড়ে; নতুন খান ইসলাম ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সমস্ত সময় ধর্মালোচনায় কাটান এবং অন্য কিছুর তোয়াক্কা করেন না; মাদ্রাসা ও নতুন মসজিদ তৈরি হল; সমস্ত দেশ থেকে মোল্লা, মৌলভী ও উলেমারা কোকান্দে এসে জড় হল; এই লোকদের খাওয়াতে অর্থের প্রয়োজন সেইজন্য নতুন খাজনা

বসান হল। খানের একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ঘোড়দৌড়; ছোটবেলা থেকেই তিনি ঘোড়া প্রচণ্ড ভালবাসেন; এমন কি ইসলাম ধর্মও তাঁর এই অনুরাগ কমাতে পারেনি। অন্যান্য বিষয়ে তিনি ছিলেন ভৎ'সনার উর্ধ্বে', সংসারের তুচ্ছ ভোগবিলাসের প্রতি ছিলেন বিমুখ। হারেম ও খানের শয়নকক্ষের মধ্যের বাগানের পথ ঘাসে ভরে গিয়েছিল। এর উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাওয়ার শব্দ এবং সঙ্গে প্রধান খোজার ধীরে নিশ্বাস ফেলার ও পা ঘষে ঘষে চলার শব্দ যখন শোনা যেত, তারপর অনেক দিন কেটে গিয়েছে। দরবারের আমীর ওমরাহদের কাছ থেকেও তিনি এই ধরনের আচরণ ও প্রজাদের কাছ থেকে ধর্ম ভাব আশা করতেন। শহর কোতোয়াল ও গুপ্তচরে ভরে গিয়েছিল।

অবাধ্যতার জন্য নতুন শাস্তি চিরদিনের মত ঘোষণা করা হল। কয়েক দিন আগে ব্যভিচারের জন্য নতুন আইন ঘোষণা করা হয়েছিল যার ফলে অবিশ্বাসী স্ত্রীদের বেত মারা হবে এবং অবিশ্বাসী স্বামীদের অনুমোদিত চিকিৎসকদের ছুরিতে পুরুষত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে। একই ধরনের আরও অনেক ফরমান ছিল; কোকান্দের প্রত্যেকটি অধিবাসী যেন হাজার সুতোয় তৈরী মাকড়সার জালের মধ্যে বাস করত যার সঙ্গে একটা ছোট্ট ঘণ্টা বাঁধা আছে; যত সাবধানীই হও না কেন যে কোন ভাবেই একটা সুতো তোমার গায়ে এসে লাগবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টুং করে একটা বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠবে যার ফল হচ্ছে ভয়াবহ।

কিন্তু বসন্তকালের মোহ ছিল এত বেশি যে আমরা যখনকার কথা বলছি তখন কোকান্দের অধিবাসীরা তাদের বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল। নতুন সূর্যের উজ্জ্বল আলোর নীচে বাজার একটি কোলাহলমুখর সজীব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন কাল হতে ফুল এবং গায়ক পাখীর প্রতি অনুরাগের জন্য কোকান্দের অধিবাসীরা বিখ্যাত, এখনও তারা সেই প্রথা বজায় রেখেছে। প্রত্যেকেই টিউলিপ বা এক গুচ্ছ যুঁইফুল কানের উপর ও মাথার টুপির নীচে গুঁজে রাখে। পাখা-ওয়ালা ছোট্ট বন্দীরা অন্ধকারে সুর কাঁপিয়ে গান ধরে এবং প্রায়ই সরাইখানায় অলস আগন্তুকরা রক্ষকের সামনে একটা টাকা নিয়ে টস করে ও সকলের সম্মতি নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে ছোট্ট বন্দী গায়কপাখীকে মুক্ত করে দেয়। গাড়ী, ঘোড়সওয়ার ও পথিকরা থামত ও উপর দিকে মুখ করে উজ্জ্বল আকাশে তাকে উড়ে যেতে দেখত।

"তুরাখন বাবা আমাদের কাছে সৎ কাজ আশা করেন," খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর একচোখো সঙ্গীকে বললেন। "এই ছোট বন্দীদের দিয়ে তবে সুরু করা

যাক। টাকা নাও। কিন্তু মনে রেখ—কোন ছিদ্র দিয়েও একটা টাকাও বার করবে না এমন কি যদি টাকার থলিটা করুণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে থাকে তবুও।"

"শুনেছি ও মেনে চলব।"

একচোখো ক্যাছের সরাইখানায় গেল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাখী নিয়ে ফিরে এল। একের পর এক পাখীরা রোদে ডানার ঝাপটা দিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

এক বিরাট জনতা রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়াল। তারা একচোখোর দাক্ষিণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

সে প্রত্যেকটি খাঁচা খুলে পাখীটাকে বার করে নিয়ে আনল, হাতের উপর কিছুক্ষণ রেখে তার শরীরের উষ্ণতা ও ছোট্ট হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি কিছুক্ষণ অনুভব করল ও পরে 'শান্তিতে উড়ে যাও' এই কথা বলে অকোশে ছুঁড়ে দিল। "উড়ে যাচ্ছি! ধন্যবাদ, ভাল মানুষ। তুরাখন বাবাকে তোমার দয়ার কথা বলব," ওরা যেন তাদের পাখীর ভাষায় উত্তর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একচোখো তৃপ্তির হাসি হাসল।

"আশ্চর্য আমি এটা আগে একবারও ভেবে দেখিনি। এক সময় আমার টাকা ছিল এবং আমি হাজার হাজার পাখীকে ছেড়ে দিতে পারতাম। আগে বুঝতে পারিনি এই ছেলেখেলায় এত আনন্দ আছে।"

"অনেক কিছু আছে যা তুমি জানতে না, এখনও জান না," খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "আমি ভুল করিনি—তার মনের ভিতর একটা জীবন্ত ফোয়ারা আছে," মনে মনে নাসিরুদ্দিন ভাবলেন।

"রাস্তা ছাড়! পালাও!" ঢাকঢোলের শব্দের সঙ্গে ভয়প্রদ চীৎকার ভেসে এল। জনতা পিছনে হটে পালাল এবং খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন যে তাঁর সামনে একটা টাট্টু ঘোড়ার পাশে একজন বড় রাজপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একদল প্রহরী সেই সম্ভ্রান্ত লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—সকলেই দেখতে ভয়ংকর, বিরাট গোঁফ ও অতি উৎসাহী এবং চেপ্টা লাল মুখ, হাতে তাদের বর্শা, কৃপাণ, মুগুর, কুঠার এবং অন্যান্য ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র। সম্ভ্রান্ত লোকটির বুকে ছোট বড় নানা ধরনের পদক শোভা পাচ্ছে এবং তার কাল পাকানো গোঁফ সমেত নাদুসনুদুস মুখটায় উদ্ধত ও গর্বিত ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। লাগাম ধরে দুজন লোক ঘোড়াটাকে ধরেছিল; সেটা লাফ দিয়ে খট খট শব্দ করছিল এবং ভয়ংকর

বেগুনে চোখে তির্যক দৃষ্টি হেনে মুখের খাবার বার বার চিবাচ্ছিল। ঘোড়ার জিনের কাপড়টা সোনা দিয়ে মোড়া ছিল।

"কোথা থেকে আসছিস, ওঁছা বদমাস?" রাজপুরুষ জানতে চাইলেন, বিরক্তিতে তাঁর নীচের ঠোঁট বাইরের দিকে বেরিয়ে এল।

ওঃ, তিনি যদি একটুও জানতে পারতেন নোংরা জামাকাপড় ও তেলতেলে টুপি মাথায় এবং তালি দেওয়া জুতো পরে কে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

"আমরা গাঁয়ের বাসিন্দা, বাজার করতে কোকান্দে এসেছি," মুখে একটা বিনয়ের ভাব এনে খোজা নাসিরুদ্দিন মিনমিনিয়ে বললেন। "আমরা কোন অন্যায় করিনি, কেবল আমাদের অতুলনীয় খানের গৌরবে এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে কয়েকটি পাখীকে মুক্ত করে আকাশে উড়িয়েছি।"

"কয়েকটা বোকা পাখীকে আকাশে উড়িয়ে একটা জনতার সৃষ্টি না করে কি অন্য কোন উপায়ে খানের প্রতি আনুগত্য ও আমার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যেত না?" রাজপুরুষ রেগে গিয়ে জানতে চাইলেন, ঠোঁট বাঁকিয়ে 'মুক্ত করে' কথাটার উপর জোর দিয়ে অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে বললেন। "এই সব 'মুক্ত করা' বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে," মুখ ভেঙ্গিয়ে বললেন; "এইসব নোংরা প্রথা শহরকে কুখ্যাত করেছে। তোমার খরচ করবার মত টাকা আছে দেখছি, কিন্তু রাজকোষে রেখে সৎভাবে ব্যয় করার বদলে—যেটা হচ্ছে আনুগত্য দেখানোর একমাত্র উপায়—তুমি বাজারের পথে তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ। খানাতল্লাসী কর!" প্রহরীদের আদেশ দিলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন ও একচোখোকে ধরে তাদের জামা-কাপড় ও বোঁচকা খুলে ফেলা হল।

প্রহরীরা সদর্পে তাদের মনিবের কাছে রূপো ও তামার টাকা সমেত একটা থলি নিয়ে এল।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। সরিয়ে নাও!" তিনি তাঁর প্রধান প্রহরীকে আদেশ করলেন। "রাজকোষে জমা দেবার জন্য পরে তুমি আমাকে দিয়ে দিও।"

প্রহরী টাকার থলিটা তার পাজামার বিরাট পকেটে ফেলে দিল এবং ঢাকের বাজনার সঙ্গে শকট-বাহিনী আবার চলতে সুরু করল: সামনে ঘোড়ায় চেপে চললেন রাজপুরুষ, পিছনে লাল রং-এর পাজামা ও বড় বড় জুতো পরে চলল প্রহরীর দল, পিছনে চলল ব্যাণ্ডবাদক, যার পরনে ছিল একই ধরনের পাজামা,

কিন্তু কোন জুতো ছিল না, পদমর্যাদা অনুযায়ী তার পিছনে আর কেউ ছিল না। যেখান দিয়েই তারা যাচ্ছিল, বাজারের আনন্দ কোলাহল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সরাইখানা খালি হচ্ছিল এবং ঢাকের শব্দে ভয় পেয়ে পাখীরা গান বন্ধ করছিল ; রাজপুরুষের চকচকে চোখের নীচে জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, যা সচল ছিল তা হচ্ছে নিষেধ ও ভয় মেশানো তাঁর ফরমান। তিনি যেই চলে গেলেন তাঁর পিছনে জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, আনন্দ ও কোলাহল যেন চির তরুণ ও অদম্য, যে কোন বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে তাকে পরিহাস করছে। মুহূর্তের জন্য হয়তো তিনি এর প্রবাহ বন্ধ করতে পারতেন কিন্তু এই প্রবাহ অবদমিত করা বা নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করতে তাঁর ক্ষমতা ছিল না। জীবনযাত্রার বিরাট চলন্ত প্রবাহ বসন্তের প্রতিটি ফুল, প্রতিটি শব্দ নিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পশ্চাদমুখী প্রহরীদের দিকে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন :

"যে রাজপুরুষেরা পার্থিব শক্তি ভোগ করেন তাঁদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : তাঁদের কাজের অনিষ্ট করার ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁদের বলা হয় দুর্বল, মধ্যম ও পরাক্রমশালী। আমাদের পকেটে আর একটি পয়সা নেই—কিন্তু আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারত ; আমাদের মাথাটাও হয়তো আর সঙ্গে থাকত না, কারণ এই শাসক হচ্ছেন পরাক্রমশালীদের একজন।"

"প্রহরীর পকেট থেকে টাকার থলিটা বার করে নেওয়ার জন্য আমার হাতটা নিসপিস করছিল," একচোখো স্বীকার করে বলল। "কিন্তু আমি আপনার অনুমতি পাইনি।"

"তুমি কি নিজে চিন্তা করতে পার না ?" খোজা নাসিরুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন। "আসল মালিকের কাছে তার টাকার থলি ফিরিয়ে আনার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না।"

"এই যে !" একচোখো বলল এবং কথাগুলো উচ্চারণ করেই তার বোঁচকার ভিতর থেকে হারিয়ে যাওয়া টাকার থলিটা বার করল। "তার পকেটে অবশ্য আরও দুটো ব্রেসলেট ছিল—ওজন দেখে সোনার মনে হচ্ছিল—আমি কিন্তু সেগুলো নিইনি।"

কাছের খাবারের দোকানে প্রচুর ভূরিভোজনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া টাকার থলি উদ্ধার উদযাপন করা হল। রক্ষক দয়ালু খদ্দেরদের একের পর এক পদ দেবার জন্য ছোটাছুটি সুরু করল, শেষ করল তীব্র গন্ধযুক্ত আফগানী আচার দিয়ে

যা জিভকে শুকনো ও তৃপ্ত করল। খাবারের দোকান থেকে তাঁরা সরাইখানায় গেলেন, সেখান থেকে গেলেন কুলপি বরফের দোকানে এবং ভোজ শেষ হল হালুয়া দিয়ে।

পরে তাঁরা বাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেন। সেসব দিনে কোকান্দের বাজার লম্বায় ও চওড়ায় এত বড় ছিল যে সবচেয়ে বেশি যারা দৌড়াতে পারত তাদের পক্ষেও একবারে গোটা বাজারটা পাক দেওয়া সম্ভব ছিল না। শুধু রেশমের দোকানগুলোই ছিল দু' রশির চেয়ে বেশী লম্বা এবং কুমোর, জুতো, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক এবং অন্যান্য দোকানের সারিগুলোও খুব ছোট ছিল না; ঘোড়া ও গোরু মোষের বাজার আকারে ছিল বিরাট। এই জায়গাগুলো ছিল ক্রমবর্ধমান ঝাঁকে ঝাঁকে ঠেলাঠেলি করা জনতায় ভর্তি। বেশ কষ্টের সঙ্গেই খোজা নাসিরুদ্দিন ও তাঁর সঙ্গে একচোখো কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে চললেন।

বিক্রীর জন্য দোকানে দোকানে যে সব জিনিস, নলখাগড়ার মাদুর ও কার্পেট এনে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রাচুর্য ও জাঁকজমক কোন ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যায় না। সেসব দিনে প্রাচ্যের গর্ব করার মত যে কোন জিনিস সেখানে ছিল। সবচেয়ে সাধারণ ও বাজে হুক্কা থেকে ইস্তানবুলের কাজ করা এবং সোনা ও দামী পাথর বসানো সবচেয়ে দামী হুক্কা, ভারতীয় আয়না, বিভিন্ন রংয়ের পারস্য দেশের কার্পেট যার কাজ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, রেশম বস্ত্র যা মনে হয় সূর্যের কাছে যেন তার উজ্জ্বলতা ধার নিয়েছে, সন্ধ্যা-সূর্যের চেয়েও নরম ও উজ্জ্বল ভেলভেট, এছাড়া ট্রে, ব্রেসলেট, কানের দুল, ঘোড়ার জিন, ছুরি ইত্যাদি……।

জুতো, পোশাক, টুপি, বোঁচকা, জলের পাত্র, মৃগনাভি, মুখোস, গোলাপের আতর—এখানেই আমরা কলম থামাব কারণ কোকান্দ বাজারের সব জিনিসের তালিকা করতে গেলে আমাদের দুটো পুরো বই লিখতে হবে।

বিভিন্ন বর্ণ, শব্দ ও গন্ধে ভরা বাজারের দিনগুলি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। অস্তগামী সূর্য গোলাপী আলোয় মোড়া উঁচু মেঘগুলোকে গলিয়ে দিচ্ছিল। বিশ্রামের সময় হয়ে এল। লোকেরা বাড়ীর দিকে চলল, আগন্তুকরা সরাইখানার দিকে হাঁটল। কিন্তু বাজার শেষ হয়ে গেল ঘোষণা করে ঢাকের শব্দ তখনও বাজেনি এবং অনেক দোকান তখনও তাদের কেনাকাটা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এদের মধ্যে একজন টাকা-পয়সার লেনদেন করতেন, নাম রহিমবাই, কোকান্দ শহরের সবচেয়ে ধনী নাগরিক। বেশ মোটাসোটা মানুষ, জোড়া চিবুক ও শুকিয়ে যাওয়া মুখ ছিল তাঁর, ষাঁড়ের মত ঘাড়টা তাঁর জামার নীচে বেরিয়ে পড়েছে এবং মোটা ও বেঁটে আঙুলগুলো অসংখ্য আংটিতে ভর্তি; তিনি তাঁর কাউণ্টারের পিছনে বসে ভারী পাতায় ঢাকা চোখ দুটো মেলে নীচের দিকে রূপা, সোনা ও তামার মুদ্রার ছোট ছোট স্তূপগুলোর দিকে চেয়েছিলেন। এখানে ছিল ভারতীয় টাকা, চীন দেশের চৌকো চেং, তাতারদের অল্টিন যেগুলো সোনার মজুতদারদের হাত ঘুরে এখানে এসেছে, একটা গর্জনরত সিংহ খোদাই করা পারস্যের তোমান, আরবের ডিনার এবং আরও অনেক রকমের মুদ্রা যা তখন প্রাচ্যে প্রচলিত ছিল; দূর খ্রীষ্টান দেশগুলির মুদ্রাও এখানে ছিল—গিনি, ডবলুন এবং ফার্দিং যাদের উপর খোদাই ছিল ফ্রান্সের রাজার ছবি, অস্ত্রে সজ্জিত ও উন্মুক্ত তরবারি হাতে এবং বুকের উপর ক্রুশের চিহ্ন শোভা পাচ্ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন এবং একচোখো মুদ্রা-বিনিময়কারীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন তিনি তাঁর সারাদিনের লাভ হিসেব করছিলেন। কাউণ্টার থেকে মুদ্রাগুলো সংগ্রহ করছিলেন মুখে একটা বিষাদের ছায়া নিয়ে, তাঁর পুরু লাল ঠোঁট দুটো কাল দাড়ির মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। তাঁর মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে সোনা ও রূপোর মাছের মত মুদ্রাগুলো পিছলে একটা আনন্দের ঝংকার তুলে তাঁর থলিতে এসে পড়ছিল, এদিকে তামার মুদ্রাগুলো না গুনে ঝাঁট দিয়ে জড় করে থলিতে ফেলছিলেন এবং সেগুলো নীচে পড়ে পাথরের মত শব্দ তুলছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর সঙ্গীর দিকে চাইলেন, যার দেখতে পাওয়া চোখটায় তিনি একটা তীক্ষ্ণ হলুদ রংএর আভা দেখতে পেলেন। কিন্তু সে দেখতে পেল না। চোর শান্তভাবেই সোনার দিকে চেয়েছিল এবং তার মুখে একটা ভিন্ন ধরনের চিন্তার আভা দেখা গেল:

"আজ সকালে সূর্য ওঠার আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমার গোলাপের ডালে শিকড় ধরেছে," সে বলল। "আমি কি সেই স্বপ্ন বিশ্বাস করব, করব না? এটা কি হতে পারে যে তুরাখন আমাকে ক্ষমা করবে, না, আমার আগের দুর্বলতা বছর খানেকের মধ্যে আবার আমাকে আক্রমণ করবে এবং আমি আবার চুরি করতে সুরু করব?"

আমাদের একটু জেনে নেওয়া যাক যে খোজা নাসিরুদ্দিন এই সময়ে তাঁর

স্বর্ণকারকে ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তার আসল রোগটা ধরতে পেরেছিলেন ; রোগটা হচ্ছে আত্মসচেতনতা থেকে উদ্ভুত একটা নির্দিষ্ট ধারণার জন্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক সর্বজ্ঞ আভিসেন্না বলেছেন যে, যে কোন শারীরিক আঘাত মানুষের মনকে প্রভাবিত করে এবং উল্টোটাও হয়। আভিসেন্নার বাণী অনুসরণ করে এবং একচোখের প্রতি তাঁর পর্যবেক্ষণের ফল কাজে লাগিয়ে তিনি এক সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

"এটা হচ্ছে স্বর্গীয় স্বপ্ন," আভিসেন্নার পরামর্শ অনুযায়ী গলায় একটা দয়া ও আশ্বাসের সুর এনে তিনি উত্তর দিলেন। "মনে রেখ, তুরাখন যে তোমার প্রতি এবার দয়ালু হবেন ও তোমাকে ক্ষমা করবেন, এটা বিশ্বাস করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে।"

তাঁদের কথাবার্তা বাধা পেল একটি মহিলার আবির্ভাবে ; মহিলাটি বিধবা, তা তার জামার ধারের নীল সেলাই দেখে বোঝা গেল। জামাটা পরার অনুপযুক্ত হলেও ধারের সেলাই ছিল নতুন। এ থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন ধরে নিলেন যে তার স্বামী সম্প্রতি মারা গিয়েছে এবং বিধবার এমন কি শোক প্রকাশের জন্য কাপড় কিনবারও সঙ্গতি নেই।

"হে দয়ালু ও দানশীল বণিক, আমি আপনার কাছে আমার ছেলেদের বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করছি," সে মুদ্রা-বিনিময়কারীকে বলল।

"পথ দেখ, আমি কোন ভিক্ষা দিই না," মুখ না তুলেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন ; তাঁর চোখ দুটো যেন টাকা-পয়সায় আঠা দিয়ে লাগান আছে।

"ভিক্ষা চাইছি না, শুধু সাহায্য চাইছি যা তোমার পক্ষেও হয়তো ক্ষতিকর হবে না।"

শেষে মুদ্রা-বিনিময়কারী উপরে চাইতে মনস্থ করলেন।

"আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার কাছে কিছু ধনরত্ন আছে—এগুলো হচ্ছে এক সময়ের এক স্বচ্ছল সংসারের সঞ্চয়, দুর্দিনের জন্য আমি এতদিন জমিয়ে রেখেছিলাম," পোশাকের ভিতর থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে মহিলাটি বলল। "সেই দুর্দিন এসেছে, আমার তিনটে ছেলেই অসুস্থ।" তার গলায় কান্নার সুর শোনা গেল। "আমি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে রত্নগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তারা কেউ কিনতে চাইল না যতক্ষণ না সর্বশেষ ফরমান অনুযায়ী প্রধান কোতোয়াল সেগুলো দেখবে। কিন্তু তুমি ত জান তাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের পর আমার রত্ন বা টাকা কোনটাই থাকবে না—প্রধান

কোতোয়াল নির্ধারিতভাবে সেটাকে চুরির সম্পত্তি বলে ঘোষণা করবে ও রাজকোষের জন্য বাজেয়াপ্ত করবে।"

"হুম," কিছুটা নরম হয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বণিক বললেন। "রাজকোষে যাবে কি যাবে না সেটা অন্য প্রশ্ন, তবে সে যে এগুলো বাজেয়াপ্ত করবে এটা নিশ্চিত। এদিকে আবার কোতোয়াল পরিদর্শন না করলে অজানা লোকের কাছে জিনিস কেনার অনেক বিপদ আছে। ফরমাস অনুযায়ী এই অপরাধের জন্য প্রাপ্য হচ্ছে কারাদণ্ড ও একশ'বার লোহার ডাণ্ডার আঘাত। তোমার দুঃখের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে······দেখাও তোমার কি আছে।"

সে তার হাতে ছোট্ট থলিটা দিল। তিনি এটা খুলে কাউণ্টারের উপর রাখলেন একটা ভারী ব্রেসলেট, বড় পান্না বসানো কানের দুল, একটা চুনির গলার হার, একটা সোনার হার যেটা প্রথা অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের প্রতীক হিসাবে দিয়ে থাকে এবং আরও কতকগুলো সোনার ছোট ছোট অলংকার।

"এগুলোর জন্যে কত চাও?"

"দু'হাজার রুপোর টাকা," মহিলা ভয়ে ভয়ে বলল।

একচোখো খোজা নাসিরুদ্দিনকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে বলল, "এর আসল দামের এক তৃতীয়াংশ মেয়েটা চাইছে। এগুলো ভারতীয় চুনি—আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।"

মুদ্রা-বিনিময়কারী পুরু ঠোঁট কুঁচকে অবহেলার স্বরে বললেন।

"সোনা খাঁটি নয় আর পাথরগুলো কাশগরের সবচেয়ে সস্তা দামের।"

"মিথ্যা বলছে!" ফিসফিস করে একচোখো বলল।

"তোমার প্রতি সহানুভূতির জন্য ও মেয়ে, আমি সবগুলোর জন্য—হ্যাঁ···এক হাজার রুপোর টাকা দিতে পারি।"

একচোখো ছটফট করে উঠল এবং তার হলদে চোখটা বিরক্তিতে জ্বলে উঠল; বাধা দেবার জন্য সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে সংযত করলেন।

বিধবা তর্ক করতে উদ্যত হল।

"আমার স্বামী বলেছিলেন যে তিনি শুধু চুনির জন্যই হাজার টাকার বেশি দিয়েছিলেন।"

"তিনি কি বলেছিলেন আমি জানি না, জানতেও চাই না। মনে রেখ—

এই সোনা-পাথর চুরি করাও হতে পারে। ঠিক আছে আমি তোমাকে আরও দুশো টাকা দেব। এক হাজার দুশো, তার বেশি একটা তামার পয়সাও না!"

গরীব বিধবা আর কি করবে? সে রাজী হল।

মুদ্রা-বিনিময়কারী নিশ্বাস ফেলে সোনা-পাথরগুলো তার থলিতে পুরে রাখলেন ও বিধবার হাতে একমুঠো টাকা দিলেন।

"ডাকাত!" একচোখো ফিসফিস করে কেঁপে কেঁপে উঠে বলল: "আমি চোর, সারা জীবন চোরেদের মধ্যে কাটিয়েছি, কিন্তু এর মত রক্তচোষার সাক্ষাৎ আগে কখনও পাইনি।"

কিন্তু এই শেষ নয়। মহিলা টাকা গুনে চীৎকার করে উঠল, "শেঠজি, তুমি ভুল করেছ—এখানে মাত্র ছ'শো পঞ্চাশ আছে।"

"ভাগো," মুদ্রা বিনিময়কারী চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। "চুরি করা সোনা সমেত পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার আগে পালিয়ে যাও।"

"সাহায্য কর, আমার সব চুরি করে নিল! ভাল মানুষ কে আছ, সাহায্য কর!" দারুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা চীৎকার করে উঠল।

একচোখোর বিরক্তির সীমা পেরিয়ে গেল, খোজা নাসিরুদ্দিন তাকে আর হয়তো সামলাতে পারতেন না যদি না, ঢাকের একটা কান ফাটানো শব্দ রাস্তার মোড়ে শোনা যেত।

রাজপুরুষ ও তার প্রহরীরা দোকানের দিকে এগিয়ে আসছিল। শহর পরিভ্রমণ শেষ করে তারা শহরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

মেয়েটা ভয়ে চুপ করে গেল ও পিছন দিকে সরে গেল।

বণিক পেটের নীচে হাত জড় করে ও মাথা অল্প নীচু করে রাজপুরুষকে সেলাম জানালেন।

ঘোড়ার উপর থেকে রাজপুরুষ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সাড়া দিয়ে সেলাম জানালেন:

"সেলাম, রহিমবাই, বণিক চূড়ামণি! মনে হচ্ছে আপনার দোকানের কাছে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম।"

"হ্যাঁ, ঐ যে ও!" মহিলাকে দেখিয়ে মুদ্রা-বিনিময়কারী উত্তর দিলেন। "ও অসৎ এবং নীচ ব্যবহারের জন্য অপরাধী, ও শান্তি নষ্ট করছে, টাকা চাইছে, ধনরত্ন ও অন্যান্য জিনিসের কথা বলছে......।"

"ধনরত্ন ?" রাজপুরুষ হঠাৎ উল্লাসে বললেন, তার কাঁচের মত বাইরের দিকে ঠেলে ওঠা চোখ দুটো জলজল করে উঠল ; এত জ্বলছিল যে চোরের হলুদ চোখটা তার তুলনায় শিশুর চোখের মত নিষ্পাপ ও নম্র দেখাচ্ছিল।

"মেয়েটাকে আমার সামনে নিয়ে আসুন!"

কিন্তু বিধবা তখন পালিয়ে গিয়েছে। তার শেষ সম্বল বাঁচাবার উৎকণ্ঠায় পাশের একটা রাস্তা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

"এই হচ্ছে একটা উদাহরণ : সাধারণ মানুষ যতই নীচু স্তরের হবে ততই সহজভাবে চুরি জোচ্চোরি করবে," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "চুরি বন্ধ করতে গিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসার নামে ডাকাতিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ঐ বিধবার পিছনে ছুটে দেখ ও কোথায় বাস করে।"

একচোখো অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কয়েকটা অদ্ভুত ব্যবহারের মধ্যে একটা হচ্ছে হঠাৎ চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং রহস্যজনকভাবে আবার আবির্ভূত হওয়া, ঠিক যেন আশপাশের বাতাসে গলে যাওয়া আবার সেখান থেকে বস্তুর আকারে বেরিয়ে আসা।

প্রহরীদের চোখে না পড়ার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন পাথরের জমা করে রাখা স্তূপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন ; এই জায়গার পাশ দিয়ে যে ঝরণাটা বেরিয়ে গিয়েছে সেচের জন্য সেখানে পাথর এনে জমা করা হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি দোকানে কি হচ্ছিল দেখতে ও শুনতে পাচ্ছিলেন।

রাজপুরুষ দয়া করে এক কাপ চা খাবার জন্য বণিকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁরা দুজনে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে খানের উপস্থিতিতে খুব শীঘ্রই যে ঘোড়দৌড় হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

"আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে ভয় করি না, রহিমবাই," গোঁফের ডগা মোচড়াতে ও তা দিতে দিতে রাজপুরুষ বললেন। "আপনি আরবে যে ঘোড়াগুলো কিনেছেন আমি তাদের সম্বন্ধে শুনেছি। শুনেছি অবশ্য কিন্তু দেখিনি—কারণ আপনি আপনার বৌকে যতটা না লুকিয়ে রাখেন তার চেয়েও বেশি সাবধানে সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখেন। গুজব সমুদ্র পার করার খরচ নিয়ে সমস্ত ঘোড়ার পিছনে আপনি চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছেন। এমন কি প্রথম পুরস্কার পেলেও আপনার খরচ উঠবে না।"

"বাহান্ন হাজার টাকা খরচ লেগেছে, বাহান্ন," আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে বণিক

বললেন। "যখন মহান খানকে আনন্দ দেওয়ার কথা ভাবি তখন খরচের কথা আমি চিন্তা করি না।"

"সত্যিই প্রশংসার এবং আমি আপনার উৎসাহের কথা খানের কানে তুলব। যদি আমার তুর্কী প্রথম পুরস্কার নেয় তবে রাগ করবেন না। আরব ঘোড়া উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত সত্যি, কিন্তু আমি মনে করি তুর্কীরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল।"

রাজপুরুষ বিভিন্ন জাতের ঘোড়ার গুণাগুণ নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন, এদিকে বণিক মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং ভিতরে ভিতরে খুশি হচ্ছিলেন এবং তাঁর আঙুলগুলো তাঁর মোটা পেটের উপর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল।

বাতাস সহসা সুগন্ধে ভরে উঠল। মুদ্রা বিনিময়কারীর স্ত্রী ভিতরে এলেন। তিনি লম্বা ছিপছিপে মেয়ে, একটা পাতলা বোরখা পরেছিলেন যার ভিতর দিয়ে তাঁর মুখের রং এবং পাউডার, তাঁর চোখের ও ভুরুর কাজল ও ঠোঁটের চীনা রং দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

রাজপুরুষ উঠে তাঁকে সেলাম জানালেন।

"সেলাম সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত আরজি-বিবি, আমার পরম বন্ধুর স্ত্রী আপনি।"

মাথা নীচু করে ও অল্প হেসে তিনি উত্তর দিলেন। রাজপুরুষের সামনে নিজের ঐশ্বর্য্য ও উদারতার গর্ব করার সুযোগ না ছাড়তে পেরে, ব্যবসায়ী থলি থেকে কয়েকটা দামী পাথর বার করে স্ত্রীকে উপহার দিয়ে মিথ্যা করে বললেন : যে তিনি ঘণ্টাখানেক আগে স্বর্ণকারের দোকান থেকে আট হাজার রুপোর টাকা দিয়ে কিনে এনেছেন। তাঁর স্ত্রী বিনীত ভাষায় তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন কিন্তু যখন তিনি তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাজপুরুষের দিকে। আত্মশ্লাঘায় মগ্ন হয়ে বণিক কিছুই লক্ষ্য করলেন এবং নিজের মনেই বলে চললেন যে রত্নগুলির জন্য তিনি আট হাজার টাকা, আরবী ঘোড়ার জন্য বাহান্ন হাজার এবং এটা সেটার জন্য আরও হাজার টাকা দিয়েছেন। রাজপুরুষ গোঁফে তা দিতে দিতে সব শুনছিলেন এবং পিছনে নাক সিঁটকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন—সেই ধরনের হাসি যা কোকান্দের অনেকেই হাসে যার খানিকটা ছোরা বা অন্য কিছু দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের মত শোনায়।

"সুন্দরী আরজি-বিবি, এই রত্নগুলো আপনার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে

তুলবে," রাজপুরুষ বললেন। "কি দুঃখের কথা যে ঐ পরীর মত সুন্দর মুখে রত্নালঙ্কার পরতে দেখার আনন্দ শুধু আপনার স্বামীর একার।"

"নেকলেস ও কানের দুল পরে, আরজি-বিবি, যদি কামিলবেকের সামনে তোমার মুখের ওড়না এক মিনিটের জন্য খোল তবে কোন পাপ হবে না; কামিলবেক আমার প্রাণের বন্ধু," বণিক মনের আনন্দে বললেন (তাঁর আত্মশ্লাঘা ও আত্মতৃপ্তি এ পথে তাকে পরিচালিত করল!)

তিনি কোনরকম আপত্তি না করে রাজী হলেন এবং অলংকার পরে তাঁর ঘোমটা তুলে ধরলেন।

রাজপুরুষ গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে পিছনে সরে এলেন ও দুই হাতে তাঁর চোখ ঢাকলেন যেন রূপের ছটায় তাঁর ধাঁধাঁ লেগেছে।

বণিক মনে মনে এত খুশী হলেন যে শিস্ দিতে ও নাক দিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন এবং শূয়রের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠলেন।

পাথরের স্তূপের পিছন হতে খোজা নাসিরুদ্দিন সবই বুঝতে পারলেন এবং মাথা নেড়ে মনে মনে চিন্তা করলেন: "কিসের জন্য হাসছিস, ভোঁদা বোকা! তুই আরব থেকে ঘোড়া আনিয়েছিস্ আর তোর বৌ ঘরের কাছেই তাকে খুঁজে পেয়েছে!"

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে চোর খোজা নাসিরুদ্দিনের সামনে হাজির হল।

"বিধবা কাছেই থাকে," সে বলল। "সত্যিই তার তিনটে ছেলে আছে এবং সকলেই অসুস্থ। ছ'শো টাকা তার ধার শোধ করতে যথেষ্ট নয়। কাল আবার কপর্দকহীন হয়ে পড়বে ঐ রক্তচোষা বদমাসটার জন্য।"

"এই দোকান আর ঐ বিধবার বাড়ী মনে রাখবে," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমাদের আবার তাদের প্রয়োজন হবে। এখন চল যাওয়া যাক।"

রাজপুরুষ, গর্বিত মুদ্রা-বিনিময়কারী ও তার স্ত্রীকে পিছনে ফেলে রেখে তাঁরা এগিয়ে চললেন; পড়ে রইল তাঁদের হাজার হাজার টাকা, তাঁদের ধনরত্ন, আরবী ঘোড়া আর তাঁদের নির্লজ্জ গোপন কাহিনী। যে সরাইখানায় তাঁরা থাকতেন সেটা ছিল বাজারের অন্য পাশে ফলে তাঁদের জনশূন্য ব্যবসাকেন্দ্রগুলি এবং নিস্তব্ধ চকগুলি পেরিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটতে হল। লাল সূর্যাস্ত চোখ ধাঁধিয়ে তুলল, সন্ধ্যার আলো বড় বড় নরম ঢেউ তুলে জমির উপর দিয়ে ভেসে

চলল এবং এই সোনালি আলোয় মসজিদের গম্বুজ ও মিনারগুলি যেন পার্থিব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে স্বচ্ছ পদার্থের মত আকাশে ভেসে উপরে উঠল এবং আলোর শিখায় গলে পড়ল।

একাদশ অধ্যায়

পাহাড়ের হ্রদ! বাজারে প্রায় প্রত্যেককেই খোজা নাসিরুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন—কৃষক, পথিক, শিল্পী, ভাঁড় ও বাজীকর—কিন্তু বৃথা। এ ধরনের হ্রদের কথা আগে কেউ শোনেনি। "কোথায় হতে পারে?" খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। "সম্ভবতঃ কোন আগের জন্মে বৃদ্ধ দরবেশের এ ধরনের হ্রদ ছিল, নয়তো অন্য কোন গ্রহে—হয়তো বৃহস্পতি বা শনি গ্রহে এবং বুড়ো বয়সে তাঁর স্মৃতি-শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সব গুলিয়ে ফেলেছেন এবং আমাকে পৃথিবীতে খুঁজতে পাঠিয়েছেন।"

তুরাগ্‌ন সম্পর্কিত আর একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। "উৎসবের মাত্র এক সপ্তাহ বাকী আছে", তিনি চিন্তা করলেন। "আমার টাকার প্রয়োজন, ছ' হাজারের কমে হবে না, কিন্তু কোথায় আমি পাব?"

কেন টাকার প্রয়োজন প্রকাশ না করেই তিনি একচোখো চোরের উপদেশ চাইলেন।

"আগের দিনে কোকান্দে ছ' হাজার টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সোজা ছিল", চোর বলল। "এখন কোকান্দের লোক গরীব হয়ে পড়েছে এবং ঐ রকম একটা মোটা টাকার থলি সমেত একজন লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে। অবশ্য যদি না মুদ্রা-বিনিময়কারী হয়?"

"আবার তুমি পাপ-চিন্তার আশ্রয় নিচ্ছ?" খোজা নাসিরুদ্দিন ভর্ৎসনার সুরে বললেন। "তোমাকে কি চুরি করতেই হবে? অন্য কোন উপায় নেই?"

"যদি পাশা খেলে জিতি?"

"হারতেও তো পার। আমরা জিতব এমন একটা খেলা বেছে নেব।"

একটা অর্ধেক গড়ে-ওঠা চিন্তা, যা হয়তো বাস্তবে পরিণত হতে পারে, খোজা নাসিরুদ্দিনের মাথায় এল।

"তিনজন নিয়ে খেলা: তুমি, আমি আর ঐ মোটা অবিশ্বাসী ব্যবসাদার। কিন্তু ওকে কেমন করে আমরা খেলায় টেনে আনব?"

"ঐ মোটা সওদাগর, বিধবা ও অনাথের রক্ত-শোষক!" একচোখো চীৎকার

করে উঠল। "ওকে খেলায় টেনে আনো? মনে হয় এই খুঁটি বা ঐ উটটাকে খেলায় টেনে আনা অনেক সোজা!"

"মনে হয় সব কয়জন লোকের টাকা ওর কাছ থেকে নিতে পারলে ভাল হয়," নিজের পরিকল্পনায় উৎসাহ পেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন। স্বেচ্ছায়, নিশ্চয়ই, তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়। মুদ্রা বিনিময়কারীর পক্ষেও সেটা ভাল হবে, কারণ পার্থিব অস্তিত্বের পর পরলোকে উচ্চতর অস্তিত্বে যেতে তার সুবিধা হবে।"

"ঐ রক্তচোষা স্বেচ্ছায় ছ'হাজার টাকা দেবে!" একচোখো হেসে ফেলল। "প্রথম একশো বছরে কেন তার পার্থিব অস্তিত্ব শেষ হবে? দেখুন কেমন করে থলিটা আঁকড়ে আছে—কেউ ওখানে এখন কেড়ে নিচ্ছে না।"

এইসব কথাবার্তা প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি সরাইখানায় হচ্ছিল। শহর ঘুমিয়ে ছিল, বাজারের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেবল দুর্গপ্রাকারগুলোতে আলো জ্বলছিল। শুক্লপক্ষের নতুন চাঁদ মিনারের উপর একাকী ঝুলছিল যেন ঘরের টালিগুলোকে বরফের মত ধবধবে আলো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। চারদিক ঠাণ্ডা ও নিস্তব্ধ। গ্রীষ্মকাল দিনগুলোকে গরম ও ধুলো ভর্তি করে রেখেছিল, কিন্তু রাত্রি যেন পাখা মেলে তারকাখচিত বাতাসে ভরা ঝলমলে অস্পষ্টতা এবং রহস্যময় সজীবতা নিয়ে এখনও বসন্তের রাত্রির মত ছিল। একচোখো কম্বলের নীচে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল। এদিকে খোজা নাসিরুদ্দিন রহস্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে নীল কুয়াশা পৃথিবীতে এসে পড়তে দেখে মুগ্ধ হয়ে এবং অনেক দূরের পৃথিবী দেখতে পাওয়ার মত দূরদৃষ্টি নিয়ে দুই চোখ খুলে শুয়ে রইলেন।

মধ্য রাত্রি ঘোষণা করে ঢাকের শব্দ খোজা নাসিরুদ্দিনকে আবার পার্থিব সংসারে নিয়ে এল—মোটা বণিক ও তাঁর চামড়ার টাকার থলির চিন্তায়। স্বেচ্ছায় তিনি চিন্তার সাবাংশগুলোকে নাড়া দিলেন। "খোঁজ কর, যুক্তি দেখাও, খোঁজ কর! বণিক নিশ্চয়ই ছ'হাজার টাকা দেবেন, এবং তিনি নিজের ইচ্ছায় দিবেন, কারণ আমি বুদ্ধি খাটিয়েছি এবং এটা হবেই!"

এদিকে নিঃসন্দিগ্ধ মুদ্রা-বিনিময়কারী কোন আশু বিপদের আশংকা না করে শান্তিতে নাক ডাকাচ্ছিলেন এবং সুন্দরী স্ত্রীর পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে নিজের ঠোঁট চাটছিলেন। আরজি-বিবি জেগে ছিলেন এবং রেশমের কুর্তার নীচে বেরিয়ে পড়া স্বামীর ভুঁড়িটার দিকে ঘৃণিত চোখে চেয়েছিলেন এবং রাজপুরুষের

কাম-লোলুপ দৃষ্টি ও আকর্ষণীয় গোঁফের কথা ভাবছিলেন। শয়নঘর ছিল গরম ও ভ্যাপসা—জানালাগুলো ছিল শক্ত করে বন্ধ এবং প্রদীপ থেকে তেলতেলে কালি বাতিদানের উপর এসে পড়ছিল। "ওঃ সুন্দর কামিলবেক," মহিলা ভাবছিলেন। "তোমার আলিঙ্গন কি মধুর আর এই পৌরুষহীন মোটা বোকাটার সঙ্গ কি বিরক্তিকর!" এই সব পাপ চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমাবার আগে পর্যন্ত সেই কাল গোঁফের আকর্ষণীয় রূপের কথা চিন্তা করছিলেন ও ভাবছিলেন যে সেই গোঁফের অধিকারীও তখন নিশ্চয়ই তাঁর কথাই ভাবছেন।

তিনি ভুল করেছিলেন। সেই গভীর রাতে অন্য চিন্তা তাঁর স্বপ্নের পুরুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তাঁর ব্যক্তিগত উন্নতির চিন্তা, রাজ অনুগ্রহের চিন্তা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশের চিন্তা।

রাজপ্রাসাদের শয়নকক্ষে রাজকীয় খানের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তখন খোসামোদের সুরে সারাদিনের ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন। খান এই প্রথা চালু করেছিলেন। অনেকে হয়তো ভাববে যে দিনের বেলায় তাঁর যথেষ্ট সময় নেই, কিন্তু আসলে তা নয়, তিনি রাতে একা থাকতে ভয় পেতেন, কারণ তিনি হাঁপানিতে ভুগতেন। এই রোগে তিনি বেশ ভুগতেন, রাজদরবারের চিকিৎসক-দের চেষ্টা সত্ত্বেও রোগ যায়নি; চিকিৎসকেরা আশ্বাস দিয়েছিল যে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং খুব শীঘ্রই চলে যাবে। চিকিৎসকেরা অবশ্য মিথ্যা বলেনি, কারণ তারা এমন একটা পরিবেশ করে আনছিল যখন রোগটা খানের প্রাণ সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে।

উঁচু বালিশের উপর হেলান দিয়ে ও পুরু লেপ টেনে নিয়ে খান বেশ কষ্টের সঙ্গেই ঘড় ঘড় শব্দ করে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, তাঁর দুর্বল বুকটা পাতলা সিল্কের জামার নীচে ওঠা-নামা করছিল। যদিও শোবার ঘরের জানালাগুলো খোলা ছিল এবং কেউ সুগন্ধি তামাক হুঁকা থেকে টানছিলেন না, তবুও বাতাসের জন্য তিনি জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন।

"বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর," রাজপুরুষ বলে চললেন, "যখন আমি নিজের চোখে আগামী ঘোড়দৌড়ের জন্য সব কিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে কিনা দেখবার জন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেলাম।"

"গত বছরও তুমি নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করেছিলে," খান বাধা দিয়ে

বললেন। "তবুও একটা ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। মনে রেখ এবার যেন মাঠে কোন গর্ত না থাকে।"

"এবার আমার গর্দানের বদলে আমি উত্তর দিতে রাজি আছি," সেলাম জানিয়ে রাজপুরুষ বললেন। "আশা রাখছি আমার তুর্কী ঘোড়া উপযুক্তভাবে জাঁহাপনাকে আনন্দ দেবে।"

"শুনতে পাই, তোমার তুর্কী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। একজন বণিক—নাম ভুলে যাচ্ছি—আরব থেকে ঘোড়া এনেছে, যার জন্য সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার খরচ করেছে। তুমি কি সেই ঘোড়াগুলো দেখেছ ?"

"দেখেছি জাঁহাপনা," দ্বিধা না করে রাজপুরুষ মিথ্যা বললেন। "ঘোড়াগুলো, নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু আমার ঘোড়ার মত নয়। আরও বলছি যে বণিক অহংকারের সঙ্গে দাম বাড়িয়ে বলেছে। আমার গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী তার কুড়ি হাজারেব কিছু বেশি লেগেছে।"

"বিশ হাজার ? বিশ হাজার জোড়ায় কি ঘোড়া হতে পারে ? ওরা কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে মণিমুক্তা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে হাজির হবে ?"

"বণিক নীচ বংশের। সে আভিজাত্যের নিয়মকানুন কি করে জানবে ?" রাজপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের মত বললেন।

এইভাবে তাঁর ঘোড়দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, মোটা মুদ্রা-বিনিময়কারীর প্রতি কলঙ্কলেপন করে রাজপুরুষ দরবারের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হলেন। তিনি কোষাধ্যক্ষের নাম উল্লেখ করলেন, যে সন্দেহজনক ভাবে প্রচুর টাকা খরচ করে আটজন অতিথিকে আপ্যায়িত করেছে, রাজস্ব উজির এবং প্রধান খোজা যে মাদক দ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত সেটার ইঙ্গিতও তিনি দিলেন।

প্রধান শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য রাজপুরুষ এখানে থামলেন। অনেক দিন ধরেই তিনি এটা চিন্তা করছিলেন ; বাগানের মালি যেমন একটা দামী ফলকে যত্ন করে, তিনিও তেমনি তাঁর এই পরিকল্পনা লালন-পালন করছিলেন। রাজপুরুষটির শত্রু হচ্ছে সেনাপতি ইয়াদগোরবেক, নির্ভীক নামে পরিচিত, কোকান্দের অশ্ববাহিনীর প্রধান—একজন বীর সৈনিক। যাঁর মুখে শত্রুর তরবারির ক্ষতচিহ্ন এবং অনেক যুদ্ধে যিনি জয়লাভ করেছেন। দাস মনোভাবাপন্ন নীচতা সব সময়েই সাহসী ও শৌর্যশালী মানুষকে ভয় পায়। রাজপুরুষ ইয়াদগোরবেককে সব সময়েই তাঁর সাফ জবাবের জন্য ঘৃণা করতেন এবং আরও

বেশী করে করতেন সাধারণ লোক তাঁকে যে সম্মান ও ভালবাসার চোখে দেখতো তার জন্য।

ইয়াদগোরবেক ছিলেন গম্ভীর, চেহারা ছিল বয়স্ক ও পাকানো. পাকা গোঁফ নীচে ঝুলে থাকত; মাথার পাগড়ীতে একটা সোনালি পালক লাগানো ছিল—প্রতিরক্ষা বিভাগে তাঁর পদমর্যাদার প্রতীক—পরনে একটা ময়লা সিল্কের জামা, কনুইয়ের কাছে জল জল করছিল; পায়ের পাতার দিকে তোবড়ানো একজোড়া জুতো ঘোড়ার রেকাবের উপর ছিল এবং ঘোড়ার লোমের সঙ্গে অবিরাম ঘর্ষণের ফলে গোড়ালির দিকটা ধূসর হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল একজন দেহরক্ষী—বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক আধকানা লোক যে তাঁর যুবা বয়স থেকে পরিচর্যা করে আসছে। তাঁর যুদ্ধের ঘোড়ায় চেপে ইয়াদগোরবেক সামনের দিকে ঝুঁকে বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন—ঘোড়াটাও বুড়ো এবং গায়ে যুদ্ধের চিহ্ন। নিস্তব্ধ জনতা পিছনে হটে পথ করে দিল এবং বেশ সসম্ভ্রমে ফিসফিস করতে করতে পিছনে পিছনে চলল। তাঁর পুরনো দিনের বন্ধুরা, যাঁরা তাঁর মতই বুড়ো এবং গায়ে যাদের একই ধরনের যুদ্ধের দাগ, সরাইখানা থেকে চীৎকার করে উঠল, "সেলাম, নির্ভীক, আবার কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব? আমাদের ভুলবে না, আমরা এখনও তরোয়াল চালাতে পারি!" প্রতিবার যখন তিনি রাজপ্রাসাদে আসতেন বৃদ্ধ সৈনিক চুপ করে থাকতেন এবং নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতেন না; কিন্তু মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো যেন জোরে জোরে তাঁর জয়গাথা গাইত, তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল বা রণবাদ্যের শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝন, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ঢালের ঠোকাঠুকি এবং জয়ঢাকের গম্ভীর আওয়াজ যা অনেক মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করত, এক কথায় অতীতের প্রতিধ্বনি।

রাজপুরুষের কাছে এ সমস্তই ছিল কাঁটার মত, যিনি কখনও একটা সংঘর্ষেও ছিলেন না, যাঁর মাথার উপর শত্রুসৈন্যের তরোয়াল একবারও ঝলক দিয়ে ওঠেনি। শত্রুসৈন্যকে নিরাপদে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাথা মাটির দিকে নুইয়ে দুজন প্রহরী যখন তার উপর চেপে বসত—একজন কাঁধে অন্যজন পায়ের উপর, তার আগে পর্যন্ত বীর কামিলবেক কখনও শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে আসতেন না।

"আর কি?" জোরে শব্দ করে একটা হাই তুলে খান জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ রাত হয়েছে, চোখের পাতা ভারী বোধ করলেন তবুও আরামদায়ক ঘুম তাঁর কাছে আসবে না।

রাজপুরুষ শরীর বাঁকালেন, ভয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

"জাঁহাপনা, আমার মনে একটা বেদনাদায়ক সত্যি আছে!"

"বল।"

"আপনার মন ভারাক্রান্ত করতে আমি ভয় পাচ্ছি।"

"বল।"

"এটা সেনাপতি ইয়াদগোরবেকের ব্যাপারে।"

"ইয়াদগোরবেক? সে কি কোন ব্যাপারে দোষী? কি সেটা?"

রাজপুরুষ থতমত খেয়ে গেলেন, পরে আবেগ চেপে বেশ পরিষ্কার গলায় বললেন:

"আমি তাঁকে ব্যভিচারের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত করেছি।"

"ব্যভিচার? ইয়াদগোরবেক?" হতবুদ্ধি হয়ে খান চীৎকার করে উঠলেন, "তুমি পাগল হয়েছ। এছাড়া আমরা যে কোন জিনিস বিশ্বাস করতে রাজী

"হাঁ, জাঁহাপনা, ব্যভিচার!" বেশ জোরের সঙ্গেই রাজপুরুষ উচ্চারণ করলেন। আমার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রায় ছ' বছর আগে বিপত্নীক হয়ে......।"

"জানি......।"

"ঐ ভোগবিলাসী ইয়াদগোরবেক আল্লার নির্ধারিত পথে আইন মাফিক বিয়ে না করে শরাফৎ নামে এক পারসী মহিলার সঙ্গে বছর দুই ধরে আসঙ্গ লিপ্সায় লিপ্ত।"

"জানি," বাধা দিয়ে খান বললেন। "কিন্তু সেই মেয়েটি এখন একা; পাঁচ বছর আগে তার স্বামী যানবাহন নিয়ে ভারতে যাচ্ছিল এবং যাবার পথে মারা যায়।"

"আরও কথা জাঁহাপনার কানে তোলার জন্য আমি আপনাকে থামাচ্ছি। ফরমান ঘোষণার পর দু'মাস পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইয়াদগোরবেক সেই মহিলার সঙ্গে তার ব্যাভিচারের সম্পর্ক ত্যাগ করেনি; সেই কারণে সে দোষী এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবার যোগ্য।"

"কিন্তু কেন সে তার সম্পর্ক ত্যাগ করবে যখন মহিলা একাকী। আমি বলছি," খান বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "কেন ফরমান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যত সব আজেবাজে ব্যাভিচারের কথা?"

একটা বড় রাজ্যের খান হয়ে তিনি চান বা না চান প্রচলিত আইন তাঁকে বজায় রাখতেই হবে যদি তিনি তাঁর রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে রাজ্য রক্ষা করতে চান।

"জাঁহাপনা প্রশ্ন করছেন—ফরমান কি প্রয়োগ করা যেতে পারে ?" গোঁফে জোরে একটা মোচড় দিয়ে রাজপুরুষ বলে উঠলেন। "কিন্তু যদি ঐ মহিলা একাকী না হয় এবং তাঁর বিয়ে, যা আইন-মাফিক বাতিল হয়নি, এখনও বৈধ থাকে তবে কি হবে ? কি হবে যদি তার স্বামী না মরে থাকে এবং এখনও জীবিত থাকে ?"

"জীবিত ? তাহলে এই পাঁচ বছর কোথায় ছিল ?"

"সে বেঁচে আছে এবং এখন ভারতের পেশোয়ারে ক্রীতদাস। আমার কারাগারে দুজন পেশোয়ারের বন্দী আছে—গত বছরের আগের বছর তাদের দুজনকে বাজারে মহান খানকে যাদু করার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয়বার জেরা করার পর তারা তাদের দোষ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেছিল এবং আইন অনুযায়ী আমি তাদের কারাগারে পুরে শাস্তি দিয়েছিলাম। এই লোক দুটো সম্প্রতি—দিন কয়েক আগে—নতুন করে সাক্ষ্য দেয় যে তারা পেশোয়ার বাজারে ঐ মেয়েটার স্বামীকে দেখেছে ক্রীতদাসরূপে, অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায়। তিনবার সে তার স্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়েছিল তার মুক্তির জন্য টাকা পাঠাতে অনুনয় করে, কিন্তু সে কোন জবাব পাঠায়নি ; দিব্যি করে বলতে পারি সে তার ব্যাভিচারী প্রেমিক ইয়াদগোরবেকের প্রেরণাতেই করেনি। জাঁহাপনা, জেরার উত্তরে লোক দুটো এই উত্তর দিয়েছিল—এবং দুজনে একই ভাষায় বলেছিল।"

"যখন জেরা করবে সকলে একই ভাষায় কথা বলবে," গম্ভীর হেসে খান উত্তর দিলেন। "যদি এই ধরনের হাস্যকর অভিযোগে ইয়াদগোরবেককে গ্রেপ্তার করা হয় তবে প্রজারা কি বলবে, সৈন্যরাই বা কি বলবে ? আমার মনে হয় পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে।"

রাজপুরুষের ঔদ্ধত্যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বক্তব্য আগে থেকে তৈরি করে এসেছিলেন ; তুলে ওঠা কাল গোঁফ দুটো আরও বিরক্ত করছিল ; এছাড়া মাথার পিছন দিকে রোগের জন্য একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। পরে যখন কথা বললেন তখন খানের কথায় যেন মোটা হুলের মত কিছু একটা ছিল।

"কিছু ষড়যন্ত্র আছে আমরা বলি। পেশোয়ারের লোক দুটোকে প্রায় দেড় বছর আগে ধরা হয়েছিল কিন্তু মহিলার স্বামীকে যে দেখেছে সেটা মাত্র কিছুদিন আগে জানিয়েছে। এতদিন কেন তারা এই সাক্ষাৎ দেয়নি ?"

"তারা বেয়াদবের মত অস্বীকার করছিল এবং এখনও পর্যন্ত স্বীকার করেনি।"

"বেয়াদবের মত অস্বীকার?" খান বললেন, আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "তোমার ভাষায় তারা স্বীকার করেছিল যাদু করার কথা, যার জন্য তারা কারাবন্দী; দ্বিতীয়বার জেরার পর—যেটা প্রায় দেড় বছর লেগেছিল—তারা স্বীকার করল সেই মহিলার স্বামীকে দেখার কথা, যার জন্য তাদের কোন শাস্তি পেতে হয়নি। এবং সেটাও তোমার কারাগারে ও তোমার হাতে? বেশ অদ্ভুত, তাই না? অ্যাঁ?"

রাজপুরুষ বুঝতে পারলেন যে তিনি অশুভ সময় বেছে নিয়েছেন। খান বেশ খারাপ মেজাজে আছেন এবং কাছে যাকে পাচ্ছেন তাকেই এলোপাথারি হুল বিঁধিয়ে দিচ্ছেন। সে রাতে তাঁর পক্ষে অসুস্থতার ভাণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে থাকাই উচিত ছিল এবং তাঁর জায়গায় খানের হুলের কামড় খাবার জন্য অন্য কাউকে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু ভুল শোধরাবার এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে; যে সব লোক রাজার পাশে পাশে থাকে তাদের মাঝে মাঝে এ ধরনের ভুল হয়—যে আগে কোন জিনিস ধরবার চেষ্টা করে, প্রথম চড় খাবার সম্ভাবনা তারই বেশি।

"হে দিন দুনিয়ার মালিক, আমি আগে থেকেই ইয়াদগোরবেকের ব্যাভিচারের খবর সম্পূর্ণ জানতাম এবং আমি আগে চুপ করেছিলাম তার একমাত্র কারণ আপনার স্বাস্থ্য, এমন একটা ভয়ানক খবরে যা ভেঙ্গে পড়তে পারত," রাজপুরুষ এধার ওধার করে বলে চললেন এই আশায় যে আবার তিনি তাঁর পথ ধরতে পারবেন।

কিন্তু হায় সে রাতে তাঁর ভাগ্য ছিল খারাপ।

"তুমি ইয়াদগোরবেকের ব্যাভিচারের খবর আগে থেকেই সম্পূর্ণ জানতে?" খান আবার বললেন। "কোথায়? সম্ভবতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের তাঁবুতে, যেখানে তুমি কোন দিনও ছিলে না? এবং কার সঙ্গে? সে কি তার তরবারির সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল? আমরা অন্য জিনিসও দেখেছি। এ ধরনের খবর আমরা অন্যের বেলায় পেয়েছি……সেইসব লোকের বেলায় যাদের প্রচুর সময় ও লোভ আছে যারা ব্যাভিচার করার জন্য চমৎকার গোঁফ গজিয়ে ও চকচকে জুতো পরে চীনদেশের রাজপুত্রের মত ঘুরে বেড়ায়। সেখানেই ব্যাভিচারের খোঁজ করা উচিত। আমি নিশ্চিত যে এই ধরনের অনুসন্ধানে বেশি সময় লাগবে না।"

মাটি কেঁপে উঠল এবং রাজপুরুষের পায়ের তলা থেকে তা যেন সরে গেল। এটা কি শুধু অনুমান অথবা খান কারও কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছেন? সম্ভবতঃ তিনি সব জানেন আরজি-বিবিও কি তাঁর পরিচিত? সম্ভবতঃ, তিনি কি সময় কাটাতে চাইছেন যেমন করে একটা বিড়াল থাবা মেলে একটা ইঁদুরের উপর বসে সময় কাটায়? একটা আরবীয় ঘূর্ণিঝড় যেমন সামনে যেসব খেজুর-গাছ পায় উপড়ে ফেলে, রাজপুরুষের মাথার মধ্যে এইসব চিন্তা তেমনি পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তাঁর মতলব নিয়ে আর বেশি দূর এগোতে চাইলেন না। এখন নিজের ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়াই বেশি প্রয়োজন।

মুখের ফ্যাকাসে ভাব লুকাবার জন্য তিনি আলোর কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং গলা পরিষ্কার করার জন্য একটু কেশে নিলেন।

বুদ্ধি খাটিয়ে সুকৌশলে তিনি খানের কাছ থেকে সরে আসতে পারতেন কিন্তু নিজে কাপুরুষ হওয়ায় বেশ ভয়েই পালাতে হল।

"জাঁহাপনা সব সময়েই ন্যায় পথে চলেন," অত্যন্ত বাড়িয়ে ও তোষামোদের স্বরে তিনি বললেন। "ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে আমার প্রভু আমার চোখের সামনের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। এখন বুঝতে পারছি পেশোয়ারের ঐ শয়তান দুটো আমাদের সদাশয় ইয়াদগোরবেকের নামে কলংক লেপন করতে চেয়েছিল যাতে তাঁর সামরিক কার্যাবলী ছোট করে দেখান হয় এবং খান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি কমে যায়। এই হচ্ছে তাদের ঘৃণিত উদ্দেশ্য! এখন দেখতে হবে তারা উৎসাহ পেল কোথায় এবং কে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কাল নিজে পেশোয়ারের দুষ্কৃতিকারী দুজনকে আবার জেরা করব!"

খান চুপ করে শুনলেন। যে হাসিটা তার মুখে লেগেছিল সেটা যেন সমস্ত ঘটনার পূর্বাভাস। কি কথা লুকিয়ে ছিল এবং যখন ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে যাবে তখন কি কথাই বা বার হবে? যুক্তির সঙ্গে ভয় মিশিয়ে রাজপুরুষ তাঁর অভিযোগ মুলতুবি রাখতে চেষ্টা করলেন এবং না থেমে আরও খোসামোদের স্বরে বললেন।

"জাঁহাপনা, আপনার রাত্রি সুখের হোক!" তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "আপনার অসীম জ্ঞানের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার মুখোস খুলে গিয়েছে এবং একজন ভাল মানুষের নাম থেকে কলংক দূর করা হয়েছে। এখন আমার

বিবেক পরিষ্কার, আমার যুক্তিও উন্নত ধরনের, আমার আত্মাও আলোকিত—আমি অভিযোগ প্রত্যাহার করছি।"

তিনি প্রতি কথায় কুর্নিশ করে সেলাম জানালেন এবং প্রাণ বাঁচাতে পিছনের দরজার দিকে সরতে লাগলেন। ঘরটি বেশ বড় থাকায় চৌকাঠ পার হতে তাঁর সময় লাগল ; তাঁর ডান পা যখন এর উপর এসে পড়ল এবং শেষ সেলাম জানিয়ে যখন বাঁ পা'টা তুলতে যাবেন এবং পরের মুহূর্তেই দরজার পিছনে চলে যাবেন ঠিক এমন সময় যেন একটা পাখাওয়ালা তীর ছুটে এসে শাস্তি দিতে এল।

"অপেক্ষা কর!" খান বললেন। "তারপর এখন এখানে এস, কাছে এস।"

ভয়ে জল-জল করা চোখ দুটো খানের হাতছানি দেওয়া আঙুলটার দিকে অকম্পিত দৃষ্টিতে মেলে রাজপুরুষ তাঁর ইতস্ততঃ পদক্ষেপ নীরবে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন যেন একটা অদৃশ্য ফাঁস তাঁর গলায় লেগে সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। দরজা থেকে খানের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল মানসিক যন্ত্রণায় ভরা।

"তোমার পেশোয়ারের লোক দুটো কোথায়?" খান জানতে চাইলেন।

"ওরা কারাগারে জাঁহাপনা।"

"আমরা নিজেরা তাকে জেরা করতে চাই।"

রাজপুরুষের চোখে অন্ধকার নেমে এল, তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

তাঁর জিভ, যাইহোক, যুক্তির উপর নির্ভর না করে কাজ করে চলল।

"সকালে তাদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আনা হবে।"

"সকালে নয়, এখনই," খান বললেন। "আমরা এখন ঘুমাব না, সুতরাং তাদের এখানে আনার ব্যবস্থা কর।"

"তারা প্রাসাদে আসার জন্য উপযুক্ত নয়, জাঁহাপনা," রাজপুরুষ তোতলাতে তোতলাতে বললেন। "তারা কম্বল পরে আছে, গায়ে লোম এবং উস্কোখুস্কো……।"

"কিছু যায় আসে না, দরকার হলে নাপিতকে ঘুম থেকে তুলবে।"

"তারা জঘন্যভাবে নাক ডাকায়……।"

"আমরা খোলা জানালার বাইরে তাদের আলাদা করে রাখব। ঐ মহিলার স্বামীর সম্পর্কে আমি বিস্তৃতভাবে তাকে জেরা করব ; সে কি করে পেশোয়ারে

এল এবং কেই বা তাকে ক্রীতদাস বানাল। যাদু করার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করব যার জন্য আজ তারা কারাগারে। যদি ঠিক ঠিক উত্তর পাই তোমার কাজের জন্য দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার পাবে। তারা আমাকে সব বলবে। তুমি অবশ্য সরে যাবে যাতে তারা নির্ভয়ে কথা বলতে পারে এবং আমরা শুনতে ও বুঝতে পারি। এই যে প্রহরীরা!"

একটা আলোর নীচে ঝুলান একটা পিতলের ঘণ্টায় ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেন।

রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের প্রধান হাজির হলেন।

"তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাকবে," খান রাজপুরুষকে বললেন। "তুমি প্রাসাদ প্রহরীদের চারজনকে নিয়ে কারাগারে যাও যেখানে লোক দুটো..."

ঠিক সেই সময় হাঁপানির একটা টান গলায় এল যেন একটা ঘোড়া টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ল। খান দুলে উঠলেন, জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন এবং নীল হয়ে উঠলেন; একটা শুকনো কাশি তাঁর দুর্বল শরীরটা কাঁপিয়ে তুলল; তাঁর চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে এল এবং জিভ বাইরে ঝুলে পড়ল। রাতের চিকিৎসকরা তাদের পাত্র, তোয়ালে এবং বদনা নিয়ে ছুটে এল; চারদিকে হৈ-হট্টগোলে ভরে গেল।

রাজপুরুষ নিজেই জানতেন না কেমন করে প্রাসাদ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। হাঁপানির আকস্মিক আঘাতে খান সংজ্ঞাহীন হয়ে না পড়লে সে রাতেই হয়তো তাঁর জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেত।

যতক্ষণ না তিনি বাইরে চকে এসে রাতের পরিষ্কার বাতাসে নিশ্বাস নিলেন ততক্ষণ তাঁর প্রাণ যেন ধড়ে ফিরে এল না।

বিপদ আটকে রাখা হল সাময়িকভাবে, কিন্তু একেবারে দূর হল না। খান যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন আবার পেশোয়ারের লোকদের কথা ভাববেন এবং তখন আবার তাদের হাজির করতে বলবেন।

পেশোয়ারের এই লোক দুজনকে সরিয়ে দিতে হবে এবং সকাল হবার আগেই সরাতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

রাজপুরুষ মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

গতকাল তিনি তাদের ফাঁসি দিতে বা মেরে ফেলতে পারতেন, কেউ একটি কথাও বলত না। কিন্তু আজ এ সবে কোন ফল হবে না। কে জানে যে

পেশোয়ারের লোক দুজনের জোড়া মাথার সঙ্গে আর একটি মাথা জুড়ে দেওয়া হবে না—যেটা তাঁর নিজের ?

শেষ একমাত্র উপায় আছে, যা অবশ্য কখনও পরখ করে দেখা হয়নি—সেটা হচ্ছে জেল থেকে পালান !

এই চিন্তা করে তিনি অফিস ঘরে এলেন যেখানে তাঁর বিশ্বাসী লোক আছে যারা তাঁর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে ও শান্তি বজায় রাখবে।

পেশোয়ারের সেই যাদু করতে আসা লোক দুজন—যারা সেদিন রাতে খানের আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আসলে ছিল পাথর-ভাঙ্গা মিস্ত্রি। বহুদিন ধরেই এরা দুজন একসঙ্গে কাজ করে এবং জীবিকা অর্জনের জন্যই কোকান্দে এসেছিল। দুজনেই বয়স্ক লোক এবং জীবনে কখনও যাদুবিদ্যা-সংক্রান্ত কোন কাজ করেনি বা জানে না। নিজের সুবিধার জন্যই রাজপুরুষ এইসব মনগড়া জিনিষ বানিয়েছিল।

প্রায় দেড় বছর অন্ধকার জেলখানায় কাটানর পর পেশোয়ারীদের নতুন করে সাক্ষী দেবার জন্য উৎপীড়ন-কক্ষে ডেকে আনা হয়েছিল, যার ধরন প্রথমটার চেয়ে কম প্রচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য ছিল না। সমস্ত কিছুই এক মহিলাকে নিয়ে যাকে কেউ একজন কোন এক জায়গায় বশ করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে এবং তার স্বামী তার মুক্তির জন্য কোন অর্থ খরচ করবে না অথবা দুজনেই ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে……এদিকে কেউ একজন বয়স্ক এক সেনাপতিকে তুক্ করে শারাফত্ নামে এক মেয়েতে পরিণত করেছে—এক কথায় বেচারা পেশোয়ারী দুজনের মাথা গুলিয়ে গেল এবং তারা আবার কারাগারে ফিরে এল মুখ গম্ভীর করে ও ভাগ্যে কি ঘটবে সে ব্যাপারে একেবারে উদাসীন হয়ে। এক বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল দ্বিতীয়বার জেরার পর ফাঁসির কাঠগড়া থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না।

এই বিশ্বাসেই তারা তিন জন জেল রক্ষকের সাক্ষাৎ পেল যারা খুব সকালেই তাদের কাছে এসে জেলের ফটক খুলে দিল।

খুব সাবধানে ও গোপনে দুজন জেলকর্মচারী পেশোয়ারী দুজনকে উপরে নিয়ে এল এবং তৃতীয় জন একটা উখা নিয়ে ঘষে ঘষে হাতকড়া দুটো কাটতে লাগল।

রাজপুরুষের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছুই বেশ সুষ্ঠুভাবে ঘটছিল। কিন্তু

উপরে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটল ; বন্দীরা ভেবেছিল যে তাঁদের ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেজন্যে তারা একজন মোল্লাকে আনতে দাবী জানাল। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসাবে পাপ থেকে মুক্ত না হয়ে আল্লার অনুগ্রহ পেতে তারা অস্বীকার করল।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন ফল হল না।

ব্যর্থ হয়ে জেলরক্ষক দুজন ফিসফিস করে তাদের জানাল যে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

পেশোয়ারী দুজন বিশ্বাস না করে আরও জোরের সঙ্গে মোল্লার জন্য দাবী জানাল।

ইতিমধ্যে সময় পেরিয়ে সকাল হয়ে আসছিল—যে সময়টা এই গোপন কাজের মোটেই অনুকূল ছিল না।

পেশোয়ারী দুজনকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না, কারণ তারা এমন চেঁচামেচি সুরু করে দিল যে অন্যান্য কয়েদখানা থেকে প্রতিধ্বনি ও বন্দীদের উত্তর শোনা গেল। কয়েদখানাটাও রাজপ্রাসাদের এত কাছে ছিল যে সেখানেও শব্দ যাওয়া সম্ভব।

জেলরক্ষকরা সমস্ত ব্যাপারটা রাজপুরুষকে জানাতে বাধ্য হল, যদিও তিনি সামনে ছিলেন না, তবে জেলের খুব কাছেই ছিলেন।

রাজপুরুষের হাতে ঠিক সেই সময়ে কোন বিশ্বাসী মোল্লা ছিলেন না। জীবনে অনেক কিছুই দেখেছেন কিন্তু বন্দীদের ধর্মে এত বিশ্বাস আগে কখনও দেখেননি।

গোপন কাজ বলে বাইরের কোন মোল্লাকে লাগান সম্ভব হল না।

বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে রাজপুরুষ তাঁর একজন বিশ্বস্ত রক্ষীকে সাদা আলখাল্লা ও সাদা পাগড়ী পরে মোল্লা সেজে পেশোয়ারী দুজনের সামনে হাজির হতে বললেন।

নতুন আমদানী করা মোল্লা মুখে একটা পবিত্র ভাব এনে তাদের কাছে এল, কিন্তু সময়োপযোগী প্রার্থনার পবিত্র বাক্যের পরিবর্তে দীর্ঘ দিনের অভ্যাস অনুযায়ী এবং নিজেদেরও অবাক করে দিয়ে আজে বাজে কথা অনর্গল বলে চলল, ফলে পেশোয়ারীরা সহজেই তাকে চিনে ফেলল।

রক্ষীর ভুল কাজ সমস্ত কিছু পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিল। সংস্কার অনুযায়ী পাপ ক্ষয় হতে না দেখে এবং শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রতারিত হওয়ার জন্য

বন্দী দুজন আরও জোরে চীৎকার সুরু করল এবং কারাগারগুলো থেকে অনেকটা ভূমিকম্পের গর্জনের মত চাপা উত্তর এল।

ব্যাপারটা আর একবার রাজপুরুষকে জানান হল।

তিনি দাঁত কড়মড় করে উঠলেন ও মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, অনেকটা প্রত্যুষের আলোর ফ্যাকাসে রেখার মত।

সময় চলে যাচ্ছে।

সকাল এগিয়ে আসছে।

সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হতে চলেছে।

প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ভয়ের তাড়নায় মরিয়া হয়ে রাজপুরুষ শেষ চেষ্টা করতে ইচ্ছা করলেন।

তিনি হুকুম দিলেন তৎক্ষণাৎ শিঙ্গা ফুঁকে, ঢাক বাজিয়ে, ঢালের খটখট শব্দ তুলে এবং যতদূর সম্ভব চেঁচিয়ে বন্দীদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হোক এবং বিপদসংকেত জানান হোক।

এই তুমুল কোলাহলের মধ্যে পেশোয়ারীদের ধরে ফেলা হবে—তাদের কান্নার শব্দ সাধারণ চীৎকারে ডুবে যাবে—তাদের মুখে কাপড় দিয়ে বন্ধ করে তাদের বেঁধে ফেলা হবে এবং চারজন রক্ষীর পাহারায় দক্ষিণের ফটক দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চাপিয়ে পাচার করা হবে।

পলাতকদের অনুসন্ধান উত্তরের ফটকের দিকে করা হবে।

সব কিছুই করা হল।

শিঙ্গা ভোঁ করে উঠল, ঢাক বেজে উঠল, মশাল জ্বালানো হল এবং "ধর ধর," বলে চীৎকার উঠল।

মুক্ত তরবারি ও খাড়া গোঁফ নিয়ে সাদা ঘোড়ায় চেপে রাজপুরুষ মশালের আলোয় এধার ওধারে ছোটাছুটি সুরু করলেন যেন বিপদ সংকেত শুনে তিনি এইমাত্র ছুটে এসেছেন।

কর্কশকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন:

"উত্তর ফটকে ছোট!"

অনুসন্ধানী দল ছুটতে লাগল—সবার আগে আগে উন্মুক্ত তরবারি আকাশে উঁচিয়ে ছুটলেন রাজপুরুষ।

বস্তার ভিতর পেশোয়ারীদের দম বন্ধ হবার উপক্রম, এদিকে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাদের কোকান্দের দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অবিরাম দৌড়ানর পর তারা নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল ঘেরা এবং কাল কাঁটায় ভর্তি এক পরিত্যক্ত কবরখানায় এল।

পেশোয়ারীদের থলির ভিতর থেকে বার করা হল।

তারা তখনও নিশ্বাস নিচ্ছিল যদিও আস্তে আস্তে।

সকালের রোদে, সজীব বাতাসে এবং ভিস্তি ভর্তি করে পাশের সেচের নালা থেকে নিয়ে আসা জল তাদের উপর প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দেওয়ার পর প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল।

পেশোয়ারীদের জ্ঞান ফিরে এল এবং আবার তারা মানুষের কথাবার্তা বুঝবার ক্ষমতা ফিরে পেল।

তাদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলা হচ্ছিল সেগুলো ঈশ্বর নিন্দায় ভর্তি এটা সত্যি হলেও পেশোয়ারীরা বুঝতে পারল যে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং পরিত্রাণের জন্য তারা আল্লার গুণগান করতে লাগল।

তাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে তারা যেন খান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পেরিয়ে চলে যায় এবং কখনও কোকান্দে আর না আসে।

তাদের পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হল—এর অর্ধেক সীমান্ত প্রহরীদের খুশী করতে যেন ঘুঁষ দেওয়া হয়।

বাকী অর্ধেক প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল, পরে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে কোকান্দের দিকে ছুটল।

নিজেদের মুক্ত দেখে পেশোয়ারীরা প্রথমে যা করল তা হচ্ছে নিজেদের পরিষ্কার করে নিল নামাজের জন্য, যা এতদিন তারা কারাগারে করতে পারেনি।

পরে জামাগুলো মাটিতে বিছিয়ে নিয়ে তারা হাঁটু মুড়ে বসল বাঁদিকে উদীয়মান সূর্যকে রেখে ও পবিত্র শহর মক্কার দিকে মুখ করে।

তারা আন্তরিকভাবে অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়ল যা সেদিনের সেই রহস্যময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারই উপযোগী।

যখন তারা নামাজ শেষ করল তাদের মন তখন শান্তিতে ভরে গিয়েছে; এরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, এদের ছোট্ট মনও অল্পেই খুশী।

প্রত্যেকে পঁচিশটি করে দুজনে সমানভাবে টাকাটা ভাগ করে নিল এবং

পরিবারের সকলের জন্য লুকিয়ে রাখল, কারণ তাদের অনুপস্থিতিতে পরিবারের লোকেরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরে তারা সূর্যের উজ্জল আলোয়, গাছের সবুজ শাখা-প্রশাখার নীচে, পাখীদের কলতানের মধ্যে আনন্দ করতে করতে রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে সুরু করল, নিজেদের মধ্যে অতীতের দুর্ভোগের কথা আলোচনা করছিল; তারা বুঝতে পারছিল না কেন দেড় বছর আগে হঠাৎ তাদের ধরা হয়েছিল এবং কেনই বা সেদিন রাতে অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে হঠাৎ তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আল্লার দুর্জ্ঞেয় রহস্যে মুগ্ধ হয়ে এবং মানুষের ক্ষণভঙ্গুর ভাগ্যে বিচলিত হয়ে মাথা নাড়ান ছাড়া তাদের আর করার কিছুই ছিল না এবং শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের বিজ্ঞ ও যথেষ্ট রহস্যময় কার্যাবলী তাদের অতি সরল মনকে বিহ্বল করে তুলেছিল।

পরদিন কোন দ্বিধা না করে এবং প্রত্যেকে মাত্র দশটি মুদ্রা খুইয়ে যেটা তারা আগে থেকেই আলাদা করে রেখেছিল খান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত পার হল এবং সেইদিন সন্ধ্যায় আবার তাদের নতুন মসজিদ তৈরি করার জন্য কাজ করতে ও পাথর ভাঙ্গতে দেখা গেল।

এই ভাবে ধীরে ধীরে একটার পর একটা কাজ ছেড়ে ও ধরে তারা নিজেদের গ্রামে আবার ফিরে এল এবং তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে আবার মিলিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করল।

পরের জীবনে তাদের ভাগ্যে কি ঘটছিল আমরা জানি না, তবে এটুকু বিশ্বাস করি যে মানুষের স্বার্থ যেখানে চালবাজির চাকা ঘোরায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেখানে অসত্য তথ্যের পিষ্টন চালায় সে রকম প্রতিটি মিথ্যার বেসাতি করা কোন যাঁতা কলে তারা পিষে মারা যায়নি।

পেশোয়ারীদের চারপাশে সেদিন রাতে যে ঝড় উঠেছিল সে ঝড়, যে সরাইখানায় খোজা নাসিরুদ্দিন ও তাঁর সঙ্গী একচোখো চোর ঘুমাচ্ছিল, সেখানে এসে পৌঁছায়নি; কেবল ঢাক ও শিঙ্গার শব্দের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সেখানে জেল থেকে এসে পৌঁছেছিল এবং উত্তর ফটকের দিক থেকে মাটির উপর ঘোড়ার খটখট শব্দ ভেসে আসছিল। পরে সকাল পর্যন্ত আবার সব চুপ করে গিয়েছিল।

চাঁদ ডুবে গিয়ে নীল আভা চলে গিয়েছিল, তার জায়গায় ঊষা লগ্নের একটা ধূসর কুয়াসা চারদিক ছেয়ে ফেলেছিল, কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন তখনও মোটা বণিক ও তার টাকার থলির কথা ভাবছিলেন, ফলে একটুও চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে পারেননি।

মুদ্রা-বিনিময়কারীকে ফাঁকি দিয়ে ছ' হাজার টাকা বার করার শ'খানেক কৌশল তাঁর মাথায় এল, আবার তিনি সেগুলি বাতিল করে দিলেন। "লাভ করার একটা মিথ্যা বাজী কি ধরব?" খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। "অথবা আমি কি ভয় দেখিয়ে টাকাটা বার করব?"

হঠাৎ একটা উপায় বার করার আনন্দ তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে গেল। এটা মুদ্রা-বিনিময়কারীর থলি খোলার একটা নিশ্চিত উপায়! বিদ্যুতের একটা সাদা ঝলক খেললে যেমন হয় তেমনি সব কিছুই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সমস্ত সন্দেহ দূর হল।

এই আনন্দের বেগ এতই তীব্র ছিল যে খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে তা শহরের অন্য প্রান্তে মুদ্রা-বিনিময়কারীর বাড়ীতে এসে পৌঁছেছিল। বণিক কম্বলের নীচে একটা টাকা টস করছিলেন, এবং জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ও পুরু ঠোঁট চাটতে চাটতে বাঁদিকে পেটের নীচে যেখানে থলিটা সব সময় বাঁধা থাকত সেই জায়গাটা ধরেছিলেন।

"উফ!" স্ত্রীকে আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে তিনি বললেন। "কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখলাম যে, একটা বড় মই থেকে পা পিছলে দানা মাখান খড় ভর্তি একটা মাটির গামলায় পড়ে গেলাম আর ছাই রং-এর একটা গাধা টাকার থলি ও অন্যান্য সব কিছু সমেত আমাকে খেয়ে ফেলল। পরে আমাকে মলের সঙ্গে বার করে দিল কিন্তু টাকার থলিটা তার পেটেই রয়ে গেল।"

"চুপ কর, আমাকে ঘুমাতে দাও," তাঁর স্ত্রী তাড়া দিয়ে বললেন, মনে মনে ভাবলেন: "সুন্দর কামিলবেক অবশ্য এ ধনের অর্থহীন নির্বোধ চিন্তা করে না।" স্বপ্নিল ভঙ্গিতে মৃদু হেসে জানালার দিকে চেয়ে রইলেন, প্রত্যুষের রঙ্গীন আভা আর একটি দিনের আগমন বার্তা জানাচ্ছিল; সাবধান হওয়ার আর একটি দিন—তার, মুদ্রা-বিমিয়কারীর এবং সুন্দর কামিলবেকের।

দ্বাদশ অধ্যায়

কিন্তু সেদিন সবচেয়ে বেশি সাবধান হওয়া বোধ হয় খোজা নাসিরুদ্দিনের ভাগ্যে ছিল।

একচোখোকে সরাইখানায় রেখে প্রত্যুষ উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাজারের যে অংশে পুরানো কাপড়-চোপড় বিক্রী হয় সেখানে এলেন। সেখানে সস্তায় একটা ছেঁড়া কার্পেট, একটা লাউ-খোলা, একটা পুরানো চীনা বই, একটা আয়না, একটা কাঠের মালা এবং এটা সেটা আরও অনেক কিছু। পরে তিনি সাই নদীর তীর ধরে গলা-কাটা সেতুর কাছে এলেন।

সেতুটার এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ হচ্ছে আগের দিনে প্রথা ছিল যে যাদের ফাঁসি দেওয়া হত তাদের মুণ্ডু বড় বড় খুঁটিতে বিঁধে এখানে দেখাবার জন্য রাখা হত; কিন্তু এখন খানের আদেশে খুঁটিগুলো প্রধান প্রধান চকে পোঁতা হয়েছে যাতে রাজপ্রাসাদ থেকে সেগুলো দেখা যায়; এদিকে সেতুটা তার পুরোনো দিনের নাম বয়ে বেড়ালেও এখন ফকির, দরবেশ ও ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষীদের দখলে গিয়ে পড়েছে।

তাদের প্রায় জন পঞ্চাশেক সব সময়েই সেখানে বসে থাকত—এই জ্ঞানী ঋষিরা সুপ্ত ভাগ্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারতেন। যাঁরা বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় তাঁরা দেয়ালে খোদাই করা গুহায় এসে বসতেন, কিন্তু যাঁরা এখনও বেশ খ্যাতি পাননি তাঁরা গুহার বাইরে কার্পেটের উপর বসতেন আর যাঁরা একেবারে নতুন তাঁরা যেখানে পারতেন বসতেন। প্রত্যেকটি জ্যোতিষীর সামনে পড়ে ছিল যাদুর কাজে ব্যবহৃত শুকনো জিনিসপত্র, যথা কড়াইদানা, ইঁদুরের হাড়, যাদু-করা গুল-কুনা নদীর জল ভর্তি লাউ-এর কমণ্ডলু, কচ্ছপের খোলা, তিব্বতীয় গাছের শিকড়, এবং আরও অনেক কিছু যেগুলো ভবিতব্যের গহন গভীর অন্ধকার অনু-সন্ধান করতে লাগে। যারা একটু বিজ্ঞ তাদের সামনে ছিল বই—মোটা এবং বহুদিনের পুরোনো হলুদ পাতায় ভর্তি, ভিতরে ছিল অসংখ্য রহস্যময় চিহ্ন যেগুলো অনভ্যস্ত মনকে ভয় ও শিহরণে ভরিয়ে তুলত। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিতে প্রধান জ্যোতিষীকে একটা নরমুণ্ডু রাখতে দেওয়া হয়েছিল যেটা ছিল অন্যদের ঈর্ষার কারণ।

জ্যোতিষীরা তাদের কলাকৌশল ও বৃত্তি অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। কেউ বিয়ে ও তালাক নিয়ে কাজ করত, কেউ বা আশু মৃত্যু ও তা থেকে উদ্ভূত

উত্তরাধিকার নিয়ে, অন্যেরা প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে ; কারও এলাকা ছিল ব্যবসা, কেউ বেছে নিয়েছিল ভ্রমণ, কেউবা আবার রোগ বিশেষজ্ঞ ছিল। অল্প আয় নিয়ে কেউ অবশ্য অভিযোগ করত না, কারণ গলা-কাটা সেতু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য থাকত এবং সন্ধ্যাবেলায় জ্যোতিষীদের টাকার থলি তামার পয়সা ও রূপোর ছোট ছোট মুদ্রায় ভরে উঠত।

খোজা নাসিরুদ্দিন বড় গুহাটার দিকে এগিয়ে গেলেন যেটা ছিল প্রধান জ্যোতিষীর অধিকারে—একজন দুর্বল বৃদ্ধ, চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল ও এতই হাড় জিরজিরে যে কোণের দিকে জামা বেরিয়ে ঝুলছিল এবং সামনের কার্পেটে যে নরমুণ্ডটা বসিয়ে রাখা হয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন তাঁর ধড় থেকে সেটা বেরিয়ে এসেছে। বিনয়ে সেলাম জানিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় তিনি তাঁর কার্পেট পাততে পারবেন।

"কি ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে তুমি ব্যবসা করতে চাও?" দুর্বল কণ্ঠে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

অন্যান্য গুহা থেকে জ্যোতিষীরা কথাবার্তা শোনার জন্য মাথা বার করলেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল বৈরী-সূচক।

"আর একজন?" বাঁ দিকে একজন মোটা জ্যোতিষী বললেন।

"এই সেতুর উপর দেখছি এবার আমরা অনেক কজন," সিল্কের কাপড়ের মত মুখের দ্বিতীয় আর একজন বললেন যার মুখের উপরের পাটি থেকে দাঁতগুলো বেরিয়ে নীচের পাটি পর্যন্ত এসেছে।

"গতকাল আমি এমন কি দশ টাকাও রোজগার করতে পারিনি," তৃতীয়জন অভিযোগ করলেন।

"এদিকে অন্যেরা দলে দলে ঢুকে পড়ছে! কোথা থেকে যে এরা আসে!" চতুর্থ জন জুড়লেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছ থেকে অন্য কোন ধরনের অভ্যর্থনা আশা করেননি এবং সেইজন্য তাঁদের খুশি করার মত কথা আগেই থেকে তৈরি করে রেখেছিলেন।

"হে জ্ঞানী ভাগ্যনিয়ন্তাগণ, আমার কাছ থেকে কোন প্রতিযোগিতার ভয় করবেন না। আমার ভবিষ্যদ্বাণী অন্য ধরনের যা ব্যবসা বা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে নয়, এমন কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়েও নয়। আমি কেবল চুরি এবং চোরাই

মাল উদ্ধার নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি এবং এই বৃত্তিতে আমি বলব আমার সমতুল্য আর কেউ নেই।"

"চুরি?" প্রধান জ্যোতিষী বললেন ও প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন; মনে হল যেন তাঁর জামার নীচের হাড়গুলো খট খট করে হেসে উঠল। "চুরি আর চোরাই মাল উদ্ধার, তুমি বলছ? তাহলে যে কোন এক জায়গায় বসে পড়—যাইহোক তুমি এক পয়সাও রোজগার করতে পারবে না।"

"এক পয়সাও না!" অন্যেরা তাদের প্রধানের হাড়ের শব্দ তুলে হাসার অনুকরণ করে এক সঙ্গে বলে উঠল।

"এই বৃত্তি নিয়ে কোকান্দে তোমার করার কিছু নেই," বৃদ্ধ বললেন। "কোকান্দে চৌর্যবৃত্তি শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা হয়েছে। তুমি যদি অন্য কোথাও যাও, যেমন হেরাট বা খোরেশ্‌মে, তবে ভাল হয়।"

"আঃ, চলে যেতে……।" খোজা নাসিরুদ্দিন করুণ সুরে বললেন। "আমি যাবার টাকা কোথায় পাব, আমার পকেটে মাত্র আট টাকা পড়ে আছে।"

হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পাশে সরে এলেন এবং পাথরের নুড়ির উপর কার্পেট বিছালেন।

ইতিমধ্যে বাজার কোলাহলে ভরে উঠেছে। দোকান খুলেছে, দু পাশের দোকানের সারিগুলোতে গুঞ্জন উঠেছে, চকগুলো জনস্রোতে ভরে গিয়েছে। একের পর এক লোক সেতুর কাছে আসছে—বণিক, শিল্পী, নিঃসন্তান মেয়েরা, ধনী বিধবারা নতুন স্বামীর সন্ধানে, বিরহী প্রেমিকের দল এবং অন্যান্য অলস তরুণেরা যারা তাদের কাজ কর্ম আইনানুগ করতে চাইছিল।

কাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গেল! ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে সর্বদাই এক দুর্ভেদ্য রহস্য, কিন্তু এখানে এই সেতুর উপর প্রকট নগ্ন হয়ে দেখা দিল; এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে সাহসী জ্যোতিষীদের শ্যেন দৃষ্টি প্রবেশ করতে পারেনি। ভাগ্য, যাকে আমরা নিষ্ঠুর বলি, অনমনীয় ও অবশ্যম্ভাবী এবং এই সেতুর উপর অত্যন্ত নিকৃষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিল ও প্রতিদিন অতি নিষ্ঠুরতম অপব্যবহারের সামগ্রী হল। এটা বললে ঠিক বলা হবে যে সর্বশক্তিমান রাণী হওয়ার পরিবর্তে ভাগ্য এখানে ঠাণ্ডা রক্ত বিশিষ্ট প্রশ্নকারীদের শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে যাদের দলের পাণ্ডা হচ্ছে পুরোনো হাড়ের থলিটা, নরমুণ্ডর গর্বিত অধিকারী।

"আমি কি আমার নতুন বিয়েতে সুখী হব?" নির্দিষ্ট বয়সের একজন

বিধবা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে উত্তর শোনবার জন্য প্রায় দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

"হ্যাঁ, হবে যদি কোন কাল রংয়ের বাজপাখী সকালবেলায় তোমার জানালায় এসে না বসে," জ্যোতিষী উত্তর দিলেন। "ইঁদুরের এঁঠো করে দেওয়া পাত্র থেকে সাবধানে থাকবে এবং তা থেকে কখনও খাবে না।"

কাল রংয়ের বাজপাখী সম্বন্ধে একটা সন্দেহ নিয়ে বিধবা হয়তো চলে যাবে, যে মিথ্যা সন্দেহ তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবে এবং ছোট জন্তু ইঁদুরটাকে নিয়ে হয়তো একদম মাথা ঘামাবে না। তবুও এদের ভিতরই লুকিয়ে আছে তাদের দাম্পত্য-সুখ নষ্ট হওয়ার আশংকা; যদি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করতে কোন দিন সে আসে তবে জ্যোতিষী অতি সহজেই সেদিন ব্যাখ্যা করতে পারবে।

"সমরখন্দের একজন লোক আমাকে আঠার গাঁট পশম বিক্রী করতে চায়। এটা কি লাভজনক ব্যবসা হবে?" একজন বণিক জানতে চাইলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁর কড়াই দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ইঁদুরের হাড়গুলো গুনতে বসল এবং পরে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল:

"কিনতে পার, কিন্তু সাবধান যখন দাম দেবে তখন যেন একশ হাতের মধ্যে কোন টাক মাথার লোক না থাকে।"

টাক মাথার লোকের অশুভ প্রভাব কিভাবে এড়ান যায় চিন্তা করতে করতে বণিক চলে গেল; টাক-মাথার লোককে চেনা খুব সহজ কাজ নয়, কারণ পাগড়ী ও টুপী পরা লোকে সারা বাজার ছেয়ে আছে।

সমস্ত জ্যোতিষীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আসন ছিল নরমুণ্ডর অধিকারীর। নিজের বৃত্তিতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড ও অভিজ্ঞ। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ নরমুণ্ড; ছোঁয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর রক্তহীন ঠোঁট দুটো নাড়তেন, কি মনোযোগের সংগে তিনি শুকনো সাপের চামড়ার উপর ফুঁ দিতেন, কাছিমের খোলাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করতেন এবং গুল-কুনার ঝরণার যাদু করা জল ভর্তি লাউয়ের খোল শুঁকে দেখতেন। তারপর আসত নরমুণ্ডের পালা। ভুরু কুঁচকে ও অস্পষ্ট ভাষায় বিড়বিড় করে জ্যোতিষী তাঁর পাকানো হাড় ভর্তি হাত দুটো বাড়িয়ে দিতেন এবং ঠিক পরেই আচমকা হাত দুটো টেনে নিতেন যেন আগুনে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেন। আবার হাত বাড়িয়ে হঠাৎ টেনে নিতেন। সবশেষে তিনি নরমুণ্ডটা তুলে নিয়ে কানের কাছে নিয়ে আসতেন।

দুটো মুণ্ড ভীত খদ্দেরদের দিকে চেয়ে থাকত—একটা শুধু হাড়, অন্যটা চামড়ায় ঢাকা। দুটো খুলি যেন নিজেদের মধ্যে সংলাপ সুরু করেছিল, হাড়েরটা যেন ফিসফিস করছিল আর চামড়ারটা গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছিল। এর পর আর কার পয়সা দেবার মত সাহস ছিল? হাতটা নিজের ইচ্ছামত থলি থেকে রৌপ্য মুদ্রা বার করে নিচ্ছিল।

একটা দিন কেটে গেল, পরে আর একটা দিন, তার পরে আর একটা। চোরাই মাল উদ্ধার করার জন্য কেউ খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে এল না এবং তাঁর চীনা বই থেকে আউড়ানর বা লাউয়ের কমণ্ডলু শুঁকবার সুযোগ এল না।

সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি কার্পেট তুলতেন চারদিক হতে জ্যোতিষীরা ঠাট্টা করে উঠত।

"আজ আবার সে এক পয়সাও পায়নি!"

"তোমার সেই আট টাকার আর কত বাকী আছে ওহে চোরের জ্যোতিষী?"

"ও আজ রাতে কি খাবে, ঐ জ্যোতিষীটা, যার সমান আর একটাও নেই?"

হতাশ হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন চুপ করে রইলেন।

চতুর্থ দিন সারা শহর কেঁপে উঠল এবং একটা সাংঘাতিক চুরির খবর সত্য বলে প্রমাণিত হল, যে ধরনের চুরির খবর দেখা যায়নি বা আগের দিনে যখন চোরদের রাজত্ব ছিল তখনও ঘটতে শোনা যায়নি। আগামী বসন্তের ঘোড়-দৌড়ের আশায় মুদ্রা-বিনিময়কারী যে ঘোড়া এনে যত্ন করছিল তাদের দুটো আরবী ঘোড়া চুরি গিয়েছে রাতে তার আস্তাবল থেকে।

সকাল বেলায় চুরির খবর ভয়ে ফিসফিসানির মধ্যে এক কান থেকে আর এক কানে ছড়িয়ে পড়ল; দুপুরের মধ্যে লোকেরা জোরে জোরেই বলতে লাগল এবং সন্ধ্যার দিকে ঢাকের ও শিঙ্গার শব্দের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, এই উদ্ধত চোরকে ধরিয়ে দেবার হদিশ যে দিতে পারবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেতুর পাশে জ্যোতিষীদের মধ্যেও একটা আলোড়ন দেখা দিল। সকলের দৃষ্টি খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে নিবদ্ধ হল।

"পাঁচশো টাকা রোজগারে জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও!"

"টাকাটা বাগাও, ইতস্ততঃ করছ কেন?"

"এত তুচ্ছ পুরস্কার ও পরোয়া করে না, ও পাঁচ হাজার টাকা আশা করে।"

এইসব ঠাট্টা বিদ্রূপ খোজা নাসিরুদ্দিনের দম বন্ধ করে আনল এবং তাঁকে মনে মনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল।

তাঁর সাফল্যের সময় এসেছে ভেবে তিনি সমস্ত রাগ দমন করলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইতিমধ্যে শহরে উত্তেজনা বেশ বেড়ে চলল।

শোকে মুদ্রা-বিনিময়কারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও বিছানা নিলেন।

পেশোয়ারের বন্দী দুজনের রহস্যজনক ভাবে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সেদিন রাতে খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর রাজপুরুষ মনে মনে নিদারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেও স্বাস্থ্যের দিকে তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। সেদিনের চুরির পর তিনি আর একটি এবং আরও বেদনাদায়ক সাক্ষাৎকারের সম্মুখীন হলেন। গোলমালের আশংকায় রাজপুরুষ বজ্র-বিদ্যুৎ ভরা মেঘের মত গম্ভীর হলেন (যার ভিতর দিয়ে অকস্মাৎ সূর্যের ছটা এসে পড়ার মত মাঝে মাঝে একটা গোপন হাসি বেরিয়ে আসছিল যার উৎস ছিল আগামী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার চিন্তা যেখানে তাঁর তুর্কী ঘোড়ার আর কোন বিপজ্জনক আরবী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না)।

খান সেদিন রাতে রাজপুরুষকে তাঁর শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন। শ্রোতা ছিলেন কেবল একজন, সমস্ত কথা একজনই বলছিলেন, এদিকে অন্যজনের এই সাক্ষাৎকারে ভূমিকা ছিল শুধু সেলাম করা, গোঁফ মোচড়ানো, চোখ ঘোরানো, আকাশে হাত তোলা এবং কথার পরিবর্তে অন্যান্য শরীর আন্দোলনে সীমাবদ্ধ (যা না হলে মানব সন্তানগণ দাম্পত্য প্রণয়ে তো বটেই, রাজকর্মেও অসুবিধা বোধ করত)।

খানের সামনে থেকে হলুদ ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে রাজপুরুষ বেরিয়ে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বড় ও মাঝারি সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন।

তাদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন তাঁর প্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের চেয়েও স্বল্প ছিল।

বড় ও মাঝারি সেনাপতিরা আবার ছোট ছোট সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের বক্তৃতা ছিল কয়েকটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে।

নীচের স্তরের লোকেরা অর্থাৎ সাধারণ প্রহরী ও গুপ্তচরদের কোন বাক্যে বিব্রত হতে হল না কেবল কয়েকটা তাড়া গেল।

দীর্ঘ দিন ধরে কোকান্দে এমন একটা অশান্তিপূর্ণ রাতের কথা জানা ছিল না। প্রায় সমস্ত রাস্তা, চক ও গলিগুলিতে অস্ত্রের ঘড়ঘড় শব্দ ও গর্জন শোনা গেল এবং রাতের শীতল চাঁদের আলোয় যখন প্রহরীরা চোর খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন বর্শা, ঢাল এবং কৃপাণগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। দুর্গ প্রাকারগুলোয় মশালের আলো পরিষ্কার আকাশে দাউ দাউ করে আগুনের শিখা তুলল এবং একটা ধোঁয়াটে আগুনের আলো শহর ভরে তুলল। রাতের প্রহরীরা বেদনাদায়ক হাঁক আদান-প্রদান করছিল। শ' খানেক গুপ্তচর অন্ধকার কোণে সেতুর নীচে, বাগানের ভাঙ্গা দেওয়ালে, নোংরা জায়গায় ও কবরখানাগুলিতে লুকিয়ে রইল।

বড় ও মাঝারি সেনাপতিরা, ছোট সেনাপতি ও প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত সরাইখানা ও পান্থ আবাসগুলিতে তল্লাসী চালালেন। যে সরাইখানায় খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা সেখানেও এলেন ও তাঁর মুখের উপর জ্বলন্ত মশালের আলো ফেললেন। তিনি চোখ খুললেন না, যদিও বুঝতে পারলেন যে তাঁর দাড়িতে পটপট শব্দ হচ্ছে এবং চুলের পোড়া গন্ধ পেলেন।

একচোখো চোর সে রাতে তাঁর সঙ্গে ছিল না।

পরদিন সকাল শহরে কোন শান্তি আনতে পারল না।

দুপুরের কাছাকাছি রাজপুরুষ ও তাঁর দলবল গলাকাটা সেতুর কাছে হাজির হলেন।

তাঁর চোখ দুটো জলজ্বল করছিল, গোঁফ দুলে উঠল এবং কণ্ঠস্বর মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে দিল।

তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন অশ্বারোহী সৈন্য দলের মাঝখান থেকে লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে এল—একজন কুকুরের মত একটা ঘোড়ায় চেপে অন্যজন একটা ধূসর রংয়ের ঘোড়ায় চেপে। প্রথম জন শূন্যে বেত আস্ফালন করে ও ঘোড়ার জিনের উপর কাত হয়ে বসে তীব্র গতিতে লাফাতে লাফাতে সেতুর উপর দিয়ে শব্দ তুলে ছুটে গেল; একটা গরম বাতাসের ঢেউ ঘোড়ার ঘামের সঙ্গে মিশে জ্যোতিষীদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। দ্বিতীয় জন নদীর নীচের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে অগভীর সাই নদী পার হল চারপাশে জল ছিটিয়ে, পরে এক লাফে নদীর অন্য পারে উঠে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হল।

রাজপুরুষ তাঁর হাত অন্য আর একদিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং পদাতিক প্রহরীর দল হুড়োহুড়ি করতে করতে বর্শা, ঢাল ও কৃপাণের ঝনঝন শব্দের মধ্যে সেদিকে ছুটল।

পরে রাজপুরুষ বৃদ্ধ প্রধান জ্যোতিষীর দিকে পা বাড়ালেন ও তাঁর সঙ্গে গোপন কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না, তবে প্রতিটি কথাই অনুমান করছিলেন।

তাঁরা অবশ্য আলোচনা করছিলেন কি করে হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া দুটো উদ্ধার করা যায়। বৃদ্ধ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে মাথার খুলির ভিতরের গুপ্ত শক্তি সমেত যত রকম অলৌকিক শক্তি আছে সবগুলিই তিনি কাজে লাগাবেন। রাজপুরুষ নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন ও গোঁফে তা দিতে লাগলেন তিনি এখানে অর্থহীন রূপকথার গল্প শুনতে আসেননি, তিনি কাজ চান!

ফলে বৃদ্ধের নিয়ন্ত্রণে যে সব পার্থিব শক্তি ছিল তাদের সাহায্য চাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। সেইমত জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করা হল আগের দিন অথবা তার আগের দিন তাদের মধ্যে কে ভাগ্য গণনা করেছেন এবং খদ্দেরদের মধ্যে কেউ সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছেন কিনা যাতে চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেকে এবং সকলেই উত্তর দিতেন যে তাঁরা সে ধরনের কিছু লক্ষ্য করেননি।

রাজপুরুষ খুশী হলেন না এবং গোঁফ পাকাতে লাগলেন। তাঁর চকচকে দৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে ছিল গুরুতর প্রহার, বেত্রাঘাত ও শহর থেকে নির্বাসন।

জ্যোতিষীরা ভয়ে ম্লান হয়ে উঠলেন। ভাগ্য এতদিন ধরে তাঁদের হাতে নির্ধারিত হচ্ছিল, আজ হঠাৎ তাঁদের সামনে নতুন ও ভয়াবহ রূপে দেখা দিল এবং আজ যেন তাঁদের এই পরাজয়ে দীর্ঘ দিনের প্রতিহিংসায় আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। শুধু কড়াইদানা ও ইঁদুরের হাড়গুলো নয়, এমনকি মাথার খুলিটাও যেন শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

এবার উত্তর দেবার পালা এল খোজা নাসিরুদ্দিনের।

তিনি সকলের মত একই উত্তর দিলেন যে তিনি কিছু দেখেননি এবং সন্দেহজনক কিছু শোনেননি।

রাজপুরুষ রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন—আবার কিছু না !

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল গুহার উল্টো দিক থেকে (খোজা নাসিরুদ্দিন যেমন অনুমান করেছিলেন সেই রকম), হিংসায় ভরা নাকি-স্বরে কণ্ঠস্বর :

"তুমি বলনি যে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে তোমার সমতুল্য আর কেউ নেই !"

'উদ্ধার' কথাটা শুনে রাজপুরুষের কান যেন জ্বালা করে উঠল।

"কেন তুমি চুপ করে ছিলে, জ্যোতিষী ?" তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর কাঁচের মত চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "বল !" তাঁর গুমরে-ওঠা রাগ যেন বাইরে যাবার একটা পথ খুঁজছিল। "তোমাদের অভিশপ্ত বাসা আমি টান মেরে ভেঙ্গে ফেলব, গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেব !" তিনি গর্জন করে উঠলেন। "প্রহরী, ওকে ধর ! ঐ জ্যোতিষীটাকে ধর, ঐ বদমাসটাকে, আর ওকে বেত মার যতক্ষণ না ও বলবে চুরি হওয়া ঘোড়া দুটো কোথায় আছে। নতুবা ওকে সকলের সামনে স্বীকার করতে হবে যে ও একটা নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী ! বেত লাগাও !"

রক্ষীরা খোজা নাসিরুদ্দিনের জামা ছিঁড়ে ফেলল। বেতটা ভিজিয়ে নিতে, দুজন সেতুর দিকে ছুটল। দেরী করা বিপজ্জনক। খোজা নাসিরুদ্দিন বিনয়ের সঙ্গে রাজপুরুষকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

"আপনার অযোগ্য ক্রীতদাস জাঁহাপনার পায়ে একটা আরজি রাখছে শোনবার জন্য। আমি হারিয়ে যাওয়া জিনিসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করি এবং চুরি যাওয়া ঘোড়া উদ্ধার করতে আমি পারব।"

"পারবে ? তবে এখনও কেন করনি ?"

"হে মহান প্রভু, আমার ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে যাঁর চুরি গিয়েছে তাঁকেই আমাকে ডাকতে হবে নইলে আমার গণনায় কোন ফল হবে না।"

"ঘোড়া দুটো উদ্ধার করতে তুমি কত সময় নেবে ?"

"যদি আজ সন্ধ্যার আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আমার কাছে আসেন তবে মাত্র একটি রাত লাগবে।"

এই কথায় গণক মহলে একটা আলোড়ন ও ফিসফিস শব্দ শোনা গেল।

হাড় বার করা বৃদ্ধ ইতিমধ্যেই তাঁর মুখে নির্বাসনের আভাস পেয়েছিলেন এখন তাঁর মুখ আশায় ভরে উঠল।

রাগে হতবুদ্ধি হয়ে রাজপুরুষ খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

"তুমি আমার মুখের সামনে মিথ্যা বলতে সাহস পাচ্ছ! আমি তোমার সব ফন্দী ও বদমায়েসী জানি। আমি চাইছি এই সেতুর উপরেই তোমাকে শাস্তি দিতে যাতে সরকারী পয়সায় তোমার পিছনে আর গুপ্তচর রাখতে না হয়!"

"আমার কথায় কোন মিথ্যা নেই, হে তেজস্বী, মহামতি প্রভু!"

"ঠিক আছে দেখা যাবে। কিন্তু, জ্যোতিষী, তুমি যদি মিথ্যা বলে থাক তবে তোমার জন্ম না নেওয়াই ভাল ছিল। মুদ্রা-বিনিময়কারী রহিমবাইকে এখানে ডেকে নিয়ে এস!"

"রহিমবাই অসুস্থ!" মাঝারি সেনাপতিদের একজন, যিনি রাজপুরুষের পাশে পাশে ঘুরছিলেন, অত্যন্ত নম্র স্বরে বললেন।

"আমি অসুস্থ নই?" রাজপুরুষ ফেটে পড়লেন। "আমি অসুস্থ নই? গত দু দিন আমি চোখের পাতা বন্ধ করিনি, অভিশপ্ত ঘোড়া দুটোকে খুঁজে বেরিয়েছি। সে বিছানায় শুয়ে থাকবে আর আমি তার কাজ করব! ডেকে নিয়ে এস! খাটিয়ায় করে ওকে এখানে নিয়ে এস!"

দুজন মাঝারি ও একজন বড় সেনাপতির সঙ্গে আটজন প্রহরী বণিকের বাড়ির দিকে ছুটল।

রাজপুরুষ উচ্চতায় ছিলেন মাঝারি ধরনের—এমন কি মাঝারিও কোন রকমে; ফলে তাঁর আকৃতি ও তাঁর উচ্চপদের মধ্যে একটা বৈষম্য থেকে গিয়েছিল। প্রকৃতির এই শোচনীয় ব্যর্থতা দূর করার জন্য তিনি সর্বদা উঁচু ও সরু গোড়ালির জুতো পরতেন, ফলে তাঁর উচ্চতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেতুর উপর তিনি এদিক ওদিক হাঁটতে সুরু করলেন, তাঁর জুতোর গোড়ালি পাথরের নুড়ির উপর শব্দ তুলল, তিনি থামলেন, পাথরের দেওয়ালের দিকে ডান হাত তুলে হেললেন, পরে রাজকীয় ভঙ্গিতে বাঁ হাত তুলে গোঁফে মোচড় দিলেন। একটা সন্ত্রস্ত অবস্থা চারদিকে বিরাজ করছিল এবং আস্তে আস্তে তাঁর রাগও কমে এল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর রাজপুরুষ আর মৌনী থাকলেন না এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর প্রশ্নাতীত প্রভুত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন জেনে তৃপ্তি বোধ করলেন। "অধীনস্থ কর্মচারীদের মনে ভয় ও শিহরণ আনা কি প্রধানের

কর্তব্য নয় ?" তিনি মনে মনে আনন্দ পেলেন। "প্রভুত্ব অর্জন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাছবিচার করে প্রত্যেককে চাবুক মারা, শুধু দেখতে হবে দণ্ডবিধানের সঙ্গে যেন পরিবেশ অনুযায়ী উপদেশ দেওয়া হয় নতুবা এর হিতকর ফল নষ্ট হয়ে যাবে।" এই সব চিন্তা রাজপুরুষকে শান্ত করল—তিনি মনে করলেন যেন তিনি ঐশ্বরিক জ্ঞানের শক্তিমান পাখা দুটোরও উপরে উঠেছেন, তারকা-অধ্যুষিত উচ্চতায় যেখান থেকে সমস্ত কিছুই দেখাচ্ছিল ছোট ও অতি তুচ্ছ, যেখান থেকে নীচের দিকে চাইতে হয় করুণার সঙ্গে ক্রোধ নিয়ে নয় ; যে দৃষ্টি নিয়ে তিনি বৃদ্ধ গণকের দিকে চেয়েছিলেন তা ঠিক দয়ার দৃষ্টি না হলেও মনে হচ্ছিল যেন কিছুটা আধ্যাত্মিক গুণ লাভ করেছে এবং তাঁকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তাঁকে ভস্ম না করে বা কোন আঘাত না দিয়ে। "বেত্রাহত লোকের অপরাধের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে," তিনি তাঁর চিন্তার পরিধি আরও বাড়িয়ে চললেন, "কোতোয়াল-দের প্রধানের চিন্তাধারার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, এমন কি যে অপরাধের জন্য সে শাস্তি পেল সেটা যদি অপরাধ নাও হয় তবে সে নিশ্চয়ই অন্য কোন অপরাধে অপরাধী।" এই শেষ চিন্তার গভীরতা ও গূঢ় অর্থে তাঁর দম বন্ধ হয়ে এল ; কোন মরণশীল মানুষ এর উপরে ওঠবার আশা করতে পারে না, কারণ তার অপর পারে হচ্ছে স্বর্গীয় জ্ঞানের রাজত্ব ; তিনি প্রায় এর সীমানা পর্যন্ত উঠে এসেছেন এবং তাঁর মানসিক দৃষ্টির সামনে প্রসারিত চোখ-ধাঁধানো আলোর অসীম গভীরতায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

মুদ্রা-বিনিময়কারীর বাড়ী খুব বেশি দূরে ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই খাটিয়া ফিরে এল।

সিল্কের পর্দার নীচে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে মুদ্রা-বিনিময়কারী বেরিয়ে এলেন, বিবর্ণ দশা, মুখটা ফোলা, উস্কোখুস্কো দাড়িতে বালিশের তুলোর টুকরো লেগে ছিল। বুকে হাত দিয়ে ও যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তিনি রাজপুরুষকে সেলাম জানালেও দুর্বল কিন্তু বিদ্রূপের সুরে বললেন :

"সেলাম, মহান ও সর্বশক্তিমান কামিলবেক ! কি জন্য তিনি তাঁর এই অধম ক্রীতদাসকে তার রোগশয্যা থেকে তুলে এনেছেন ? ক্রীতদাস কি এতই নীচু ও অধম যে অবাধ্য চোরদের হাত থেকে রক্ষা পাবারও আশা করে না ?"

"এই কারণেই আমি আপনাকে ডেকেছি রহিমবাই—চুরি যাওয়া ঘোড়া

উদ্ধারে আমরা কতটা সচেষ্ট সেটা প্রমাণ করার জন্য। আমি যথেষ্ট দুঃখিত ও বিচলিত।"

"কি জন্য মহান কামিলবেক বিচলিত? এবারের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর তুর্কী ঘোড়া কি পুরস্কার পেতে নিশ্চিত নয়?"

এটা সোজা তাঁর মুখে যেন খোলাখুলি একটা আঘাত।

রাজপুরুষ বিবর্ণ হয়ে উঠলেন।

"হারিয়ে যাওযার কষ্ট ও তার ফলে অসুখের জন্য রহিমবাই মিথ্যা কারণকে সত্যি বলে মনে করছেন," তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন। "এখানে আপনার সামনে একজন জ্যোতিষী আছেন যিনি তাঁর নিজের কথানুযায়ী অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী এবং হারানো ঘোড়া উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

"জোতিষী! সেই জন্যেই কি আপনি আমার মত একজন দুর্বল লোককে বিছানা থেকে তুলে এনেছেন? না, আমার মনিবই তাঁর নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করুন ও আমাকে যেতে দিন।"

এই বলে তিনি যাবার জন্য ফিরলেন।

রাজপুরুষ উদ্ধতভাবে বললেন:

"এই শহরে একমাত্র আমিই হুকুম দিয়ে থাকি! সুযোগ্য রহিমবাই যেন দয়া করে জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন।"

কেমন করে লোককে বাধ্য করা যায় রাজপুরুষ জানতেন এবং তিনি তাই করলেন। বণিক মুখ বিকৃত করলেন কিন্তু যে রকম আদেশ পেয়েছিলেন সেইমত খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না, জ্যোতিষী, এক কপর্দকও না। আমি কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী এসেছি। দুটো পুরোপুরি আরবী ঘোড়া আস্তাবল থেকে হারিয়ে গিয়েছে।"

"একটা সাদা, অন্যটা কাল," চীনদেশীয় বইটা খুলে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"সারা শহর আপনার বাক্যের সত্যতা যাচাই করতে পারে, হে তীক্ষ্ণদৃষ্টি জ্যোতিষী", মুদ্রা-বিনিময়কারী উপহাস করে বললেন। "যেদিন আরব থেকে আসে সেদিনই অনেকে আমার ঘোড়ার প্রশংসা করেছিল।"

"সাদা ঘোড়াটার ঘাড়ের লোমের নীচে পশমের সুতোর মত একটা ছোট্ট

দাগ আছে আর কাল ঘোড়ার বাঁ কানের কাছে একটা কড়াইদানার মত আঁচিল আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন শান্তভাবে বলে চললেন।

বণিক অবাক হয়ে গেলেন।

এই বিশেষ চিহ্ন দুটো দুজন ছাড়া আর কারও জানা ছিল না—তাঁর নিজের এবং তাঁর বিশ্বাসী সহিসের—অন্য কারও নয়।

তাঁর মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের ভাব দূর হয়ে গেল।

"ঠিকই বলেছেন জ্যোতিষী! কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?"

রাজপুরুষও কৌতূহলী হয়ে কাছে সরে এলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর চীনা বই-এর আর এক পাতা উল্টালেন।

"তাছাড়া সাদা ঘোড়াটার লেজের মধ্যে বশীকরণের জন্য একটা সাদা সিল্কের বোনা সুতো আছে আর কাল ঘোড়াটার লেজে কাল সিল্কের সুতো।"

এমনকি বিশ্বাসী সহিসটাও সেটা জানত না। ঘোড়ার লেজে বশীকরণের সুতো বিনুনী করে অত্যন্ত গোপনভাবে বণিক নিজে রেখেছিলেন, কারণ ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতায় বশীকরণ অথবা যাদু করা ছিল নিষিদ্ধ এবং আইনতঃ হাজত বাসের যোগ্য অপরাধ।

খোজা নাসিরুদ্দিনের কথাগুলো বণিককে ভয় ধরিয়ে দিল।

এই কথাগুলো মহান কামিলবেককে কিন্তু অবিচলিত রাখল না। তাঁর ভাবনা-চিন্তা পুরোদমে লাফাতে সুরু করল। "এইভাবে চলতে থাকলে ঘোড়া দুটো বার করে দিলেও আমি আশ্চর্য হব না! আমি যতটুকু চেয়েছিলাম এ তার চেয়েও বেশি। আমার কাজ হচ্ছে অনুসন্ধানে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান, কিন্তু এর ফলাফল আমার উপর নির্ভর করে। ঘোড়াদুটো পাওয়া যাবে কি যাবে না আল্লার উপর নির্ভর করে; অন্ততঃ প্রতিযোগিতার আগে যেন পাওয়া না যায়। শয়তান এই জ্যোতিষীকে আমার কাছে পাঠিয়েছে! কিন্তু আমি কি করতে পারি? আহা কি যাদুবিদ্যা! আমি যদি মুদ্রা-বিনিময়কারীকে ভয় দেখাই ও হাতে-নাতে ধরি এবং এইসব তদন্ত বন্ধ করে দিই তাহলে তার আরবী ঘোড়া সময়মত ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসতে পারবে না।"

"এর উত্তরে কি বলবে রহিমবাই?" বিচারকের মত অশুভসূচক কণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন।

"আমি কোন সিল্কের সুতোর কথা জানি না," বণিক তোতলাতে তোতলাতে বললেন, তার মুখ এমনভাবে পালটে গেল যে তার সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা

করল। "সম্ভবতঃ আস্তাবলের লোকেরা······আমাকে না জানিয়ে······। অথবা ঘোড়ার আগের মালিক···ওখানে, আরব দেশে··· ।"

ঠিক এই সময়ে, যাইহোক, তার মনে পড়ল যে ঘোড়াদুটো অদৃশ্য হয়েছে এবং সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।

"সব মিথ্যা !" বিরক্তির ভান করে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "জ্যোতিষী মিথ্যাবাদী এবং অপপ্রচার করছে। যদি আমার ঘোড়া আবার পাওয়া যায়···"

"ওদের কালই পাওয়া যাবে," খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন। "থামুন, আমার বইয়ে আরও কিছু জানা যাবে। এতে বলছে যে সাদা ঘোড়াটার ডান পায়ের খুরে যে লোহার পাত লাগান আছে তাতে পোঁতা পেরেকগুলোর মধ্যে একটা সোনার পেরেক আছে যেটা মন্ত্র-পড়া। এটাকে যাতে চিনতে পারা না যায় সেজন্য ধূসর রং লাগান আছে। কাল ঘোড়াটার পায়েও এ ধরনের মন্ত্র পড়া পেরেক ঢোকান আছে—অবশ্য আমি বুঝতে পারলাম না কোন পায়ে।"

"হুঁ ! মন্ত্র-পড়া পেরেক, বশীকরণ করা সুতো !" বাঁকা হাসি হেসে রাজ-পুরুষ বিড়বিড় করে উঠলেন। "আমার রাজ কর্তব্যই আমাকে তদন্ত করতে বাধ্য করবে।"

বণিক ভয়ে বিহ্বল হয়ে বাক্যহারা হয়ে গেলেন; যাইহোক তিনি এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলেন না; দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়ী বৃত্তিতে মিথ্যা বলার অভ্যাস তাঁর সাহায্যে এল।

"আমি বুঝতে পারছি না এই গণক কি বলছে। আমার বিশ্বাস সে তার দাম বাড়াবার জন্য এসব বলে যাচ্ছে। ও বরং বলুক সে তার গণনার জন্য কত টাকা চায় এবং তার কথা মিথ্যা হলে সে কত টাকা বাজী রাখবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের বিবেক-রূপী বই তাঁর কাছে অনেক বেশি পরিষ্কার—তাঁর চীন দেশীয় বইয়ের চেয়েও পরিষ্কার। বণিকের অবশ্য আর কোন সন্দেহই ছিল না যে জ্যোতিষী অসাধারণ ভাগ্য-গণনার অধিকারী। ঘোড়াদুটো উদ্ধার করার ইচ্ছার সঙ্গে জেলে যাওয়ার চিন্তাও এসে পড়ল। মন্ত্র-পড়া পেরেক, বশকরা সিল্কের সুতো, রাজপুরুষ যে সব ব্যাপারেই নাক গলিয়েছে···এই দুর্দশায় একমাত্র জ্যোতিষীই তাকে উদ্ধার করতে পারে।

"পারিশ্রমিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার আমাদের দুজনের মধ্যে, আমাদের দু'জোড়া চোখের সামনেই হবে," বণিকের উগ্র ও গোপন ইচ্ছার উদ্দেশ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবে না?" উদ্বেগের সঙ্গে রাজপুরুষ বললেন।

"না, তাহলে আমার গণনা সফল হবে না।"

রাজপুরুষ রাজী হতে বাধ্য হলেন। তিনি সরে গেলেন ও প্রহরীদের সেখান থেকে সরে যেতে বললেন। এক মিনিটের মধ্যেই খোজা নাসিরুদ্দিন ও বণিক সকলের শ্রবণ শক্তির বাইরে এলেন। প্রধান জ্যোতিষী গুঁড়ি গুঁড়ি মেরে তাঁর নিজের গুহায় যাবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

"আমরা এখন একা," বণিক বললেন।

"আমরা একা," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"বুঝতে পারছি না কোথা থেকে ঐ পেরেক ও সিল্কের সুতোটা এল।"

"এক মিনিটের মধ্যেই আমরা তা জানতে পারব," চীনা বইটার দিকে হাত বাড়িয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। ৫৬ক

"না, জ্যোতিষী," বণিক তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন। ওটা ছিল গতকালের ব্যাপার আর আমাদের ভাবতে হবে··· ।"

"আগামী কালের, ভবিষ্যতের কথা," খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কথায় সমাপ্তি টানলেন।

"নিশ্চয়ই! তাহলে ভাল হয় জ্যোতিষী, যদি ঘোড়া দুটোকে ফিরিয়ে আনা হয়···মানে···অ্যাঁ···বলতে গেলে, তাদের আগের চেহারায়।"

"পেরেক ও সিল্কের সুতো ছাড়া, আপনি বলতে চাইছেন। বুঝতে পারছি।"

"না, অত জোরে নয়, জ্যোতিষী! এখন বলুন আপনার পারিশ্রমিক কত?"

"আমার পারিশ্রমিক অতি নগণ্য, শেঠজি—দশ হাজার টাকা।"

"দশ হাজার, হায় আল্লা, তাদের আসল দামের প্রায় অর্ধেক! আরব থেকে কোকান্দে নিয়ে আসার খরচ নিয়ে আমার লেগেছিল বিশ হাজার টাকা।"

"মহান কামিলবেককে আপনি অন্য দাম বলেছিলেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, দোকানের মধ্যে—বাহান্ন হাজার?"

বণিকের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। স্বভাবতঃই এই আশ্চর্যজনক জ্যোতিষীর দূরদর্শিতা সব সীমা ছাড়িয়ে গেল!

"সব কিছুই কি আপনার বইয়ে পাচ্ছেন?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বণিক ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বই! কোথায় পেয়েছিলেন?"

"চীনে।"

"এ ধরনের কি অনেক বই চীনে আছে?"

"পৃথিবীতে এ ধরনের বই এই একটি।"

"আল্লার জয় হোক, তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আমাদের মত ব্যবসায়ীদের ভাগ্যে কি ঘটবে যদি এ ধরনের শ'খানেক বই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে—ভাবতেও ভয় লাগছে! এটা বন্ধ কর, জ্যোতিষী, বন্ধ কর। ঐ সব চীনা চিহ্নগুলো আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী।"

"আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করো না, বণিক!"

"আমি নিরস্ত্র আর তোমার হাতের ঐ বইটা যেন ধারালো তরোয়াল।"

"আগামী কাল তুমি তোমার ঘোড়া পাবে। সোনার পেরেক বা সিল্কের সুতো ছাড়াই তুমি ওদের পাবে, চুক্তিমত। টাকা ঠিক করে রেখ—সোনা, একটা থলিতে। এস আমাদের শেষ অনুষ্ঠান করা যাক।"

খোজা নাসিরুদ্দিন লাউয়ের খোলের কমণ্ডলুটা উল্টে মন্ত্রপড়া জল নিয়ে নিজের ও বণিকের উপর ছড়িয়ে দিলেন।

রাজপুরুষ, সেনাপতিরা, প্রহরীরা এবং অন্যান্য জ্যোতিষীরা নীরবে এইসব কাজকর্ম হতে দেখলেন।

হাড় জিরজিরে বুড়ো প্রধান জ্যোতিষী হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছিলেন; দুবার তিনি চুপি চুপি গুঁড়িগুঁড়ি মেরে তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং দুবারই প্রহরীরা দেখতে পেয়ে তাঁকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর অপচেষ্টা ব্যর্থ করল।

যখন তিনি শুনলেন গণনার জন্য কত পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে তখন তিনি যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন।

"দশ হাজার!" তিনি ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে উঠলেন ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কেউ তাঁকে আর তুলে ধরলেন না, কারণ এই অসম্ভব পারিশ্রমিকের কথা শুনে সকলেই প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিল।

রাজপুরুষ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কাশলেন ও হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

কিন্তু বণিক যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন তখন একদল গুপ্তচর তাঁকে অনুসরণ করল।

"এর অর্থ আমিও ওদের দৃষ্টির বাইরে যাব না," খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। তিনি অবশ্য ভুল করেননি। পিছন ফিরে দেখলেন তাঁর পিছনে তিনজন ও পাশে একজন।

"জ্যোতিষী!" খোজা নাসিরুদ্দিনকে তর্জনি দেখিয়ে রাজপুরুষ বললেন। "মনে রাখবে আমার উপস্থিতি ছাড়া বণিককে ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না! এ ব্যাপারে তোমার তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নেই। মনে রেখ সোনার পেরেক ও সিল্কের সুতো যেন অদৃশ্য হয়ে না যায়। শেষে তোমার জন্ম নেওয়ার জন্য যেন পরিতাপ করতে না হয়! যাও!"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কার্পেট গুটিয়ে নিয়ে গলা-কাটা সেতু ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর সহযোগী জ্যোতিষীদের বিষদৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করল। গুপ্তচররা তাঁকে অনুসরণ করল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমস্ত দিনই তিনি তাদের চোরের মত অলক্ষিত পদক্ষেপ শুনতে পেলেন। তারা তাঁকে খাবার দোকানে অনুসরণ করল, সেখান থেকে সরাইখানায়। তিনি যখন বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন তখন চারজনই হুমড়ি খেয়ে পাশে বসে পড়ল—দুজন এপাশে এবং অন্য দুজন ওপাশে—এবং তাঁর শায়িত দেহের দু'পাশ থেকে কথাবার্তা বলতে লাগল, তাদের স্বল্প বেতন নিয়ে এবং তাদের পেশাগত অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করছিল। এইসব বেদনাদায়ক কথাবার্তার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং জেগে উঠে দেখলেন আর একদল গুপ্তচর—সম্ভবতঃ রাতের প্রহরী, যারা ধূসর রংয়ের প্রায় অদৃশ্য পোশাক পরেছিল—তাঁর পাশে বসে আছে। রাতের গুপ্তচরদের আলোচনার বস্তু দিনের লোকদের মত একই ছিল, তাদের বিচার সম্পর্কে এবং তাদের উপর সেনাপতিদের নিপীড়ন ও দোষ দেখার ব্যাপার নিয়ে।

গোধূলি হয়ে এল, অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বলতা কমে এল এবং একটা সরু চাঁদ আকাশে দেখা দিল। মসজিদের মিনারে মিনারে মৌলভীরা চাঁদ দেখে একটানা আজান দিতে সুরু করল। খোজা নাসিরুদ্দিন সন্ধ্যার নামাজের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তিনি লাউয়ের খোলের ছিপি খুলে কিছুটা যাদু করা

জল একটা কাপে ঢাললেন, তাতে হাত ডুবালেন, প্রদীপের সলতে উস্কে দিলেন ও পরে এটা জ্বাললেন। একটা পাণ্ডুর দপ্ দপ করা আলোয় সরাইখানার কোণটা ভরে গেল এবং গুপ্তচরদের ধূসর পোশাকের অন্ধকারে মিশে যাওয়া ভাবটা দূর হয়ে গেল। তাদের ভয়ংকর মুখটা আরও পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল যখন তারা আরও ভালভাবে দেখবার জন্য মুখটা এগিয়ে আনল; সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল বুড়ো গুপ্তচরটা, জুতোর মত অপরিষ্কার লোক, যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভালভাবে দেখবার আগ্রহে, তাঁর কানের কাছে মুখ এনে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

শয়তানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে অভিযুক্ত না হবার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন নামাজ পড়তে লাগলেন ও পরে চীনদেশীয় বইটা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলেন। গুপ্তচরেরা এটা লক্ষ্য করল। তারা ভাবছিল তিনি পড়ছেন কিন্তু আসলে পড়ার পরিবর্তে, তিনি শুধু সময় কাটাচ্ছিলেন, এমনকি বইটার দিকে চেয়েও দেখছিলেন না। "আমি সৎ হব," তিনি চিন্তা করলেন। "আমি পেরেক ও সিল্কের সুতো ছাড়াই ঘোড়া দুটো বণিককে ফেরত দেব; রাজপুরুষের ক্রোধ থেকে রেহাই পেতে আমি যত শীঘ্র সম্ভব অদৃশ্য হয়ে যাব।" বিশ্রী চেহারার বুড়ো গুপ্তচরটা প্রায় তাঁর ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল এবং তার দুর্গন্ধপূর্ণ বিশ্বাসের বিরক্তিকর শব্দটা তাঁর কানে এসে লাগছিল। তাকে দূরে সরাবার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর হাতের কোণটা দিয়ে তার নাকের ডগায় আঘাত করলেন এবং শেষবারের মত ভিজে নিশ্বাস ফেলে ও নিশ্বাসের শব্দ করে তার বিরক্তিকর প্রত্যঙ্গটা সরিয়ে নিল।

একচোখো চোরটা সরাইখানার সামনে এসে হাজির হল। গুপ্তচরদের দেখে সে সব বুঝতে পারল এবং এমনকি খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে না চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এক মিনিট পরে সরাইখানার উঁচু মেঝের নীচে তিনি একটা হালকা টোকা শুনতে পেলেন।

"শুনতে পাচ্ছি!" একটা ভয়াতুর কণ্ঠে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন ঠিক যেন সামনে দেখতে পাওয়া এক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন। "দেখতে পাচ্ছি!" এবং তিনি মন্ত্র-পড়া জলের দিকে ঝুঁকলেন। গুপ্তচরেরা আর একবার তাঁর পাশে এসে ভীড় করে দাঁড়াল ও জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। "আমি ঘোড়াগুলো দেখতে পাচ্ছি, একটা

সাদা, অন্যটা কাল, আমি তাদের ঘাড়ের লোম দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘোড়ার খুরের লোহা দেখতে পাচ্ছি, খাঁটি লোহা কোনও খাদ নেই। আমি তাদের বিরাট লেজ দেখতে পাচ্ছি, সুন্দরভাবে আঁচড়ান। আগামীকাল তারা যেন তাদের স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে আসে, লোহায় যেন কোন কিছু মেশানো না থাকে, ঘোড়ার লোমে যেন কোন সুতো লাগান না থাকে। 'ভাজ অন রু কি পাইডোভু······' " ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই শ্লোক আউড়াতে আউড়াতে তিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান শেষ করলেন এবং পাপী গুপ্তচরদের কানে এই প্রখ্যাত ও পবিত্র শ্লোক তুলে দেওয়ার জন্য হাঁটু মুড়ে মহান ইয়ামির কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ধ্যান করতে লাগলেন, গুপ্তচরদের কানে শিয়ালের চীৎকার ও হায়েনার খ্যাক খ্যাক ছাড়া অন্য কিছু তোলা উচিত নয়। কিন্তু এই গুপ্তচরেরা ইয়ামির পরিশ্রমের কোন স্বাদ পায়নি এবং এই শ্লোকগুলিকে তারা ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র ভেবেছিল; কবির নাম সেইজন্য গুপ্তচরদের মনে আনাগোনা করলেও তাঁর নামের বিকৃতি বা অসম্মান ঘটেনি।

উঁচু মঞ্চের নীচে নখের আঁচড়ের শব্দ শোনা গেল—খোজা নাসিরুদ্দিনের কথা শোনার ও বুঝতে পারার ছিল এটা ইঙ্গিত। শেষ পংক্তি ছিল দ্রুত কাজ করার একটা ইঙ্গিত যেটা ছিল আগে থেকেই ঠিক করা।

যাদু শেষ হলে খোজা নাসিরুদ্দিন বইটা আবার বন্ধ করলেন এবং মন্ত্রপড়া জল আবার লাউয়ের খোলায় ঢেলে রাখলেন।

বিশ্রী চেহারার বুড়ো গুপ্তচরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়াল ও সমস্ত বিবরণী দাখিল করার জন্য চলে গেল। অন্য গুপ্তচর তিনজন থেকে গেল।

গুপ্তচরদের অনুসন্ধানের ফল ছিল নগণ্য। যার উপর তারা দৃষ্টি রেখেছিল দেখল সে চা খেল, হুঁকা পান করল এবং পরে সেটা পাশে রেখে সকাল পর্যন্ত ঘুমাল, তার বেশি অবশ্য তারা আর কিছু দেখতে পেল না।

রাত্রি কেটে গেল।

আগে কখনও গলাকাটা-সেতুর উপর এত ভীড় হয়নি যেমনটি হয়েছিল সেদিন মে মাসের রোদে ভরা সকালে।

সেদিন ঘোড়া ছুটো দেখতে পাওয়া যাবে! সমস্ত শহরটা সেতুর উপর ভেঙ্গে পড়ল। সাই নদীর দুই পাড় লোকে ভরে গিয়েছিল এবং দু পাশের বাড়ীর ছাদগুলো মেয়েদের রঙ্গীন ওড়নার সঙ্গে যেন উল্লাস করছিল।

রাজপুরুষ ও বণিক সেদিন খুব সকালেই সেতুর উপর এসেছিলেন।

"জ্যোতিষী, আমার ঘোড়া কই?" গুপ্তচরদের সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিন যখন পাশের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এলেন তখন বণিক বললেন।

"আমার টাকা কোথায়?"

"এই যে এখানে," বোঁচকার ভিতর থেকে একটা টাকার থলি বার করে বণিক বললেন। "দশ হাজার, স্বর্ণমুদ্রা। গুনবার প্রয়োজন নেই। তিনবার মেলান হয়েছে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন ধীরে সুস্থে তাঁর থলি খুলে চীনা বই বার করলেন এবং কার্পেটের উপর বসলেন।

রাজপুরুষ দূর থেকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

বণিক গভীর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

"তাড়াতাড়ি," হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, গোঁঙাতে গোঁঙাতে বণিক বললেন। "কেন বৃথা সময় নষ্ট করছ, জ্যোতিষী!"

খোজা নাসিরুদ্দিন কোন উত্তর দিলেন না। মনে হল তিনি যেন তাঁর বইয়ের একাগ্রতার সঙ্গে মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু আসলে তিনি সাদা দাগ ও লাল পিঠের একটা গুবরে পোকাকে তাঁর বইয়ের পাতার উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে দেখছিলেন। "আমি কথা বলব তখনই যখন এটা উড়ে যাবে," তিনি ভাবলেন। কিন্তু গুবরে পোকাটার উড়ে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না। এটা এক পাতা থেকে আর এক পাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পরে বইয়ের কভারের নীচে এল যেখানে অন্ধকারে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার তাজা হয়ে নিতে ইচ্ছা হল।

বণিক বুকে হৃদপিণ্ডের কাছে হাত রেখে কাতরাতে ও কাঁপতে লাগলেন ও তার গোল গাল দুটো যেন তাদের আকৃতি হারাতে সুরু করল।

খোজা নাসিরুদ্দিন একটা কথাও বললেন না।

শেষে গুবরে পোকাটা আবার আলোয় এল, পিঠের সুন্দর বর্মটা খুলে ধরল, পরে তার কাল রং-এর ছোট্ট পাখা দুটো মেলে উড়ে গেল।

পরে খোজা নাসিরুদ্দিন গম্ভীর ভাষায় বললেন:

"বই বলছে, শেঠজি, যে আপনার কাছে ঘোড়া দুটো আগের আকৃতিতে অর্থাৎ প্রকৃতি তাদের যে আকৃতি দিয়েছে সেই ভাবেই ফিরে আসবে।"

বণিক খুশী হলেন।

"আপনার ঘোড়ারা, বণিক," খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন, "তোমাক

গ্রামের কাছে যে পুরোনো খনি আছে সেখানে আছে। পূর্ব দিক থেকে খনিতে নেমে, বার পা মত এগিয়ে যেতে হবে, পরে ডান দিকের একটা গুহায়...”

তিনি সবে মাত্র কথা শেষ করেছেন তৎক্ষণাৎ সেতুর এক ধার থেকে মুদ্রা-বিনিময়কারীর সহিসেরা এবং অন্য দিক থেকে রাজপুরুষের প্রহরীরা রাস্তা ধরে তীর বেগে ঘোড়ায় চেপে লাফাতে লাফাতে ছুটে গেল। জনতা দুই পাশে সরে গিয়ে তাদের যেতে জায়গা দিল, পরে আবার কাছে সরে এল।

ঘোড়সওয়াররা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়ার খুরে ভেসে আসা ধুলো বাতাসে ভাসছিল।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। রাজপুরুষ ও বণিক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে চেয়েছিলেন এবং দুজনেই নিজের নিজের চিন্তায় ও আশায় উত্তেজিত হচ্ছিলেন।

বিরাট জনতা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

এই নীরবতার মাঝখানে খোজা নাসিরুদ্দিন সেতুর নীচে থেকে জলের গুঞ্জন ও ছলাৎ ছলাৎ শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলেন এবং মাথার উপরে শুনতে পেলেন একটা বাজপাখীর তীব্র চীৎকার। সেটা তার পাখা দুটো মেলে দিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে তৈরি থামের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

সেতু থেকে চোমাক গ্রামের দূরত্ব আট রশির অল্প কিছু বেশি হবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল—ঘোড়সওয়ারদের ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে চীৎকার ও বিদ্রূপের গুঞ্জন শোনা গেল।

মুদ্রা-বিনিময়কারী যেন আশার জ্বলন্ত আগুনের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিটি শব্দেই চমকে উঠছিলেন।

রাজপুরুষ অন্য দিকে তাঁর উদ্ধত কিন্তু নিশ্চুপ ভাব বজায় রাখছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর উঁচু গোড়ালি দিয়ে নুড়িগুলোতে আঘাত করছিলেন।

একটা সাধারণ গাছের ছায়া সেতুর প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছিল। গাছের মাথায় একটা আলোড়ন দেখা দিল এবং একটা ছোট ছেলের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল, “ওরা আসছে!”

জনতার মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দিল। ভীড়ের মধ্যে একটা বক্র রাস্তা করে দেওয়া হল এবং তার অন্য প্রান্তে খোজা নাসিরুদ্দিন দেখতে পেলেন ঘোড়সওয়ারদের ফিরে আসতে।

সাদা অথবা কাল কোন আরব ঘোড়া তাদের সঙ্গে ছিল না।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আশ্চর্য হবার আগেই খোজা নাসিরুদ্দিনকে ধরে প্রহরীরা টানতে টানতে নিয়ে গেল।

"দাঁড়াও, আল্লার নামে দিব্যি করে বলছি, থাম!" মুদ্রা-বিনিময়কারী চীৎকার করে উঠলেন। "ঘোড়াগুলো গুহাতেই ছিল—এই লাগামটা সেখানেই ছিল। জ্যোতিষীকে ছেড়ে দাও, সে প্রায় ঠিকই বলেছে!"

জ্যোতিষী প্রায় সত্যিই বলেছে, রাজপুরুষের আশা অনুযায়ী প্রায় সত্যিই বলেছে।

বণিক বৃথাই চীৎকার করতে ও কাঁদতে লাগলেন—প্রহরীদের রাখা গেল না, দীর্ঘ চাকুরী জীবনে কেউ কোন দিন তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। খোজা নাসিরুদ্দিন হঠাৎ তাদের হাতে অত্যন্ত নীচ ও অধম ব্যক্তিতে পরিণত হলেন যেন গুরুতর অপরাধ করেছেন, কারাগারে কাউকে টানতে টানতে নিয়ে যাবার আগে যেমন করে অনেকটা সেই রকম করেই নিয়ে গেল। শেষে তিনি সেতুর উপর যা দেখলেন তা হচ্ছে রাজপুরুষের মাথা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পিছন দিকে হেলে আছে, বণিক কর্কশ স্বরে চীৎকার করছেন এবং বণিকের প্রধান সহিসের হাতে রুপার পাতে মোড়া লাগাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কোকান্দের জেলখানার নাম জিন্দান, প্রাসাদের প্রধান ফটকের পাশে এবং প্রাসাদ দুর্গের দেওয়ালের বাইরের দিকে অবস্থিত—যা নির্মাণকারীদের প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দেয়। দেওয়ালের ভিতর দিকে অবস্থিত হলে এই অসংখ্য দাগী আসামীকে খাওয়ানর দায়িত্ব খানের রাজকোষের উপর পড়ত। কিন্তু প্রাসাদের সীমানার বাইরে হওয়ায় বিচারাধীন বন্দীরা রাজকোষের উপর আর বোঝা হয়েছিল না, কারণ বন্দীরা নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করত। যাদের পরিবার ছিল তারা তাদের সামনে যা এনে রাখা হত তা দিয়েই জীবনধারণ করত, বাকীরা শহরের অধিবাসীদের দয়ার দানের উপর নির্ভর করত।

জেলখানা ছিল একটা ঢাকা গর্ত, উপর দিকে ছিল বাতাস বার হবার তিনটে বড় ফুটো যার ভিতর দিয়ে দুর্গন্ধ বাতাস বেরিয়ে যেত। চল্লিশটা ধাপের একটা খাড়া সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছিল। উপরে প্রবেশ পথে একজন সদাজাগ্রত জেলরক্ষী পাহারা দিত—হয় আবদুল্লা বিরিয়ারিমাদাম নিজে, যাকে বিরাট

দৈত্যের মত চেহারার জন্য বলা হত দেড়খানা আবদুল্লা—এক ভয়ংকর মাংসপেশী বহুল দৈত্য। তাকে কখনই তার ভারী চাবুক অথবা তার সহকারী রূপে দেখা যেত না; সহকারী ছিল পুরু ঠোঁট ও নীচু ভুরু বিশিষ্ট এক ভয়ংকর আফগান। সঙ্গে তার কোন চাবুক থাকত না, কিন্তু তার আঙুলের গ্রন্থিগুলো বন্দীদের চোয়ালের হাড়ের সংস্পর্শে আসার চিহ্ন বহন করত।

এই দুজন লোকের উপর জেল কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের খাওয়ান নির্ভর করত। খাবারের জন্য দুটো ভিক্ষার বাক্স এবং টাকা পয়সার জন্য সরু গলার একটা কমণ্ডলু জেলখানার প্রবেশ পথে রাখা ছিল। এইভাবে পাওয়া ভিক্ষার জিনিস জেল রক্ষীদের ইচ্ছামত বিলি করা হত; টাকা-পয়সা ও ভাল খাবার-দাবার নিজেরাই নিয়ে নিত এবং কয়েদীরা পেত অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অনুরোধ ও কান্নার সঙ্গে পথচারীদের কাছে রুটি ভিক্ষার শব্দ শোনা যেত কয়েদখানার গভীর অন্ধকার থেকে; এইসব অনুরোধ ও কান্না কখনও কখনও কাতরানি ও চীৎকারে পরিণত হত যখন আবদুল্লা তার চাবুক বা তার সহযোগী খোঁচা ভরা মুষ্ঠি নিয়ে নিচে নেমে যেত।

সিঁড়ির চল্লিশটা ধাপ নীচে গড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশের কাতরানি ও চীৎকারের শব্দে অজ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞান ফিরে পেতে খোজা নাসিরুদ্দিনের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। যখন ধাতস্থ হলেন এবং তাঁর চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হল তখন তিনি চারপাশে বিভিন্ন ধরনের দাগী আসামীদের দেখতে পেলেন।

ক্ষমতা, ভাগ্য ও সম্মান লাভের জন্য রাজপুরুষ উন্নতির যে সোপান বেয়ে উপরে উঠেছিলেন এরা প্রত্যেকেই যেন সেই সোপানের এক একটি ধাপ! গত সপ্তাহে দুটো ধাপ—অর্থাৎ পেশোয়ারী দুজনকে—সরিয়ে তাঁকে কিছু পরিবর্তন করে আনতে হয়েছিল এবং তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছিল আর একজনকে নিয়ে এসে—খোজা নাসিরুদ্দিনকে; আবার এমন ধাপও আছে যেগুলো আরোহণকারীর পক্ষে বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ তারা খুব সহজেই তাঁর পা ভাঙতে পারে সম্ভব হলে ঘাড়ও—এবং এটা এমনই একটা অবস্থা যা আমাদের সদাসচেষ্ট ও রাজ ভাগ্যান্বেষী অবহেলা করেছিলেন।

রাগ ও দুঃখ খোজা নাসিরুদ্দিনের মনে জ্বলছিল; এমন কি তিনিও যিনি সেদিন জীবনের অনেক কিছু দেখেছিলেন, ভাবতেও পারেননি যে পৃথিবীতে এত ভয়াবহ জায়গা থাকতে পারে; তিনি যেন নরককুণ্ডের কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছেছেন।

তাঁর হৃদয়ে যেন আর একটি ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া হল—তাদের দেওয়া চিহ্ন যারা তাঁদের হৃদয়কে নিষ্ঠুরতার বর্মে আবৃত করে রাখে।

তাঁকে তাঁর নিজের ভাগ্য নিয়ে একবার চিন্তা করতে হবে, বুঝতে চেষ্টা করতে হবে কি করে এসব ঘটল।

সমস্ত ঘটনাটা খোজা নাসিরুদ্দিনের নিজের কাছেই গোলমেলে ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘোড়া দুটো কোথায় ছিল? খনি থেকে কি করে অদৃশ্য হল? তারা যে সেখানে ছিল এটা ধ্রুব সত্য, কারণ বণিক লাগামটা চিনতে পেরেছিলেন।

রাজপুরুষের কি তাঁর গুপ্তচরদের মাধ্যমে ঘোড়া দুটো অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে হাত ছিল, অথবা ছিল না?

ধূর্ত জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ আনতে চান—শুধু কি প্রতারণা অথবা এ ছাড়া অন্য কিছু?

এক-চোখো চোর কোথায়, তার কি হয়েছে?

এই সব আগাম চিন্তায় খোজা নাসিরুদ্দিন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। একটা অন্ধ সন্দেহ তাঁর মনে এসে হাজির হচ্ছিল। "সম্ভবতঃ একচোখো অন্য কোনও শহরে বিক্রী করার জন্য ঘোড়া দুটোকে নিয়ে গিয়েছিল? যদি তাই হয় তবে আমার কারাগার-বাস তার পক্ষে বরং ভালই এবং নিরাপদ হবে……।" সেই মুহূর্তে তাঁর ভাবনা দূর হল এবং এ ধরনের নীচ চিন্তার জন্য লজ্জা পেলেন। "এক-চোখো চোর হতে পারে, জন্ম থেকেই চোর, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, কিন্তু সে একরোখা লোক, সে বিশ্বাসঘাতক নয়!"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর এই ধারণায় আরও দৃঢ় হলেন এবং নিজের আত্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করলেন।

তিনি ঠিক কি বেঠিক ছিলেন সেটা আমরা পরে যথাসময়ে আবিষ্কার করব। ইতিমধ্যে আমাদের কারাগার ছেড়ে একবার গলা-কাটা সেতুতে কি হচ্ছে দেখা যাক যেখানে সাম্প্রতিক হৈ-হুল্লোড় এখনও থেমে যায়নি। সমস্ত কিছু পণ্ড হয়ে যেতে রাগে তেলে বেগুনে হয়ে এবং হাত-পা কাঁপা অবস্থায় মুদ্রা-বিনিময়কারী রাজপুরুষের সামনে ধরা গলায় বললেন:

"ঘোড়া দুটো পাওয়া গিয়েছে! প্রায় পাওয়া বললেই চলে! খনিতে একটা লাগাম পাওয়া গিয়েছে—এই যে! এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে মহান কামিলবেক জ্যোতিষীকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং তাঁকে ধরে জেলে

পুংলেন। কিন্তু আমার মহান প্রভু যেন প্রতারিত না হন—আমি আপনার মতলব বুঝতে পেরেছি। আমি রাজপ্রাসাদে নতুন লোক নই। আল্লার জয় হোক। আমি মহান খানের পায়ের উপর গিয়ে পড়ব এবং তাঁর কাছে আশ্রয় ও বিচার প্রার্থনা করব!”

রাজপুরুষ শান্তভাবে কিন্তু গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুনছিলেন।

ঘোড়া তাঁর কাছে নিয়ে আনা হলে তিনি তার উপর চেপে বসলেন এবং ঘোড়ার জিনের উপর বসে রাজকীয়ভাবে বললেন :

“জ্যোতিষী অনেক অপরাধে অপরাধী এবং সেজন্যই তাকে জেলে পোরা হয়েছে। আমি গতকালই তাঁকে ধরতাম কিন্তু সুযোগ্য রহিমবাইকে তাঁর ঘোড়ার অনুসন্ধানে সাহায্য করার জন্যই কিছু করিনি। আমি রহিমবাই-এর সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে কষ্ট মাথায় তুলে নিয়েছিলাম তার জন্য রহিমবাই অত্যন্ত অকৃতজ্ঞভাবে তার প্রতিশোধ দিচ্ছে।”

মুদ্রা-বিনিময়কারী উপরের দিকে তাঁর বড় নখ সমেত হাত দুটো তুলে বললেন।

“আমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য? হায় আল্লা, সমস্ত কিছুর মধ্যে আমি আপনার একটি ইচ্ছাই দেখতে পাচ্ছি—সেটা হচ্ছে আগামী ঘোড়দৌড়ে জেতা!”

রাজপুরুষ কোন উত্তর দিলেন না। বাজনার শব্দ ও “রাস্তা ছাড়” শব্দের মধ্যে তিনি তাঁর রাজকীয় বিদায় নিলেন, সামনে পিছনে পাহারা দিয়ে চলল প্রহরীর দল হাতে লাঠি, উন্মুক্ত তরোয়াল, উদ্যত বর্শা, তীক্ষ্ণ খোঁচ ও দোদুল্যমান বল্লম।

সেতুর পাশের ভীড় কমে এল। জনতা ছত্রভঙ্গ হল, তাদের আশা পণ্ড হল। হাসি, ঠাট্টা ও তামাসার কোন শেষ ছিল না।

ভীড়ের মধ্যের অনেক লোকই বিভিন্ন সময়ে এই সেতুর উপর বোকা বনেছে। তারা জোরে জোরে জ্যোতিষীকে গালাগাল দিতে লাগল এবং তাদের অপকৌশল প্রকাশ করতে লাগল।

জ্যোতিষীরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা বুঝতে পারল যে তাদের আয় দারুণভাবে কমে যাবে। ঐ বদমাস অহংকারীটা! সে চোরাই মাল উদ্ধার করবে বলে তাদের সমস্ত জাতটাকেই লজ্জা দিয়েছে ও অপমানিত করেছে।

মুদ্রা-বিনিময়কারী বাড়ীর দিকে ছুটলেন এবং দৌড়বার সময় হাত দোলাতে ও বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন।

অনুচরেরা অবশ্য তাকে অনুসরণ করল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা রাজপুরুষকে খবর দিল যে মুদ্রা-বিনিময়কারী নাপিত ডাকিয়ে তাঁর দাড়ি ঠিকঠাক করছেন।

আরও এক ঘণ্টা বাদে তাঁকে জানানো হল যে মুদ্রা-বিনিময়কারী বালি দিয়ে তাঁর ধাতুর তবক পরিষ্কার করছেন এবং মখমলের পোশাক রোদে দিয়েছেন; এইসব পোশাক বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া বণিকেরা অন্য সময়ে সিন্দুকে ভরে রাখেন।

এইসব খবরে রাজপুরুষ ভুরু কোঁচকালেন। বণিক মনে হচ্ছে রাজপ্রাসাদে তাঁর অভিযোগ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যিই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লোকটার নির্লজ্জ পাগলামি!

বিপদ দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে এখন যখন পেশোয়ারীদের স্মৃতি খানের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি।

দেরি না করে অবিলম্বে সাবধান হতে হবে।

রাজপুরুষ হাততালি দিলেন এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন অপরাধমূলক তদন্তকার্যের প্রধান সহকারী। কাল ও ভয়ংকর চেহারার মোটা লোক পা দুটো বাঁকা, মাছের মত গর্তে ঢোকা চোখ দুটো ছোট কপালের নীচে যেন বসান আছে। এই ভীষণ-দর্শন রাজপুরুষের যে জন্যে খ্যাতি তা হচ্ছে তার হাতে কোন আসামীই দু দিনের বেশি দোষ লুকিয়ে রাখতে পারে না; এই সময়ের পরে সকলেই দোষ স্বীকার করে। যে সব অপরাধ করতে সে সাহায্য করেছিল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে বাজারে দোকানদারকে নিয়ে; উদাহরণস্বরূপ যেমন সে স্বীকার করেছিল যে সস্তায় সে খারাপ জাতের তরমুজ কিনে, হলুদ ও সবুজ রং লাগিয়ে দেখতে ভাল জাতের তরমুজের মত করে অনেক লাভ করে বিক্রী করেছিল।

"গত বছর ইয়ারমত-মামিশ-ওগলি নামে যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তার কাগজপত্র কোথায়?" রাজপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন।

মোটা লোকটা চলে গেল ও কয়েক মিনিট পরেই এক গাদা কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে এল। সেগুলি সে রাজপুরুষের সামনে রেখে দরজার দিকে সরে গেল এবং সেখানে পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও নিজের নাকের দিকে চেয়ে রইল। সে তার ধীর-স্থির ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং কি করে সে সাফল্যের সঙ্গে তার তদন্ত চালাত সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। এই সমস্যার

উত্তর তার হাতের দিকে চাইলেই পাওয়া যাবে—খোঁচা খোঁচা গিঁট পড়া হাত ও হুকের মত আঙুল।

রাজপুরুষ, ভুরু কুঁচকে কাগজে ডুবে গেলেন। দেখে মনে হল তিনি যেন ছক নিয়ে চিন্তামগ্ন এক দাবা খেলোয়াড়। তাঁর হাতের ঘোড়ে হচ্ছে জ্যোতিষী অর্থাৎ খোজা নাসিরুদ্দিন।

সেই তুচ্ছ ঘোড়েটাকে মন্ত্রী করতে হবে। জ্যোতিষীকে ভয়ংকর অপরাধের জন্য দায়ী করে একজন বিপজ্জনক অপরাধী হিসাবে খানের কাছে সাব্যস্ত করতে হবে।

এভাবে করতে পারলে অনেক উদ্দেশ্য এক সঙ্গে সফল হবে। যথা :

এক : মোটা বণিকের জ্যোতিষীর ব্যাপারে অভিযোগ যে তাকে ইচ্ছা করেই জেলে পাঠানো হয়েছে—জ্যোতিষীর নিজের স্বীকারোক্তিতেই টিকবে না ;

দুই : আরব ঘোড়াগুলো প্রতিযোগিতার মাঠে হাজির হতে পারবে না এবং প্রথম পুরস্কার তার তুর্কী ঘোড়াকে দেওয়া হবে ;

তিন : মোটা বণিককে শাস্তি দেওয়া হবে তার নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্য, কারণ প্রতিযোগিতার পরেও সে তার হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া তার কাছে ফেরত পাঠায়নি ;

চার : এই উদ্দেশ্যে উপরি-উক্ত জ্যোতিষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে বা সম্ভব হলে ফাঁসিতে লটকান হবে ;

পাঁচ : অবস্থা অনুকূল হলে উপরের সুযোগ ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে এবং উৎসাহ দেখানর জন্য পদক পাওয়া যেতে পারে ;

ছয় : তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু খুব সাবধানে সমস্ত কাজ করতে হবে ; সম্ভবতঃ খান নিজে জ্যোতিষীকে পরীক্ষা করতে পারেন যা পেশোয়ারীদের বেলায় প্রায় হতে চলেছিল। উঃ কি দুঃখের, একজন শাসকের পক্ষে কি নীচতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক—আশ্চর্য হবার নয় যখন তাঁকে বলা হয় নীচ ঘরে জন্ম এবং তাঁর আসল বাবা হচ্ছে রাজবাড়ীর আস্তাবলের সহিস !

এবার রাজপুরুষ নিজের চিন্তায় নিজেই ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেলেন এবং জোরে জোরে কাশতে সুরু করলেন ; মোটা লোকটার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন সে কিছু বুঝতে পেরেছে কি না।

মোটা লোকটা একইভাবে তার নাকের দিকে চেয়ে ধ্যানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। রাজপুরুষ আবার একাগ্র হয়ে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে সুরু করলেন।

যে কাগজগুলো তাঁর সামনে ছিল সেগুলো হচ্ছে সত্যিকারের ভয়ংকর বিদ্রোহী ইয়ারমত-মামিশ-ওগলিকে নিয়ে, যার নাম মহান খানের মনে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপুরুষ ইতস্ততঃ করছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না জ্যোতিষীকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করবেন বা ঘটনার পর ফালতু মনে করবেন। অথবা কোন আরও নির্ভরযোগ্য পথ বেছে নেবেন?

বহুক্ষণ ধরে ভাবলেন, পরে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিছন দিকে গদিতে হেলান দিলেন।

ইয়ারমতের সঙ্গে আত্মীয়তা—এটা হচ্ছে একটা ফাঁদ যা থেকে জ্যোতিষী কিছুতেই রেহাই পাবে না! যদি পায় তবে সে প্রমাণ করুক যে বিদ্রোহীর পিতামহ তারও পিতামহ নয়। এমন কি যদি জ্যোতিষীর ঠাকুমা কবর থেকে উঠে এসে বিরক্তির সঙ্গে এ ধবনের কুৎসার প্রতিবাদ করে তাহলেও তার সাক্ষ্য অস্বীকার করা হবে, কারণ এটা বেশ ভালভাবেই জানা যে মেয়েরা তাদের নৈতিক পদস্খলন কখনই স্বীকার করে না।

"জ্যোতিষীকে দুর্গে নিয়ে এস!" রাজপুরুষ হুকুম দিলেন।

মোটা লোকটার কাল মুখ নিষ্ঠুর আনন্দে ভরে গেল, তার হাত দুটো নিসপিস করে উঠল এবং ধীরে ধীরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গেল।

ষোড়শ অধ্যায়

দেয়ালের নীচের প্রকোষ্ঠ আলো করা হয়েছিল চার দেয়ালে চারটা লোহার ব্রাকেট থেকে ঝুলিয়ে রাখা মশাল দিয়ে। ধোঁয়ার মধ্যে আবছা আলো দিচ্ছিল মশালগুলো এবং এদের পাণ্ডুর আলোয় খোজা নাসিরুদ্দিন দেখতে পেলেন এক কোণে একটা পীড়ন-যন্ত্র আর তার নীচে একটা গামলায় চামড়ার চাবুক ভিজতে দেওয়া হয়েছে। একটা বেঞ্চির উপর সুন্দরভাবে সাজান আছে স্ক্রু, চিমটে, তুরপুণ, আঙুলে বিঁধবার জন্য সূঁচ, লোহার দস্তানা, কাঠের ঘোরান জুতো, কান, নাক ও দাঁতের তুরপুণ, টেনে ধরবার জন্য বিভিন্ন ওজন, বাঁশ, পেটে ঢোকাবার জন্য জলের পাইপ ও পিতলের ফানেল, এবং আরও অনেক ধরনের যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র যেগুলো আসামীদের জেরা করার কাজে লাগে। সমস্ত জিনিসই দুজন ঘাতকের দায়িত্বে ছিল যাদের দুজনেই ছিল বোবা ও কালা—ফলে আসামীদের মুখ থেকে বার হওয়া কোন কথা বাইরে যাবার কোন সুযোগ ছিল না।

প্রধান ঘাতক একজন বয়স্ক বিবর্ণ লোক, পাতলা ঠোঁট, চেপ্টা লাল নাক

এবং কোন উজ্জ্বলতা নেই, মিষ্টি কিন্তু স্থির চোখ কোটরে ঢুকে আছে ; সহকর্মীর সাহায্যে পীড়ন-যন্ত্র তৈরি করছিল ; সহকর্মী একজন কুঁজওয়ালা বেঁটে, বিরাট ঝুলে-পড়া হাত ; সে চাবুকগুলো পরীক্ষা করছিল ; প্রত্যেকটি চাবুক হাতে তুলে ওজন দেখছিল এবং একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে রাখছিল। এদিকে পা দিয়ে বেলো চালিয়ে নিপীড়নের জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বালাচ্ছিল।

দেয়ালের কাছে একটা বিরাট আরামকেদারায় রাজপুরুষ বসেছিলেন দরজার দিকে মুখ করে ও দাঁতের মধ্যে হুঁকার নল নিয়ে। সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর কাগজগুলো জড়ান অবস্থায় পড়ে ছিল এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের হাত গণনার টুকিটাকি জিনিষগুলোও টেবিলের উপর ছিল। রাজপুরুষের পায়ের কাছে বসেছিল তাঁর কেরানী ও তার পাশে হিংস্র মুখে হাসি টেনে বসেছিল মোটা লোকটা যার পক্ষে এই দুর্গে জেরা করা ছিল একটা অনুষ্ঠানের মত।

সত্যি বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে খোজা নাসিরুদ্দিনের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। "ও আমার গুলজান, আমার কচি বাচ্চারা, আমার কি আর তোমাদের দেখার ভাগ্য হবে!" তিনি চিন্তা করলেন।

মোটা লোকটার আদেশে প্রধান ঘাতক খোজা নাসিরুদ্দিনের জামা খুলে ফেলল এবং মাংসল হাতে খোজার পিঠটা আস্তে ও আদরের সঙ্গে চাপড়ে দিল।

বেঁটে লোকটা একটা চাবুক বেছে নিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কাজ সুরু হবার আগে রাজপুরুষ কাগজগুলো পড়তে ও উল্টাতে লাগলেন ও নখ দিয়ে দাগ দিলেন এবং অশুভ ভঙ্গিতে হেসে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

শেষে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন।

"তুমি নিজে নিশ্চয়ই জান তোমাকে ধরার ও জেলে রাখার কারণ। আমি তোমার সম্বন্ধে সব কিছুই জানি, তোমাকে দীর্ঘ দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন তোমার দুষ্কৃতিগুলো ও তোমার সত্যিকারের নাম বল।"

এটা অবশ্য খোজা নাসিরুদ্দিনের জীবনে প্রথম জেরা নয়। সময় নেবার জন্য তিনি চুপ করে রইলেন।

"তুমি কি জিভের ব্যবহার ভুলে গিয়েছ?" চোখ ছোট করে রাজপুরুষ বললেন। "অথবা সব গুলিয়ে ফেলেছ? আমাকে কি তোমার স্মৃতি শক্তি সজীব করে তুলতে হবে?"

মোটা লোকটা চিবুক তুলে চোখের পলক না ফেলে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চেয়ে রইল।

কুঁজো ঘাতকটা এক পা পিছনে সরে এসে চাবুক তুলে ধরল।

খোজা নাসিরুদ্দিন ভয়ে মুষড়ে পড়েননি বা পিছনে সরে আসেননি, কিন্তু মনে মনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তিনি অনিশ্চয়তার এক অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছেন।

একটা ভয়ই বার বার তাঁর মনে হচ্ছিল যে তাঁকে হয়ত চিনে ফেলা হয়েছে।

কাগজগুলোয় যদি তাঁর নাম লেখা থাকে তাহলে কি হবে?

যদি তাই হয় তাহলে তাঁর সর্বনাশ হবে।

কিন্তু কি করে তাঁকে চিনতে পারল?

তবে কি এক-চোখো সব কিছুর পিছনে আছে? সে কি ঘোড়া দুটোকে বিক্রী করেছে, সেই সঙ্গে রক্ষককেও? ধর্মের পথে প্রবেশ করার আগে তার শেষ পাপ কাজগুলোর এটাও কি একটা?

খোজা নাসিরুদ্দিনের জায়গায় অন্য কোন সাধারণ লোক একই চিন্তা করত এবং এইভাবে তার বিচলিত মনকে সান্ত্বনা দিত এবং একটা ভীত দৃষ্টি বা পাগলের মত হাসি দিয়ে ভয় প্রকাশ করত এবং অবশ্যই তখন তার দুর্বলতা বা অবিশ্বাসের জন্য তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। এমন কি তখন ঘাতকদের সামনে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কথা বলবার মত শক্তি পেলেন ও অবিচলিত ভাবে বললেন, "না!"

আত্মবিশ্বাসই সেদিন তাঁকে বাঁচাল এবং তাঁকে গলা পরিষ্কার করে রাজ-পুরুষকে কথার উত্তর দিতে সাহায্য করল:

"জাঁহাপনা, আমার ভাগ্য গণনায় কোন ধাপ্পা ছিল না।"

উত্তর ছিল অত্যন্ত সোজা ও অকৃত্রিম কিন্তু আসলে এটা ছিল যেন একটা ফাঁদ। অনেক সময় জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে যখন একটা খরগোস একটা নেকড়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলে।

"গণনা সত্যি!" মুখ ভেঙ্গিয়ে রাজপুরুষ বললেন। "তোমার গণনা একটা জিনিসই প্রমাণ করেছে যে তোমার পেশার অন্য লোকেরা সকলে মিলে যতটা বদমাস তুমি একাই ততটা বদমাস।"

আল্লার জয় হোক, তিনি সবার উপরে—রাজপুরুষ তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি তাহলে খোজাকে সত্যিই জ্যোতিষী ভেবেছেন। তাহলে তাঁর আসল নাম নিশ্চয়ই কাগজে লেখা নেই।

একটা ভারী পাথর যেন খোজা নাসিরুদ্দিনের বুকের উপর থেকে সরে গেল। যেন প্রথম লড়াইয়ে জয় হলো তাঁরই।

"আমার মহান প্রভু নিজেই লাগাম দেখেছেন," সুযোগ বুঝে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন। "আমি জোরের সঙ্গেই বলছি যে ঘোড়া দুটো গুহাতেই ছিল। ঘোড়সওয়াদের উপস্থিত হওয়ার এক মিনিট আগেও তারা সেখানে মনের আনন্দে দানা চিবাচ্ছিল।"

এটা ছিল রাজপুরুষের জন্যে দ্বিতীয় ফাঁদ; তিনি সোজা ফাঁদে এসে ঢুকলেন।

"তাহলে তারা সেখানে ছিল না কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন:

"কারণ আগের দিন গলা-কাটা সেতুতে কথোপকথনের সময় আমি একজনের চোখে এক উদগ্র ইচ্ছা দেখতে পেয়েছিলাম তা হচ্ছে ঘোড়া দুটোকে তার মনিবের কাছে যেন তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া না হয়।"

রাজপুরুষ ধরাশায়ী হলেন।

তিনি অবাক হলেন।

তিনি কাশতে সুরু করলেন।

তিনি মোটা লোকটা ও কেরাণীর দিকে অস্বস্তির সঙ্গে চাইলেন।

ধীরে ধীরে তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

তাঁর দৃষ্টি আবার আগের রূপে ফিরে এল। সেই দৃষ্টিতে তিনি যেন পড়লেন: "বিপজ্জনক, নইলে তার সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে!"

গাদা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে তিনি ভাঁজ খুললেন এবং খোজা নাসিরুদ্দিনকে তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহী ইয়ারমতের সম্বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেন—প্রশ্নদাতার পক্ষে একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন যার ফল হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী বিপদ।

খোজা নাসিরুদ্দিন রাজপুরুষের হাব-ভাব বুঝতে পারলেন।

"আর অন্য চোখে, যে চোখে শাসনের অগ্নিশিখা প্রকাশ পাচ্ছিল না, কিন্তু যেটা অর্থের চিন্তায় অভ্যস্ত, সেই চোখে এই হীন জ্যোতিষী নৈতিক চরিত্রহীন অসাধারণ সুন্দরীর প্রতি সন্দেহ দেখেছে। এই সন্দেহ থেকে আসবে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে প্রতিহিংসার চেষ্টা এবং সেখান থেকে উঠে আসবে বিপদ যা তেজস্বী ও মহান প্রভুর অজান্তে তাঁর মাথার উপরে ইতিমধ্যেই ঝুলছে।"

ভয়ানক একটা আঘাত!

রাজপুরুষের দম বন্ধ হয়ে এল।

তাঁর হাতের কাগজ কেঁপে উঠল ও আপনা থেকেই গুটিয়ে নিচের থেকে উপরে উঠতে লাগল।

বিদ্যুতের মত তিনটে দৃষ্টি—একটা জ্যোতিষীর দিকে, একটা মোটা লোকটার দিকে, একটা কেরানীর দিকে।

সব কিছুর আগে এই প্রত্যক্ষদর্শীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে!

দ্রুত গতিতে তিনি একটা কাগজ তাঁর জামার আস্তিনে ঢুকিয়ে দিলেন, পরে একটা উগ্র অসন্তোষের সঙ্গে মোটা লোকটাকে বললেন; নামাঙ্গানের শাসন-কর্তার চিঠি কোথায়—কই দেখতে পাচ্ছি না?

মোটা লোকটা তাড়াতাড়ি তন্ন তন্ন করে কাগজগুলো খুঁজতে লাগল। স্বভাবতঃই চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছিল।

"চিরদিন তুমি সবকিছু মিশিয়ে ফেল, পরে ভুলে যাও," অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রাজপুরুষ বললেন। "যাও খুঁজে দেখ।"

মোটা লোকটা চলে গেল।

পরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাজপুরুষ মনে মনে কিছু ভাবলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন:

"উঃ, আমি ভুলে গিয়েছি! কেরানী, ছুটে যাও এবং গিয়ে বল যে আমার জন্য যেন শাহিমর্দান মসজিদের মোল্লার বিবরণীটাও খুঁজে নিয়ে আসে।"

কেরাণীও তখন চলে গেল।

দুর্গের প্রকোষ্ঠে তখন তাঁরা মুখোমুখি। কালা ও বোবাকে অবশ্য ধরা হল না।

"ওখানে কি আজেবাজে বলছিলে, জ্যোতিষী!" রাজপুরুষ খোজা নাসিরুদ্দিনকে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে বললেন। "গতকালের গাঁজার প্রভাব, মনে হয়, এখনও তোমার মাথা থেকে দূর হয়নি। এক অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে, হিংসা, শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা, আরও কত কিছু—এসব প্রলাপের অর্থ কি?"

তিনি ভাণ করলেন যেন কিছু শোনেননি বা বোঝেননি।

খোজা নাসিরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চালবাজি নষ্ট করে দিলেন।

"আমি বণিক রহিমবাই ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আরজি-বিবির কথা বলছিলাম

এবং আরও একজন তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলছিলাম যাকে আমার প্রভু খুব ভাল ভাবেই জানেন।"

একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিরাজ করছিল।

জয় সুনিশ্চিত। খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন তাঁর চোখ দুটো জলজ্বল করছে ও গরম হয়ে উঠেছে।

রাজপুরুষকে যেন দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে পিষে ধ্বংস করা হল। তিনি কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে হুকাটা জড়িয়ে ধরলেন। জড় হুকাটা যেন জলের শব্দের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিল কিন্তু ধোঁয়ার কোন কুণ্ডলি বার হচ্ছিল না। খোজা নাসিরুদ্দিন ছুটে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে এক টুকরো কয়লা তুলে নিলেন এবং কলকেতে রেখে কোন রকম উৎসাহ না দেখিয়ে ফুঁ দিতে সুরু করলেন যাতে রাজপুরুষ আবার যুক্তি করার ক্ষমতা ফিরে পায় এবং মোটা লোকটা আসার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে পারেন।

তাঁর পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল। রাজপুরুষ আবার হুকায় টান দিতে সুরু করলেন এবং ধীরে ধীরে বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে লাগলেন।

তাঁর সামনে তখন একমাত্র পথ ছিল—জ্যোতিষীর সঙ্গে মীমাংসায় আসা।

যাইহোক তিনি তখনও আত্মসমর্পণ করেননি এবং ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন।

"জ্যোতিষী, কোথায় এই গালগল্প শুনেছ? দেখছি, তুমি সেতুর উপর বুড়ো মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাস।"

"আমার একটিই মাত্র বুড়ো মেয়ে আছে যার সঙ্গে প্রায়ই গল্প করি।"

"আচ্ছা, তার নাম কি, দেখতে কেমন, জলদি বল, কোথায় সে থাকে? আমি তার সঙ্গেও কথা বলতে পারলে আনন্দিত হব।"

"আমার পুরানো জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বই—এটা আমাকে সব কিছু বলেছে এবং আমি এর সত্যতা বণিকের চোখে যাচাই করেছি।"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে এই বইয়ের সাহায্যে তুমি সব গোপন তথ্য বার করতে পারবে? ছোট ছেলেদের রূপকথা?"

"আমার মহান প্রভু যাতে খুশী হবেন। আপনি ইচ্ছা করলে আমি চুপ করে যেতে পারি। কিন্তু আগামী কাল যদি খানের কানে কথাটা যায় তবে কি হবে? কারণ বণিক যদি তার বিবাহিত স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজদরবারের আশ্রয় নেন।

আঘাতের পর আঘাত, প্রত্যেকটা আগেরটার চেয়েও ভয়ানক!

বিশেষ করে রাজপুরুষের পক্ষে এই দিনটি ছিল অত্যন্ত খারাপ; রাজপ্রাসাদের চিকিৎসকের ভয়ংকর ছবিটা তাঁর সামনে ভেসে উঠল এবং ধারালো ও নিষ্ঠুর ছুরির স্পর্শে তিনি যেন থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

সম্ভবতঃ বণিক ইতিমধ্যেই তার অভিযোগ ঠিক করে নিয়েছে? সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদে ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে?

দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে আসবে সর্বনাশ।

কৃত্রিমতা ও চালবাজি দূরে সরিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেওয়াই ভাল।

"ঠিক আছে, জ্যোতিষী, তোমার ভাগ্য-গণনা করার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে," রাজপুরুষ বললেন, গলায় মিত্রতার সুর এনে। "তুমি আমার প্রয়োজনে আসবে—বুঝতে পারছ? আমি তোমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিব, তোমাকে পুরস্কৃত করব এবং মাথার খুলিওয়ালা ঐ থুরথুরে বুড়োটার বদলে তোমাকে প্রধান জ্যোতিষী করব।"

খুলির অধিকারী বুড়োটাকে তার গুহা থেকে বার করে দেওয়ার কোন ইচ্ছা খোজা নাসিরুদ্দিনের ছিল না, অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচারও ছিল না। এই অনুগ্রহের জন্য তিনি রাজপুরুষকে ধন্যবাদ জানালেন এবং মাথা নীচু করে তাঁর অসীম বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেন।

"বাঃ!" রাজপুরুষ বললেন। "তুমি সত্যিই বলেছ—প্রভুভক্তি। জ্যোতিষী, তুমি ও আমি পরস্পরকে বুঝতে পারছি। তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তোমাকে গ্রেপ্তার করার ও জেলে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমার হুকুম ছিল অনেকটা অন্ধ আদেশ ও খানিকটা ছল। আমি গতকাল যখন তোমায় দেখি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি তোমার বৃত্তিব অন্যান্য লোকের অনেক বেশি পারদর্শী। তোমার মত লোকেরই আমার প্রয়োজন, সেইজন্যই তোমাকে আজ এই প্রকোষ্ঠে ডেকে পাঠিয়েছি। আসল কথা হচ্ছে আমি আমার সহকর্মী ঐ মোটা লোকটাকে বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস খুব শীঘ্রই সে নিজের কান নিজেই ছেঁদা করবে, পেট জল পোরা পাইপ ও ভারী ওজনগুলো নিজের শরীরেই লাগাবে। তাকে সমস্ত ঘটনা থেকে দূরে সরানর জন্যই আমি হুকুম দিয়েছিলাম তোমাকে গ্রেপ্তার করার; আমার মনে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও গোপন উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে সকলের অলক্ষ্যে তোমার সঙ্গে গোপন কথা

বলা, যেমন-টি এখন আমরা করছি, কারণ খুব বেশি দেরি নয় যখন আমি ঐ মোটা লোকটাকে ফাঁসির মঞ্চে পাঠাব, তুমি তার স্থান নিতে পারবে—অবশ্য এই সর্তে যে তুমি আমার প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বস্ত থেকে নিজের কর্তব্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতে পারবে······।"

অনেকক্ষণ ধরে এই সব মিথ্যা ও অসংলগ্ন বক্তৃতা দিয়ে তিনি অমূল্য সময় নষ্ট করলেন যখন মোটা লোকটার আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছিল। খুব বেশি কষ্ট না করে শেষে তিনি এই সব প্রলাপ প্রয়োজনীয় পথে চালাতে সমর্থ হলেন।

"এখন থেকে তুমি প্রধান জ্যোতিষী," রাজপুরুষ ঘোষণা করলেন। "বৃদ্ধ লোকটা তার চেলা-চামুণ্ডাদের আয় থেকে এক-দশমাংশ দাবী করত, কিন্তু তুমি তোমার দাবী দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে পার। অলস বদমাসদের করুণা করার কোন কারণ নেই—তারা সেখানে বসে বসে দিব্যি মোটা হচ্ছে, তুমিই কেবল আমাকে বিপদ থেকে সাবধান করেছ। তাদের কাছ থেকে এক পঞ্চমাংশ চাইবে, যদি তারা গোলমাল করে আমাকে জানাবে—আমি তাদের শান্ত করে দিব। এখন জ্যোতিষী, আমাদের দেখতে হবে কখন বণিক অভিযোগ করতে ইচ্ছা করেছে। সম্ভবতঃ কাল ?"

"না, অত তাড়াতাড়ি নয়। এখনও তার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। সে অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না আমার মহান প্রভু ইচ্ছা না করছেন······।"

"সে বৃথাই অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে কি করে এটা জানতে পারল ? আমার শত্রুদের কে তার কানে তুলেছে ? তুমি কি এটা বার করতে পারবে ? অঁ্যা ?"

"যদি আমার বই দেখতে পাই যেটা ঐ থলিতে আছে।"

"নিয়ে নাও।"

"খোজা নাসিরুদ্দিন থলি থেকে বিখ্যাত বইটা বার করলেন, খুললেন এবং চীনা অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন যেন পুরোনো বন্ধুদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন ; মনে করলেন যেন তিনি তাদের এখন আরও ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন।

"আচ্ছা ?" রাজপুরুষ অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। "ওরা কি কথা বলছে না চুপ করে আছে ?"

এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাগ্য গণনার উপযোগী কবরখানার মত নিস্তব্ধ

গাম্ভীর্য কণ্ঠস্বরে নিয়ে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন ভুরু কুঁচকে ও পেট ফুলিয়ে বললেন।

"শুনুন!" পাঁচালীর সুরে বললেন। "আমি দেখতে পাচ্ছি দিনের শেষে সূর্য ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমি একটা বাজার দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা দোকান দেখতে পাচ্ছি যার ভিতরে মোটা বণিক রহিমবাই বসে আছে। আমি একটা ঢোলের শব্দ এবং প্রহরীদের চীৎকার শুনতে পাচ্ছি। সামনে এগিয়ে এলেন এক ক্ষমতাবান ও মহান ব্যক্তি। আমি তাঁর দৃপ্ত দৃষ্টি তাঁর রাজকীয় গোঁফ দেখতে পাচ্ছি। তিনি ঘৃণিত বণিককে দেখতে ইচ্ছা করলেন ও তাঁর কাছে নেমে এলেন। তাঁরা চা খেতে খেতে কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার কথা, আরব ও তুর্কী ঘোড়ার কথা বললেন। কিন্তু এ কোন অপদেবতা? মনে হল যেন রাতের আকাশের রাণী নিজেই পৃথিবীতে নেমে এলেন। কোন ভাষাতে উপযুক্তভাবে বণিকের দোকানে উপস্থিত সেই সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করা যাবে? সে ধীরে ধীরে পাছা দুলিয়ে উপস্থিত হল যা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে ও যুক্তি স্তব্ধ করে দেয়। তার মুখ একটা ওড়না দিয়ে ঢাকা, কিন্তু সকালের নরম আলোর মত কোমল গায়ের রং এবং প্রবালের মত তার ঠোঁট দুটো সিল্কের ওড়নার ভিতর থেকে যেন জ্বলছিল। দেখ, নীচ বণিক তার টাকার থলি খুলে ভিতর থেকে অনেকগুলো রত্ন বার করল। পরে, পরে······ঐ খানেই রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, কপট ফাঁদ!"

তিনি রাজপুরুষের দিকে চাইলেন। রাজপুরুষের সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তাঁর গোঁফটা দুলে উঠল, জিভটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কথা বলার কোন শক্তি ছিল না।

"ও কুখ্যাত বণিক!" যেন বিরক্তির সঙ্গে বইয়ের কাছ থেকে সরে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন। "ও নীচ ফেরিওয়ালা! সে তার স্ত্রীকে জড়োয়াগুলো পরতে বলল, সে তাকে মহান প্রভুর সামনে মুখের ঢাকা খুলতে বলল। আমি দেখছি উজ্জ্বল সূর্য ও দীপ্তিমান চাঁদ পরস্পরের প্রশংসা করছে। দুজনের হৃদয় পারস্পরিক কাম-ইচ্ছায় ভরে উঠল। তারা জ্বলতে লাগল, এক জন অন্যজনকে পেতে ইচ্ছা করল, তারা ইচ্ছা ভুলে গেল, তাদের আকুল দৃষ্টি বিশ্বাসঘাতকতা করল, গালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ রক্ত তাদের পাপ ঘোষণা করল! স্বর্গীয় গোপনতা প্রকাশ পেল, আবরণ ঘুচে গেল। সেই নীচ

বণিক, জঘন্য গুপ্তচর, সেই পাপী ও পরশ্রীকাতর দৈত্য, পরের প্রণয় নষ্টকারী দুরাত্মা, তার নীচ উদ্দেশ্য সফল করল। সে তাদের দৃষ্টি-বিনিময়ে বাধা দিল, তাদের জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে শুনল, তাদের হৃদপিণ্ডের ওঠা-নামা শুনল। সে তার সন্দেহে অবিচলিত এবং তার সাপের মত কুটিল মনে হিংসার হিস হিস শব্দ শুনতে পেল। সে প্রতিশোধ নেবে ঠিক করেছে কিন্তু তার সহৃদয় ব্যবহারের অন্তরালে তার কুটিল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখেছে।"

"সে তাহলে এই চায়!" রাজপুরুষ বিড়বিড় করে বলে উঠল। "সত্যি বলতে কি, আমি ভাবতেও পারিনি যে ঐ নেকড়েটা এত ধূর্ত হবে। আল্লার দয়ায়, জ্যোতিষী, তুমি যদি সেই দোকানে চতুর্থ ব্যক্তি হতে তবে সব নিজের চোখেই দেখতে পেতে। এখন থেকে তোমার কাজ হবে বণিকের উপর লক্ষ্য রাখা। তার উপর সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টি রাখতে এবং তার যে কোন রকম উদ্দেশ্য জানলেই এসে জানাবে।"

"তার কোন উদ্দেশ্য আমার দৃষ্টি এড়াবে না। যত শীঘ্র আমি এই জেল ছেড়ে যাই···"

"সন্ধ্যার দিকে তুমি ছাড়া পাবে, তাড়াতাড়ি ছাড়া সম্ভব নয়, কারণ খানের কাছে আগে সমস্ত বিবরণ দাখিল করতে হবে।"

"যদি খান রাজী না হন?"

"তার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

"আর একটা কথা, জাঁহাপনা : কিছু খরচ হবে।"

"ছাড়ার সময় তুমি প্রথমে দু হাজার টাকা পাবে।"

"যদি তাই হয় তবে জাঁহাপনার সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

দরজায় শব্দ হল এবং সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মোটা লোকটা এবং কেরানী কোন কাগজ খুঁজে না পেয়ে ফিরে এল। পীড়নযন্ত্রের নীচে জ্যোতিষীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে না দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল; তার বদলে অক্ষত শরীরে রাজপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন কি হাসতে দেখল, অবশ্য তার চোখের দিকে চেয়ে দুর্বোধ্যভাবে হাসছিল।

"এই লোকটিকে উপরে নিয়ে যাও এবং দেখবে তার প্রয়োজন মত সব কিছু যেন তাকে দেওয়া হয়," রাজপুরুষ মোটা লোকটিকে আদেশ দিলেন। "এটা একটা বিশেষ মামলা যার তদন্ত বিবরণী আমি নিজেই খানের কাছে দেব।"

মোটা লোকটি খোজা নাসিরুদ্দিনকে দুর্গের উপরের একটি ঘরে নিয়ে এলেন যেখানে মেঝের উপর কার্পেট পাতা ছিল এবং একটা নরম কোচের উপর গদি লাগান ছিল, এমন কি একটা হুঁকাও ছিল। একটা থালার উপর পোলাও খোজা নাসিরুদ্দিনের সামনে রাখা হল এবং তিনি মোটা লোকটির অকম্পিত দৃষ্টির সামনে সবটা খেয়ে নিলেন।

একটা শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করা হল এবং একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, যদিও জেলখানার নীরবতা না হওয়ায় খোজা নাসিরুদ্দিন আর ভয় পাচ্ছিলেন না।

তিনি কোচে হেলান দিলেন। একটা অবসাদ তাঁর শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল যেন তিনি একটা শক্ত কাজ কিছু আগে করেছেন। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা চিন্তাগুলো তাঁর ব্যস্ত মস্তিষ্কে কোন বিশ্রাম পেল না—তারা রাজপুরুষের পিছন পিছন খানের বিশ্রাম ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করল। "ওরা কি বিবেচনা করবেন? অবশ্য আমার তাতে কিছু যায় আসে না: সুন্দর কামিলবেক নিজের ব্যবস্থা নিজেই করুক।" দূর থেকে উটের গলার ঘন্টার শব্দ তাঁর কানে আসতে লাগল—মনে হচ্ছিল যেন রূপোর পাখা মেলে ঘুম গান গাইতে গাইতে তাঁর বালিশের উপর নেমে আসছে। তাঁর চিন্তার গতি ক্রমশঃ কমে এল। "ঘোড়া দুটো? কোথায় তারা যেতে পারে এবং খুঁজে বার করতে হবে একচোখো এখন কোথায়?" শেষ অস্পষ্ট একটা চিন্তা পাখা মেলে আকাশে উড়ল—সেটা হচ্ছে বণিকের স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তা। "হোরাসানের বাগানের সুগন্ধি ফুল, তোমার প্রণয় আমার জীবন রক্ষা করেছে!" এবং এই শেষ চিন্তাটা শূন্যে মিলিয়ে গেল। খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিজয়ীর শান্ত ঘুমের মত গভীর ঘুমে তিনি আচ্ছন্ন হলেন। এটা বললে হয়তো অসঙ্গত হবে না যে প্রথম সংঘাতের আঘাত তিনি আত্মবিশ্বাস ও মনের জোরে কাটিয়ে উঠলেন—যে দুটোই হচ্ছে যে কোন মহান হৃদয়ের বর্ম স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে হেরাটের ফারিস ইবন হাটাবের কথা মনে পড়ে, সেই পবিত্র চরিত্র ঋষির কথা, যিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে সুখ অর্জন করবার জন্য মানুষের প্রয়োজন খুবই অল্প—একে অন্যকে বিশ্বাস করলেই হবে, কিন্তু একজন নীচ প্রকৃতির মানুষ যার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ, সুখ তার হাতের বাইরে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

"তার মাথাটা কেটে নিলেই ভাল হত। সেই সাংঘাতিক বিদ্রোহীর সঙ্গে আত্মীয়তা যথেষ্ট বিপদের কারণ।"

"আমি সন্দেহের শেষ কারণ পর্যন্ত যাচাই করে দেখেছি, জাঁহাপনা, যে তাদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। জ্যোতিষী ভিন্ন পরিবারের ও ভিন্ন গ্রামের লোক।"

"এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবুও তাদের আত্মীয়তা থাকতে পারে, প্রত্যক্ষ না হলেও যদি ঘোরানো সম্পর্ক হয় তাহলে কি হবে?"

"সে কখনও ইয়ারমতকে দেখেনি। গুপ্তচরেরা তাকে অন্য কারণে ভুল করে ধরেছিল।"

"একবার যখন তাকে ধরে জেলে পোরা হয়েছে তখন নিরাপত্তার জন্তে তার মাথাটা কেটে নাও না কেন? স্থগিত রাথার আমি কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না। পেশোয়ারীদের ঝাড়-ফুঁকের চেয়ে বিদ্রোহ অনেক বেশি বিপজ্জনক। এটা হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। একজন ইয়ারমত আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তার দুষ্কর্ম আমাদের মুখে বলিরেখার দাগ টেনে চিহ্নিত করেছে!"

"জাঁহাপনা, একটা নীচ জ্যোতিষীর ঘৃণিত মাথাটা সংরক্ষণ করে আপনাকে দেখানর মত অসৎ কাজ থেকে আমাকে যেন দূরে থাকতে হয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার মনে ছিল—সেটা হচ্ছে সিংহাসনকে আরও সুরক্ষিত করা।"

"তাহলে বল।"

"আমি যে উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলাম তা হচ্ছে আমার চিন্তাধারার বাহন যেন দুর্বল উটের এক সারি; যাদের আপনার রাজপ্রাসাদের সামনে নিয়ে এলে তারা আপনার রাজকীয় শক্তির সামনে নতজানু হয়ে বসবে এবং আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের উৎস থেকে তাদের পান করতে দেব......"

"থাম, রাজপুরুষ। ভবিষ্যতে এইসব কথা আগে থেকেই কাগজে লিখে নিয়ে আসবে এবং রাজদরবারের উৎসব অনুষ্ঠানের অধিকর্তাকে পড়ে শোনাবে। তাঁকে মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনতে দেবে—আর সেইজন্যই তার মাইনে বাড়ানো হয়েছে।"

"উৎসব অনুষ্ঠানের অধিকর্তাকে—রাজার কানে তুলে দেবার কথা জানাব।"

"তোমার মত আমার কুড়িজন মন্ত্রী আছে এবং প্রত্যেকে দু' ঘণ্টা করে কথা বললে আমরা ঘুমাব কখন ?"

"শুনলাম ও মেনে নিলাম। গত বছর আমরা অনেক কুড়ি মাথা কেটেছিলাম, তার জন্য আমাদের সিংহাসন আরও শক্তিশালী হয়েছিল—সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

"তাহলে দেখতেই পাচ্ছ। সব সময়েই এটা সাহায্যে আসে।"

"যদি রাজকীয় ক্ষমার একটা উদাহরণ এই সময় তুলে ধরা যায় তবে কি আরও সাহায্যে আসবে না ? আমরা যদি জ্যোতিষীকে ছেড়ে দিই এবং শহরের প্রজাদের ঢোল-সহরৎ দিয়ে জানিয়ে দিই তবে এটা ধরে নিলে কি যুক্তিপূর্ণ হবে না যে প্রজাদের বুক আনন্দে ভরে উঠবে এবং উল্লাসে চীৎকার করে উঠবে, "উঃ আমরা কি সুখী, আমাদের কি ভাগ্য যে এমন একজন শক্তিশালী অধিপতির অধীনে বাস করি, বসন্তের সূর্যের উত্তাপের মত যিনি আমাদের আরাম দেন······"

"ওটা কাগজে লিখে রাখ এবং নিচে গিয়ে পড়বে। যাও।"

"এইভাবে জাঁহাপনা প্রজাদের মনে নতুন করে সমর্থন পেলেন।"

"আমার মনে হয় তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু এই জ্যোতিষীও কম বিপজ্জনক নয়, যদি সে আত্মীয় হয়······"

"এই বিপদ সহজেই কাটান যায়, জাঁহাপনা। প্রথমে তাকে ছাড়া হবে পরে ঢোল-সহরৎসহ দূর দূরান্তরে ঘোষণা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জীবন-ভিক্ষা। পরে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে আবার মাঝ রাতে তাকে ধরে এনে আমার ঘরে তার মাথা কেটে ফেলা হবে, তখন কোন শব্দই বাইরে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র সাবধানতা। প্রথম কাজটি হবে প্রকাশ্যে, দ্বিতীয়টি হবে গুপ্তভাবে। গৌরবের জন্য ক্ষমা ও সাবধানতা হবে একে অন্যের পরিপূরক এবং আমাদের মহান অধিপতির মুকুটে দুটো অসাধারণ রত্নের মত ঝলমল করবে······"

"এ সবকিছুই উৎসবের অধিকর্তাকে নিচে বলবে। তোমার বলা শেষ হয়েছে ?"

"আমার তুচ্ছ চিন্তার পাত্রের এটা কেবলমাত্র নীচের অংশ, জাঁহাপনা।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যা ক্রমশঃ হয়ে আসছে। তোমার কথায় আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি। আমি তোমার পরিকল্পনা অনুমোদন করছি।"

"আমার মহান অধিপতির দয়ার দৃষ্টি আমার মনে আনন্দের শিখা জ্বালায়! আমি এই মুহূর্তেই জ্যোতিষীর মুক্তির জন্য একটা ফরমান জারী করব এবং কাল সকালেই ঘোষকরা খানের ইচ্ছার কথা প্রজাদের জানিয়ে দেবে।"

"সুতরাং তাই হোক!"

সন্ধ্যার দিকে খোজা নাসিরুদ্দিন নতুন পোশাক, নতুন জুতো এবং ঝুলির মধ্যে বেশ ভারী টাকার থলি (সবই রাজপুরুষের দান) নিয়ে তাঁর কারাগার ত্যাগ করলেন।

তিনি দুর্গের ফটক থেকে সোজা শহরের কেন্দ্রস্থলে এলেন যেখানে সন্ধ্যার কাঁপা কাঁপা ছায়া ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে।

ফটকের বাইরে প্রথম যে ব্যক্তিকে তিনি প্রথম দেখতে পেলেন সে হচ্ছে দামী পোশাক পরিহিত মুদ্রা-বিনিময়কারী, তাঁর তবকের পিতলের পাতটি বুকে লাগান ছিল আর হাতে ছিল লাগামটা। রাজার কাছে অভিযোগ দাখিল করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করার আশায় সেখানে তিনি পায়চারি করছিলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিনকে দেখতে পেয়ে ঘামে ভর্তি তাঁর মোটা মুখটা আনন্দে চক্চক্ করে উঠল:

"তোমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, গণক!, উঃ, কি আনন্দ! আমার ঘোড়া তাহলে আমাকে ফেরত দেওয়া হবে। আমি একটা অভিযোগ খসড়া করিয়েছি যার জন্য আমার লেখককে বার টাকা দিতে লেগেছে। এই যে তুমি ইচ্ছা করলে পড়তে পার।"

"আমি কেবল চীনা ভাষা পড়তে পারি।"

"এখানে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো তোষামোদ করার জন্য লেখা হয়েছে; আমি আবেদন করেছি যেন ঘোড়া পাওয়ার আগে তোমার ধড় থেকে মাথা আলাদা না করা হয়। দেখ আমি তোমার কত শুভাকাঙ্ক্ষী।"

"সব কিছুই বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমার কৃতজ্ঞতা নেবেন, বণিক।"

"তাহলে চল যাই, তুমি ভাগ্য-গণনা সুরু কর; সম্ভবতঃ এখনও তোমার রাত হওয়ার আগে ঘোড়া দুটো বার করা সম্ভব হবে।"

"এত তাড়া কেন? আমি তাড়া পছন্দ করি না। যদি তুমি ধড় থেকে আমার মাথাটা খসে যাওয়া বন্ধ করতে পার তবে ঘোড়ার খোঁজ করাটাই বা আমরা স্থগিত রাখতে পারব না কেন?"

"কি বলতে চাইছ? ঘোড়ার অনুসন্ধান বন্ধ রাখতে চাইছ? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে, আর মাত্র তিন দিন পরে ঘোড়দৌড় সুরু হবে?"

"খানের কাছে যেতে চেষ্টা কর: সম্ভবতঃ ঘোড়দৌড় বন্ধ রাখতে তাঁর মত পাবে এবং দু'এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দেবেন।"

ফটকের কাছে কাল-বিলম্ব না করে খোজা নাসিরুদ্দিন বাজারের দিকে চললেন যেখানে ঢাকের আওয়াজ অস্তগামী সূর্যকে বিদায় জানাচ্ছিল।

"সাবধান, গণক!" রাগে মুখ লাল করে বণিক ফোঁস ফোঁস করে উঠলেন। "বুঝতে পেরেছি তুমি ঘুষ খেয়েছ এবং জানি কে খাইয়েছে। রাজদরবারে আমার পরিচিত বন্ধু আছে এবং এই ফটক নিশ্চয়ই একদিন আমার জন্য খুলবে; সেদিন, ওঃ জ্যোতিষী, সেদিন তোমার ও তোমাকে যে ঘুষ খাইয়েছে দুজনের পক্ষেই না কি দুর্ভাগ্যের দিন হবে!"

খোজা নাসিরুদ্দিন তখন তাঁর শ্রবণ-দূরত্বের বাইরে, ফলে এই ভয় দেখানো কথাগুলো শুনতে পেলেন না।

তাঁর পথের দুই পাশ ছিল খাড়া ও উঁচু এবং তাদের ছায়া এসে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন উপকথার দৈত্যের শিরদাঁড়া, যে দৈত্যটা তাঁর উপর লাফ দিতে আসছে, কিন্তু কোন অলৌকিক শক্তি রক্ষা করছে এমন এক মায়াবী রাজপুত্রের মত তিনি সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে চললেন। তাঁর মুখটা জ্বলন্ত সূর্যের দিকে ছিল। টুকরো টুকরো বাতাসের মেঘে ঢাকা গিরিশৃঙ্গের পিছনে মেঘগুলোকে আলোয় স্নান করিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল এবং পৃথিবীকে যেন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল যে প্রচণ্ড গরমের পর আগামী কাল সকালে পাহাড়ের উপর থেকে একটা শীতল বাতাস বইবে।

সেদিন রাতে যখন তিনি সরাইখানায় শুয়েছিলেন তখন বেদির মধ্য দিয়ে একচোখোর সঙ্গে শান্তভাবে আলাপ আলোচনা করছিলেন।

"সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে আমি তোমাকে যে বিশ্বাস করেছিলাম তা নষ্ট হয়নি," হাতটা মুখের সামনে চোঙের মত ধরে তিনি বলতে থাকলেন যাতে কথাগুলো পাশে ছড়িয়ে না পড়ে। "এখন আমাকে বল ঘোড়া দুটো গুহায় কেন ছিল না, তাদের কি হয়েছিল?"

"আমি তাদের গুহায় রেখে আসিনি। কারণ গুপ্তচরেরা সর্বত্র ছড়িয়েছিল এবং খনিতেও তারা উঁকি-ঝুঁকি দিতে সুরু করেছিল। সকাল হবার

আগেই কুয়াশার আড়ালে আমি ঘোড়া ছুটো নিয়ে একটা খালি শহরতলির বাড়িতে······”

আলাপ-আলোচনা অনেকক্ষণ চলল যখন রাত বেশ বেশি হয়েছে।

ভবিষ্যতে কি করতে হবে সে সব জেনে নিয়ে একচোখো অদৃশ্য হল।

খোজা নাসিরুদ্দিন উপুড় থেকে চিৎ হলেন, বিরাট একটা হাই তুললেন ও কয়েক মিনিট পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালেই তিনি সোজা গলা-কাটা সেতুতে এসে জানতে পারলেন যে সকলেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী নিযুক্ত হওয়ার খবর জানে।

কি বিরাট একটা পরিবর্তন! আগের সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে তিনি তাদের দেখলেন ক্রীতদাসের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকতে, খোসামোদের স্বরে কথা বলতে এবং বিনয়ের সঙ্গে হাসতে।

মড়ার খুলির অধিকারী সেই হাড় জিরজিরে বুড়োটা অন্য এক গুহায় সরে গিয়েছে। সে গুহাটা ছিল আরও সংকীর্ণ ও অন্ধকার; সেখানে সে একটা দাঁতভাঙ্গা শিকারী কুকুরের মত চাপা গলায় গর্জন করছিল।

তার তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর, যারা গতকালও তার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকত, তার সঙ্গ ত্যাগ করে দল পালটেছে। হাতে ঝাঁটা ও ভিজে কম্বল নিয়ে তারা বড় গুহার ভিতরটা তাদের নতুন মনিবের জন্য পরিষ্কার করতে করতে হৈ-হুল্লোড় করছিল। খোজা নাসিরুদ্দিনের সামনে তারা নত হয়ে অভিবাদন জানাল। তাদের একজন তাঁর হাত থেকে কার্পেটটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দিল, অন্য একজন মাথার পাগড়ী দিয়ে তাঁর জুতোর ধুলো ঝেড়ে দিল, তৃতীয় জন চীন দেশের বইটা নিয়ে ফুঁ দিয়ে ও মলাটে আঁচড় দিতে লাগল যেন ধুলোর কণাগুলো সরিয়ে দিতে চায়।

ইতিমধ্যে রাজপুরুষ নিজেই সেতুতে এসে উপস্থিত হলেন এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে গুহায় গোপন আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি আবার প্রতিশ্রুতির জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করলেন এবং পুরোমাত্রায় তা পেলেন।

“জ্যোতিষী, তুমি কি বণিককে ভালভাবে যাচাই করেছ? তার অসৎ উদ্দেশ্য-গুলো কি অন্তঃস্থল পর্যন্ত পরখ করেছ?”

“হ্যাঁ দেখেছি, জাঁহাপনা। এখন পর্যন্ত কোন বিপদ নেই।”

“ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে, জ্যোতিষী, সতর্ক থাকবে!”

সকলের চোখের সামনে রাজপুরুষ চুমু খাবার জন্য তাঁর হাতটা জ্যোতিষীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন—এই ধরনের অনুগ্রহের উদাহরণ এখানে আগে আর কখনও দেখা যায়নি।

"এখন বল—আগে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম—ঘোড়া দুটোর কি হয়েছিল—কেন তারা গুহায় ছিল না?"

"ঘোড়া দুটো? খুব সোজা—আমি তাদের সরিয়ে রেখেছিলাম।"

"তুমি 'সরিয়ে রাখা' বলতে কি বোঝাতে চাও? তুমি ছিলে সেতুর উপর আর তারা ছিল খনির ভিতর।"

খোজা নাসিরুদ্দিন উদাসীন ভাবে কাঁধ দুটো নাচালেন যেন এটা তাঁর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

"খুব সোজা—আমি মন্ত্র পড়ে তাদের হাওয়া করে দিয়েছিলাম।"

"হাওয়া করে দিয়েছিলে? তুমি তাও করতে পার?"

"এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন ঘোড়া দুটো লাফাতে লাফাতে খনির কাছে এসেছে, আমি তখন বই পড়ে জানতে পারলাম যে চোরেরা ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে মন্ত্রপড়া সোনার কাঁটা ও সিল্কের সুতো নিয়ে পালিয়েছে। সেইজন্যই আমি সাময়িক ভাবে ঘোড়া দুটো ফেরত না দিতে ঠিক করলাম এবং আমার প্রভুর কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তাঁর উপদেশ নিতে মনস্থ করলাম।"

"অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ন্যায় সঙ্গত কাজ!"

"তখন তাদের অদৃশ্য করে দেওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না।"

"ভারী মজার ব্যাপার! তুমি একেবারে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের অদৃশ্য করে দিলে, অ্যাঁ? আচ্ছা এইভাবে বণিককে বাতাসের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য করা কি যেতে পারে? অনেক দূরে ধর বাগদাদ কি তেহেরাণে অথবা বিধর্মীদের দেশে যেখানে তারা বণিককে ক্রীতদাসে পরিণত করবে, পারবে কি?"

"এ ধরনের কাজ আমি পারি না। আমার ক্ষমতা কেবল পশুপাখীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সম্ভবতঃ সেই সময়ে যখন রহস্যের অনুসন্ধানে গভীর ভাবে মগ্ন·

"দুঃখের। খুব দুঃখের! রাজ দরবারে এমন অনেক মানুষ আছে যারা—বুঝলে······"

কল্পনায় তাঁর চোখের সামনে অনভিপ্রেত ব্যক্তিদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অসংখ্য

ছবি ভাসতে লাগল। সবার সামনে ভেসে গেল বণিক, চিৎ হয়ে শুয়ে ভাসছিল, দাড়িগুলো উসকো-খুসকো, চোখ দুটো বড় বড়; ইয়াদগোরবেক তাকে চেপে ধরে আছে এবং সে ছাড়াবার জন্য হাত পা ছুঁড়ছে; পিছনে ঝুলতে ঝুলতে এসেছিল একের পর এক প্রধান উজির, প্রধান রাজস্ব উজির, প্রধান কাজী, রাজদরবারের প্রধান রক্ষক এবং রাজদরবারের অসংখ্য কর্মচারী এবং এই ছবি-গুলোর সবশেষে আকাশে যাকে ভেসে আসতে দেখে রাজপুরুষ অবাক হলেন ও ভয় পেলেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং খান। বসে থাকার ভঙ্গিতে তিনি উড়ছিলেন, শরীরটা সামনের দিকে অল্প ঝুঁকেছিল, মনে হচ্ছিল যেন কোন সংবাদদাতার কথা শোনার জন্য যেই ঝুঁকে কান দুটো তিনি বাড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁকে সিংহাসন থেকে ছোঁ মেরে তুলে নেওয়া হয়েছে; তাঁর পোশাক ছিল বাতাসে ভর্তি এবং উপর দিকে উড়ছিল, ফলে লাল ও সবুজ জরির কাজ করা শালোয়ারে ঢাকা তাঁর শরীরের নীচের অংশ দেখা যাচ্ছিল। সমস্ত কিছুই দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর মাথা ঘুরছিল এবং এই সব লোভনীয় দৃশ্য দেখে তাঁর কান তখনও ভোঁ ভোঁ করছিল; তিনি কাশতে ও বিড় বিড় করে বকতে সুরু করলেন, এবং আশ্চর্য হচ্ছিলেন কি অদ্ভুত অনুভূতির সঙ্গে তিনি সমস্ত জিনিস আকাশে ভাসতে ভাসতে যেতে দেখলেন যা তাঁর বোধশক্তির বাইরে এবং তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়ে হাজির হচ্ছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে জনসাধারণের অসন্তোষ একটা মৃদু গন্ধের মত কোন সাহায্য বা প্রচার ছাড়াই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর চিন্তা জ্যোতিষীর উপর এসে পড়ল: "আমার চোখের সামনে যেসব অদ্ভুত ও ভয়ংকর দৃশ্য দেখা দিল তা এর কোন মন্ত্রে ঘটেছে কিনা আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। সে দারুণ বিপজ্জনক, অনেক কিছু জানে এবং জিনিসপত্র বাতাসে অদৃশ্য করে দিতে পারে। তার কাছে আমার যা যা প্রয়োজন একবার হয়ে গেলেই আমি তার উপর নিরাপত্তামূলক আইন জারী করব।"

রাজপুরুষ সেতু ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে শান্তি বিরাজ করছিল; পরে একে একে জ্যোতিষীর দল উপহার হাতে নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে আসতে সুরু করল। একজন সামনে তাঁর কার্পেটের উপর পঞ্চাশটি রুপোর টাকা রাখল, আর একজন সত্তরটা, পরের জন আরও বেশি, প্রত্যেককেই নিজের আয় অনুযায়ী রাখছিল। এইভাবে প্রথম দিনেই খোজা নাসিরুদ্দিন শাসন-যন্ত্রের ঠিক মাঝের ধাপে তাঁর নতুন অবস্থানের দুটো

প্রধান বৈশিষ্ট্য জানতে পারলেন : প্রথম, উপরের ধাপের লোকদের আশ্বাস দেওয়া এবং দ্বিতীয়, নীচের লোকদের কাছ থেকে উপহার নেওয়া।

মড়ার খুলির অধিকারী বুড়ো জ্যোতিষী শেষে সামনে এগিয়ে এলেন এবং কার্পেটের উপর দেড়শো রুপোর টাকা রাখলেন—প্রত্যেকের চেয়েই পরিমাণটা বেশি। অপসারণের জন্য মর্মান্তিক আঘাত পাওয়ায় তাঁকে বিষণ্ণ ও রুক্ষ লাগছিল এবং দেখে মায়া হচ্ছিল, কিন্তু তিনি বেশ গর্বিত ও উদ্ধত দেখাবার চেষ্টা করছিলেন ; যাইহোক তাঁর মানসিক যন্ত্রণা যে বুড়োর চোখ দুটোর কোণে জলের আকৃতি নিয়েছিল এটা সকলেই দেখতে পাচ্ছিল এবং বুঝতে পারছিল। সেদিন সকালে তিনি তার সবচেয়ে বড় সম্পদ মড়ার খুলিটা বালি দিয়ে পরিষ্কার করে পরে তেল দিয়ে চিকণ করে সকলের চোখ পড়ে এমন এক জায়গায় রেখেছিলেন। খুলিটাই এখন ছিল তাঁর শেষ আশা, তার শেষ আশ্রয়।

বেশ বিচলিত হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বুড়োর টাকাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"এটা নিন। আমার প্রয়োজন নেই।"

বুড়ো ফোঁস করে নিশ্বাস টানলেন এবং তার চোখে একটা বিশ্রী সবুজ আলোর আভা দেখা দিল।

"এটা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তুমি আমার প্রায় সব নিয়েছ, তবুও সে সব কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সম্ভবতঃ তুমি চাইছ আমি তোমাকে খুলিটাও দিয়ে দিই ?"

"আমার প্রয়োজন নেই," খোজা নাসিরুদ্দিন ভদ্রভাবে বললেন। "আপনার টাকা ফেরত নিন, খুলি আপনার কাছে নিভয়ে রাখুন, আমি আপনার কাছে কিছুই চাই না। আমাকে এখন আপনার ভাগ্য গণনা করতে দিন।"

বুড়ো রাগে গর গর করে উঠলেন।

"তুমি আমার ভাগ্য গণনা করবে? আমি এই সেতুর উপর গত চল্লিশ বছর ধরে বসে আসছি! আমি এই খুলির অধিকারী! আর তুমি গতকাল মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে আমাদের সকলকেই লজ্জায় ফেলেছিলে!"

"কিছু যায় আসে না, শুনুন," খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর বই খুলে বললেন। "শান্ত হোন, আপনার দুঃখকষ্ট ক্ষণস্থায়ী এবং ক্রমশঃ দূর হয়ে যাবে। এই মাস শেষ হওয়ার আগে আপনার আগের সম্মান ও উপার্জন আবার ফিরে আসবে। আপনার উন্নতি যে কেড়ে নিয়েছে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে, বসন্তকালের সকালের

কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে এই সেতুর উপর তার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই দীর্ঘ দিন ধরে থাকবে না। যখন তার নাম জানা যাবে······অনেক হয়েছে—চৈনিক অক্ষরগুলো আমার দৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসছে এবং আমি আর কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে এবং এই নতুন লোকটা তাঁকে ঠাট্টা করছে অথবা ভাগ্য-পরিবর্তনের আকস্মিক আঘাত তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে কি না বুঝতে না পেরে, তিনি সেখান থেকে সরে এলেন। তিনি নিজের গুহায় আত্মগোপন করে রইলেন এবং বিষণ্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ভয়ে জড়সড় হয়ে রইলেন।

কিন্তু আরও দুর্ভাগ্য সেদিন তাকে ঘিরে ধরল—তা হচ্ছে তার আগের তাঁবেদারদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ।

"এই, তুমি!" বিদ্রূপের হাসি হেসে তারা চীৎকার করে উঠল। "তোমার পাওনা অংশ আদায় করে নিচ্ছ না কেন?"

"সে আগামী কাল পর্যন্ত এসব বন্ধ রেখেছে।"

"আমাদের আয়ের অর্ধেক অংশ নেওয়ার অধিকার যতদিন না মহামান্য শাসনকর্তা তাকে দিচ্ছে ততদিন সে অপেক্ষা করবে!"

"সে প্রধান জ্যোতিষীর কাজ করতে গিয়ে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে নিজের ইচ্ছায় কাজে ইস্তফা দিয়েছে।"

নিজেরা নীচ এবং নিকৃষ্ট স্তরের জীব হওয়ায় তারা ভেবেছিল যে সকলেই হয়তো একই চরিত্রের হবে এবং একটুকু সন্দেহ করেনি যে তাদের চীৎকার ও বিদ্রূপ খোজা নাসিরুদ্দিনের মনঃপূত হবে না। তারা তাঁকে চীনা বই থেকে ভাগ্য-গণনা করতে শুনেছে এবং নিজেবদের নীচ প্রবৃত্তির বশে তারা এই ভাগ্য-গণনাকে বিজিত শত্রুর প্রতি নিজেদের বিদ্বেষমূলক বিদ্রূপে রূপ দিয়েছে।

"তোমার খুলিটা সরিয়ে নাও, বহু দিন ধরেই এটা আমাদের দৃষ্টিকটু লেগেছে!" নতুন প্রধানকে খুশী করার প্রতিযোগিতায় তারা চীৎকার করে উঠল। "তুমি এটা মানুষের খুলি বলে চালাও কিন্তু যে কেউ এক দৃষ্টিতেই বলে দিতে পারবে যে এটা একটা বাঁদরের খুলি!"

"হ্যাঁ, ঠিকই ত, একটা বাঁদরের!"

"তা ও আবার একটা জঘন্য বাঁদরের!"

বুড়ো মানুষটা সব কিছুই সহ্য করতে পারতেন কিন্তু তাঁর খুলির নিন্দা সহ্য করতে পারতেন না।

"তোমাদের চুল মাথার খুলি ভেদ করে নিচের দিকে মাথার ঘিলু পর্যন্ত বাড়তে পারে; হাকিম, তোমার মত নীচ সাপকে আমার বুকের ভিতর পুষেছিলাম," নিজের গুহার বাইরে থেকে তিনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন। "তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ এই একই সেতুর নিচে ক্ষুধার্ত, নোংরা ও ছেঁড়া পোশাকে তোমাদের আমি দেখতে পেয়ে বন্ধুত্ব করেছিলাম ও ছেলের মত যত্ন করে খেতে পরতে দিয়ে তোমাদের ভাগ্য-গণনা করার কৌশল শিখিয়েছিলাম—এবং এখন আমাকে তোমাদের আর কি প্রয়োজন? আদিল, তুমি কি ভিতরে বাইরে একেবারে পাল্টে গিয়েছ, তোমার নাড়িভুঁড়ি কি বাইরে বাতাসে বেরিয়ে পড়েছে আর একটা বিছা তোমার যকৃতে এসে কামড় দিয়েছে? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ গত বছরের আগের বছর তোমার সাড়ে সাতশো টাকা ধার শোধ করে আমি তোমাকে বেত্রাঘাত ও কারাবাস থেকে রক্ষা করেছিলাম?"

এই কথাগুলো থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন জানতে পারলেন যে এই জঘন্য চেহারার হাড়ের থলি এবং এই ধরনের ভাগ্য-গণনার মত একটা বিশ্রী-পেশায় লিপ্ত—যা গুপ্তচর-বিদ্যার সঙ্গে জড়িত—লোকটা তাঁর ঘৃণিত জীবন-ধারনের অন্তরালে স্বচ্ছ ঝরণার মত দয়া ও সহানুভূতির একটা উৎস বয়ে চলেছেন। তাঁর আগের পদে তাড়াতাড়ি আবার বহাল হবেন এই কথা মনে রেখে ও অকৃতজ্ঞদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবেন ভেবে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করলেন না।

দুপুর ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল, সূর্য জ্বলছিল এবং গলা কাঁচের মত গরম হল্‌কা ছাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেতুর উপরের নুড়িগুলো কুমোরের আগুনের ভাটার মত শুকনো গরম বাতাস ছড়াচ্ছিল, কোন বাতাস বইছিল না এবং গাছগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল; পাখীরা গাছের ছায়ার নীচে লুকিয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

অনেক দূরে ঢাক ও শিঙ্গার আওয়াজ উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-সহরৎ দেওয়া মানুষগুলোর গলা শোনা গেল; অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা সেতুর উপর এসে খানের ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করল। জ্যোতিষীরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল; তাদের নতুন মনিব চারপাশে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। খোজা নাসিরুদ্দিন নিজেও তাদের এই ধরনের

চিন্তাধারার অংশীদার হলেন। সত্যিই সেখানে বেশি হট্টগোল হচ্ছিল যা তিনি পছন্দ করছিলেন না এবং ক্ষমার আড়ালে তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক হবার জন্য সাবধান করল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তিনি আশা করেছিলেন যে ঘোড়দৌড় শুরু হবার আগের যে কোন দিন বণিক সেতুর উপর আসবেন এবং ঘোড়ার খবর নেবার জন্য তাঁকে বিরক্ত করবেন।

কিন্তু তা হয়নি। বণিক একবারও আসেননি। অহংকারের চেয়েও অসন্তোষ বেশি করে তাঁর মন ভরে তুলেছিল এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বা রাজ-প্রশংসা কোনটাই পাবার আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না—এক-মাত্র ইচ্ছা তাঁর হচ্ছিল প্রতিশোধ নেওয়া। রাজপুরুষের স্বরূপ খুলে দেওয়া, শত্রুকে ধ্বংস করা, তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ধুলোয় গুঁড়ো করে দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল; অবশ্য এই সঙ্গে ইচ্ছা হচ্ছিল সেই বদমাস গণকটাকে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

না বললেও চলে যে সেদিন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল রাজপুরুষের তুর্কী ঘোড়া দুটো। তারা ছিল উৎকৃষ্ট, চমৎকার; অন্য ঘোড়াগুলোর প্রায় পাঁচশো হাত আগে আগে তারা বাতাসে লেজ উড়িয়ে উড়ন্ত তীরের মত ছুটছিল।

কানে তালা লাগানো শিঙার ভোঁ ভোঁ শব্দ, ব্যাগপাইপের তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং ছোট বা বড় ঢাকের উন্মত্ত আওয়াজের মধ্য বিজয়ী ঘোড়া দুটোকে একটা সাজানো মঞ্চের কাছে নিয়ে আসা হল যেখানে খান বসেছিলেন। তুর্কী দুটো ঘাড় বাঁকিয়ে লাগামটা জোরে জোরে চিবাতে লাগল এবং মাটির উপর জোরে জোরে পা ছুড়তে লাগল যেন আর একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়ে যাবার জন্য তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাইরের পথটা বার বার প্রদক্ষিণ করছে তবুও তাদের দম নিতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না, তাদের পিঠ এবং শরীরের পাশগুলো শুকনো ছিল এবং ঘামের একটা ফোঁটাও সেখানে ছিল না; তাদের লম্বা পায়ে কোন শিরা কাঁপছিল না বা দপদপ করছিল না।

তাদের প্রশংসা করে খান মৃদু হাসলেন।

সিংহাসনের পিছনে যে আমির-ওমরাহরা বসেছিলেন তাদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন বয়ে গেল।

জয়ের আনন্দে রাজপুরুষ লাল হয়ে উঠলেন, নবাবী চাল দেখিয়ে কাঁধ দুটো নাচাতে ও গোঁফ দুটো মোচড়াতে লাগলেন এবং শরীরটা ডানে বাঁয়ে দুলিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এধার ওধার যাওয়া আসা করতে লাগলেন।

খানের প্রধান ঘোষক সামনে মঞ্চের ধারে এগিয়ে এসে হাত তুলল এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঢাক এবং শিঙ্গার শব্দ থেমে গেল এবং জনতা সামনে মঞ্চের ধারে এগিয়ে এসে চুপ করে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"কোকান্দ ও অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের পরম দয়াময় ও সূর্যের মত উজ্জ্বল সার্বভৌম সম্রাট," গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষক বলে চলল, "যাঁর খ্যাতি পৃথিবীর অন্যান্য সম্রাটদের খ্যাতি ম্লান করে দেয়, আল্লার পরম প্রিয়ভাজন (যাঁর নাম আরও গৌরবান্বিত হোক) এবং পৃথিবীতে যিনি মহম্মদের উত্তরাধিকারী···"

খান উৎসব অনুষ্ঠানের অধিকর্তাকে ইঙ্গিত করতেই তিনি ঘোষকের কাছে এগিয়ে এলেন এবং তার হাত থেকে গুটান কাগজটা নিয়ে সেখানে লেখা অংশের তিন-চতুর্থাংশ আঙুলের নখ দিয়ে দাগ দিয়ে নিজে অন্য সময় দেখার জন্য চিহ্নিত করলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পেতেন। ঘোষক গতানুগতিক ভাবে সুরু করতে না পেরে কিছুটা তোতলাতে সুরু করল, পরে তার বিহ্বল দৃষ্টি একেবারে শেষের লাইনগুলোর উপর পড়তেই আবার বলতে সুরু করল :

"······অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে চল্লিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার অতুলনীয়, সুদেহী এবং দ্রুতগামী······"

"বিচার করুন," জনতার মধ্যে থেকে একটা কাতর আবেদন ভেসে এল। "আমি মহান খানের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যে অন্যায়ের প্রতিবিধান করেন!"

খান ভুরু কোঁচকালেন। দরবারের আমির-ওমরাহদের মধ্যে একটা ভয়ের গুঞ্জন বয়ে গেল। এই সময়ে, একটা উৎসবের মুহূর্তে! এত বড় ধৃষ্টতার কথা আগে শোনা যায়নি!

বণিককে মঞ্চের দিকে যেতে দেবার জন্য জনতা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পাগড়ী না বেঁধে খালি পায়ে এবং বুকের উপর তবক আঁটা দামী জামা গায়ে দিয়ে মুখ আঁচড়ে ও দাড়ির গোছা ছিঁড়ে, এক মুঠো ধুলো মাথার উপর ছড়িয়ে দিয়ে বণিক খানের সামনে নতজানু হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "বিচার করুন!"

রাজপুরুষের কাল গোঁফ দুটো মনে হচ্ছিল যেন মুখ থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে ভাসছে ; তিনি অত্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছেন।

"ওকে তুলে ধর!" খান রেগে বললেন। "নির্বোধটাকে তুলে ধর, সে আজকের উৎসব পণ্ড করে দিয়েছে! তাকে তুলে ধরে আমার সামনে নিয়ে এস।"

প্রহরীরা বণিকের বগলের নিচে ধরে তাকে টানতে টানতে মঞ্চের দিকে নিয়ে এল। তারা সিঁড়ির উপর দিয়ে এত তাড়াতাড়ি টেনে আনতে লাগল যে বণিকের ছুঁড়তে থাকা ছোট ছোট পা দুটো একটা পদক্ষেপও ফেলতে পারল না।

রাজদরবারের আমির-ওমরাহদের মধ্যে আলোড়ন আরও বেড়ে গেল : বণিককে চিনতে পারা গিয়েছে। বাণিজ্য-উজির তাড়াতাড়ি খানের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে খানকে সব বললেন।

"একজন বিত্তশালী বণিক?" অবাক হয়ে খান পুনরাবৃত্তি করলেন। "আর একজন সম্ভ্রমশালী লোক? তাহলে এমন দুরবস্থায় কেন? তাকে আরও কাছে নিয়ে আসতে দাও, তাকে বলতে দাও?"

প্রহরীরা টানতে টানতে তাঁকে আরও কাছে নিয়ে এল। খাবারের বস্তার মত তিনি তাদের ঘাড়ে ঝুলছিলেন ; তিনি কথা বলতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না ; তাঁর মোটা ঠোঁট দুটো গোঁফ-দাড়ির মধ্যে নিঃশব্দে নড়ছিল।

খান অপেক্ষা করতে লাগলেন, দরবারের রাজকর্মচারীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজপুরুষের দম বন্ধ হয়ে এল, তাঁর চোখ দুটো বণিকের উপর স্থির হয়ে জ্বলছিল।

ইতিমধ্যে তুর্কীদের বাজি জেতার খবর আগুনের গোলার মত বাজার, সরাইখানা, ধর্মশালাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল এবং গলা-কাটা সেতুতেও এসে পৌঁছাল।

"বণিক এবার নিশ্চয়ই আসবেন," খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার উপর এত হাজার টাকার ঘোড়াগুলোকে হারাতে নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছা করবেন না।"

আর একবার খোজা নাসিরুদ্দিন ভুল করলেন। বণিক আসেননি। তাঁর বদলে অশ্বারোহী প্রহরীরা লাফাতে লাফাতে এল একটা খালি ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের নাগাল পেয়ে তাঁকে ঘোড়ায়

চাপিয়ে একটা কথাও না বলে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। সমস্ত কিছুই এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে ভাগ্য গণনার উপকরণ যথা তাঁর বই, লাউয়ের খোলা ও অন্যান্য জিনিস গুলিতে পুরবার তিনি সময় পেলেন না।

প্রধান জ্যোতিষীর গুহা খালি পড়ে রইল।

বহুক্ষণ ধরে একটা নিস্তব্ধ বিহ্বল-ভাব সেতুর উপর বিরাজ করছিল। পরে অন্যান্য জ্যোতিষীরা এই নিয়ে আলোচনা ও নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে বসল। কোথায় তাকে নিয়ে গেল? কারাগারে? বধ্য-মঞ্চে? অথবা তাকে আবার কোন উঁচু পদে বসান হবে?

বেশির ভাগই অবশ্য এই সিদ্ধান্তে এল যে তার ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার। তিনজন চাটুকার যারা তাড়াতাড়ি বুড়োকে অস্বীকার করে দল পালটিয়ে ছিল তারা তাদের হঠকারিতার জন্য বিশেষ করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য দুঃখ করতে লাগল।

বুড়োর গুহার দিকে যে প্রথম গেল সে হচ্ছে হাকিম, যে ছেলের মত বুড়োর গুহায় অনেক দিন ছিল।

"হে মহাজ্ঞানী, এই ঘর কি অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে নয়?" সন্তানের মত একটা মিথ্যা উদ্বেগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল। "আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি আমার তুলো লাগান নল-খাগড়ার মাদুরটা আপনাকে দিতে পারি।"

অন্য দুজন চাটুবাক্যে খোসামোদ করতে পিছিয়ে পড়বে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গুহার সামনে এগিয়ে গেল।

"হে জ্ঞানী শিক্ষক!" একজন মধুর মত মিষ্টি সুরে বলল। "একজন অত্যন্ত ধনী বিধবা কাল আমার কাছে উপদেশ নিতে এসেছিল। তার সমস্যা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল এবং আমি বুঝতে পারছি না কি করা যায়। আমাকে অনুমতি দিন যখন সে আজ আসবে তখন যেন তাকে আপনার কাছে সোজা নিয়ে আসতে পারি যাতে আপনি তার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এ থেকে যা কিছু পাওনা সব আপনার। আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য......"

"আর আপনার অতুলনীয় বিদ্যা!" অন্যেরা মাঝখানে বলল।

"আর বিনয়ী ভাব!" প্রথম জন তাড়াতাড়ি বলল।

"আর এই ভবিষ্যদ্বক্তা খুলিটা!" দ্বিতীয় জন ব্যাখ্যা করে বলল।

ইতিমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, হাকিম, নিজের কথা বলার জন্য একটু জায়গা খুঁজে বার করতে চেঁচামেচি করে এধার ওধার লাফালাফি সুরু করতে লাগল।

"দয়ার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!" সে চীৎকার করে উঠল। "গতকাল আপনার মুখে কি সুন্দর একটা বিনয়ের হাসি ফুটে উঠেছিল। আপনি একজন অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন ঋষি। গতকাল যখন আপনি আমার নির্দোষ বিদ্রূপগুলো শুনেছিলেন তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে এসব কৌতুক ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্ররোচিত হয়নি'।"

বুড়ো তাঁর চোখ তুললেন না কিন্তু একটা আনন্দহীন হাসির ছায়া তাঁর শুকনো ঠোঁটের উপর দেখা দিল। প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যটা তাঁর মনে পড়ল, জ্ঞান কখনও উচুতে থাকে না, নীচেই থাকে।" যাইহোক, যত ভয়ংকর কথাই তিনি উচ্চারণ করুক না কেন এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তাঁর জ্ঞান অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। তিনি বললেন:

"যথা সময়ে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি কিছু ভাল কাজ করেছিলাম এবং তার জন্য আজ শাস্তি পাচ্ছি। এই হচ্ছে বেদনাময় পৃথিবীর নিয়ম যেখানে প্রত্যেকটি শুভ কাজের জন্যে কর্মকর্তাকে শাস্তি পেতে হয়।"

বক্তা এবং তার শ্রোতারা এই ভয়ংকর কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারল কিনা সন্দেহ যার পরে—অন্তত: যদি তারা অর্থ বুঝতে পারত—তবে আলোচনা বন্ধ হয়ে যেত; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তারা বুঝতে পারেনি। তারা বিশ্বাস হারিয়েছিল অথবা বৃদ্ধের মত হতাশ হয়ে পড়েছিল, এই ঘটনা-গুলো ছিল তারই ওজর মাত্র।

বণিককে যেমন করেছিল তার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রহরীরা খোজা নাসিরুদ্দিনকে টেনে মঞ্চের উপর তুলে নিল এবং খানের পায়ের কাছে কার্পেটের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সাধারণ লোকের কেউ আর কাছে ছিল না, কৌতূহলী জনতার শেষ লোকটিকেও প্রহরীরা বেত ও লাঠির সাহায্যে মাঠের ধারে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

খোজা-নাসিরুদ্দিন এক নজরেই বুঝতে পারলেন যে বণিক ও রাজপুরুষের মধ্যে এক দারুণ সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। দুজনেই ঘামছিলেন ও তাঁদের লাল দেখাচ্ছিল; দুজনেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করছিল ও হাত কাঁপছিল।

খান নিজেও রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন।

"কখনও না," রাগে গরগর করতে করতে চাপা গলায় তিনি বললেন, "আমার

কোন দিনও কেউ একটা বিশ্রী সামান্য ঝগড়া রাজার কানে তুলে দেবার সাহস পায়নি! তাও আবার প্রকাশ্যে, হাজার হাজার চোখের সামনে! তোমার এই তুচ্ছ অভিযোগ হাজির করবার আর কি কোনও সময় পেলে না?" তিনি ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। "রাজাই বা কেন আনন্দ উপভোগ করে বা ঘণ্টাখানেক খেলা দেখে মনটা একটু হালকা করবে না? তখন তোমাদের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ বা কোন কুৎসা হাজির করে সব কিছু ভণ্ডুল করা হবে?"

ঠিক এই সময়েই তাঁর দৃষ্টি খোজা নাসিরুদ্দিনের উপর এসে পড়ল।

"এ আবার কে?"

"একজন জ্যোতিষী, জাঁহাপনা," বাণিজ্য-উজির আস্তে আস্তে বললেন। "সেই লোকটা সমস্ত কিছুর মূলে···"

"কোথা থেকে আসছে? কি জন্য এসেছে?"

উজির বিবর্ণ হয়ে উঠলেন।

"আমি তাকে এই বিশ্বাসে এখানে ডেকে এনেছিলাম যে মহান জাঁহাপনা হয়ত ইচ্ছা করবেন তাকে প্রশ্ন করতে···শুনতে···যাচাই করতে···ভাবতে···আমি ভেবেছিলাম···"

নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়ে তিনি হাত-পা ছুঁড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন এবং অসহায় ভাবে দরবারের সভাসদদের কাছে সাহায্য পাবার আশায় চারদিকে চাইছিলেন।

কিন্তু কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। সকলেই চুপ করে রইলেন।

"সে বিশ্বাস করেছিল!" রাগে লাল হয়ে খান চীৎকার করে উঠলেন। "সে ভাবছিল! শীঘ্রই আরও কিছু অবাস্তব জিনিস তোমরা বিশ্বাস করবে এবং সমস্ত বাজারের লোক, মেথর, মুদ্দোফরাস এবং ঝাড়ুদারদের সিংহাসনের কাছে ধরে নিয়ে আসবে আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত আলাপ আলোচনা করার জন্য! তোমরা যদি এই বদমাস জ্যোতিষীটাকে এখানে টেনে নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে থাক তবে তোমরাই তার সঙ্গে কথা বল এবং আমাকে সেই সম্মান থেকে রেহাই দাও। হয় তাকে আমাদের সামনে এই মুহূর্তে অভিশপ্ত ঘোড়া দুটোকে বার করতে বল নতুবা তাকে আমাদের প্রতারণা করার অভিযোগ স্বীকার করতে বল এবং তার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি এইখানে মঞ্চের উপর সকলের সামনে ভোগ করতে বল।"

খান চুপ করে গেলেন ও পিছন দিকে গদির উপর হেলান দিলেন ; তাঁর মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

ইতিমধ্যেই খোজা নাসিরুদ্দিন বণিকের দিকে চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টিপলেন ; বণিক এতে ক্ষেপে গিয়ে রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন এবং দাড়ির আর এক গোছা চুল ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু চীৎকার করতে সাহস পেলেন না।

"জ্যোতিষী!" বাণিজ্য-উজির বললেন। "তুমি আমাদের রাজার ইচ্ছা নিজের কানে শুনেছ—সুতরাং তুমি আমার সমস্ত প্রশ্নের খোলাখুলি পরিস্কার ও এড়িয়ে না গিয়ে উত্তর দাও।"

সেইভাবেই খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন—খোলাখুলি, পরিস্কার ও এড়িয়ে না গিয়ে। সত্যি তিনি ঘোড়া দুটো বার করতে চাইলেন। এখন, এই মুহূর্তে এবং খানের সামনে। তিনি বণিককে তার প্রতিশ্রুত দশ হাজার টাকার পুরস্কারের কথা মনে করে দিতে সাহসী হলেন।

"এ ধরনের বাজি ছিল না কি?" বাণিজ্য-উজির মুদ্রা-বিনিময়কারীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বণিক উত্তর দিতে গিয়ে জামার নীচে থেকে একটা টাকার থলি বার করলেন ও উজিরের হাতে দিলেন।

"দেখ, জ্যোতিষী!" টাকার থলি নাড়িয়ে উজির বললেন, থলির ভিতর থেকে সোনার ঠুন ঠুন শব্দ ভেসে এল। "কিন্তু এটা পাবার আগে প্রথমে তোমাকে ঘোড়া দুটো বার করতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তোমার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার যে অভিযোগ আছে তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। যদি তুমি ঘোড়া দুটো আজ বার করতে পার তবে আমাদের বুঝিয়ে বল গতকাল, বা তার আগের বা তারও আগের দিন কেন তুমি ঘোড়া দুটো বার করনি? কেন তুমি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আগে তাদের বার করনি আর আজই বা তাদের বার করতে চাইছ কেন?"

"আকাশে অশুভ তারা সাদ-আদ-জবিহ থাকার······" খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর আগের বোখারা জীবনের মত আবার সুরু করলেন।

"তারা আকাশে আছে এখানে না," উজির বাধা দিয়ে বললেন। "তারাটা ওখানে আছে ; মনে হচ্ছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজাকে আরব ঘোড়াদের দেখা থেকে বঞ্চিত করার এক দুরভিসন্ধি ; ঘোড়ার মালিক বলেছিল যে ঘোড়া দুটো রাজাকে-

দেখা দিয়ে আনন্দ দিতে অসমর্থ হবে না। যদি তুমি এ ধরনের কু-কাজ সত্যিই করে থাক তবে কে তোমাকে এ কাজ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল ?"

তাঁর এই অসৎ ইচ্ছা প্রণোদিত ধারণা তাঁর চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুরুষের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল।

"স্বীকার কর, জ্যোতিষী!" তিনি চীৎকার করে উঠলেন, জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভিতর জ্বলছিল। "খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নাও। আমাদের তেজোদীপ্ত খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কে তোমাকে প্ররোচনা দিয়েছিল, কে এই নীচ শয়তান যে তার শ্রদ্ধা ভক্তির ছদ্মবেশে সাপের বিষদাঁত লুকিয়ে রেখেছিল ? বল, স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে! তোমার পুরস্কারও দেওয়া হবে—আমাদের সম্রাটের শত্রুদের ধরিয়ে দেবার উৎসাহে আমি নিজে তোমাকে এই টাকার উপর আরও দু' হাজার—না, তিন হাজার টাকা বখশিস দিব যদি তুমি সব ফাঁস করে দাও!"

তাঁর শত্রুকে চিরদিনের মত ধ্বংস করার প্রবল ইচ্ছায় তিনি পাঁচ এমন কি দশ হাজার টাকাও স্বেচ্ছায় দিতে রাজী।

কিন্তু যে মানুষটাকে তিনি কবর দেবার চেষ্টা করছিলেন তিনিও ভরাডুবি হতে দেবার ছোকরা নন, বরং উঠতি বয়সের এক প্রতাপশালী রাজকর্মচারী যিনি রাজদরবারের বাদ-বিসম্বাদের লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছেন।

রাজপুরুষ সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ দুটো ঝকঝক করছিল এবং তাঁর খাড়া গোঁফ দুটো যুদ্ধরত হাতীর দাঁতের মত দারুণভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে আছে।

"জাঁহাপনা কি শুনতে পাচ্ছেন ও দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখন কি ঘটছে ? টাকা দিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা—এটা কি একটা জঘন্য ধরনের ঘুষ নয় ?"

"জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করে আমি খানেরই আদেশ পালন করছি," উজির গর্জন করে উঠলেন। "কেউ আমাকে ঘুষ দেওয়া অথবা অন্য লোকেদের মত ঘোড়া চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারবে না।"

"সর্বশক্তিমান আল্লা!" রাজপুরুষ উঁচু গোড়ালির জুতোর উপর লাফ দিয়ে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে উঠলেন। "হে ঐশ্বরিক শক্তি! কেন আমাকে এ ধরনের অপমান শুনতে বাধ্য করা হচ্ছে! এবং কার কাছ থেকে! সেই সব লোকের কাছ থেকে যাদের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও বিশ্বাস

দেওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য বলপূর্বক অন্যায়ভাবে সে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে যেমন গত বছর ব্যবসা নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল……"

"কি অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়েছে ?" উজির বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো আবছাভাবে ঘোলাটে হয়ে নড়াচড়া করতে লাগল, কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন কোন অন্যায় কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে। "সম্ভবতঃ মাননীয় প্রধান কোতোয়াল দুর্গ-প্রাকারগুলো সংস্কার করার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার কথা বলছেন যার একটি পাথরও সংস্কার করা হয়নি, যদিও বরাদ্দ টাকার শেষ কপর্দকটিও খরচ করা হয়েছে……"

"দুর্গ-প্রাকার ?" জনসেবা বিভাগের প্রধান কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন। "যদি দুর্গ-প্রাকারের সম্বন্ধেই বলতে হয় তবে সাধু হুজরতের চকের বড় জলাধার পরিষ্কার করার কথাও বলতে হয়। কে এটা পরিষ্কার করতে দেখেছে ? সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় চার বছরে এসে পড়ল এবং রাজকোষ থেকে চার বার টাকা আদায় করা হয়েছে।"

এই সময় প্রধান মিরাব, যার উপর রাজ্যের সমস্ত ঝরণা ও জলাশয়গুলোর দায়িত্ব ছিল বলতে উঠলেন এবং জানালেন যে বাজার চক এখনও পাথর দিয়ে বাঁধাতে বাকী আছে ; তখন বাজারের প্রধান ওভারসীয়ার, তারের মত ক্ষীণ বৃদ্ধ যাঁর চোখ দুটো পেঁচার মত গোল এবং মুখে বসন্তের দাগ, খোঁচা খেয়েই রেগে উঠলেন ; তোতলাতে তোতলাতে অস্ফুটভাবে তিনি জানালেন যে তিন থলি ভর্তি সোনা যে গাড়ীগুলোতে করে বোখারার আমিরের কাছে পাঠান হয়েছিল সেগুলো গন্তব্যস্থলে কোন দিনই পৌঁছায়নি ; তখন সড়ক বিভাগের প্রধান রক্ষকের বজ্রকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল এবং তিনি বললেন যে 'বদমাসের বাচ্চাদের' জন্য এই সোনা হারিয়েছিল কারণ তারা গাড়ীগুলো আক্রমণ করেছিল তাঁর বাগাড়ম্বর ভরা বক্তৃতা রাজপুরুষের অট্টহাস্যে বাধা পেল যিনি গুপ্তচরদের মারফত আগেই খবর পেয়েছিলেন এই 'বদমাসের বাচ্চা' কারা ; বাণিজ্য-উজির আর একটা কথা বললেন, তার পরে প্রধান মিরাব এবং পরে একে একে বাজারের ওভারসীয়ার, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য লোকেরা কথা বলে চললেন।

এক মিনিটের মধ্যেই সেখানে পরস্পর দোষারোপ ও ভর্ৎসনায় রাজকীয় রক্ষের উপর এক দারুণ কাণ্ডের সৃষ্টি হল।

সকলেই বণিক, জ্যোতিষী ও হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার কথা একদম ভুলে গেলেন।

মুখ লাল করে, রাগে চোখ বড় করে, ভয়ংকর ভাবে মুঠো বাগিয়ে এবং ভারী জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়ে উজির ও রাজকর্মচারীরা একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিলেন এবং গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে একে অন্যের দাড়ি ধরে টানছিলেন।

এই সময় কেউ একজন সাই নদীর উপর দুটো সেতু তৈরি করার কথা বলল—যে বেদনাদায়ক ঘটনা তা খানের নিজেরও জানা ছিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ায় খান নিজে সিংহাসনের উপর উঠে দাঁড়ালেন ও চীৎকার করে উঠলেন :

"সেতু! তোমরা বলছ বদমাস চোরের দল! ঐ সেতুর জন্যে পাথরকুচি সরবরাহ করার চুক্তিপত্রের কি হল? আহা, কাদির তুমি চুপ করে আছ! আর দুশো ষাটটা সেগুন গাছের কড়ি; যেগুলো পরে প্রমাণিত হল যে পপলার গাছের কড়ি এবং সব পচা! এসব কার কাজ! ইউনুস—বল?"

খোজা নাসিরুদ্দিনই শেষ পর্যন্ত বাগ-যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। তাঁর যাদু-মন্ত্রের বইটা আকাশে তুলিয়ে তিনি গলার স্বর উঁচু করলেন :

"হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া দুটোর ব্যাপারে আমার মন্ত্রের বই বলছে······"

তাঁর কথাগুলো আগুন-লাগা ঘাসের বিস্তৃত জঙ্গলে যেন বৃষ্টির মত এসে পড়ল।

প্রথমে যিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি হচ্ছেন খান; তিনি একটা শান্ত দৃষ্টি সকলের উপর বুলিয়ে নিলেন।

আমির, উপদেষ্টা এবং ওমরাহরা চুপ করে গেলেন এবং সিংহাসনের পিছনে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এলেন; তিক্ততা, হিংসা ও ঘৃণা তখনও তাঁদের মনে জ্বলছিল।

"এই সভ্যতা-ভব্যতা লংঘনকারী ইতরের দল!" জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে খান সুরু করলেন। "আর কত দিন তোমাদের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করব? মনে করবে না তোমাদের আজকের এই নীচতা আমি ক্ষমা করব। রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর! তোমাদের দেখে আমার ভাবতেও কাঁপুনি ধরছে যে রাজ্যে এই ঘোর অরাজকতার জন্য আল্লার কাছে আমি কি উত্তর দিব! আমরা যাই করি বা করতে চেষ্টা করি না কেন তোমাদের নির্বুদ্ধিতা,

ঔদ্ধত্য, ঝগড়া, বে-আইনী কাজ ও চুরির আড়ালে সমস্ত প্রচেষ্টাই ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। আমাকে দোষ দিও না যদি কোন দিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে তোমাদের সকলকে একসঙ্গে তাড়িয়ে দিই এবং রাজকোষের উন্নতির জন্য, তোমরা এতদিন চুরি করে যা কিছু করেছ সব বাজেয়াপ্ত করে নিই!" রাগে মুখ লাল করে তিনি বাণিজ্য-উজিরের দিকে ফিরে বললেন, "জ্যোতিষীকে বলতে বল! সে যে একটা বদমাস এবং ছদ্মবেশী জোচ্চোর সেটা তাকে প্রমাণ করতে দাও এবং তার যথাযোগ্য শাস্তি যেন ভোগ করে! ঘোড়াগুলো কোথায়?"

"ঘোড়াগুলো কোথায়, জ্যোতিষী?" বাণিজ্য-উজির প্রতিধ্বনি তুললেন।

"নৈমানচিন রাস্তার উপর শহরতলির একটা বাড়ীর আস্তাবলে ঘোড়া দুটো আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "দুটো ঝরণার মোহানায় একটা বাগানে ঘোড়া দুটো আছে, যে বাগানের বেশ অলংকার করা ও চিত্র বিচিত্র করা একটা ফটক আছে যার ফলে অন্য বাগান থেকে সহজেই এটাকে পৃথক করা যায়।"

"বেশ নকসা করা ছবি সমেত ফটক?" মুদ্রা-বিনিময়কারী আনন্দে বলে উঠলেন। "দুটো ঝরণার মোহানায়? আরে, ওটা যে আমার নিজের গ্রীষ্ম-কালীন বাগান-বাড়ী। কিন্তু এটা এখন খালি ও বন্ধ—কেমন করে ঘোড়া দুটো সেখানে গেল?"

রাজকর্মচারীরা মুদ্রা-বিনিময়কারীর কথায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।

সমস্ত সন্দেহের নিরসন করলেন খান, তিনি বললেন:

"সেখানে কোনও ঘোড়া নেই এবং আগেও কোন দিন ছিল না। জ্যোতিষী সমস্ত ঘটনাটা বিকৃত করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে ও নিজে শাস্তি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। ওর জন্যে বেত ঠিক করে রাখ এবং দুজন ঘোড়সওয়ারকে শহরতলির বাড়ীতে পাঠাও যাতে প্রমাণ হয় যে সে মিথ্যা বলছে।"

প্রশস্ত নৈমানচিন সড়ক ধরে ঘোড়সওয়াররা ছুটে বেরিয়ে গেল।

"অবশ্য তারা ওখানে কিছুই দেখতে পাবে না! একেবারে কিছু না, কোন ঘোড়া না!" খানের পারিষদবর্গ তাঁর পিছনে বলে উঠলেন।

সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন একটু অন্য ধরনের। তাঁরা হলেন খোজা নাসিরুদ্দিন, মঞ্চের উপর বেত্রাঘাত করার প্রস্তুতি হওয়া সত্ত্বেও যিনি নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মুদ্রা-বিনিময়কারী ও রাজপুরুষ

যাদের জ্যোতিষীর সর্বজ্ঞতার অভিজ্ঞতা আগে থেকেই আছে। "আমার নিজের বাড়িতে," মুদ্রা-বিনিময়কারী মনে মনে ভাবছিলেন, সমস্ত ধরনের অনুমান সত্ত্বেও তাঁর যুক্তি বিহ্বল হয়ে পড়ছিল। "সম্ভবতঃ, ঘোড়াদের ব্যাপারে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটছে!" রাজপুরুষ চুপ করে দম বন্ধ রেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যদিও সমস্ত জিনিস বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। ওঃ, জ্যোতিষীর কথা যেন মিথ্যা না হয় এবং বণিকের বাড়িতে ঘোড়া দুটো যেন পাওয়া যায়। তাহলে তখন; তখন......তিনি জানেন কি করতে হবে ও কি বলতে হবে!

অল্পক্ষণের মধ্যেই—নৈমানচিন সড়ক খুব কাছে হওয়ার জন্যে—ঘোড়সওয়ার দুজনকে ঘোড়ার পথের শেষ ধারে ফিরে আসতে দেখা গেল।

"ওরা আসছে, ওরা আসছে! আমার ঘোড়ারা!" মুদ্রা-বিনিময়কারী চীৎকার করে উঠলেন এবং সমস্ত কিছু ভুলে ঘোড়সওয়ারদের দিকে ছুটে গেলেন।

রাজপুরুষের ইঙ্গিতে প্রহরীরা ছুটে গিয়ে বণিককে সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগেই ধরল ও টেনে মঞ্চের উপর আবার তুলল। "আমাদের আলোচনা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি, সুযোগ্য রহিমবাই!" প্রতিহিংসার আনন্দে রাজপুরুষ ফোঁস ফোঁস করে উঠলেন।

ঘোড়সওয়ার দুজন এগিয়ে এল। লাগাম ও জিন ছাড়া দুটো ঘোড়াকে তারা ধরে নিয়ে এল—একটা ঝিনুকের মত সাদা, অন্যটা বাবুই পাখীর পাখার মত কাল।

এদের মত আকৃতিতে চেহারায় ও চালচলনের এত সুন্দর ঘোড়া প্রতিযোগিতার মাঠে আর কখনও দেখা যায়নি।

সভাসদদের মাঝে বিস্ময় ও প্রশংসার আনন্দ-উল্লাস ভরে উঠল।

মুদ্রা-বিনিময়কারী কেঁপে উঠলেন এবং উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু প্রহরীরা তাঁকে শক্ত মুঠোয় ধরল।

"এই ঘোড়া দুটো পৃথিবীর অলংকার বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না," খান বললেন।

"সত্যিকারের অলংকার! সত্যিকারের অলংকার!" পারিষদবর্গ বিভিন্ন স্বরে প্রতিধ্বনি তুললেন।

ঘোড়া দুটোকে মঞ্চের কাছে নিয়ে আসা হল। জনতা চুপ করে গেল;

প্রত্যেকেই নিজেদের অভিযোগ ও ঝগড়া ভুলে গেল এবং সুন্দর আরব ঘোড়াদের প্রশংসায় ডুবে গেল।

তখন আর একবার মুদ্রা-বিনিময়কারীর তীক্ষ্ণ কান্না-ভরা চীৎকার জেগে উঠল :

"বিচার করুন !"

একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। খান মুখ বিকৃত করলেন।

"ও আর কি চায়, ঐ বিরক্তিকর বণিকটা? সে তার ঘোড়া ফিরে পেয়েছে ; সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বল।"

"আমার পুরস্কারের কি হবে জাঁহাপনা?" খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি তাকে মনে করিয়ে দিলেন।

"জ্যোতিষী," কোন রকম দৃষ্টি না দিয়েই খান বললেন, "কিন্তু তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবে।"

বাণিজ্য-উজির তখন মুদ্রা-বিনিময়কারীর দশ হাজার টাকা ভর্তি চামড়ার থলিটা উঁচু করে ধরলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিজের মাথার উপর রাখলেন, সকলকে দেখান ও শোনানর জন্য নাড়লেন পরে খোজা নাসিরুদ্দিনের পায়ের কাছে রাখলেন।

"এটা নাও, জ্যোতিষী ; মহান খান অত্যন্ত ন্যায়-বিচারক !"

কিন্তু মুদ্রা-বিনিময়কারী পাশ থেকে বাজপাখীর মত ছুটে এলেন এবং দুই হাত দিয়ে থলিটা চেপে ধরলেন।

"ঘুষের কি হল, জাঁহাপনা !" খোজা নাসিরুদ্দিনের হাত থেকে টাকার থলিটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে বণিক বললেন, এদিকে তাঁর মুখটা অসম্ভব বিকৃত হয়ে উঠেছে।" বিশ্রী ঘুষের ব্যাপার, যার ফলে আমার অতুলনীয় ঘোড়া দুটো প্রতিযোগিতায় যেতে দেরি করল! এই যে এখানে যে ঘুষ দিয়েছে ও নিয়েছে—দুজনেই আছে," তাঁর দাড়িটা খোজা নাসিরুদ্দিন ও রাজপুরুষ দুজনের দিকেই নাড়িয়ে বললেন, এদিকে টাকার থলিটা তখনও হাতে ধরেছিলেন। "রক্ষা ও বিচার করুন! জ্যোতিষীকে বলতে বলুন কেন সে আমার ঘোড়া দুটো গতকাল পায়নি ; এদিকে দেখুন আজ কত সহজে সে তাদের বার করল ; এর জন্যে তাকে কত দেওয়া হয়েছিল এবং কে দিয়েছিল? আমার টাকা ফেরত দাও, বদমাস, শুনতে পাচ্ছ !"

তিনি পাগলের মত টাকার থলিটা এমন জোরে টান দিলেন যে টাকা

শামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন ; খোজা নাসিরুদ্দিন থলিটা ধরে নাছোড়বান্দা হয়ে গায়ের জোর দিয়ে টান দিতে লাগলেন।

মঞ্চের সর্বত্র প্রতিবাদ উঠল।

একটা উত্তেজিত গুঞ্জন সভাসদদের মধ্যে উঠল।

এ ধরনের অসভ্যতা কখনও শোনা যায়নি—তাও আবার রাজার সামনে!

প্রহরীরা দুজনকেই ধরে দূরে সরিয়ে দিল।

টাকার থলিটা খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে রইল।

মুদ্রা-বিনিময়কারী হাঁপাতে হাঁপাতে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এইভাবে রাজপুরুষের শুভ সময় এল—তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও বিজয়ের সময়। উদ্দেশ্যে স্থির থেকে তিনি সাহসে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ও খানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

"আমি কি এবার কথা বলার অনুমতি পেতে পারি! এই বণিক আমার ঘুষের অভিযোগ এসেছে। কিন্তু তাকে আগে বলতে বলুন কি করে ঘোড়া দুটো তার নিজেরই গাঁয়ের বাগান-বাড়ির আস্তাবলে এল?"

আকস্মিক এই আক্রমণে মুদ্রা-বিনিময়কারী কি আর উত্তর দিবেন? তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

পরে রাজপুরুষ বেশ জোরে চীৎকার করে উঠলেন:

"আমরা কোন উত্তর শুনতে পাচ্ছি না। এইখানেই রয়েছে সত্যিকারের অবিশ্বাস! প্রথমতঃ, আরবী ঘোড়াদের জয় সম্বন্ধে সন্দেহ করা যেতে পারে, কারণ তাদের বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে তাদের গতি অনেক নিকৃষ্ট স্তরের, দ্বিতীয়তঃ অপমান এড়াবার জন্য সে তার ঘোড়া দুটো দূরে গাঁয়ের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে এবং সমস্ত শহর জুড়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে যে সে দুটো চুরি গিয়েছে—এ ধরনের কাজকে কি বলা যেতে পারে! সমস্ত লোকের লক্ষ্য বস্তু হয়ে, শান্তি নষ্ট করে, খালি পায়ে ও পাগড়ী না বেঁধে অমার্জিত পোশাক পরে এবং বিশ্রী ও মিথ্যা কান্না জুড়ে সে আমাদের খানের মন থেকে সমস্ত আনন্দ দূর করেছে; এ সবের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সম্রাটের চোখে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিনীত কর্মচারীকে বিকৃত ভাবে দেখান!"

উত্তেজনায় রাজপুরুষের গলা কেঁপে উঠল। জামার আস্তিন দিয়ে চোখের কোণের জল মুছে ও আকাশের দিকে হাত তুলে তিনি শুরু করলেন:

"এটা কি একটা অন্যায় কাজ নয়? কে খানের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিচার

আশা করে—আমি, যার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কুৎসা ও গালাগালি করা হয়েছে, না ঐ নীচ মুদ্রা-বিনিময়কারী, যার প্রতিহিংসার সীমা পরিসীমা নেই ? কে নিশ্চয় করে বলতে পারে যে আগামী কাল সে আর একটা অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে নিয়ে রাজপ্রাসাদে আসবে না, যথা আমি তার দোকান লুঠ করেছি অথবা তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ?"

ভারী সুন্দর অবতারণা, সব দিক বিবেচনা করে সুন্দরভাবে পরিকল্পিত। তিনি কিছুক্ষণ থামলেন যাতে মরণ বাঁচনের এই কথাগুলো তাঁর মনের ভিতরে প্রবেশ করে পরে উপসংহার টেনে বললেন :

"জিজ্ঞেস করা হয়েছে : কে ঘোড়া চুরি করেছে ? কে এই নির্লজ্জ চোর ছিল যাকে আমরা এতদিন খোঁজ করছিলাম ? এখন এটা পরিষ্কার কেন তাকে আমরা এতদিন খুঁজে পাইনি, এখন আর খোঁজ করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ চোর নিজেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ! এই যে এখানে !"

তাঁর চোখে না পড়া ছোট্ট শরীরটা যতটা পারলেন উপরের দিকে তুলে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে রাজপুরুষ তাঁর আঙুল বাড়িয়ে বিবর্ণ ও জড়সড় বণিককে দেখালেন।

"আমি চোর ? নিজের ঘোড়া আমি নিজেই চুরি করেছি ?" বণিক অসংলগ্ন ভাবে তোতলাতে তোতলাতে বললেন।

তার নীচ অসহায়ভাবে বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো রাজপুরুষের গুরুগম্ভীর গলার শব্দে ডুবে গেল—যেমন একটা জলপ্রপাতের গর্জনে কাছের একটা ঝরণার অস্পষ্ট শব্দ আমাদের শোনার আগেই মিলিয়ে যায়।

"ঐ যে ও দাঁড়িয়ে আছে !" রাজপুরুষ গর্জন করে উঠলেন। "ক্ষমতা থাকলে আমার কথার প্রতিবাদ করুক !"

এই অবস্থায় যা সচরাচর ঘটে থাকে এখানেও তাই ঘটল, মুদ্রা-বিনিময়কারীর বিহ্বলতাকে অনেকেই তার অপরাধের অবিসম্বাদিত প্রমাণ মনে করল এবং রাজপুরুষের বজ্রকণ্ঠ ছিল তার সাধুতার প্রমাণ।

অবশ্য কয়েকজন সেখানে ছিলেন—বাণিজ্য উজিরের নেতৃত্বে কয়েকজন রাজপুরুষের শত্রু—এই সংঘর্ষে তাঁরা মুদ্রা-বিনিময়কারীর পক্ষ নিল। তাঁরা প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"কে আবার নিজের জিনিস নিজে চুরি করে ?"

"কখনও শোনা যায়নি !"

"ভাবতেও পারা যায় না!"

"তাঁর মত শ্রদ্ধেয় মানুষ সারা কোকান্দে পরিচিত!"

রাজপুরুষের অনুগামীরা জোরের সঙ্গেই তাদের প্রতিবাদ করল; কয়েকজন বেশ অঙ্গভঙ্গি করে দেখাতে লাগল কেমন করে জিনিসপত্র আপনা থেকেই অদৃশ্য হয়ে যায়; বোখারা যাবার পথে তিন বস্তা সোনা কেমন করে চোরেরা উধাও করেছিল সেই প্রসঙ্গটা আবার টেনে আনল; তখন সড়ক বিভাগের প্রধান রক্ষক অবর্ণনীয়ভাবে আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বাজারের যে চকটা তখনও বাঁধান হয়নি সেটা নিয়ে চীৎকার করতে সুরু করে দিলেন; আবার সাধু হজরত চকের জলাধার, দুর্গ-প্রাকার, বাণিজ্য স্থানগুলো এবং জোর করে টাকা আদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল—এক কথায় এক মিনিটও যায়নি যখন সিংহাসনের পাশে আর একবার পরস্পর দোষারোপ ও ভর্ৎসনার মাঝে হৈ-হুল্লোড়ের সৃষ্টি হল। আর একবার রাজ্যের বড় বড় রাজকর্মচারীরা বিবর্ণ হয়ে, ঘামতে ঘামতে, রাগে ফেটে পড়ে চীৎকার চেঁচামেচির মাঝে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খান কিছুই বললেন না। তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটো একটা বিস্বাদে ভরা মুখের চেহারা নিল; তিনি আস্তে আস্তে সরে এসে কাঁধ দুটো ঝুলিয়ে বসে পড়লেন এক ফাঁকা মাঠের দিকে চেয়ে রইলেন।

আর একবার বণিক, জ্যোতিষী ও ঘোড়া দুটোকে সকলে ভুলে গেল।

ধীর পদক্ষেপে একজন বয়স্ক প্রহরী—উচ্চপদের মনে হয়—মঞ্চ থেকে নেমে এল। খানের অধীনে কাজ করে তার মাথার চুল পেকে গিয়েছে এবং অনেক কিছু দেখেছে; দেখে মনে হয় অসৎ প্রকৃতির লোক নয় বড় পরিবারের ভারে বোঝা-গ্রস্ত, প্রয়োজন ছাড়া লাথি বা ঘুঁষি মারার উৎসাহ কখনও দেখতে না অবশ্য যখন শাসনে অধিষ্ঠিত লোকেরা থাকত তখন ছাড়া। দামী কার্পেটের উপর আস্তে আস্তে পা ফেলে সে বণিকের কাছে এল।

"তোমার ঘোড়া নিয়ে বণিক মনের আনন্দে বাড়ী যাও; এখানে তোমার করার কিছুই নেই; ওদের নিজেদেরই এখন অনেক সমস্যা আছে।"

তাঁর ঘাড়ের পিছনে ঘুঁষি দিয়ে আস্তে খোঁচা মেরে—খুব আস্তে এবং তাও কেবল কর্তব্যের খাতিরে ও অন্য কেউ দেখেছে কিনা লক্ষ্য করে—প্রহরী তাঁকে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনল; ঘোড়া দুটো তাঁর হাতে দিয়ে এবং দুজন অধীনস্থ প্রহরীর পাহারায় তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। পরে সে জ্যোতিষীর সঙ্গে একই ধরনের ব্যবহারের জন্যে মঞ্চে ফিরে এল।

কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন সেখানে ছিলেন না। তিনি সব সময়েই সবার অলক্ষ্যে সরে পড়তেন ঠিক সেই সময় তিনি ঘোড়দৌড় মাঠের শেষ প্রান্তে ছিলেন একটা অল্প বয়সের তুঁত গাছের আলোছায়ার নিচে; গাছটা সাদা নুড়ি ও সোনালি বালির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছুটো ঝরণার মোহানায় দাঁড়িয়েছিল। শাখা-প্রশাখাগুলো খস খস করছিল, পাখীরা গান ধরেছিল, একটা ইঁদুর ছুটে পালাল, একটা ছোট মাছ জল ছিটকাল এবং সন্ধ্যার আকাশের শান্ত নীল পরিবেশে পেঁজা মেঘগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে জলের উপর ঝুঁকে তাঁর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটোকে তৃপ্ত করলেন, নিজেকে পরিষ্কার করে জামা খুলে মুখ মুছলেন এবং খালি গায়ে বাতাসের ঠাণ্ডা ছোঁয়া পেতে আরাম পেলেন। পরে তিনি মাঠের দিকে ফিরে চাইলেন। সেখানে মঞ্চের উপর নরকের ফুটন্ত কড়াই-এর মত বিভিন্ন রং-এর পোশাকের মধ্যে এবং ঝকঝকে মডেল, প্লেট এবং কৃপাণের আলোয়, পরস্পর দোষারোপ ও চীৎকার—যা অস্পষ্ট হয়ে দূরে খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে ভেসে আসছিল,—এবং তাদের রাগ ও উত্তেজনা যেন ফুটছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন হাসলেন, টাকার ভারী থলিটা আঙুল দিয়ে ছুঁলেন এবং ধীরে সুস্থে নাচের ভঙ্গিতে এবং খসখসে বাতাস ও কিচির মিচির করা পাখীদের সঙ্গ পেয়ে তিনি ঝরণার ধার ধরে জলের আনন্দ-মুখর কলতান অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন।

ভাগ্য-গণনার থলিটা এখন তাঁর বোঝা হয়ে দাঁড়াল। পথে তিনি বুড়ো বুড়ো গাছে ঘেরা একটা বদ্ধ পুকুরের পাড়ে এলেন যার ভিতর থেকে একটা পচা গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। যেই না খোজা নাসিরুদ্দিন ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমরার দল গুন গুন করতে করতে তাঁকে ঘিরে ফেলল এবং তাঁর ঘামে ভরা মুখ, গলা এবং খোলা বুকের অংশ হুল নিয়ে আক্রমণ করল। কাঁটা ভর্তি ঝোপের মত একটা পুরোনো মালবেরি গাছ ও তার গুঁড়ির নিচে একটা কাল মুখের মত বড় গর্ত বেছে নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তার ভিতর টাকার থলিটা ফেলে দিলেন এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ময়দা সানার মত টিপে টিপে সেটা ভিতরে ঢুকিয়ে রাখলেন। খোলা হাত পা ও হালকা মন নিয়ে তিনি ছাতায় ভর্তি শিকড়ের উপর এসে বসলেন। ভোমরাদের তাড়াবার জন্যে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি তুঁত গাছটার উদ্দেশ্যে বললেন, "মনে রেখ কাউকে বলবে না। এই শহরে একমাত্র তুমিই জান কোথায় গলাকাটা সেতুর সেই বিখ্যাত জ্যোতিষী লুকিয়ে আছে।" তাঁর গোপনতায় এমন বিশ্বাসী

অভিভাবক হয়ত আর পাওয়া যাবে না। জলাশয়ের চারপাশের বৃক্ষদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে বিষণ্ণ ও মৌন এবং তার কণ্ঠে-ভরা আত্মার অন্তঃস্থলে মানুষের জন্য ঘৃণা উচ্চারণ করতে না পারলেও অনুভব করত ; সে তার নিজের জায়গায় দীর্ঘ দিন নিরাপদে দাঁড়িয়ে আছে, তার শিকড়গুলো মাটির ভিতর অনেক দূর চলে গিয়েছে সেখানে শীত বা ঝড়ের কোন ভয় ছিল না এবং মনের সুখ না পাওয়া কিছু লোকের সেখানে তারা কোন পার্থিব জিনিসের পিছনে ছুটছিল না।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

পুরানো তুঁত গাছটার সঙ্গে কথাবার্তা দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনের জীবন-গ্রন্থের আর একটি পৃষ্ঠা উল্টান হল। তিনি যা যা পরিকল্পনা করেছিলেন সমস্তই সফল হয়েছে, মুদ্রা-বিনিময়কারীর চামড়ার থলি তাঁর সামনে খোলা হয়েছে, দশ হাজার টাকা ভর্তি থলিটা তাঁর বোঁচকার ভিতর আছে ; রাজপুরুষের দেওয়া আর একটি টাকার হালকা থলির এটা সুন্দর সঙ্গী যদিও ভারী। এখন কেউ হয়ত ধারণা করবে যে খোজা নাসিরুদ্দিনের বাকী কাজ নিয়ে চিন্তা করার পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু সাবধান হওয়ার তাড়া এক সঙ্গে জড় হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খোজা নাসিরুদ্দিন পরের দিন কি করেছিলেন তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করব না—এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে তিনি কেনাকাটা করছিলেন। একজন শিশুর প্রিয় যে কোন জিনিসই তাঁর চোখে পড়ছিল তিনি সে সব জিনিস কিনছিলেন : সিল্কের ছোট ছোট জামা, রঙ্গীন ফিতে লাগানো জুতো, পোশাক, খেলনা, মিষ্টি, পুঁতির মালা এবং রূপোর ছোট ছোট আংটি। বাজারে তাঁর সঙ্গী ছিল একচোখো চোর যে একটা বড় বস্তার ভারে টলমল করছিল ; যখন বস্তাটা কানায় কানায় ভরে উঠল চোর বাজারের ভিতর একটা ছোট গলির মধ্যে একটা খালি বাড়ীতে সেটা বয়ে নিয়ে গেল এবং যখন ফিরে এল, দেখল যে আর একটা বস্তা অর্ধেক ভর্তি হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এই কেনাকাটা সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত চলল। একচোখো চোর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বস্তাটাকে প্রায় টানতে লাগল। অনেক পরে আবার ঢাক বাজার শব্দ শোনা গেল এবং একটা দমকা ঝড় সমস্ত বাজার ছেয়ে ফেলল এবং অস্তগামী সূর্যের উত্তপ্ত ও বিচ্ছুরিত কিরণের নিচে, বাজারের ধুলো ভরা বিস্তৃত এলাকার উপর ও উত্তরে ঘোড়ার হাট থেকে দক্ষিণে চীনা শহরগুলি

পর্যন্ত দোকানে দোকানে দরজা বন্ধ করার খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছিল সেই সঙ্গে ঠুনঠুন শব্দ উঠছিল পিতলের আংটায় বাঁধা চাবি থেকে। ভীড় কমে এল, উট ও টাঙ্গার দল তাদের রাতের আশ্রয়ে ফিরে যেতে লাগল, ধর্মশালার দরজাগুলো তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হল এবং অসংখ্য সরাইখানা ও ভোজনালয়গুলো ভেসে বেড়ানো ধোঁয়ার উগ্র গন্ধে আকাশ ভরিয়ে তুলেছিল ; সূর্যের আলোয় ধোঁয়ার মেঘের উপরটা সোনালি ও নিচেটা নীল-ধূসর দেখাচ্ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন ও একচোখো চোর শেষ বস্তা দুটো কাঁধে তুলে নিলেন ও কুঁজো হয়ে বেঁকে বাড়ীর দিকে হাঁটলেন। রূপোর ছোট্ট ছোট আংটি, যেগুলো খোজা নাসিরুদ্দিন শেষ মুহূর্তে যখন কেনেন তখন ঢাকের শব্দ বাজছিল সেজন্য তিনি সেগুলো হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন ; রূপোর ঠুনঠুন শব্দে আনন্দ পাবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আংটিগুলো নাড়ছিলেন, বাজারের হট্টগোলের পর এই শব্দ ছিল মনোরম।

মনে রাখা উচিত এসব ঘটনা ঘটেছিল তুরাখন বাবার উৎসবের আগের দিন। রাস্তা ছিলো উৎসবের আনন্দে মুখর। খোজা নাসিরুদ্দিন ও একচোখো এই চোর অঞ্চলের আট, নয় এবং দশ বছর বয়সের ক্ষুদে বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন যারা রহস্যে ভরা মুখ নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল এবং যাদের চোখ ছিল সজীব ব্যাকুলতায় উজ্জ্বল ; প্রত্যেকেই নিজের নিজের দরকারী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ মাথার টুপি ঝুলিয়ে রাখার জন্য রঙীন সুতো জোগাড়ে ব্যস্ত, অন্যেরা সেদিন যে ভাল কাজ করতে পারেনি সেই ভাল কাজ করায় ব্যস্ত। সকলে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাদের পরিচিত পথিক দুজনকে যাবার সময় সালাম জানাতে ভুলল না এবং মিষ্টি গলায় বলে উঠল :

"শুভ সন্ধ্যা, কেমন আছ, তোমাদের কালকের কাজ সফল হোক। আমরা কি বস্তা দুটো বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি ?"

"ধন্যবাদ !" খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "আজ রাতে তোমাদের কাজ সফল হোক এবং তোমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। তোমরা এই বস্তা দুটো কি করে বইবে ? তোমাদের মত তিনজন এক একটি বস্তায় ঢুকলেও জায়গা থাকবে। যাইহোক তোমরা আমাদের সঙ্গে আসতে পার এবং আমি আশ্বাস দিচ্ছি তুরাখন বাবার চোখে সেটা বয়ে নিয়ে যাবারই সামিল হবে।"

বাচ্চারা তাঁর কথাগুলোকে আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন জানাল এবং তাঁর সঙ্গ

নিল। বাচ্চাদের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন ও একচোখো বাড়ীতে এসে পৌছাল ; কারও খালি পা, কারও বা জুতো পায়ে ; ন্যাড়া মাথা এবং শুয়োরের লেজের মত চুল, চেপ্টা নাক এবং সোজা নাক ; মেছেতার দাগ এবং পরিষ্কার, কালো, সুন্দর, লাল-চুলে ভরা মাথা এবং আরও অনেক রকম ছেলেতে ভর্তি। রূপোর ছোট ছোট আংটিগুলো এখানে কাজে লাগল ; পরাবার মত যথেষ্ট ছিল এবং শেষ দুটো আংটি সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

"আংটিগুলো টুপির মধ্যে রাখবে, কারণ আজ রাতে তাদের ঝুলিয়ে দিতে হবে," খোজা নাসিরুদ্দিন শিশুদের উপদেশ দিলেন। "তুরাখন বাবার কাছে এটা হবে বস্তা দুটো বইতে সাহায্য করার চিহ্ন।"

খোজা নাসিরুদ্দিন এবং একচোখো চোর দিনের বাকী অংশটা সেই খালি বাড়ীতে জিনিসগুলোর মাঝে কাটালেন—ছোট ছোট জুতো এবং জামা কাপড়, মিষ্টি এবং খেলনা, সব মেঝের উপর স্তূপ করে রাখা ছিল। সূর্যাস্তের আবছা হলুদ-গোলাপি আলোয় তাঁরা নৈশভোজ সারলেন।

রাত নেমে এল। আকাশে চাঁদ ছাড়া কিছু ছিল না ; চারপাশে একটা চওড়া ও অস্পষ্ট বৃত্তের মত আভা ছড়িয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল এবং তাদের পরের কাজ-কর্মের কিছু কিছু দেখছিল। বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে তাঁরা গুঁড়ি মেরে নিস্তব্ধ ও পরিত্যক্ত রাস্তায় নেমে এলেন, চাঁদের আলোর নরম নীল অস্পষ্ট আভায় রাস্তা যেন নতুন রূপ নিয়েছে, ছুটন্ত জলের ছোট ছোট ঢেউ এবং দেয়াল ও বেড়ার উপর কালো ছায়াগুলো মিলে যেন একটা রহস্যময় পথের সৃষ্টি করেছে, যে পথ দিয়ে তুরাখন বাবা নিজেই যে কোন মুহূর্তে বেড়িয়ে আসবেন অথবা খলিফা হারুণ-আল-রশিদ ভিতর ও বাইরের আলাদা রং-এর জামা গায়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে আসবেন যে জামার একদিকে ভিখারীর ছেঁড়া ও তালি দেওয়া পোশাক কিন্তু নিচে মণিমুক্তায় খচিত রাজপোশাক।

অনেকবার তাঁরা বোঝা উপুড় করে খালি বস্তা হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছেন এবং আবার পুরো বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রথা অনুযায়ী ছোট দরজাটা সেদিন খোলা ছিল এবং কব্জাগুলো মাঝে মাঝে শব্দ করে উঠছিল।

প্রায়ই এক চোখোকে বিরক্ত হয়ে ফিসফিস করে বলতে শোনা যাচ্ছিল :

"এই ঘরে যে ক্ষুদে শয়তানগুলো বাস করে তারা তাদের মাথার টুপি কোথায়

লুকিয়ে রাখতে পারে ? অপেক্ষাকর, আমি আঙুর বাগানের নীচেটা একবার দেখব।"

মাথার টুপিগুলো সাধারণতঃ কোন গুপ্ত ও নির্জন স্থানে রাখা হয়; কোনটায় রূপোর ছোট ছোট আংটি আছে যেগুলো ঝকঝক করছিল এবং এগুলোতে বস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার পুরস্কার হিসাবে খোজা নাসিরুদ্দিন এক তাল হালুয়া রেখেছিলেন।

যে মাসের রাত্রি ছিল ছোট এবং যে সব জিনিস তাঁরা তৈরী করেছিল সেগুলো সংখ্যায় ছিল অনেক। তাঁদের সেগুলো তাড়াতাড়ি ও কোন বিশ্রাম না নিয়েই বইতে হচ্ছিল।

যখন তাঁরা বিধবার ছোট্ট উঠোনে এসে উপস্থিত হলেন তখন সকাল হয়ে এসেছে এবং কুয়াশা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে।

শেষ বস্তা কয়টা তাঁরা প্রায় ছুটে এবং বারবার রক্তিম পূব দিকে চেয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, কারণ সেই দিক থেকে—সমুদ্রও পাহাড়ের ওপার থেকে চুনীর মুকুট পরে ও সূর্য কিরণের আবরণে ঢাকা দিয়ে আর একটা নতুন উজ্জ্বল দিন দেখা দিল।

তাঁরা সব কিছুই সময় মত করলেন। দূরে রাস্তার পাশের একটা ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগানে তাঁরা শেষ বারের মত ঘোরাফেরা করলেন এবং যেখান থেকে তাঁদের দেওয়াল টপকে পালাতে হয়েছিল ; এর কারণ একজন চঞ্চল বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিছানা থেকে উঠে তার মাথার টুপির কাছে এদের প্রায় ধরে ফেলেছিল। বেড়ার অন্য পাশে শিশিরে ভেজা সজারুদের মধ্যে বসেছিলেন তাঁরা, তাঁদের হৃদপিণ্ড দপদপ করছিল ; তাঁদের দেখে ছোট পাখীরা এক মিনিটের মধ্যেই তীক্ষ্ণ চীৎকারে সকালের শান্ত পরিবেশ ভরিয়ে তুলল। সকালের সজীব বাতাস সুরু হওয়ার সঙ্গেই কুয়াশা উপরের আকাশে মিলিয়ে গেল এবং নীল গভীরতা আরও পরিষ্কার ও তীব্র হয়ে দেখা দিল ; এদিকে সজারু পাখীরা হাতের তালুর মত ছোট্ট পাখা দুটো পাশে মেলে ধরেছিল এবং শিশিরের বড় বড় ফোঁটাগুলো তার উপর টলমল করছিল ঠিক যেন ডুবুরিদের রুক্ষ হাত তাদের ডুব দিয়ে নিয়ে আসা মুক্তো ভরা ঝিনুকগুলো দেখাচ্ছিল।

একই রাস্তা দিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন, এবারে সূর্যের আলো তাঁদের উপর হালকা ও শান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পথের দু'পাশের বাড়ীগুলো থেকে আযানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। "ও পবিত্র রাত্রি," একচোখো বলল, "আজ

হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে শুভ রাত্রি।" খোজা নাসিরুদ্দিন শুধু ক্লান্তিতে এদিক ওদিক করছিলেন।

যে বাড়ীটা তাঁরা ভাড়া করেছিলেন সেটা ছিল অনেক দূরে এবং ইতিমধ্যে কয়েকটি সরাইখানাও খুলেছে; তাদের রক্ষকরা ঘুম-ঘুম চোখে আড়মুড়ি দিচ্ছিল ও হাই তুলছিল এবং উনুনে আগুন জ্বালানর পর কার্পেট ও মাদুরগুলো সরিয়ে রাখছিল।

"বাড়ীটা যখন খালি তখন আমাদের সেখানে যাবার প্রয়োজন কি?" খোজা নাসিরুদ্দিন বেঁকে একটা সরাইখানার দিকে যেতে যেতে বললেন।

রক্ষক তাদের বিশেষভাবে সেলাম জানাল কারণ তাঁরা ছিলেন সকালের প্রথম খদ্দের এবং তাঁদের নিয়েই সেদিনের বউনি।

ঘরের একটু অন্ধকার কোণে একটা নরম কম্বল পেতে সে তাঁদের বসতে দিল এবং সুগন্ধ চা পরিবেশন করল।

হেলান দিয়ে বসে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন:

"যদি তুরাখন বাবা প্রতিবার এ রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে উৎসবের পরে সারা বছর ধরে যে তিনি ঘুমান তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"সমাধির পাশে আমি যে ডালটা পুঁতেছিলাম সেটার কথা ভাবছি," একচোখো বলল। "কি ভাবছেন—এটা কি শিকড় নিয়েছে, না নেয়নি?"

খোজা নাসিরুদ্দিন কোন উত্তর দিলেন না। শীঘ্রই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন—তিনি হলেন এক সদা প্রফুল্ল পথিক যিনি যেখানেই শুয়ে মাথা রাখতেন সেইটাই যেন তাঁর বাড়ী। মিনিটখানেকের মধ্যেই একচোখোও ঘুমিয়ে পড়ল। বাজারে যাবার পথে টাঙ্গার একটানা ঘড়ঘড় শব্দ, সরাইখানার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া উটের ঘণ্টার ঠুনঠুন শব্দ, ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া রাখালদের কান-ফাটানো শব্দ, ভিস্তিওয়ালাদের উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, শহরের বিভিন্ন কোণ, ফটক এবং অলিগলি থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য রুটি ও কেকের ফেরিওয়ালাদের চীৎকার, কোন কিছুই তাঁদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারল না। ইতিমধ্যে সরাইখানার চারপাশের ও উপরের বাতাস যেন উজ্জ্বল, চকচকে ও গলে যাওয়া সিসের রূপ নিয়েছে এবং পৃথিবী যেন সকালের শান্ত, শীতল জল থেকে দুপুরের উত্তপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে।

আশ পাশের বাড়ীতে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের যে উত্তেজনা এতদিন ঘিরে রেখেছিল সে সব ভুলে গিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ ঘুমালেন। লোকেরা একে

অন্তকে তুরাখনের উপহার দেখাচ্ছিল আনন্দের সঙ্গে ফিসফিস করে। এই অপূর্ব ও আশ্চর্যজনক ঘটনা যা আশপাশের শুধু একটা দুটো নয় অসংখ্য বাড়ীকে প্রভাবিত করেছিল তার ব্যাখ্যা তারা কিভাবে দেবে? একটা ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না, যা হচ্ছে অত্যন্ত সোজা এবং মর্মস্পর্শী এবং যা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস তাদের শিখিয়েছিল। তাহলে বিসমিল্লা রহমান রহিম সত্য! তুরাখন হচ্ছেন প্রকৃতই ভগবানের প্রেরিত পুরুষ এবং তাঁর নাম থাকবে অমর হয়ে।

পৃথিবীতে সে রাতের ফলাফল ছিল বিরাট এবং ধারণার বাইরে। সম্ভবতঃ এর প্রতিধ্বনি আজও সকলের অজান্তে মানুষের মনে গেঁথে আছে। সেদিন রাতে কোকান্দের অনেক মানুষ পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছিল, কারণ আর কোন কাজকে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

শহরে বেশ একটা উত্তেজনা ও চাপা আলোচনা চলছিল। একটা চাপা ভয়ের সঙ্গে আনন্দ বিধবার ঘরে বিরাজ করছিল। বিধবার তিনটে ছেলেই তাদের নিজের নিজের মাথার টুপিতে হাজারটা সোনার টাকা পেয়েছে; এ ছাড়া তিনটে স্তূপ করে দামী উপহার মাটির উপর কাপড় দিয়ে যত্ন করে ঢাকা ছিল শিশিরে ভিজে যাতে নষ্ট না হয়ে যায় (যত্নটা অবশ্য একচোখো চোরের)। গরীব মেয়েটা কি ভাববে, কিই বা বলবে? সে কিছুই বলেনি, কিছুই ভাবেনি—সে কেবল কেঁদেছিল ও মনে বিশ্বাস এনেছিল। তার চোখের সামনে থেকে হতাশার একটা ভারী পর্দা যেন সরিয়ে ফেলা হল এবং সেটা ভেদ করে বেরিয়ে এল আশা, সাহায্য ও সহানুভূতির এক জ্বলন্ত দীপ্তি।

রাতের ঘটনায় বড়োরা যতটা অবাক হয়েছিল ছেলেরা ততটা হয়নি, কারণ তারা তাদের পুরোনো বন্ধু ও রক্ষকের কাছে কোন কিছুই আশা করেনি। মনের সত্তাকে জোরদার করার কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না, কারণ জীবনে প্রথম নিশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিশ্বাস তারা পেয়েছিল এবং সে বিশ্বাস মনের মধ্যে কোন দিনও ধাক্কা খায়নি বা কোনও যুক্তির দ্বারা কলুষিত হয়নি এবং তাদের হৃদয়ে অকৃত্রিম উজ্জ্বলতায় আলো ছড়াচ্ছিল। তারা বাগানে জড়ো হয়ে নরম রেশমের মত ঘাসের উপর বৃত্তাকারে নাচতে নাচতে এবং কচি কচি গলা মিলিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে গান করতে লাগল:

মিষ্টি মধুর বইছে বাতাস দখিন হতে,
পরশ পেয়ে শুভ্র হ'ল চেরির বাগান।
দিন সুরু হয় উজল আলোর ঝলকানিতে,
উঠল রে ঐ হাজার প্রাণে আনন্দ-গান।

শিস দিয়ে গায় নীলকণ্ঠ পাখা মেলে,
বজ্র যেন তুলছে আওয়াজ পরম সুখে
যাদুর রাজা ঐ তুরাখন দু'হাত তুলে,
ঘুমটি ভেঙ্গে উঠল বসে বেদির বুকে।

গান চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার তালে তালে খোজা নাসিরুদ্দিন এবং একচোখো চোর শান্ত সন্ধ্যার এক সময়ে কোকান্দ থেকে বিদায় নিলেন।

পাহাড়ের সেই হ্রদের খোঁজে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন; কোকান্দে থাকার সময় খোজা নাসিরুদ্দিন হ্রদটার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি।

গাধাটা আনন্দে লাফাতে লাফাতে সামনে এগিয়ে এল—এতদিন সে তার প্রভুর কাছ থেকে কোন যত্নই পায়নি। জিনের উপর বসে খোজা নাসিরুদ্দিন একচোখোর কাছে অভিযোগ করলেন:

"এটা একটা পিপার মত আবার মোটা হয়েছে। খুব শীঘ্র এর উপর একেবারেই চাপতে পারব না। পা ফাঁক করা কোন কিরঘিজের কাছে এটাকে বিক্রী করতে হবে।

পিছনে গানের সুর এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হল না। একটা সমবেত সঙ্গীত থেকে আর একটায় এবং একটা বাগান থেকে আর একটায় অবিরাম গান হতে লাগল:

বসন্তেরই পাখীর মত দিন চলে যায়।
বুড়োর চোখে নেই কো বিরাম, নেই কোন ঘুম,
ছোট বড় সবার তরে করছে সেলাই।
একা একা, কেউ কোথা নেই বড়ই নিঝুম।

প্রাসাদের বাইরের চকের নীচে যেখানে জেলখানা ছিল সেই জায়গাটা তাঁরা পেরিয়ে এলেন; উপরের বাতাস বার হওয়া ফুটো তিনটের কাছে দুর্গন্ধে ভরা গ্যাসের একটা ধোঁয়া জমেছিল; তাঁরা গলা-কাটা সেতুও পেরিয়ে গেলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন শেষবারের মত জ্যোতিষীদের দেখবার জন্য জিনের উপর একটু উঁচু হবার চেষ্টা করলেন। প্রধান জ্যোতিষীর গুহা তখনও খালি ছিল কিন্তু হাড় জিরজিরে বুড়ো লোকটার গুহার পাশে বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল। তেলমাখা বিখ্যাত হাড়ের খুলিটাকে দূর থেকেও চকচক করতে দেখা গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন জিনের উপর বসে পা দুটো তুলে ধরলেন এবং একচোখো তার পাজামা গুটিয়ে ও খালি পায়ে বরফে ও স্রোতে ভর্তি সাই নদী পার হলেন; ছোট ছোট নুড়ি ও বড় পাথরের টুকরোর জন্যে নদীর পাড় বেশ খাড়া হয়ে মাঝ নদীর দিকে এগিয়ে গিয়েছে; নদীর অন্য পাড়ে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানের সুর যেন তাঁদের অভিনন্দন জানাল:

ছেলে মেয়ে আজকে রাতে দুঃখ ভুলে
দুপুর রাতে স্বপ্ন দেখে পরম সুখে,
যাদুর রাজা ঐ তুরাখন দু' হাত তুলে,
ঘুমটি ভেঙ্গে উঠল বসে বেদির বুকে।

সরু অন্ধকার রাস্তার গরম এবং নর্দমার মত ছোট ছোট গলি পেরিয়ে শহরের পাঁচিলের বাইরে আবার তাঁরা গাঁয়ের খোলা বাতাসের স্পর্শ পেলেন। তাঁদের সামনে পড়ে আছে বাগান, মাঠ এবং রাস্তা—যে রাস্তা চলে গিয়েছে ডানে, বামে আবার কোথাও সোজা।

একচোখো আবেদনের ভঙ্গিতে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চাইলেন।

"আমরা কি সমাধি না দেখে এবং আমার লাগান গাছের ডালটার দিকে না তাকিয়ে চলে যাব?"

সত্যি বলতে কি খোজা নাসিরুদ্দিনের সমাধি দেখার কোন ইচ্ছা ছিল না; তিনি ভয় করছিলেন যে পচে যাওয়া গাছের ডালটা একচোখোকে হয়তো হতাশ করে তুলবে এবং তাঁর মনে যে বিশ্বাস জন্মেছে তা নষ্ট করে ফেলবে। একটা উপযুক্ত ওজর খুঁজে না পেয়ে তিনি একরকম জোর করেই যেতে চাইলেন।

তাঁরা সেগুন গাছগুলোর দিকে বাঁক নিলেন; গাছগুলো ডান দিকে আরও গাঢ় এবং ঘন সবুজ হয়ে বেড়ে উঠেছে। এক সময় তাঁরা নিজেদের গাছগুলোর শীতল ঘন ছায়ার নীচে দেখতে পেলেন।

একচোখো চুপ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল। তার মনের ভিতরের অশান্তি খোজা নাসিরুদ্দিনের গোচরে এল যদিও তিনি জানতেন যে

কোন অলৌকিক ঘটনা থাকতে পারে না, তবুও তিনি তাঁর বুকের ভিতর একটা উত্তাপ অনুভব করলেন যা তাঁর শরীরে কাঁপুনি ধরাল।

কোন কিছুর জন্য অবশ্য তিনি উত্তাপ অনুভব করেননি! একটা বিরাট ঘন ঝোপের সামনে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর গোলাপের পিছনে একটা সমাধি দেখামাত্রই কাঁপুনির সৃষ্টি হল।

একটা বিরাট চীৎকার করে একচোখো প্রায় অজ্ঞান হয়ে সমাধির পাথরের উপর আছড়ে পড়ল এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল।

বিংশতি অধ্যায়

সমাধির রক্ষক ছিল আগের সেই বুড়ো লোকটা যার গায়ে বর্ণনার অতীত দিন আগের সেই জামাটাই গায়ে ছিল; দেখে মনে হচ্ছিল সমাধির কাছে প্রিয় সাধুর জন্যে লোকেদের আনা ফিতা এবং তালি দিয়ে জামাটা তৈরি। দেখামাত্রই সে পথচারীদের চিনতে পারল।

"কেমন করে তোমরা যেতে পারলে—পথে কোন বাধা নেই? লোকে বলেছে তুরাখনের নামে সেখানে নাকি একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।"

"যার প্রয়োজন আছে সে ঠিকই পার হবে। কোন বাধা তাকে আটকাতে পারবে?" সঙ্গীকে আঙুল দেখিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন; সমাধির প্রবেশ পথে একচোখো তখন সাষ্টাঙ্গে শুয়ে আছে।

বুড়ো লোকটা কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল, কথা বলার সময় হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠল:

"তোমার কি মনে আছে আমি বলেছিলাম এ বছর নিশ্চয়ই শিকড় গজাবে? আমি কি ঠিক বলিনি?"

মনে হল তার বয়স যেন কমে গিয়েছে: যদিও সে কুঁজো, কাল এবং বয়স্ক ছিল, ভিতরের একটা আলো যেন তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল; চোখ দুটো এত স্বচ্ছ ও নির্মল যে মনে হচ্ছিল যেন কোন বাজে চিন্তা তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

"এই বুড়ো শিয়াল!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমি তোমার চালাকি বুঝি! এই গোলাপের সুন্দর ঝাড়টা পেলে কোথায় এবং কি করেই বা শিকড় সমেত এটাকে তুলে আনলে?"

"এটা করতে আমার কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু আমার বুড়ো মনটা নিজে

আমি কি করব—হয়তো এটা সহানুভূতিতে ভেঙ্গে পড়ত যখন লোকটা আর একবার দেখত যে তার গাছের ডালটা শুকিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি অল্প অলৌকিক কিছু করার ইচ্ছা করেছিলাম।"

"তুমি অল্প নয় বিরাট একটা অলৌকিক কাজ করেছ, এই সব অলৌকিক কাজের জন্য আজও পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন।

একচোখো উঠল এবং সমাধি ঘরে ঢুকল।

"তারা একসঙ্গে প্রার্থনা করুক," বুড়ো বলল।

"একসঙ্গে ? ভিতরে আর কেউ আছে নাকি ?"

"একজন স্ত্রীলোক, বিধবা, আমার বিশ্বাস। পাগল। বলছে তুরাখন বাবা তার তিন ছেলেকে তিন হাজার সোনার টাকা দিয়েছে, এছাড়া আরও অনেক কিছু টুকিটাকি। সেজন্য সে এসেছে ধন্যবাদ জানাতে: নিঃসন্দেহে সে স্বপ্ন দেখেছিল······"

"বুড়ো, ভগবানের নিন্দা করো না ! আমি সবেমাত্র শহর থেকে এসেছি এবং দিব্যি করে বলতে পারি যে তার গল্পের একটা শব্দও মিথ্যা নয়। কখন তুমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করবে, এদিকে তুমি প্রতিদিন অলৌকিক ঘটনার চিন্তা কর এমনকি নিজে করবার চেষ্টা কর !"

"তাহলে আমি বিশ্বাস করি !" খোজা নাসিরুদ্দিনের দৃষ্টির সামনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করে বুড়ো বিড়বিড় করে বলল। "রাতের বেলায় যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি সম্ভবতঃ তুরাখন তখন বাইরে যায়। হয়তো সে এমন কি আমার ঘরের ভিতরটাও দেখেছে।"

"সে আরও বেশি দেখেছে—সে তোমার মনের ভিতরটাও দেখেছে এবং সেখানে হয়তো কোন শুভ চিহ্ন রেখে গিয়েছে।"

বুড়ো চুপ করে ভাবতে সুরু করল এবং অনেকক্ষণ সেখানে সমাধির মিনারের উপরে নরম নীল গভীর আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল আবছা দৃষ্টি মেলে, যেখানে ব্যস্ত ঘুঘু পাখীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের যত্ন নিতে নিতে রেশমের মত নরম পাখার খসখস শব্দ তুলে এখানে ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

"বিধবা তুরাখন বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে একটি অনাথ ছেলেকে পোষ্য নেবে তার চতুর্থ পুত্র করে।"

"আর একটি আশ্চর্য !" খোজা নাসিরুদ্দিন আনন্দে বলে উঠলেন। "এখন তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ যে পৃথিবীতে একটা শুভ কাজ করলে তার

থেকে আর একটা শুভ কাজ আসে, তার থেকে আর একটা এবং এইভাবেই একটা থেকে আর একটা হয়ে চলে, যার কোন শেষ নেই। শুভ কাজের শক্তি অসীম এবং পৃথিবীতে একদিন শুভ ও কল্যাণ জয়লাভ করবেই।"

"ঠিকই," বৃদ্ধ ফিসফিস করে বলল। "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি আপনার কথা অনেক ভেবে দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে এসব নিঃসন্দেহে সত্যি। আমার আগের ভুলের জন্যে অবশ্য দোষ দেবেন না, কারণ সেসব অনেক ঠেকে শেখার ফল। আল্লা আমাকে সহানুভূতিতে ভরা মন দিয়েছেন; কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে আমি সবচেয়ে বেশি বেদনা পাই। হতভাগাদের চোখের জল এবং অন্যায়কারীদের কাতরানি দেখলে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাই না। এমন এক সময় ছিল যখন আমি জীবনের নিষ্ঠুর অন্যায় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এক শান্ত নির্জন গাঁয়ে সাত বছর লুকিয়ে ছিলাম, সেখানে পাহাড়ের এক হ্রদ রক্ষকের কাজ করতাম। এই হ্রদের জলে চারপাশের জমিতে সেচ দেওয়া হত। আমার উদ্বিগ্ন বুড়ো মন অল্পকালের জন্য সেখানে শান্তি পেয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার অন্যায় সুরু হল। হ্রদের একজন নতুন মালিক এল নাম আগাবেক। সে ছিল একজন দৈত্য, তার মন ছিল ড্রাগনের মত ভয়ংকর এবং মাকড়সার মত নিষ্ঠুর; তার জন্ম যেন কোন নারীর পেটে হয়নি, হয়েছিল গভীর অরণ্যের কোন বিষাক্ত শেওলায়……"

"চুপ কর, বুড়ো, চুপ কর!" খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন; তাঁর হৃদপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে উঠে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিল। "তুমি আগাবেক বললে? একটা পাহাড়ী হ্রদের মালিক? এ কি সেই লোক যে গাঁয়ের লোকেদের কাছে সেচের জলের জন্য অনেক টাকা আদায় করত?"

সেই মুহূর্তে তাঁকে যেন একটা শিকারীর মত লাগছিল যিনি অনেক দিন ধরে এক হালকা-পায়ের নেকড়ে বাঘকে পাহাড়ী খাদে খাদে খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং তাকে ধরতে হতাশ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু শেষে তিনি পশুটার পায়ের চিহ্ন পেলেন একটা বরফে ঢাকা স্রোতস্বিনী নদীর তীরে—বালির উপর টাটকা পায়ের দাগ যা বাতাসে এখনও শুকোয়নি।

"একই লোক," বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। "আপনি তাহলে তার সম্বন্ধে শুনেছেন।"

"তুমি কি জান হ্রদটা সে কার কাছ থেকে কিনেছিল এবং কেমন করে?"

"লোকে বলে সে নাকি পাশা খেলায় জিতেছিল।"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর আগাবেককে খুঁজে পেলেন।

তুলনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে শিকারী তার নেকড়েকে দূর থেকে দেখতে পেলেন। ঝোপের ভিতর একটা দীর্ঘ হলুদ রং-এর ছায়াকে চুপি চুপি যেতে তাঁর চোখ দেখতে পেল এবং বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছের পাতার উপর রোদের আলো নাচতে থাকার দরুন শরীরের অন্যান্য অংশও দেখতে পাওয়া গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন বুড়ো লোকটার হাত ধরে পাশে কম্বলের উপর বসালেন যেখানে অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া উঠছিল।

"বস, বুড়ো, বস এবং যা জান আমাকে বল। আমি তোমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। সেই হ্রদটা কোথায়? কোন পাহাড়ের উপর? আগাবেক দেখতে কেমন? তার বয়স কত? আমি এত উত্তেজিত বলে অবাক হবে না। বিশ্বাস কর শুধু অলস কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করছি না। ঐ আগাবেক কোথা থেকে এসেছে? সে আগে কোথায় বাস করত এবং কি করত?"

"তোমার প্রশ্নগুলো মৌচাক থেকে বেরিয়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত, আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে," বুড়ো লোকটা ওকালতির ভঙ্গিতে বলল। "তোমার অধৈর্যের লাগাম টান, প্রশ্নগুলো একটার পর একটা কর যাতে আমি বুড়ো মানুষ ভালভাবে গুছিয়ে এবং তাড়া না করে উত্তর দিতে পারি।"

এক সময়ে বিশ্বাস করা হত যে যদি কোন মানুষের আড়ালে নিন্দা করা হত —তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন—তার নাক সুড় সুড় করত এবং সে অবিরাম হেঁচে যেত। তা হলে আগাবেক নিশ্চয়ই অন্ততঃ পঞ্চাশবার একটানা সেদিন হেঁচেছে তা সে পাহাড় থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাস বন্ধ করার জন্য জানালা, দরজা যত শক্ত করেই লাগাক না কেন।

তাঁর ভুল হয়েছিল, সেই অভিশপ্ত আগাবেকের অশুভ বাতাসের চিহ্ন নয়, নিষ্কৃতি ও পুরস্কার হিসাবে বাতাস সেদিন পাহাড় থেকে আসেনি, উপত্যকা থেকে এসেছিল।

"আজ সৌভাগ্যের দিন!" খোজা নাসিরুদ্দিন আনন্দ করে উঠলেন যখন দেখলেন তাঁর সব প্রশ্নই শেষ হয়ে গিয়েছে। "আমরা সবাই তুরাখন বাবার কাছে পুরস্কার পেয়েছি—বিধবা, আমার একচোখো সঙ্গী ও আমি নিজে। তুমিই কেবল কোন পুরস্কার পাওনি। কিন্তু তা হতে পারে না। এখানে এস!"

জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি যে নতুন পোশাকটা পেয়েছিলেন সেটা কাঁধ থেকে খুলে বুড়োর কোলের উপর ছুঁড়ে দিলেন।

বুড়ো তাঁকে ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু সেটা নিতে অস্বীকার করল। খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে উপহারটা নিতে বাধ্য করলেন।

"এই অতিরিক্ত পোশাকটা নিয়ে আমি কি করব?" বৃদ্ধ খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল; যখন সে নতুন পোশাকটায় নিজেকে সাজিয়ে পুরোনো তালি দেওয়া পোশাকটার দিকে চাইল তখন মনে হল যেন সেটা আর মানুষের পোশাকের উপযুক্ত নয়। "আমার মনে হয় এটা বিছানার চাদর হবে, নইলে, বালিশ।"

"এটাকে ধোঁয়া হতে দাও," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"ধোঁয়া?"

"হ্যাঁ। দেখ করলে কি হয়।"

তিনি তালি দেওয়া জামাটা তুলে নিলেন ও আগুনে ছুঁড়ে দিলেন। বাতাস তাঁর সাহায্যে এল এবং পুরু কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠল।

"এই যে এভাবে," কাশতে কাশতে ও মাটির দিকে মুখ নিচু করে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "দেখ কি সুন্দর, কি গন্ধ, কি ধোঁয়া। । অবশ্য এটা নয় যে তুমি এ ধরনের ধোঁয়া কখনও দেখনি, তবে এ ধরনের গন্ধ অবশ্য কম শুঁকেছ!"

বৃদ্ধ দুঃখে গোঁ গোঁ করে উঠল কিন্তু সে এখন কিছুই করতে পারে না—জামাটা পুরে গিয়েছে।

বাতাস শিশুদের অনেক দূরের গান ভাসিয়ে নিয়ে এল।

খুশীর হাওয়ায় উঠছে মেতে সব শিশুরাই
আনন্দ আজ উথলে উঠে কচি প্রাণে।
আজকে এস, সবাই মিলে জয়গাথা গাই
মে মাসের এই আলোয় ভরা প্রথম দিনে।

আগামী কাল ঘুমিয়ে বুড়ো পড়বে সুখে,
রইবে না কেউ ঘুম ভাঙাতে শব্দ তুলে,
মিষ্টি হাসি রইবে লেগে বুড়োর মুখে,
যাদুর রাজা মাটির নিচে পড়বে ঢুলে!

খোজা নাসিরুদ্দিন এবং একচোখো চোর কোকান্দের থেকে বেশ দূরে এসে প্রথমে আকাশের তারার দিকে চাইলেন। তাঁদের পথ ছিল পশ্চিমে, পাহাড়ের দিকে সেগুলো দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল এবং যাদের চূড়াগুলো পৃথিবী থেকে আকাশকে আলাদা করে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল যেন উজ্জল সমুদ্র গোলাপী আভা নিয়ে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়েছে এবং উপরের হালকা ছোট ছোট মেঘগুলো যেন মায়াবী দ্বীপ, যার চারপাশে আছে বালির চর, উপসাগর এবং মূল ভূমি; একটা সবুজ তারা—যেন একেবারে নতুন—জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল, মনে হচ্ছিল যেন ফ্যাকাসে কুয়াশার মধ্যে একটা দূর জাহাজের আলো ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে এল; উজ্জ্বল সমুদ্র ও তার মায়াবী দ্বীপ হারিয়ে গেল; অসংখ্য তারা দেখা দিল এবং তাদের মধ্যে আগেরটা হারিয়ে গেল। পরে আকাশে যেন আগুন দেখা দিল; চাঁদ উঠল; একটা বিরাট লাল চাঁদ যেটা ইতিমধ্যে ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে সুরু করেছে; এটা পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আকাশে পাড়ি জমিয়েছে এবং এর লাল আলোয় পাহাড়ের চূড়াগুলোর রেখা আকাশে আবার অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিল।

বাতাস সজীব হয়ে উঠল, রাত হল। জামা না থাকলেও খোজা নাসিরুদ্দিন গরম বোধ করলেন না এবং প্রায়ই জিনের উপর উঠে উঁচু হয়ে দেখতে লাগলেন কোথাও একটা সরাইখানার আলো দেখা যায় কি না।

এই ভাবেই তাদের তিনজন আবার নতুন করে যাত্রা সুরু করল—গাধাটা, একচোখো চোর এবং খোজা নাসিরুদ্দিন। কিন্তু সেদিন যদি আমরা সেই কাঁকর ভরা রাস্তায় রাতের অল্প আলোয় দেখতাম তবে আর একজন অদৃশ্য মানুষের উপস্থিতি তাদের তিন জনের চলার পথে অনুভব করতে পারতাম—তিনি তুরাখন বাবা।

দ্বিতীয় খণ্ড

সকল জ্ঞানের আধার আল্লা আমার কৃপা করুন, আমি যেন চিরযৌবন বজায় রাখার নিমিত্ত হতে পারি।

হাজার এক রাত্রির গল্প

একবিংশতি অধ্যায়

সমরখন্দের প্রখ্যাত দরবেশ করিম-আবদাল্লা, যিনি মানুষের অন্তরের বিশেষ গুণ নিয়ে গবেষণা করতেন, শিখিয়েছিলেন যে রাতের কুয়াশার মত আবার দিনের উজ্জ্বল আলোর মত মানুষ আছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করে চাঁদ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষকে সূর্য। এই বিখ্যাত দরবেশের মতে প্রভেদটা চাঁদের দরুন না সূর্যের দরুন, বোঝা যায় লোকটির জন্ম সময় থেকে এবং এই দুটো পরস্পরবিরোধী ও প্রতিকূল গ্রহের মধ্যে যে প্রথম নব-জাত শিশুর রক্তে নিজের আলো বিকিরণ করতে পারে, তার প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে অনুগত থাকে। চাঁদের কাছ থেকে মানুষ পায় নম্র ও শান্ত স্বভাব আর সূর্যের কাছ থেকে পায় তেজ ও সজীবতা; ঠিক একই ভাবে তার চারপাশের পৃথিবীর দিকে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিয়ে সে চায় তা হয় চান্দ্র নয় সৌর। প্রথমটির বেলায় এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে এক অস্পষ্ট কুহেলিকার প্রভাবে যা সমস্ত জিনিষেই একটা শান্তি ও বিষণ্ণতার ছোঁয়া রেখে যায় যখন সমস্ত কিছুই, এমন কি সেই মুহূর্তে কোন ঘটনা তার নিজের চোখের সামনে ঘটলেও, মনে হয় যেন অতীতের কোন প্রতিধ্বনি; যেন সে কোন দ্বিতীয় জীবনযাপন করছে যা হচ্ছে স্বপ্নে দেখা কোন প্রথম জীবনের অনুকরণ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি যেন এক উজ্জ্বল প্রমত্ত আলোয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যে আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়; জীবন সেখানে চিরন্তন, পিছনে কোন চিহ্ন না রেখে মিলিয়ে যায় না, সব কিছুই চলছে ও আন্দোলিত হচ্ছে এবং রামধনু রংয়ের মণিমুক্তার মত ঝলমল করছে; জীবন এখানে একই খাতে প্রবাহিত, রাতের বুকে কিছুই ফেলে না রেখে সব কিছুই যেন সে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। প্রিয়জনের প্রতিমুহূর্তের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সে তাকে রাজকীয় বদান্যতায় হাজার ভাবে ভরিয়ে তোলে; এখানে মনের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং আত্মার প্রজ্জ্বলিত উত্তাপই

মানুষের কাছে আশা করা হয়। ঝলমলে আলো, আলোড়ন ও উন্মাদনার এই উষ্ণ স্রোতে বাস করা খুব সোজা নয় কারণ জীবন তার অনুগত ও বিশ্বস্ত ভক্তদের যে দুটো বড় পুরস্কার দান করে আত্মার পক্ষে সে দুটোই বেশ শুভ-দায়ক ; এখানে কোন 'গতকাল' নেই কিন্তু আছে সর্বদা অপরিবর্তিত 'আজ', এখানে 'ছিল' নামে কোন কথা নেই, শুধু 'আছে'। শূন্যতার রাজ্য মৃত্যুর কাছে তাই সব দরজাই বন্ধ।

খোজা নাসিরুদ্দিন নিশ্চয়ই ভরা দুপুরে জন্মেছিলেন যখন সূর্য ছিল ঠিক মাথার উপরে। তাঁর রক্ত এই আলোর প্রভাবে নিশ্চয়ই তাঁর অন্তরে এক অনির্বাণ শিখা নিয়ে জ্বলত। সেজন্যে তাঁর সারা জীবনে এমন একটি মুহূর্তও আসেনি যখন তিনি দুপুরবেলায় বেশি সময় ঘুমিয়েছিলেন ; ঠিক যেন সূর্য সেই সময় একটা পিতলের ঘণ্টায় আঘাত করে প্রতিধ্বনি তুলত ও তাঁকে জাগিয়ে তুলত ; তাঁর আগুনে-ভরা রক্ত এই আহ্বানে পাগলের মত সাড়া দিত এবং শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে গিয়ে হৃদপিণ্ডে আঘাত হানত ও তিনি এক লাফ দিয়ে জেগে উঠতেন।

পাহাড়ের এ পাশের শেষ গাঁয়ের সরাইখানায় তিনি যখন জেগে উঠলেন তখন ছিল দুপুর—আরও উপরে গিরিপথের দিকে মানুষের কোন বসতি ছিল না। তাড়াতাড়ি খাবার ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়ে তিনি ও একচোখো আবার পথ চলতে সুরু করলেন।

পাহাড়ের উপর কোন পথ ছিল না—কেবল মালবাহী পশুদের পায়ে চলার পথ ; পথচারী ও ঘোড়সওয়ারদের এই রাজ্যে কোন গাড়ী ছিল না। পায়ে চলা পথ এঁকে বেঁকে উপর দিকে উঠে গিয়েছে, কোথাও কোথাও আবার সমান পথ নিচের দিকে নেমে এসেছে, ফলে অনেক সময় পথচারীরা, যাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় দু'ঘণ্টা, একে অন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথার আদান-প্রদান করতে পারত যদিও একজন তখন উপরে, অন্য জন নিচে। উপত্যকা আবার তার ফলের বাগান, মাঠ এবং গ্রাম নিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যেত ; সামনে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের চূড়ার সারি, মনে হচ্ছিল খুব কাছে, যদিও ওগুলো ছিল অনেক দূরে, নিচের দিকটা ওদের কাল এবং উপরে জলপাই রংয়ের গায়ে যেন এক পোঁচ সাদা রং লাগান আছে, মনে হচ্ছিল নীল আকাশের বুক থেকে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে তাদের ছিঁড়ে এনে মাঝে মাঝে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূর্য উঠলে দেখা গেল সেই পায়ে চলার পথটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা তিন ফুট চওড়া পাড় ধরে চলে গিয়েছে, পাড়টা এক ভয়ংকর মুখ হাঁ করা খাদের উপরে যেন ঝুলছিল, সব কিছু এক দুর্ভেদ্য কুয়াশায় ঢাকা ছিল। মনে হচ্ছিল পথচারীর পায়ের নীচের মাটি যেন হঠাৎ পাশে সরে গিয়েছে এবং এখন সে কেবল পাড়টা ধরে ঝুলছে।

খোজা নাসিরুদ্দিন আগে আগে হাঁটছিলেন, পিছনে চলছিল গাধাটা; ওর বাঁ দিকের পেটের পাশটা পাহাড়ের খাড়া গায়ে ঘষে যাচ্ছিল; সব পিছনে ছিল একচোখো। পিছনে শোনা যাচ্ছিল আলগা পাথর নুড়িগুলোর সেই ভয়ংকর খাদে পিছলে পড়ে যাওয়ার অবিরাম হিস হিস শব্দ।

পাহাড়ের পাশ ধরে তাঁরা কয়েক ঘণ্টা হাঁটলেন, পরে পায়ে চলার পথটা ক্রমশঃ চওড়া হল এবং সেই ভয়ংকর খাদটা ডান দিকে সরে গেল; সাদা রংয়ের লোভনীয় কুয়াশা আর তাঁদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে রইল না। পায়ের নিচে মাটি আবার ফিরে এল। বরফের একটা ভয়ংকর স্রোত খাড়াভাবে নিচে গিয়ে পড়ল; গুম গুম শব্দ তুলে পাক খাওয়া জলের ফেনা ও পাথর-নুড়ি খাদের তলা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। নিচে যাবার একটা ঘোরা পথ এখানে পাওয়া গেল; তাঁরা গিরিপথে এসে পৌঁছালেন। কুয়াশা সরে গিয়েছিল এবং আকাশ আবার মাথার উপর তার আগের নীল রং নিয়ে এত অপরূপভাবে শোভা পাচ্ছিল যে মায়াবী পাখী হুমাই-এর কথা মনে হচ্ছিল। এই পাখী ছিল গভীর নীল রংয়ের এবং চারপাশে এত সুন্দর আলো ছড়াত যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই নীলের প্রাচুর্যে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর সকল চিন্তা ও অনুভূতি হারিয়ে ফেললেন এবং নিচে বিছান জামাটার উপর বসে মুখ উপর দিকে তুলে তিনি পৃথিবীর মধ্যে ডুবে গেলেন, শীতল বাতাস তাঁর খোলা বুকে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

তাঁরা নিচে নেমে এলেন এবং রাখালদের গরু ঘোড়া নিয়ে যাবার মত একটা পায়ে চলার পথ দেখতে পেলেন যেটা ছোট ছোট গাছের ঝোপের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। বাতাস আরও ঘন ও গরম হল, সূর্যের আলোয় মধুর মত সুবাস দিচ্ছিল এবং মৌমাছির গুনগুন ও ফড়িংদের চির চির শব্দে চারদিক পরিপূর্ণ ছিল। নীচে নামার পথ ছিল বেশ খাড়া এবং গাধাটাকে সময় সময় পিছনে ভর দিয়ে বসে গড়িয়ে নিচে নামতে হচ্ছিল; এদিকে খোজা নাসিরুদ্দিন এক হাতে ঝোপ ধরে ও অন্য হাতে গাধাটার লাগাম ধরে বললেন:

"আস্তে, আস্তে, নইলে ঘষতে ঘষতে তোমার সবটাই ক্ষয়ে যাবে ; উপত্যকায় যখন পৌঁছাবে তখন তোমার মাথা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"

নিচে নামা বেশ কঠিন ও শ্রমসাধ্য হলেও সময় লেগেছিল অল্প। দুপুরের মধ্যেই তাঁরা চোরাক গ্রামে যাবার পথে গাড়ী চলা রাস্তায় এলেন—চোরাক ছিল তাঁদের গন্তব্য স্থান। ধূসর রংয়ের বন্ধ্য খাড়া পাহাড়ের জায়গায় দেখা গেল সবুজ ঢালু পাহাড়ী অঞ্চল, উপর থেকে দূরে এখানে সেখানে দেখা গেল কিরঘিজদের গোল গম্বুজ সমেত ছোট ছোট বাড়ীগুলো দেখতে অনেকটা বড় সাদা পাখীর মত লাগছিল যেন বিশ্রাম নিতে বসেছে আর তাদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ভেড়ার দলকে অনেকটা রংয়ের ছিটে ফোঁটার মত লাগছিল।

আর একটা বাঁক নিতেই গ্রামটা দেখা গেল তার একটু ওপাশে দেখা গেল হ্রদটা।

যে বিরোধের জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন বাড়ি ছেড়েছিলেন এইখানেই হবে তার অবতারণা। প্রাচীন উপকথার বীর যোদ্ধা—যিনি নৈতিক যুদ্ধের জন্য সোজা পাহাড়ে গিয়ে বারটা ড্রাগনকে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন—খোজা নাসিরুদ্দিনও ঠিক একইভাবে পাহাড়ে এসেছিলেন, তাঁর ড্রাগন ছিল মানুষের আকৃতি নিয়ে এবং শক্তিশালী যুদ্ধের ঘোড়ার বদলে তাঁর বাহন ছিল পেটমোটা ছোট গাধাটা। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যে কোন জিনিস ভেদ করে যেতে সমর্থ সেইজন্য তিনি ভৎর্সনার দৃষ্টিতে হাসেন না বা উপকথার এই উদাহরণকে সরিয়ে রাখেন না কারণ তিনি জানেন যে ভাল ও মন্দের লড়াই যেভাবেই হোক না কেন এই লড়াই সর্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে এবং পৃথিবীর শেষ পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎসাহী ও সরল ইবন-হাকিম এই বিষয়ে বলেছেন, "যেখানেই বা যখনই কোন কাজ করা হোক না কেন, যদি সেই কাজ পরবর্তী বংশধরদের প্রভাবিত করতে না পারে তবে কোন কাজ মন্দ বা ভাল কিছুই হতে পারে না—তা সে কাজ যেখানেই ঘটুক : কেন রাজপ্রাসাদে কুঁড়ে ঘরে, উত্তরে বা দক্ষিণে, সাক্ষী রেখে বা না রেখে ভাবে কোন কাজ—ভাল বা মন্দ যাইহোক না কেন—তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন হতে পারে না কারণ এইসব ছোট ছোট কাজের সমষ্টি থেকেই বড় কাজের সৃষ্টি।"

সুন্দর সবুজ ফলের বাগান, আঙুর খেত এবং বাড়ীর হলুদ রংয়ের ছাদের উপর পাক খেয়ে ধোঁয়া বার হতে দেখে খোজা নাসিরুদ্দিন এক নজরেই

অনুমান করলেন যে এই ছোট গ্রামটা প্রায় শ দেড়েক বাড়ী নিয়ে ; তখন ছিল রাতের খাবারের সময়। সাদা রাস্তাটা—একই রাস্তা যার উপর তখন তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন—এই সবুজের সমুদ্রে মিশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু রাস্তার দুই পাশে পাহারা দিতে থাকা লম্বা পপলার গাছে বোঝাই আঁকাবাঁকা পাহাড়ের চূড়া থেকে রাস্তাটার বাঁকগুলো গ্রামের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, যেখানে এটা আবার দেখা দিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছিল প্রথমে মাঠ ও পরে তরঙ্গায়িত ঢালু অঞ্চলের ভিতর দিয়ে উপত্যকায়। পপলার গাছের ওপারে একটা মিনার দেখা যাচ্ছিল। দুপুরের নামাজ পড়ার সময় হয়েছে কিন্তু মৌলভী বুড়ো হওয়ায় ও গলায় জোর কম থাকায় তার গলার আজানের শব্দ যাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত তাদের কাছে এসে পৌঁছাল না।

খোজা নাসিরুদ্দিনের দৃষ্টি হ্রদের উপর এসে পড়ল ; একটা ডিমের আকৃতির গর্তের মধ্যে এটা অবস্থিত ছিল, অনেকটা বালির উপর ডিমের ছাপ পড়লে যেমনটি হয় ঠিক তেমনই ; হ্রদের দূরের পাড়টা ছিল অনুর্বর ও পাথরে ভরা কিন্তু ফলের বাগানের পাশে কাছের পাড়টা ছিল পুরু সবুজ ঘাসে ঢাকা যার উপর বুড়ো সেগুন গাছের গুঁড়িগুলো ঘন সারি দিয়ে থামের মত উপরে উঠে গিয়েছে। দুটো জীবন্ত ঝলমলে শিরা যেন উপর থেকে হ্রদের ভিতর নেমে গিয়েছে—দুটো পাহাড়ী ঝরণা—এবং নিচে এখান থেকে কেবল একটা শিরা বেরিয়ে গিয়েছে—মাঠে সেচের জন্য জল নিয়ে যেত যে নালীটা তার কাল শুকনো তলদেশ। হ্রদ ও বাগানের মাঝখানে অন্য বাগানগুলো থেকে একটু দূরে উঁচু পাঁচীল ঘেরা একটা বড় সবুজ ফলের বাগান আছে যার আড়ালে আছে একটা বাড়ী—ড্রাগনের গুহা, আগাবেকের বাসস্থান।

"আমরা তাহলে এখন এখানে," একচোখো চোর বলল।

"এস বসা যাক," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "সব ব্যাপার নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।"

রাস্তার পাশে পাথরের একটা ফাটল থেকে ঠাণ্ডা জলের ধারা ফোয়ারার আকারে ছিটকে বেরিয়ে আসছিল, একটু উপরে শাখা-প্রশাখায় ভর্তি কম বয়সী একটা পপলার গাছ দাঁড়িয়েছিল, যেটা আশ্চর্যজনকভাবে পাথরগুলোর মধ্যে জন্মেছিল। গোড়ার কাছে শক্ত কাঁটাভর্তি ঝোপ গাদাগাদি করে জন্মেছিল আর চারপাশে যেন উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছান ছিল ; পাথরের ভিতর কোথাও কোন ফাটল ছিল না যেখান থেকে এটা উঁকি মেরে বেরিয়ে আসতে

পারে ; উন্মত্ত, উজ্জ্বল পান্না রংয়ের এই গাছটা হচ্ছে প্রাণবন্ত জীবনের অবিনশ্বরতার প্রতীক যা সব সময় সর্বত্র মৃত পাথরের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। গাধাটা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছিল, লেজের মাথার চুলের গোছাটা চোর কাঁটা লেগে খোঁচা খোঁচা একটা পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

"কোথা থেকে এসব জোগাড় করলি ?" লেজটা ধরে খোজা নাসিরুদ্দিন ধমক দিয়ে বলে উঠলেন।

যাত্রাপথে গাধাটার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব একচোখো নিজে থেকেই নিয়েছিল ; সে এখন কাঠের চিরুণি বার করে লেজের গোছাটা পরিষ্কার করতে ও চোর-কাঁটা পরিষ্কার করতে লাগল।

"দুঃখের ব্যাপার যে এটা একটা হ্রদ, ছোট জিনিস নয় যা চুরি করা যেতে পারে," ব্যগ্রতার সঙ্গে চোর বলল যখন গাধাটার লেজ পরিষ্কার করে সে অনেকটা স্বাভাবিক করে আনল। "সমাধি শেষবার দেখে এসে দয়াময় তুরাখনের কৃপায় আমি আমার ভিতর ভাল কাজ করার একটা প্রেরণা পাচ্ছি এবং কাজ করার সঙ্গে দারুণ উৎসাহ পাচ্ছি।"

"শুভ কাজ, বাস্তবিক," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন, "তবুও তোমার চিন্তা চুরির দিকে মোড় নিচ্ছে। এমনকি হ্রদটাও তোমার মনে চুরির চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু আনছে না।"

"আগাবেকের সামনে আমরা নিশ্চয়ই হাঁটু মুড়ে বসব ? তাহলে নিশ্চয়ই সে দয়া করে হ্রদটা ছেড়ে দেবে ?"

"নিশ্চয়ই। সে নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। ঐ দেখ।"

খোজা নাসিরুদ্দিন কাঁটা ঝোপটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। চোরটা ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে দেখল যে একটা বিরাট মাকড়সা একটা হলুদ রং-এর প্রজাপতিকে গিলছে। এটা একটা বীভৎস দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ; মাকড়সার পায়ের জোড়গুলো লাল লোমে ঢাকা, পিঠে ধূসর রংয়ের ক্রস চিহ্ন এবং গোল পেটটা মসৃণ, বেশ টান টান ও সাদা রংয়ের, যেন গোটা পেটটা পুঁজে ভর্তি। তখন সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিল ; জালের ভিতর যা ছিল তা হচ্ছে মৃতদেহের খোলস যার পাখা দুটো হাওয়ায় দুলছিল। এদিকে ফেঁপে-ওঠা মাকড়সাটা হামা দিয়ে একটা পাতার নিচে গেল এবং সেখানে লাঙ্গনের পা দুটো থাবার মত ফাঁদের ভিতর রেখে লুকিয়ে রইল।

"বুঝতে পারছ ?" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"বুঝবার কি আছে? একটা মাকড়সা একটা প্রজাপতিকে গিলে খেয়ে নিয়েছে, ব্যস।"

"এখন দেখ।"

টুপিটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন ঝোপের ভিতরটা খুঁজতে লাগলেন; বেশ কয়েকবার তাক করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না তখন আবার খুঁজতে সুরু করলেন; শেষে তিনি যা চাইছিলেন তা পেলেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাথার টুপি দিয়ে ঢেকে ফেললেন যার ভিতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ ভোঁ ভোঁ শব্দ কানে এল।

এটা একটা ভীমরুল, বেশ শক্তিশালী সুন্দর একটা ভীমরুল। একটা বাচ্চা অনভিজ্ঞ ভীমরুল নয়, পরিপূর্ণ বয়সের ভীমরুল, যথেষ্ট বিষ আছে, হলুদ-কালো ডোরা কাটা বেশ লম্বা শরীর যেন একটা পাখাওয়ালা বাঘ! একটা লতা বাঁকিয়ে চিমটার মত করে খোজা নাসিরুদ্দিন সুন্দর ভীমরুলটাকে টুপি থেকে বার করে আনলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে এধার ওধার ঘুরিয়ে দেখলেন ও দাঁড়িয়ে রইলেন; ভীমরুলটা রাগে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, কাল স্বচ্ছ পাখা দুটো দারুণ জোরে নাড়তে লাগল, লতাটাকে রাগে কামড়াতে লাগল এবং শরীরটা মোচড় দিতে দিতে মাঝে মাঝে ভয়ংকর হুলটা বার করতে লাগল যার কামড় একমাত্র বিছার কামড়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

"এটা নিয়ে আপনি কি করতে চান?" চোর জিজ্ঞাসা করল। "আগাবেকের পাজামার ভিতর কি ছেড়ে দিতে চান?"

খোজা নাসিরুদ্দিন কোন উত্তর দিলেন না। কাছে একটা ঝোপের ভিতর একটা পরিত্যক্ত মাকড়সার জাল দেখতে পেলেন এবং ভীমরুলটাকে তার ভিতরে জড়িয়ে দিলেন যাতে তার পাখা নাড়ান বন্ধ হয়ে যায়; ডানার পত পত শব্দ বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি বন্দীকে সেই বীভৎস মাকড়সার জালে রেখে দিলেন।

মাকড়সার জালটা নিচে ঝুলে পড়ল এবং বন্দী ভীমরুলটা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করায় জালটা ভীষণ দুলতে লাগল। ফাঁদের সুতোটা নড়ে উঠল এবং এবং মাকড়সাটা পাতার উল্টোদিক থেকে বেরিয়ে এল। এ ধরনের শিকার সম্ভবতঃ জালে আর কোনদিনও পড়েনি। পাহাড়ী শিকারী যেমন একটা দড়ি ধরে খাদ পেরিয়ে যায় সেইভাবে পেটটা উপর দিকে করে ক্ষিপ্রগতিতে মাকড়সাটা ফাঁদের সুতোটা ধরে জালটার কাছে ছুটে এল এবং বন্দীর দিকে এগিয়ে গেল। তখন তার কি আনন্দ হচ্ছিল, ভীমরুলটার চারপাশে ঘুরতে

ঘুরতে আনন্দে সে নাচছিল, চটচটে সুতো দিয়ে সে তাকে ঘিরে ধরল। শেষে যখন শিকার ভালভাবেই আটকান হল তখন সে তার খাবার খেতে উদ্যত হল। তার আমিষভোজী মুখটা বার করে হামা দিয়ে শিকারের কাছে এগিয়ে এল, পূর্বাভাস পেয়ে তার মোটা পেটটা আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠল। "কি মোটা একটা প্রজাপতি এবার ধরতে পেরেছি!" সে পা ফাঁক করে শিকারের উপর দিয়ে গিয়ে যেই তাকে কামড়াতে যাবে তখন ভীমরুলটা ছটফট করে নিজেকে মুক্ত করে নিল ও হঠাৎ উল্টে বসে তাকে আঘাত করল। বিদ্যুতের কাল ঝলক যেন তার ছোট্ট লম্বা শরীরটার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। ভীমরুলটা একেবারে মরণ আঘাত দিয়েছে, মৃত্যু অবধারিত! ভীমরুলটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল এবং তার শরীরের যত বিষ ছিল তার শিরদাঁড়ার ক্রশ চিহ্নের কাছ থেকে মাকড়সার মোটা পেটটায় ঢেলে দিল।

আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাকড়সাটা জালে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল, পরে তার পাগুলো একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দু একবার অত্যন্ত দুর্বলভাবে শরীরটা মোচড় দিয়ে যন্ত্রণায় পায়ের গ্রন্থিগুলো বার দুই ছুড়ে চিরদিনের মত শান্ত হয়ে গেল।

জালটা আবার পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে ভীমরুলটা জাল থেকে মুক্ত হয়ে ডানা মেলে ধরল এবং শিঙ্গার শব্দের মত আনন্দের গান তুলে রোদ-ভরা আকাশে উড়ে গেল; পিছনে বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পড়ে রইল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মাকড়সার জাল এবং শত্রুর শুষ্ক মৃতদেহটা।

"এখন বুঝতে পারছি," বীর ভীমরুলটাকে দেখে নিয়ে একচোখো বলল।

পরে কি করতে হবে এই নিয়ে তাঁরা কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। ঠিক হল তাঁরা আলাদা আলাদা ভাবে গাঁয়ে ঢুকবেন এবং যদি সরাইখানা বা অন্য কোথাও তাঁদের সাক্ষাৎ হয় তবে এমন ভান করবেন যেন কেউ কাউকে চেনেন না। এর বেশি আর কোন পরিকল্পনা করা হল না অবশ্য ঠিক হল যে অবস্থা অনুযায়ী নিজের নিজের কর্মপদ্ধতি ঠিক করবেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন গাধার কোমরের পেটিটা টান করে তার পিঠে চেপে বসলেন এবং গাধার কানে একটা মোচড় দিয়ে নিচের সবুজ মাঠের দিকে যাবার জন্য তাড়া দিলেন।

একচোখো চোর ঝরণার কাছে থেকে গেল।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চোরাক গাঁয়ের অধিবাসীরা আজও সেইসব সুখের দিনের কথা মনে করে যখন হ্রদটা, যেটা তাদের ক্ষেতের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র, আগাবেকের অধিকারে না থেকে একজন খ্যাতনামা ধনী নামাঙ্গানিয়ানের অধিকারে ছিল যিনি এত ধনী ছিলেন যে নিজের সম্পত্তি দেখা শোনার জন্য কখনও পাহাড়ে আসেননি। ধনী ব্যক্তি নিজের জন্য বিলাস, ভোগ ও আমোদের পথ বেছে নিয়েছিলেন (মূক ও বধির সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পথ থেকে তখনও তিনি অনেক দূরে ছিলেন) ; তাঁর হয়ে হ্রদের দেখাশোনা করত একজন বিদেশী, বয়সে যার মাথার চুল সাদা হয়েছিল এবং যে সরাইখানায় শুয়ে শুয়ে এই পৃথিবীর অসারতা নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করত। সেচের জন্য সে খুব কম পয়সা আদায় করত এবং গরীবদের কেবল বিশ্বাস করে জল দেওয়া হত, উপদেশ দেওয়া হত, "ভুলে যেও না।" সে তার স্মৃতিশক্তিকে এইসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভারাক্রান্ত করত না এবং কোন হিসাব পত্রও রাখত না ; শরতে চাষ-আবাদের পর গ্রামবাসীরা তাকে যা দিত তাতেই খুশী থাকত ; যারা ধার নিত কেবল তাদের বিবেকের উপর নির্ভর করত। তার নামাঙ্গানের মনিবের কাছে কোন বছর তিনশো টাকা পাঠাত আবার কোন বার আরও কম বা কিছুই পাঠাত না ; সমস্ত টাকাটার কিছুটা নিজের জন্য খরচ করত, বাকী অংশটা বিধবা, অনাথ বা অন্যান্য হতভাগাদের—যারা তার কাছে অনুরোধ নিয়ে আসত—তাদের জন্য খরচ করত। সত্যি বলতে গেলে বলতে হয় যে সে সমস্ত টাকা মনিবের নামে দান করত নিজের নামে নয় যাতে কৃতজ্ঞ লোকেরা মনিবের নামেই প্রার্থনা করতে পারে। চোরাক থেকে তিনশো টাকার একটা তুচ্ছ অংক এবং উপকৃত ব্যক্তি যারা মনিবের নামে প্রার্থনা করত তাদের একটা বিরাট তালিকা পেয়ে নামাঙ্গানের ধনী ব্যক্তি বন্ধুদের কাছে হেসে চীৎকার করে উঠত, "আমার হ্রদের রক্ষক নিশ্চয়ই আমাকে একজন নির্লজ্জ পাপী ভেবেছে তাই আমার আত্মার মুক্তির জন্য অবিশ্রান্তভাবে উৎকণ্ঠা দেখিয়ে আসছে!"

চোরাকে জীবন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল ; পৃথিবীর ঝড় ও ভয় থেকে অনেক দূরে যেন একটা মসৃণ পথের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে যাওয়া যেখানে কোন বাধা বা আঘাত নেই। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে

যেমন বাতাসের মেঘ পেরিয়ে যায় সেইভাবেই বছরের পর বছর এখানে কেটে যেত ; গোলমাল ও আনন্দের মধ্যে বিয়ে হয়, ছেলেরা জন্ম নেয়, বৃদ্ধেরা কবরের দিকে এগিয়ে যায় এবং সরাইখানায় তাদের সম্মানিত জায়গা দখল করে অন্যেরা ; তাদেরও দাড়ি একই রকম লম্বা এবং দাড়ির মালিকের অলক্ষ্যে কখন সেগুলো সাদা হয়ে যায়। জীবন যেখানে শান্ত ও একঘেয়ে সেখানেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে—প্রতিটি দিনের সময় অনন্ত কিন্তু মাস ও বছরগুলো অবিশ্রান্ত গতি নিয়ে ছুটে চলেছে ; একটা বছর পেরিয়ে গেল এটা লক্ষ্য করার আগেই, পুরোনো যে শুকনো পপলার গাছটা এতদিন দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা কেটে ফেলার আগেই বছর তিনেক পেরিয়ে যাবে এবং পপলার গাছটা বাতাসের ধাক্কায় হয়তো উল্টে পড়ে গিয়ে বাগানের পাঁচীল ভেঙ্গে ফেলবে যেটা ভাল করতে আবার মাসের পর মাস কেটে যাবে। ইতিমধ্যে দাড়ি ও কপালের চুলগুলো দিনের পর দিন আরও পেকে যাবে এবং কবর-খানার রক্ষক অপূর্ব বিনয়ের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে বার বার নাক ঘুরিয়ে জানিয়ে দেবে যে তার কবরখানায় অতি সুন্দর এক টুকরো জমি আছে যেটা গাঁয়ের সর্দারেরও অপছন্দ হবে না ; একটা ভাল সময় দেখে সেখানে একটা চারাগাছ লাগিয়ে দেওয়াই ভাল যাতে সেটা কবরখানায় বেশ মানানসই দেখতে লাগে এবং মাটিতে অনেকটা শিকড় চালিয়ে বেশ শক্ত হয় ওঠে।

মনে হত যেন অশুভ ক্ষমতার কুদৃষ্টি চোরাকের পথে যেতে ভুলে গিয়েছিল ; গ্রাম্য জীবনের কল্যানকর প্রবণতা কোন কিছুতেই বিনষ্ট হয়নি। উপত্যকায় অবস্থিত বলে ঝড় থেকে রক্ষা পেত, পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে বিধ্বংসী বন্যায় কখনও চাষের জমি নষ্ট হয়নি, গবাদি পশুর মহামারী গ্রামের ধার ছুঁয়ে চলে যেত এবং পঙ্গপালেরা যদি একান্তই কখনও দেখা দিত তবে অনেক উপর দিয়ে অন্য কোথাও উড়ে যেত। এখানকার রমণীয় প্রদীপ্ত সূর্যাস্ত সমস্ত আকাশ ভরিয়ে তুলত এবং সূর্য ক্রমশঃ ডুবে যাবার সময় দূরের বরফে ঢাকা চূড়াগুলোকে নরম গোলাপি আভায় রাঙ্গিয়ে তুলত। সন্ধ্যার শান্তিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় মসজিদের মিনারে মিনারে মোল্লাদের মধুর বিষন্ন প্রার্থনার সুর কুয়াশায় ভরা ফাঁকা মাঠের ও শিশিরে ভেজা বাগানের উপর দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। রাত্রি আসে তার উজ্জ্বল নীল রং নিয়ে, চারদিক নাইটিংগেল পাখীর গানে কেঁপে কেঁপে ওঠে ও রাতের বাতাসের গুঞ্জনে ভরে যায় এবং বাগানে ঘুমে-আচ্ছন্ন প্রণয়ীদের বুকে দীর্ঘশ্বাস তোলে।

অত্যন্ত সক্রিয় হলেও মর্মস্পর্শী হচ্ছে দুঃখ-ক্লিষ্ট চিরপথিক বালখের শহিদের কথাগুলো : "গ্রীষ্মকে অনুসরণ করে শরৎ, উজ্জ্বল দিনকে গভীর রাত্রি আর যে ভাগ্যের উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে দুঃখের অতল-স্পর্শী খাত।" এতদিন পরে চোরাকে দুঃখ এসেছে ; দুঃখ এসেছে হ্রদের নতুন মালিক আগাবেকের রূপ নিয়ে।

সেদিনের শান্ত দুপুরে খোজা নাসিরুদ্দিন এবং একচোখো চোর যখন একটা ঝরণার ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোরাকের বাগানগুলোর শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন তখন গাঁয়ের ভিতর আগে কখনও শোনা যায়নি এমন একটা হৈ-হট্টগোল শোনা গেল। লোকেরা সকলেই সরাইখানায় এসে হাজির হল এবং মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে চীৎকার সুরু করল।

সেদিন সকালে আগাবেক বসন্তকালে দ্বিতীয় জলসেচের দাম ঠিক করছিলেন ; এবারে তিনি টাকা চান না ; বিয়ে করতে চান এবং স্ত্রী হিসাবে দাবী করছেন গাঁয়ের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত চাষী মামেদ আলীর ছোট্ট মেয়ে জুলফিয়াকে, যার কালো কালো চোখ দুটো অত্যন্ত সুন্দর। এ ধরনের দাবীতে হতভম্ব হয়ে গাঁয়ের বুড়ো লোকেরা আগাবেকের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে ; তখন সে বলেছে যে গাঁয়ের লোকেরা তবে দাম হিসাবে চার হাজার টাকা দিক।

চার হাজার ! চোরাকের সমস্ত অধিবাসীর টাকা একত্র করলেও এত হবে না। গাঁয়ের বুড়োরা দিনের প্রায় অর্ধেক সময় আগাবেকের কাছে আকুতি-মিনতি করেছে ; তাদের অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল, ঘরে বোনা পোশাক ও মরচে-রংয়ের মোটা জুতো, সাদা দাড়ি এবং কালো দাগে ভরা মুখে তাদের কষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল, তাদের নুয়ে পড়া শরীর এবং পেটের উপর বিছিয়ে রাখা হাত দুটো ছিল যেন তাদের বিনয়ের প্রতীক। কিন্তু আগাবেক ছিলেন একগুঁয়ে, হয় জুলফিয়া নয় চার হাজার টাকা !

এই খবর নিয়ে বুড়োরা সরাইখানায় ফিরে এল।

বিরক্তি ও ঘৃণার কী বিরাট ঝড় উঠল ! ঠিক যেন হঠাৎ একটা গরম বাতাস উঠে তাদের মুখ ঝলসিয়ে দিল, তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হল, মুখ কালো হয়ে উঠল ও চোখে একটা কুৎসিত আলো জ্বলে উঠল। মনে হল কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং পিচফর্ক, কুড়াল ও নিড়ানি হাতে নিয়ে আগাবেকের গুহা আক্রমণ করে মাটিতে মিশিয়ে দেবে।

কিন্তু তা হল না। ঝড় উঠল কিন্তু আগেবেককে সামান্যতম আঘাতও না

হেনে আবার মিলিয়ে গেল। প্রত্যেক মানুষেরই শিরা উপশিরায় এক বিন্দু বীরত্বহীন মানসিক সুস্থতা আছে যা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই মানসিক বিকার কাউকে বলল, "আগাবেক যাকে দাবী করছে সে ত আর তোমার মেয়ে নয়!" আবার অন্য কারও কানে ফিসফিস করে বলল, "আল্লার কৃপায় আমার মেয়ের বিপদ হয়নি!" তৃতীয় জনকে হয়তো উপদেশ দিল, "তোমার ভাবী বৌয়ের উপর নজর রাখ, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না।" মানুষের ঘৃণা আস্তে আস্তে কমে এল, তাদের মনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা নিভে গেল, হাতের মুঠো আবার খুলে গেল, কাঁধ দুটো আবার নিচের দিকে নেমে এল এবং পিঠটা নুয়ে গেল। ঠিক সেই সময় আগাবেক আবার যদি সরাইখানায় এসে হাজির হতেন তাহলে তারা সবিনয়ে আগের মতই সেলাম জানাত যেমনটি গতকাল তারা করেছিল।

জুলফিয়ার বাবা মামেদ আলি সরাইখানার মাচার উপরে বসেছিলেন, তাঁর ভুরু দুটোকে একত্র করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সকলেই তাঁর মুখের কথার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের নীরবতা ছিল তাদের আত্মসমর্পণের চিহ্ন। কিন্তু কেউ স্তব্ধতা নষ্ট করল না; সকলেই চাইছিল অন্য কেউ প্রথমে কথা বলুক, যে কেবল ঠোঁট নেড়ে এবং দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্মতি জানাবে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের মতে মত জানাতে হয়েছে —বিবেককে ফাঁকি দেওয়ার এই হচ্ছে চিরন্তন পদ্ধতি। এদিকে মামেদ আলির করণীয় হচ্ছে আত্মত্যাগ করা এবং সমস্ত পাপ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর আর কোন পথ ছিল না।

দূরে অন্ধকার এক কোণে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসেছিল সৈয়দ, জুলফিয়ার বাগদত্ত। সে যথেষ্ট তরুণ এবং সেই বয়সের যখন মানুষের ভিতরে যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যের আঘাত এড়িয়ে যেতে পারে না, যখন সেই আঘাত আবার মনে এসে ধাক্কা দেয়। সে জানত যে পাঁচ, দশ অথবা পনের মিনিট হয়তো পেরিয়ে যাবে কিন্তু সব শেষে মামেদ আলিকে সেই দুর্ভাগ্যজনক কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে; এই যুবক হয়তো তাদের একজন নয় যারা অত্যন্ত দুর্বল-চিত্ত এবং জীবনে তাড়া খেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও জীবন দাঁত বার করে পিছন দিক থেকে গিলে ফেলুক সেটাই পছন্দ করে।

নীরবতা ক্রমশঃ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল। নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে যুবক অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে এগিয়ে এল।

"আপনারা কেন চুপ করে আছেন? কে প্রথম আগাবেকের জুতো চুম্বন করবে?" সে চীৎকার করে উঠল পরে মামেদ আলির দিকে ফিরে বলল, "আপনি, আপনি কিছুদিন আগেও আপনার বাড়ীতে আমাকে ছেলের মত স্বাগত জানিয়েছিলেন—আজ আপনার সে প্রতিজ্ঞা কোথায়?"

"আমরা কি করতে পারি, কি করতে পারি সৈয়দ," ফিসফিস করে মামেদ আলি বললেন। "আমরা দুর্বল এবং সে ধনী ও শক্তিশালী।"

"আপনারা দুর্বল নন, কাপুরুষ! নিস্তেজ খরগোশ—এই হচ্ছেন আপনারা!"

তার কণ্ঠস্বরে এতই পরিতাপ ছিল যে মামেদ আলি আর চোখ শুকনো রাখতে পারলেন না।

কিন্তু অন্য লোকেরা মনে যথেষ্ট আঘাত পেল ও ক্ষুব্ধ হল।

"শুনতে পাচ্ছ!" উমর চীৎকার করে বলে উঠল; সে একজন কামার, লম্বা কাহিল চেহারা, বিবর্ণ মুখ এবং রুক্ষ ভুরু। "শুনতে পাচ্ছ ও কেমন করে আমাদের লজ্জা দিচ্ছে! আত্মীয়-স্বজনহীন বেওয়ারিশ বদমাস!"

সৈয়দ একজন অনাথ যাকে লালন পালন করেছিল সফর—চোরাকের সরাই-খানার রক্ষক—এবং এই ঘটনাই কামারটা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

"ধন্যবাদ, ছোকরা, ধন্যবাদ—এই হচ্ছে তোমার কৃতজ্ঞতা," ঘোড়ার ডাক্তার ইয়ারমত্ত বলল।

"আমরা তোমার ভাল করেছি, তোমাকে অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে নিয়ে এসে গাঁয়ে মানুষ করে বড় করেছি—এই হচ্ছে তার পরিশোধ," পশমের ব্যবসায়ী আলিম বলল।

হক কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে সরাইখানার রক্ষক সফরই সৈয়দকে দেখতে পেয়েছিল এবং তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলেছিল আর অন্যরা এ ব্যাপারে কিছুই করেনি বা এই ছোট্ট অনাথ বালকের জন্য কপর্দকও খরচ করেনি; যখন সে বড় হয়ে উঠল তখন সবাই বড় গলায় বলতে লাগল যে সে-ই তাকে মানুষ করেছে এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা দাবী করল। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শান্তভাবে সে এসব শুনে যাচ্ছিল এবং যে ঘটনার জন্য আজ তাকে এই অবমাননা সহ্য করতে হচ্ছিল তার জন্য মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছিল।

এই বৃদ্ধদের এখন সে কি উত্তর দেবে, কোন যুক্তি দেখিয়ে সে তাদের সিদ্ধান্তকে নাড়া দেবে যখন সকলেরই সর্বনাশ আসন্ন, কারণ জুলফিয়া যদি

আগাবেকের ঘরে না যায় তবে তাদের সকলকে ঘোড়া, গরু, ভেড়া যার যা যা আছে বিক্রী করার প্রয়োজন হবে।

অত্যন্ত হতাশ হয়ে কারও দিকে না চেয়ে সৈয়দ সরাইখানার পিছন দিকের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

সে ছিল একা; কাঁকড়ে ভরা পথ রোদে ঝকঝক করছিল এবং দুপুরবেলায় তার ছোট্ট ছায়াটা তার পায়ের নিচে নিচে ছোট ছেলের পশমের বলের মত সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সৈয়দ যন্ত্রণায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দাঁত কড়মড় করল এবং একটা অদ্ভুত, আনন্দহীন, রক্ত-হিম করা হাসি হাসল যা যে কেউ দেখবে সে-ই বিবর্ণ হয়ে উঠবে ও প্রার্থনা করতে বসবে।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ইতিমধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন গাধায় চেপে চোরাকের বাগানগুলো পেরিয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি সদর পথে না এসে একটা গলিপথ দিয়ে ঢুকলেন, গরমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছায়ার নীচে দিয়ে চলতে গিয়ে না জেনেই এ পথে এসে পড়েছিলেন। তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আর একটি অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষকে সময় মত এড়িয়ে যাবার জন্য এটিই ছিল চোরাকে যাবার এক এবং একমাত্র পথ।

একটা ভাঙ্গা পাঁচীলের পাশ দিয়ে গাধায় চেপে যাবার সময় একটা ফাটলের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট অবহেলিত বাগান দেখতে পেলেন। বাগানের বেশ ভিতরে একটা পুরোনো গাছের গুঁড়ির নিচে কোমর পর্যন্ত গা খোলা একজন সুন্দর যুবক হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছে দেখতে পেলেন। তার পিছনে গাছের গুঁড়ির একটা গর্তে রাখালদের একটা ছুরি, ফলার মুখটা উপর দিকে করে রাখা আছে। চওড়া ফলাটা থেকে সূর্যের আলো ঝলমল করে ঠিকরে পড়ছে। "হে সর্বশক্তিমান দয়াময় আল্লা, তোমার এই অধম ক্রীতদাসকে আত্মহত্যার পাপ থেকে ক্ষমা কর," যুবক বলছিল। "আমি যেন স্বর্গে ধূলিকণা হয়ে থাকতে পারি। আর পৃথিবীতে থাকা? আমার কষ্ট বিপুল, আমার দুঃখ আমাকে বিহ্বল করে তুলছে। হে স্বর্গের পিতা, আমাকে যেন কঠিন শাস্তি দেবেন না; জীবনে সুখ পেয়েছি অল্প এবং এখন আমার শেষ আনন্দও হারিয়ে ফেললাম।"

সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে খোজা নাসিরুদ্দিন গাধার লাগাম টেনে ধরলেন

এবং নিচে নেমে চুপি চুপি যুবকের দিকে এগিয়ে গেলেন ; যে গর্তের মধ্যে ছুরিটা শক্ত করে আটকান ছিল সেখান থেকে সেটা বার করে নিলেন এবং পরে কি ঘটে দেখবার জন্য গাছের গুঁড়ির উপর চুপ করে বসে রইলেন।

প্রার্থনা শেষ করে যুবক উঠে দাঁড়াল এবং চোখ শক্তভাবে বন্ধ করে জোরে নিশ্বাস নিল যেন জলে ডুব দিতে যাচ্ছে ও পরে গুঁড়ির দিকে সোজা জোরে ছুটে গেল।

তার হিসেব ঠিকই ছিল, খোজা নাসিরুদ্দিন সরিয়ে না নিলে ছুরির ফলাটা তার হৃদপিণ্ড ভেদ করে যেত। তার বদলে সে খোজা নাসিরুদ্দিনের পেটে আঘাত করল এবং মরে গিয়েছে ভেবে চুপ করে পড়ে রইল, হাত ও আঙুলগুলো আলতোভাবে মাটি ছুঁয়েছিল। এক মিনিট কেটে গেল, পরে আর এক……।

"আর কতক্ষণ তুমি এভাবে শুয়ে থাকবে ?" খোজা নাসিরুদ্দিন জানতে চাইলেন।

মানুষের গলার স্বরে যুবক চমকে উঠল। স্বর্গের পরীদের ছাড়া অন্য কারও গলার স্বর শুনবার জন্য যুবক প্রস্তুত ছিল না। সে চমকে উপর দিকে চাইল এবং পরী ছাড়া অন্যের মুখ তার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তার বিস্ময় আরও বাড়ল—একটা রোদে-পোড়া ধুলোয় ভরা মুখ, ছোট্ট কালো দাড়ি ও চোখ দুটো আনন্দে ভরা।

"আমি কোথায় আর আপনিই বা কে ?" দুর্বল কণ্ঠে যুবক বলল।

"তুমি কোথায় ? অবশ্য সেই চিরন্তন আশ্রয়েই আছ যেখান থেকে বিদায় নেবার জন্য এত আগ্রহী হয়েছিলে। এখন থেকে আমিই হব কর্মকর্তা যার হাতে তোমার মত পাগলদের বিরুদ্ধে যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

যুবক তখন সবকিছু বুঝতে পারল ; কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে পেলেন।

"কেন, কেন আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন ! এই পৃথিবীতে আমার কোন স্থান নেই, এতটুকু সুখ নেই—যন্ত্রণা, কষ্ট, এবং ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই !"

"কি করে জানলে যে জীবনে তোমার জন্য কি জমা হয়ে আছে ?" খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন। "আমি পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়ো, তবু এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তোমার বয়সে জীবনে বিতৃষ্ণা আসা ভগবানের নিন্দা করা ছাড়া কিছুই নয়। আমাকে বল তোমার কি হয়েছে ? সম্ভবতঃ আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।"

"আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।"

"এটা ঠিক নয়। যতক্ষণ একজন মানুষ বেঁচে আছে ততক্ষণ তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। আমাকে বিশ্বাস কর। তোমার কি ঘটেছে আমাদের জানাও।"

"আপনি কি হারুণ-এল-রশিদের মত আমাকে চার হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন যা ছাড়া আমার মুখ রাখতে পারব না?"

"তুমি কি এ টাকা জুয়া খেলে হারিয়েছ?"

"ঠাট্টা করে আমার দুঃখ বাড়াবেন না, পথিক!"

"ঠাট্টা? না হে ছোকরা, নিজের দুঃখে আমি ঠাট্টা করতে পারি কিন্তু কখনই আমার সঙ্গীদের দুঃখে তা করি না! আমি মনে মনে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি এই ভেবে যে তুমি এই টাকা নিয়ে কি করবে?"

"আমি একজন সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসি······।"

"বুঝতে পেরেছি। সে বুঝি বড়লোকের মেয়ে আর তার নিষ্ঠুর বাবা তোমার কাছে কনে-পণ চাইছে।"

"তার বাবা কিছুই চাইছে না বরং মনে প্রাণে আমাদের সুখ শান্তি চাইছে। কিন্তু হ্রদের মালিক আগাবেক সমস্ত ঘটনায় নাক গলাতে চাইছে।"

"আগাবেক!" খোজা নাসিরুদ্দিন বজ্র কণ্ঠে এমন চীৎকার করে উঠলেন যে যুবক চমকে উঠল। "তুমি বলছ আগাবেক নাক গলিয়েছে! তাহলে আল্লাকে ধন্যবাদ এই ঝগড়ার জন্য, কারণ এইটাই হবে ছোকরা তোমার মুক্তির উপায়। তোমার কি হয়েছে বল।"

ভিতরে ভিতরে তাঁর মন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, তিনি যেন একটা লড়াই-এর জন্য তৈরি হলেন। আগাবেককে কখনও দেখেননি। কিন্তু শুধুমাত্র তার নামে যেন আনন্দের একটা ধাক্কা খেলেন। তিনি এই ভেবে আনন্দ পেলেন যে তাঁর জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স যেন আজ শুধুমাত্র একটা কথা নয় এবং তাঁর চুল ও দাড়ির সাদা ছোপ আজ যেন একটা মরীচিকা নয়।

যে ঘটনা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি সৈয়দের কাছে সে সব জানতে পেরে খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন:

"সেচের আর কতদিন বাকী আছে?"

"দশ দিন।"

"সময় আছে। দুঃখ করো না, তোমার অতুলনীয় সুন্দরী আগাবেকের

ধরে বাধে না। সে যদি এই ব্যাপারে নাক গলায় আমরাও তার ব্যাপারে নাক গলাব!"

এই অদ্ভুত আগন্তুকের দিকে চেয়ে সৈয়দ অবাক হয়ে গেল কিন্তু সেই সঙ্গে তার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল।

"অকারণ সন্দেহের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ এই সেচের পর আবার সেচ সুরু হবে তার পরে আবার, এইভাবেই চলতে থাকবে। আগাবেকও প্রতিবার আমার প্রণয়ীকে নতুবা চার হাজার টাকা দাবী করবে; এমন কি বেশীও দাবী করতে পারে।"

"তুমি কি ভাব আমি এখানে এসেছি তোমার আগাবেককে প্রতিবার সেচের জন্য চার হাজার টাকা এমন কি কিছু বেশি দিতে? না, আমি কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি যা ঠিক বিপরীত। এ সব অবশ্য ভবিষ্যতের ব্যাপার, যাইহোক এস আমরা একটা চুক্তি করি। প্রথম সর্ত হচ্ছে যে কেউ আমাদের সাক্ষাৎ বা আলোচনার কথা জানতে পারবে না। তোমার সুন্দরী এবং আনন্দময়ী সাদাত বা ফতিমার ব্যাপারে—কি নাম বললে যেন······"

"জুলফিয়া," যুবক ফিস ফিস করে বলল।

"জুলফিয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করে বল যে এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার নয় এবং তাকে তার গোলাপি—আমার মনে হয় বেশ বড়ই হবে—জিভটা কামড়ে ধরে থাকতে বল। দ্বিতীয় সর্ত······"

ঠিক এই সময় সৈয়দের পিছনের দেওয়ালের একটা গর্তের মধ্য দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন এক-চোখো সঙ্গীকে দেখতে পেলেন যে হাত নাড়িয়ে তাঁকে গোপন ইশারা করছিল।

"দ্বিতীয় সর্তটা আমি তোমাকে শীঘ্রই বলব, এখন এখানে বস এবং চারপাশে চাইবে না।"

যুবক নীরবে তাঁর আদেশ মেনে নিল এবং কোন দিকে চাইল না যদিও তার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। "কার সঙ্গে এই রহস্যময় আগন্তুক কথা বলছে এবং কিই বা বলছে?" সে ভাবল। সন্দেহ, ভয় এবং আনন্দ মিশিয়ে একটা শিহরণ সারা শরীরে বয়ে গেল—কিন্তু কথাগুলো শুনবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে একটা ক্ষীণ গুঞ্জন ছাড়া কিছু শুনতে পেল না।

একচোখো চোরের সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিনের কথা হচ্ছিল টাকার ব্যাপারে যার প্রয়োজন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখা দিয়েছে।

"চার হাজার!" চোর অবাক হয়ে বলল। "কেন? যদি পাহাড়গুলোর নীচে থেকে চূড়া পর্যন্ত লুঠতরাজ করেন তবে চল্লিশ টাকাও পাবেন না।"

"তুমি কোকান্দে ফিরে যাও।"

"হায় আল্লা!"

"কোকান্দে গেলে তুমি প্রয়োজনীয় চার হাজার টাকা জোগাড় করতে পারবে এবং এখানে নিয়ে আসবে। যেতে আসতে সময় লাগবে ছ' দিন, তিন দিন কোকান্দে থাকবে; সুতরাং আজ থেকে ন' দিনের দিন নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসবে।"

"আজকের দিন গুণে? তার মানে কাজ শেষ হলেই আমাকে ফিরে আসতে হবে, নিজে এক ঘণ্টারও বিশ্রাম পাব না!"

"হ্যাঁ তৎক্ষণাৎ।"

"হায় পয়গম্বর মোহাম্মদ! যদি আমার স্বাভাবিক পথে এই টাকা জোগাড় করি তবে আমি আবার ধর্ম ও ঈশ্বরের পথ থেকে সরে যাব।"

"এমনভাবে কাজ করবে যাতে যে টাকা তুমি রোজগার করবে সেটা যেন ন্যায়সংগত টাকা হয়।"

"ন্যায়সংগত টাকা? চার হাজার? ও কাবা, ও মক্কা, ও ধর্মের পীঠস্থান! আমি জীবনে কখনও ন্যায়সংগত টাকা দেখিনি। আমি কি মসজিদে ভিক্ষে করে এ টাকা জোগাড় করব?"

"আমি বলেছি আর তুমি শুনেছ। এ কাজ হচ্ছে দয়াময় তুরাখনের মহিমার জন্য যা কোকান্দে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আচ্ছা বিদায়!"

"আপনি তাহলে বিশ্রাম নিন," একচোখো উদাসীনভাবে উত্তর দিল; শান্ত সরাইখানায় খোজা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনার যে ইচ্ছা তার ছিল তা মন থেকে উবে গেল; সে আবার পিছন ফিরে পুরোনো রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে মর্মান্তিক দুঃখ পেল ও রেগে গেল কিন্তু চোরাকে আর কোনদিন ফিরে না আসার ও খোজা নাসিরুদ্দিনকে ঠকানোর চিন্তা তার মনে একবারও আসেনি। ছোটখাটো ব্যাপারে পাপ কাজ করলেও বড় কাজে সে ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসী; এই ব্যাপারে সে তথাকথিত উঁচুমনের লোকদের মত ছিল না, যারা

জোর করে অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে পরে যে মানুষেরা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে আসবে তাদের সঙ্গে নির্লজ্জ কাপুরুষের মত বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

খোজা নাসিরুদ্দিন সৈয়দের কাছে ফিরে এলেন।

"আমার দ্বিতীয় সর্ত শোন; কখনও জানবার চেষ্টা করবে না আমি কে, কেন আমি এখানে এসেছি, অতীতে আমি কি করতাম এবং ভবিষ্যতে আমি কি করতে চাইছি।"

যুবক তার জিভ কামড়ে ফেলল; এই অদ্ভুত আগন্তুক ঠিকই অনুমান করেছেন যে এই প্রশ্নগুলোই এতক্ষণ বোলতার পাখার মত আগ্রহ নিয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরি ছিল।

"আমি এখন সরাইখানায় ফিরে যাচ্ছি," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আজ সন্ধ্যায় আবার আমরা অবসরমত আলোচনা করব। ছুরিটা সরিয়ে ফেল, মন থেকে হতাশা দূর করে ফেল, এবং মনে রাখবে তোমার মত বয়সের ছেলেরা কোন কিছুই হারায় না বরং পৃথিবীতে কিছুদিন চলার পর আবার সব ফিরে পায়।"

তারা বিদায় নিল। যুবক তার প্রাণদাতাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল পরে গাছের গুঁড়ির উপর বসে আবার চিন্তায় ডুবে গেল। অস্তগামী সূর্যের আলো তার মুখের এক পাশ, পরিষ্কার চওড়া কপাল, তার দীঘল নাক, তার গাল ও ঠোঁটের স্পষ্ট রেখার উপর এসে পড়ল; নিজের চিন্তায় নিজেই সে হাসল; মন থেকে হতাশা দূর হল, তার প্রয়োজন জীবনে এবং এখন থেকে খোজা নাসিরুদ্দিনের মহান ছাপ চিরদিনের জন্য তার মনে গেঁথে রইল।

সে রাতে সরাইখানায় নিভে যাওয়া উনুনের পাশে আবার তাঁরা আলোচনা সুরু করলেন। সফর, সৈয়দের দ্বিতীয় পিতা (সঠিক বলতে গেলে তাকেই প্রথম পিতা বলা উচিত, কারণ প্রকৃতির অন্ধ নিয়ম অনুযায়ী পিতা না হলেও অন্তঃ-করণের দিক থেকে সে-ই আসল পিতা) কম্বলের নীচে শান্তিতে নাক ডাকাচ্ছিল সারাদিনের পরিশ্রমের পর। সরাইখানায় কেউ না থাকায় তাঁরা নিশ্চিন্তে কথা বলছিলেন। উনুনের ভিতর জ্বলন্ত কাঠগুলো তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছিল আগুনের শিখা তুলে, এদিকে কাঠের ধারগুলো ঠাণ্ডা হবার সময় হালকা শব্দ তুলে ছাই বার করে সাদা হয়ে যাচ্ছিল। চাঁদ দেরীতে সবেমাত্র উঠেছে এবং ওঠবার সময় একটা বাতাসের ঝড় উঠল ও সরু পপলার গাছগুলোর নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত একটা রুপালি ঢেউ তুলল। দূর পাহাড়ের পাশে একজন রাখালের

তাঁবুতে আগুন জ্বলছিল এবং একটা লাল তারার মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল যেন পৃথিবীর উপরে পড়ে তারাটা সেখানেই নিজে নিজে জ্বলছিল।

"সাহস যে হারিয়ে ফেলে সে জীবনও হারিয়ে ফেলে। ছোকরা, নিজের ভাগ্যকে তোমার বিশ্বাস করা উচিত; খোজা নাসিরুদ্দিন—তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক—প্রায়ই বলতেন······"

"কেন, তিনি কি মারা গেছেন?"

"হায়, তিনি মারা গেছেন। সঠিক জানি না, বাগদাদের খলিফা তাঁর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিল না বোখারার আমির তাঁকে ডুবিয়ে মেরেছিল—কোকান্দে এই রকমই শুনেছি।"

"সম্ভবতঃ এটা ঠিক নয়।"

"কে জানে—সম্ভবতঃ তাই······। আচ্ছা, যখন আগের সেসব দিনে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম তিনি বার বার বলতে ভালবাসতেন, 'ঠাণ্ডা শীতের পর সব সময়ই গরম বসন্ত আসে; এই হচ্ছে জীবনে মনে রাখবার মত নিয়ম এবং এর ব্যতিক্রম সকলেই ভুলে গিয়েছে।' কিন্তু দেখছি আমার সমস্ত উপদেশই বৃথা হয়েছে," সৈয়দের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তুমি এমন ছটফট করছ যেন কেউ তোমার বসার জায়গায় পেঁচাকে দিয়ে খোঁচা মারছে। এখন অনেক রাত, তুমি কোথায় যাবে?"

এত ফিসফিস করে সে উত্তর দিল যে শোনার বদলে তার ঠোঁট নাড়া থেকে খোজা নাসিরুদ্দিনকে বুঝে নিতে হল। এটা ছিল একটা মাত্র শব্দ—জুলফিয়া।

"ক্ষমা করবে, বুদ্ধিমান ছোকরা!" তিনি আনন্দে বলে উঠলেন। "আমি সত্যিই বুড়ো ও বোকা হয়ে গিয়েছি তা নইলে নির্বোধের মত প্রশ্ন করে তোমায় বিরক্ত করতাম না। জুলফিয়া হচ্ছে উঁচু স্তরের জ্ঞান, তাড়াতাড়ি তার কাছে যাও। বিশ্বাস কর, আজ রাতে চাঁদের আলোয় তুমি যা শিখবে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের বই একত্র করলেও তার সঙ্গে তুলনা করা চলে না।"

প্রত্যেক বয়সেরই একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মাহাত্ম্য হচ্ছে অন্যান্য গুণের মধ্যে খালি পেটে বিছানায় শুতে না যাওয়া। সৈয়দ চলে গেলে খোজা নাসিরুদ্দিন এক টুকরো পনীর ও বাসি রুটি খেয়ে নিজেকে তাজা করে নিলেন এবং বিছানায় শুতে যাবার জন্য তৈরি হলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি প্রেমিক দুজনের কথা ভাবছিলেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কামনা করছিলেন বাগানে যেন তাদের সুখের মিলন হয়।

"আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব সৈয়দ! আমার বাবা বলছেন তিনি আগাবেকের হাতে আমাকে তুলে দেবেন।"

"শান্ত হও, তিনি তোমাকে তুলে দেবেন না।"

"চল পালিয়ে যাই! চল পাহাড়ে নয়ত জিপসী বা কিরঘিজদের দেশে পালিয়ে যাই। রাস্তার জন্য আমি একটা পুঁটলি নিয়ে এসেছি—রুটি, পনীর ও কিছু শুকনো তরমুজ আছে।"

"অপেক্ষা কর, সম্ভবতঃ এখন আমাদের পালাতে হবে না।"

"উঃ সৈয়দ, ওরা কি আমার বাবার মত তোমাকেও ভুল বুঝিয়েছে।"

"কেঁদ না। আমি অন্য কারও হাতে তোমাকে তুলে দিচ্ছি না। শোন আমাদের এখন একজন বন্ধু ও রক্ষক পেয়েছি।"

"একজন বন্ধু ও রক্ষক? আমরা? কে তিনি?"

"কে তিনি আমি তোমাকে বলতে পারব না—সত্যি বলছি আমি নিজেই তাঁর নাম জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন।"

"কখন তাঁর দেখে পেলে?"

"আজ।"

"তুমি ইতিমধ্যেই তাঁকে বিশ্বাস করেছ?"

"ওঃ, জুলফিয়া যদি একবার তাঁকে দেখতে পাও বা তাঁর কথা শুনতে পাও তুমি নিজেও বিশ্বাস করবে। তাঁর ভিতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা ক্ষমতা বেরিয়ে আসছে যা মানুষের আত্মাকে রক্ষা করে।"

রাতের টিকটিকিরা টিক টিক করে উঠল, জুলফিয়ার গলার হারের রুপোর তাবিজগুলো টুন টুন করে উঠল এবং অন্য কিছুও টুন টুন করে উঠল—রাত ছিল অতি চাপা রহস্যময় শব্দে পরিপূর্ণ। জুলফিয়া চাইছিল সকাল যেন না আসে। উঃ পৃথিবী যদি এমনি একটা গন্ধে ভরা, অবসন্ন নীল আবছা রাতে চিরদিন ভরে থাকত! কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া আলোর রেখা পূর্ব আকাশে দেখা গেল, অন্ধকার থেকে পাহাড়ের চূড়াগুলো আবার অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিল। দিন সুরু হল।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সকাল বেলায় চা খেতে খেতে সৈয়দ খোজা নাসিরুদ্দিনকে বলল যে বেশ কয়েক বছর ধরে হ্রদে আগাবেকের কোন রক্ষক নেই এবং ক্ষেতে জল সে নিজেই ছাড়ে।

"প্রথমে সে সেই বুড়ো দয়ালু লোকটাকে চাকরীতে রেখেছিল যে নামাঙ্গানের মনিবের হয়ে হ্রদটার দেখাশোনা করত। ধারণাই করতে পারেন কেন তারা একত্রে বেশি দিন থাকতে পারেনি। বুড়ো লোকটা একজনকে বিনি পয়সায় জল দিয়েছিল, আগাবেক জানতে পেরে তাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেন। সেই ঘটনার পর দয়ালু বুড়ো লোকটার কথা এই অঞ্চলে আর শোনা যায়নি—এত দিনে সে নিশ্চয়ই কবরের নিচে, তার অস্থি ভস্ম শান্তি লাভ করুক এবং দয়াময় আল্লা তাকে যেন স্বর্গে চিরশান্তি দেন।"

"সে বেঁচে আছে!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তোমার মত ভাল ভাবেই বেঁচে আছে। সে এখন এক অদ্ভুত ধরনের কাজের লোক হয়েছে এবং পরের ভাল করার জন্য অকারণে ছোটখাটো অলৌকিক কাজ করে। কিন্তু তার জায়গায় আগাবেক কেন অন্য লোককে কাজে লাগাননি?"

"তিনি স্থানীয় লোককে বিশ্বাস করেন না এবং এখানে বাইরের লোকও বেশ কম।"

"তিনি কি প্রায়ই এই সরাইখানায় আসেন?"

"দুপুর বেলায় এখানে চা খেতে এবং আমার পালক-পিতার সঙ্গে দাবা খেলতে নিশ্চয়ই আসবেন। আগাবেক দাবা খেলতে খুব ভালবাসেন, কিন্তু আমার বাবা ছাড়া এই গাঁয়ে আর কোন লোক নেই।"

"এখন আর একজন আছে।"

"আপনি কি দাবা খেলতে জানেন?"

"হ্যাঁ খেলি এবং আরও অনেক মজার খেলা জানি যেমন 'মাকড়সা ও ভীমরুল'।"

"কখনও শুনিনি।"

"সময়ে শুনবে ও দেখবে।"

দিনের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ছিল; জ্বলন্ত আকাশ থেকে সূর্যের কিরণ খাড়া ভাবে পড়ছিল। ক্ষেতে, কুমোরের চুল্লীতে বা কামারের ধোঁয়া ভরা চুল্লীর নিচে কাজের কথা কল্পনা করা যায় না। গ্রামের লোক—চাষা ও কারিগররা—বিভিন্ন দিক থেকে সরাইখানায় এসে হাজির হল। তারা ভিতরে ঢুকে সরাই-রক্ষক সফরকে সেলাম জানাল, পরে খোজা নাসিরুদ্দিনকে অভিবাদন জানাল। "তোমরা শান্তিতে থাক মেহনতী মানুষের দল," খোজা নাসিরুদ্দিন অভিবাদনের উত্তরে বললেন, "এবং আল্লা তোমাদের বিশ্রামের দিনে আশীর্বাদ করুন!"

এর পর তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বললেন ; চাষীকে জানালেন যেন তার ফসল ভাল হয়, কুমোরকে বললেন—মাটির জিনিসগুলো যেন সুন্দর ও সমানভাবে সেঁকা হয়, মিলওয়ালাকে বললেন যেন সুষ্ঠু ভাবে মিল চলে এবং রাখালকে বললেন তার পশুর পাল যেন দিনে দিনে বাড়ে। মানুষগুলোর হাত, রোদে পোড়া মুখ, অথবা দাগে ভরা জামাকাপড় এক নজরে দেখেই তিনি বলতে পারতেন লোকটি ক্ষেত থেকে এসেছে না কুমোরের চুল্লী থেকে এসেছে, কামারশালার হাপর থেকে অথবা কসাই-এর চামড়ার কারখানা থেকে।

সৈয়দ তার ব্যবসা দেখতে বেরিয়ে গেল। অতিথিদের খেতে দিল সফর ; একেবারে শুকনো চেহারার বুড়ো মানুষ, জামা-কাপড় অত্যন্ত জীর্ণ, সরাইখানার আয় থেকে লাভ দিনে দু টাকা, খুব কম ক্ষেত্রেই তিন টাকা হয়। মাঝে মাঝে উনুনের পাশে সৈয়দের খালি জায়গার দিকে সে চেয়ে দেখছিল এবং তার শুকনো মুখটা গম্ভীর হয়ে আসছিল ; সে তার পালিত পুত্রের প্রেমের কথা জানত এবং তার জন্য দুঃখ বোধ করত।

সফর খোজা নাসিরুদ্দিনের চায়ের পাত্রটা দিল ও বিনয়ের সঙ্গে বলল :

"হে বিদেশী, কি জন্য তুমি আমার সৈয়দকে মিথ্যা আশা দিচ্ছ। বরং তোমার এমন একটা পথ দেখান উচিত যাতে তার কচি মন থেকে প্রেমের ইচ্ছা দূর হয়ে যায়!"

"কেন দূর হবে?" অবাক হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "বরং প্রেম আরও বেশি হোক ও ফল দিক।"

"কিন্তু সে ফল যদি অতিরিক্ত দুঃখে তেতো ও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়?"

"এটা একটা গরীবের বাগান, বুড়ো, যেখানে এর চেয়ে ভাল ফল আর হয় না।"

সফর বিতর্কের উত্তরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠল এবং এধারে সেধারে ছোটাছুটি করতে লাগল, কখনও বা ঝাঁটা ধরে টানছিল আবার কখনও তোয়ালে বা দাবার ছক নিয়ে টানাটানি করছিল।

অতিথিরা উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল এবং রাস্তায় নিচের দিকে চাইল।

খোজা নাসিরুদ্দিনও নিচের দিকে চাইলেন এবং তাঁর বুকে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সরাইখানার দিকে এগিয়ে আসছিলেন আগাবেক আর তাঁর আগে আগে আসছিল তাঁর ভুঁড়িটা।

যেসব অতিথি তখনও বেরিয়ে যেতে দেরী করছিল সফর তাদের পিছনের

দরজা দিয়ে এক রকম ঠেলে বার করে দিল এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের চায়ের থালটা ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখল ; খোজা নাসিরুদ্দিন একজন পথিক এবং তাঁর যাবার কোন জায়গা ছিল না।

আগাবেক ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী চীৎকারে চারদিক ভরিয়ে তুললেন। তিনি প্রভুর মত রাজকীয় ভঙ্গিতে ভিতরে এসে ঢুকলেন এবং সফরের সবিনীত সেলাম প্রায় লক্ষ্যই করলেন না এবং খোজা নাসিরুদ্দিনকে না দেখতে পাওয়ার ভাণ করলেন। আগাবেকের হাবভাব, চালচলন, তাঁর ছোট্ট মাংসল কপালের নিচে বসান কাল এবং গম্ভীর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, তাঁর কাল ও ঘন দাড়ি এবং আঙুলে মোহরের মত নাম লেখা আংটি—সব কিছু দেখে খোজা নাসিরুদ্দিন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে : "এই লোকটি অতীতে শাসক হিসাবে কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—খুব বড় না হলেও খুব ছোট ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মোহর ছিল—সেজন্য নিশ্চয়ই কাজী অথবা রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন। তিনি একাকী বাস করেন এবং রাজকার্য করেন না ; নিশ্চয়ই কোন অপরাধে অপরাধী এবং সে অপরাধও খুব ছোট ধরনের নয়। নিচের লোকদের কাছে তিনি কোন শ্রদ্ধা বা বিনয় পান না এবং তাঁর উপরেও এমন কেউ নেই যার সামনে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয় নিয়ে নত হয়ে দাঁড়াতে পারেন—এই হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে দুঃখ, তাঁর মনের রোগের পোকা।"

খুবই ভাল যে আগাবেক ছিলেন রাজকর্মচারী শ্রেণীর ; নিজের বিবেক নিয়ে বিব্রত হবার কোন ভয় খোজা নাসিরুদ্দিনের থাকবে না : তাঁর কল্পনার তলোয়ার ও অপরাধীর মাথার মধ্যে তাঁর বিবেককে এখানে আসতে হবে না যা অনেক ক্ষেত্রেই হত যখন বিরুদ্ধবাদীরা হতেন বণিক, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ অথবা দরবেশ। প্রায়ই তিনি এঁদের মন ও হৃদয়ের গুণাগুণ, তাদের দয়ালুতা এবং ছোটখাটো বিবেক বুদ্ধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতেন এবং যখন কল্পনার তলোয়ার দিয়ে মরণ-আঘাত দিতে যেতেন তখন আপনিই সেটা নুয়ে পড়ত এবং ঘটনা অনুযায়ী খুব কাছ দিয়ে আঁচড়ে বেরিয়ে যেত ; কিন্তু রাজকর্মচারীদের বেলায় তিনি কোন মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না।

আগাবেক ইতিমধ্যে বসলেন এবং চেয়ারে হেলান দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন ; এমনভাবে দেখলেন যেন তিনি একটা মাছি ; পরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ও জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে নিজের জন্য কিছুটা চা ঢাললেন।

সফর একটা দাবার ছক নিয়ে এল এবং উল্টো দিকে বসল। তারা খেলতে সুরু করলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে দাবার ছকটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং খেলাটা খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন।

একটা আয়নার মত দুজন খেলোয়াড়ের প্রকৃতিটা দাবার ছকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সফর খুব বিনয় ও ভয়ের সঙ্গে খেলছিল, একটা বড়ে ছুয়ে পরে আর একটা ধরছিল, ভয়ে ভয়ে তুলে ধরে ভাবছিল, আবার আগের জায়গায় সেটাকে রাখছিল, পরে হঠাৎ—ঠিক যেন পাহাড়ের পাশে ঠাণ্ডা জলে কেউ ডুব দিচ্ছিল—নিজের সর্বনাশ আনার জন্য সে দুর্বোধ্যভাবে চাল দিচ্ছিল। অন্যান্য জিনিসের চেয়ে একটা বড়ে বা অন্য কোন ঘুঁটি হারাবার ভয় করছিল এবং লড়াই ছেড়ে ভয়ে ছকের উপর এধার ওধার ছোটাছুটি করছিল, ঠিক যেন একটা ইঁদুর ফসলের গাদায় ছোটাছুটি করছে। স্বভাবতঃই সে সব সময় খেলায় হারছিল।

এদিকে আগাবেক লোভী বল্লমধারী সৈন্যের মত সামনে যা পাচ্ছিলেন যথা—বড়ে, হাতী, ঘোড়া, নৌকা—সবার উপরই ছোঁ মারছিলেন। তাঁর ছোঁ মারার উৎসাহ এত বেশি ছিল যে দুবার কিস্তি মাত করতে ভুলে গেলেন।

সফর সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলছিল; আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার কেবল একটা বড়ে ও তিনটে ঘুঁটি ছিল—রাজা, মন্ত্রী এবং ঘোড়া; ছকের এখানে সেখানে তারা ছড়িয়ে ছিল এবং একে অন্যের সাহায্যে আসতে অক্ষম ছিল। অন্যদের ছোঁ মেরে আগাবেক আগেই ধরে ফেলেছিলেন নিজে কিন্তু বুড়ো সফরের কাছে কেবল একটা বড়ে হারিয়েছিলেন।

সাদা রাজা নিজের কোণ থেকে বিতাড়িত হয়ে চারপাশে শত্রু পক্ষের ঘুঁটিতে আটক পড়েছিল এবং বিপক্ষের ঘুঁটিগুলো শেষ আঘাত দিতে উদ্যত হল।

"আত্মসমর্পণ করো, বুড়ো, আত্মসমর্পণ করো!" আগাবেক চীৎকার করে উঠলেন, হাসির চোটে ও নিশ্বাসের দমকে তাঁর ভুঁড়ি কেঁপে কেঁপে উঠল। "দেখ তোমার আর কি বাকী আছে! আমি তোমার প্রায় সবই ধরে ফেলেছি কেবল একটা বড়ে হারিয়েছি। চাল দাও, ঘোড়া খেল, মন্ত্রী খেল কিছুই আসে যায় না—কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তোমার রাজা আমার মন্ত্রীর মুঠোর ভিতর। ওহো সে এবার রাজাকে কোলাকুলি করতে গিয়ে মেরে ফেলবে!

তাঁর নগ্ন প্রতিহিংসাপূর্ণ আনন্দ সফরকে যেন দংশন করল, তার আভাস

তার অশ্রুসজল মুখের ক্রুদ্ধ আভায় পাওয়া গেল। অসন্তোষের সঙ্গে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে সে তখনও বাধা দেওয়ার একটা চেষ্টা করছিল; সে বড়েটাকে সামনের দিকে চালাবার জন্য তুলে নিল, ছকের উপর কিছুক্ষণ ধরে থাকল পরে সেটা পাল্টে ঘোড়া তুলে ধরল, পরে মন্ত্রী ছুঁল, পরে রাজা, কিন্তু কোন চাল দিল না।

"খেলছ না কেন?" আগাবেক চীৎকার করে উঠলেন। "বাপের দিব্যি খেলা খারাপ হচ্ছে না!"

"বাস্তবিকই খারাপ হচ্ছে না, যে কেউ প্রতি খেলায় দু টাকা বাজী রাখতে পারে," ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন ঘোষণা করলেন।

"প্রতি খেলায় দু টাকা!" আগাবেক অবাক হয়ে বললেন। "যে এতটুকুও দাবা খেলা বোঝে সে সাহস করে প্রতি খেলায় পাঁচ টাকা পর্যন্ত বাজী রাখবে। খুব দুঃখের বুড়ো যে আমরা টাকার জন্য খেলছি না," তিনি সফরকে বললেন। "তাহলে তোমার কাপড় খুলে নেওয়া হত, সরাইখানা হারাতে এবং গায়ের জামাটাও চলে যেত।"

"আমি কিন্তু টাকার জন্য খেলা শেষ করতে বিমুখ নই," অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে খেলোয়াড়দের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমি দুশো টাকা বাজি রাখব—আমার কাছে মোট এই টাকা আছে।"

আগাবেক পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উদ্ধতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন:

"মনে হচ্ছে তুমি পথের উপর বোকা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছো, তাই না? নিজের আসন থেকে না উঠে আমি কাল ঘুঁটির জন্য পাঁচশো টাকা বাজি রাখতে রাজী আছি এই সর্তে যে কোন বোকা যদি সাদা ঘুঁটির জন্য একশো টাকা বাজি ধরে।"

"এ ধরনের বোকা এখানে একজন আছে: আমি সাদা ঘুঁটির জন্য দুশো টাকা বাজি রাখলাম। এখন আপনি বলুন!"

সাদা? কি করে খোজা নাসিরুদ্দিন হিসেব করেছিলেন? কি আশা করেছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জিতবার কথা ভাবেননি?

না, জেতার কথা তিনি চিন্তা করেননি; উল্টো দিকে দুশো টাকা লোকসান

যাবে মনে করেছিলেন ; তিনি যা জিততে চাইছিলেন তা টাকা নয়, আগাবেকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ খুঁজছিলেন। সর্বশক্তিমান নিয়তির কাছে তিনি যেন তাঁর টাকা উৎসর্গ করছিলেন—তাঁর এই দুঃসাহসে নিয়তি যেন দয়া করে তাঁর অনুগ্রহ বিতরণ করে।

"তুমি সাদার উপর বাজি ধরলে ?" আগাবেক আশ্চর্য হয়ে বললেন। "সফর এই আগন্তুক কোথা থেকে এসেছে—সম্ভবতঃ সে পাগল নয়ত তোমার সরাইখানায় জোরসে গাঁজায় দম দিয়েছে।"

"শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না," থালার উপর টাকা ঢালতে ঢালতে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "যদি ভয় পেয়ে না থাকেন তবে বাজির টাকা রাখুন।"

"আমি কি ভীত ?" আগাবেক বললেন, তাঁর বোঁচকার ভিতর থেকে হলুদ রংয়ের ভারী একটা টাকার থলি বার করলেন এবং থালার উপর উল্টে দিলেন। "এখানে সাতশো পঞ্চাশ আছে। এখন থেকে চুপ করে থাকবে এবং আজে বাজে বলবে না। তোমার ধারণা যে আমার ভয় হচ্ছে, ওঁচা লোক কোথাকার !"

"খেলা সুরু হল !" খোজা নাসিরুদ্দিন ঘোষণা করলেন।

তাঁকে জায়গা দেবার জন্য সফর সরে গেল। সে হতবাক হয়ে সহানুভূতির সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চেয়ে রইল এবং আশ্চর্য হচ্ছিল সত্যিই কি এই অদ্ভুত আগন্তুকের এখনও জ্ঞান হয়নি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল যে আগন্তুক গতকাল রাতে খাওয়া ও থাকার জন্য এবং গাধার খাবারের জন্য কোন পয়সা দেয়নি। এই তুচ্ছ ভয়ে অভিভূত হয়ে সে খেলার কথা একদম ভুলে গেল। তার ছ' টাকা হারাবার ভয়ের কাছে এই খেলাই বা কি আর থালার উপর স্তূপ করে রাখা রূপোর টাকাতেই বা তার কি ?

"পথিক, তুমি কোথা থেকে আমার টাকা দেবে ?"

খোজা নাসিরুদ্দিন বিরক্ত হয়ে এই বুড়োর দিকে চাইলেন—তার এই সামান্য টাকা খোয়া যাবার তুচ্ছ ভয় তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণাজনক লাগছিল যদিও তাঁর পাশের পৃথিবী যেন ধ্বসে পড়ছিল ! যাইহোক এই অবস্থায় বুড়োকে দোষ দেওয়া তাঁর ভুল হয়েছিল কারণ ছ' টাকাই ছিল তাকে তিন দিনের জন্য খাদ্য ও

পানীয় দিতে যথেষ্ট। খোজা নাসিরুদ্দিন পরে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জা পেয়েছিলেন।

"চিন্তা করো না বুড়ো—যদি হারি তবে তোমাকে আমার জুতো জোড়া দিয়ে দিব।"

"না," আগাবেক মাঝখানে বললেন (তিনি তাঁর মহানুভবতা দেখাতে চাইছিলেন)। "আমি তোমাকে টাকা দেব সফর।"

তিনি থালা থেকে দশ টাকার একটা মুদ্রা তুলে নিলেন ও সরাইখানার রক্ষকের হাতে দিলেন।

হঠাৎ খোজা নাসিরুদ্দিন দমবন্ধ করে বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর হৃদপিণ্ডে যেন আগুন ধরে উঠল। সম্ভবতঃ এটা ছিল রাগের অভিব্যক্তি।

না, এটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য কিছু। সামনে দাবার ছকের উপর তাঁর ভাগ্য যেন ঝলমল করে হেসে উঠল। যে ত্যাগ তিনি করতে চলেছিলেন তার প্রশংসা করতে গিয়ে ভাগ্য যেন তাঁর দুশো টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছিল আর তার সঙ্গে দিচ্ছিল রাজকীয় পুরস্কার।

যা তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন তা হচ্ছে দাবার ছকের উপর সাদা ঘুঁটির জয়—তাঁর নিজের জয়! প্রথমে তিনি তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না পরে নিজের অবস্থা আর একবার বিচার করলেন। আর সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। জয়!

"আপনি খুব তাড়াহুড়ো করছেন, মশায়," তিনি আগাবেককে বললেন। "পরের টাকা নিয়ে দান করা মুসলমানের সাজে না।"

এর চেয়ে বেশি অপমানজনক আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না।

"অন্যের টাকা!" আগাবেক গাঁ গাঁ করে উঠলেন, তাঁর মুখ নীল হয়ে উঠল। "ঠিক আছে সমীহ করা কাকে বলে আমি তোমাকে শেখাব, ভবঘুরে কোথাকার! টাকাটা থালার উপর আবার রেখে দাও সফর। টাকাটা রেখে দিয়ে তার জুতো জোড়া জামিন রাখ—খালি পায়েই যেন তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। তোর চাল—শুনতে পাচ্ছিস সমাজের ওঁছা কোথাকার। ভেবেছিলাম বাজি জিতে কুড়ি টাকা তোকে দেব যাতে তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে পারিস। কিন্তু এখন তোর এই ঔদ্ধত্যের পর আমি কিছুই দেব না।"

"আমি কিছুই চাইছি না।"

"খেল ! কিন্তু প্রথমে জুতো খুলে সরাইখানা রক্ষকের হাতে দাও।"

খোজা নাসিরুদ্দিন জুতো খুলে সরাইখানা রক্ষকের হাতে দিলেন। পরে খুব সাহসের সঙ্গে মন্ত্রী নিয়ে ছকের ঠিক উল্টো দিকে চাল দিলেন।

"কাল রংয়ের রাজা মাৎ।"

"খুব খারাপ। হায় দয়াময় আল্লা!" একটা কপট ভয়ের ভাণ করে আগাবেক বললেন। "বাস্তবিক আমি ভেবেছিলাম ভয়ে আমার বুকটা ফেটে যাবে। কি দারুণ চাল! কিন্তু তুমি বোধ হয় অন্ধ—তুমি কি দেখোনি যে আমার ঘোড়া সেখানে আছে? তোমার মন্ত্রী কোথায়?"

এই বলে তিনি তাঁর নৌকা দিয়ে সাদা মন্ত্রী মারলেন এবং ছক থেকে সেটা সরিয়ে রাখলেন।

"এখন তুমি কি করবে?" তিনি খোজা নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলেন। "আচ্ছা ওঁছা মানুষ তুমি যে জুতো এবং টাকা দুই-ই হারালে! মন্ত্রী হারিয়ে তুমি আর একটা চালেই হেরে যাবে!"

একটা ছোট্ট সংক্ষিপ্ত শব্দে তাঁর কথার উত্তর দেওয়া হল।

"মাঁৎ!" কাল ঘর থেকে সাদা ঘরে ঘোড়া চালিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

আগাবেক বোকার মত ছকের দিয়ে চেয়ে রইলেন। সত্যি ঘটনা আস্তে আস্তে যখন তিনি বুঝতে পারলেন তখন তাঁর মাংসল মুখটা ক্রমশঃ নীল হয়ে উঠল।

"খেলা শেষ!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমার বাজির টাকা কই মশায়!"

কম্পিত হাতে থালা ধরে সফর সামনে এগিয়ে এল: তার একদিকে চেয়ে থাকা চোখ দুটো ভয় ও মানসিক যন্ত্রণায় ভরে গেল, সে খোজা নাসিরুদ্দিনকে থলিতে টাকা ভরতে এবং জুতো পরে নিতে দেখছিল; জুতো দুটো মিনিটখানেক আগেই খুলে রাখা হয়েছিল। বুড়ো লোকটা ভয়ে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল যদিও সে সবকিছুই ঘটতে দেখেছে। তার দেহের ভিতর বয়ে বেড়ানো প্রাণটা এত ভীতু ছিল যে সব কিছুতেই সে ভয় পেত এবং নতুন কোন লোক দেখলে বা চারপাশে কিছু ঘটতে থাকলে সে তা থেকে সর্বনাশের লক্ষণ দেখত। "কি হবে, হায় হায়, কি হবে?" সে মনে মনে বলল, এক ঝড়ের পূর্বাভাস আশংকা করে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল; সে ভয় পেল যে আগাবেকের রাগের

ধাক্কা তার মাথার উপর এসে পড়বে ও তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলবে। তার ভবিষ্যৎ বা উন্নতি যার জন্য সে এত কাঁপছিল তা হচ্ছে মাটি ও নল খাগড়ায় তৈরি এই তুচ্ছ সরাইখানা যার দাম যে কোন উদার ক্রেতার কাছেও দুশো টাকার বেশি না; সফরের আর কিছুই ছিল না—না বাড়ী-বাগান, না ক্ষেত খামার তবুও সে ভয়ে কাঁপছিল যেন তার কোটি কোটি সোনার টাকা কোন গুপ্ত ঘরে লুকান আছে। তার মত বুড়ো মানুষের অধিকারে ছিল এক অমূল্য সম্পদ—স্বাধীনতা, কিন্তু সে তার গলায় দড়ি বেঁধে ও তার আত্মার পাখা দুটো শিকলে বেঁধে রেখেছিল। দারিদ্র্যের কাছ থেকে সে পেয়েছিল বঞ্চনা এবং ঐশ্বর্যের কাছ থেকে পেয়েছিল চিরন্তন ভয়; যে দিক থেকেই হোক না কেন সবচেয়ে খারাপটাই সে বেছে নিয়েছিল।

আগাবেক একটি কথাও বললেন না। চোখ বড় করে তিনি ছকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর নীল হয়ে যাওয়া মুখটা ক্রমশঃ কাল হয়ে এল।

"এ গাঁয়ে কি কোন ডাক্তার আছে?" খোজা নাসিরুদ্দিন বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন। "সম্ভবতঃ মৃগী রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ওঁর শরীরে রক্ত দেওয়া দরকার।"

কোন ডাক্তারের অবশ্য দরকার ছিল না কারণ বিপদ কেটে গিয়েছিল। আগাবেক সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন, তাঁর জ্বালা ধরা কাঁধ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং মুখের অশুভ নীল কাল আভা ক্রমশঃ দূর হয়ে গেল।

"আশ্চর্য যে আমি এটা দেখিনি। সত্যিই, পথিক, তুমি আমাকে যাদু করেছিলে।"

"আসুন আর এক দান খেলা যাক।"

"আর একবার যদি তোমার সঙ্গে এই ছকে খেলতে বসি তবে সবচেয়ে দুর্গন্ধে ভরা শয়তান যেন আমাকে গ্রাস করে। যা পেয়েছো সব নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও; সহজে আমার কাছ থেকে যে সাড়ে সাতশো টাকা পেয়েছ তাই নিয়ে খুশী থাক।"

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছা খোজা নাসিরুদ্দিনের ছিল না।

"আবার নির্বাসন, অনন্ত নির্বাসন!" বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। "আপনি বলছেন 'সব

নিয়ে চলে যাও'। বরং বলতে পারতেন 'পালাও ভাগো'। উঃ কি নিষ্ঠুর নিয়তি !"

তাঁর কান্নার তীর লক্ষ্য ভেদ করল।

"তোমাকে কি কেউ তাহলে হয়রান করছে ?" কান খাড়া করে আগাবেক বললেন।

"অনুরাগ, বিপদ এবং ব্যর্থতা—এরাই আমাকে অনবরত হয়রান করছে।"

"তোমার ব্যর্থতা যদি আজ যেমনটি দেখালে তেমন হয় তবে ত তোমাকে হিংসা করতে হয়।"

"এটা আকস্মিক ঘটনা, একশো বারে একবার ঘটে।"

"তোমার গন্তব্য স্থান কোথায় ?"

"জানি না। চোখ যেদিকে নিয়ে যায়। উত্তর, দক্ষিণ বা পূব, পশ্চিম যেদিকেই হোক না কেন পরোয়া করি না।"

"কিন্তু তোমার ঘুরে বেড়ানোর একটা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য আছে। তুমি নিশ্চয়ই বডলোক বা ভূস্বামী নও যে খেয়াল খুশিমত ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

এই ভাবেই তাঁদের প্রথম আলোচনা শেষ হল—'মাকড়সা ও ভীমরুল' খেলার এই হচ্ছে প্রথম গৌরচন্দ্রিকা।

আগাবেগের প্রশ্নগুলোও কিন্তু উদ্দেশ্য ছাড়া ছিল না। এই পথচারী কি কোন আইন অমান্যকারী অপরাধী ? যদি তাই হয় তবে প্রথম কাজ হচ্ছে তাকে ধরে কোতোয়ালের হাতে দেওয়া এবং তাঁর সাড়ে সাতশো টাকা উদ্ধার করা। আগাবেকের উদ্দেশ্য বুঝে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে হাসলেন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাঁকে নিরাশ করতে চাইলেন না।

"হায়, সেখানে অল্প আনন্দই আছে! শুনুন, মশায়, খুব বেশি দিন আগে নয় যখন আমার নিজের বাড়ী ছিল এবং বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাতাম কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির ইচ্ছায় আমি সব হারালাম ও এই শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়লাম, যে অবস্থায় আজ আপনি আমাকে দেখছেন—একটা ভিখারীর চেয়েও খারাপ অবস্থা।"

"তোমার উপর কোন দুর্ভাগ্য এসে পড়েছিল ?"

"আমার জীবনের গল্প হাজার দুঃখে ভরা! আমি হেরাটে বাস করতাম সেখানে বাজার সরকারের খাজাঞ্চির মত লোভনীয় পদে ছিলাম।"

"হেরাট বললে না ? আমি সেখানে এক সময় ছিলাম। বলে যাও।"

"আল্লার কসম, আমার মনিব আমার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তার পক্ষে আমি খাজনা আদায় করতাম, খারাপ জায়গার জন্য মাঝারি দরে ও মাঝারি জায়গার জন্য বেশি দরে কর বসিয়েছিলাম। হতভাগ্য চাষী ও কারিগরদের কাছ থেকে জোর করে যে টাকা আমি আদায় করতাম তার প্রতিটি কপর্দকও আমার মনিবের কাছে নিয়ে আমার আনুগত্যের চিহ্ন হিসাবে তাঁর সামনে হাজির করতাম। আমার মনিব টাকা নিয়ে সব সময় বলতেন, 'ওহে উজাকবাই, যদি আমার সোনার মোহরে ভর্তি হাজার খানেক কলসি থাকত তাহলেও নির্ভয়ে আমি তোমাকে আমার সিন্দুকের চাবি দিতাম!' তিনি ভুল করেননি, তাঁর সম্পত্তি আমার কাছে আমার নিজের সম্পত্তির চেয়েও পবিত্র ছিল; আমার বাবা এই ভাবেই আমাকে শিখিয়েছিলেন; তিনি এক রাজপুরুষের বাড়ীর নায়েব ছিলেন এবং আমিও তাঁর শিক্ষামত সারাজীবন একই রকম ছিলাম। আমার মনিব আমার বিশ্বস্ততায় খুশী হয়ে তাঁর আয়ের কুড়ি ভাগের এক ভাগ আমাকে দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন।"

"খুব বেশি নয়," আগাবেক মন্তব্য করলেন।

"আট বছর ধরে সঞ্চয় করে বিপুল ভূসম্পত্তি গড়ে তোলার পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। আর একটি কারণে এই চাকরি আমি আঁকড়ে ছিলাম তা হচ্ছে জ্ঞানের জন্য লেখাপড়া করার যথেষ্ট সময় পেতাম; এই ব্যাপারে অবশ্য এখন আমি কিছু বলতে চাই না। পরে হঠাৎ এক বিরাট ঝড় আমার মনিবের উপর এসে পড়ল······।"

আগাবেক খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন যার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন তাঁর কথাগুলো যেন বৃথা না যায়।

"আমার মনিব একটু ভুল করলেন।"

"আহা!" জোরে নিশ্বাস নিয়ে ও পকেটের ভিতর হাত নাড়তে নাড়তে আগাবেক বললেন।

"মনিবের শত্রুরা তাড়াতাড়ি রাজার কানে সব নিয়ে এল, ফলে তিনি চাকরী ও সম্পত্তি দুই-ই হারালেন; সে সব রাজভাণ্ডারে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।"

"বুঝতে পারছি," সহানুভূতিতে মোটা মাথাটা নাড়তে নাড়তে আগাবেক বললেন। "এইসব ভুলের জন্য অনেক সময় দারুণ মাশুল দিতে হয়, দারুণ মাশুল!"

তাঁর অতীত জীবনের আর একটি পৃষ্ঠা খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে পরিষ্কার হল।

"আমার মনিবের সেই শোচনীয় ভাগ্যে আমাকেও অংশ নিতে হল এবং এখন আমি পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, জানি না কোথায় আমার এই ভ্রাম্যমান শরীর ও ক্লান্ত মাথা রাখব। নিঃসন্দেহে আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইভাবে ঘুরে বেড়াতাম যদি না আজ এই ধরনের একটা সংঘর্ষ হত এবং অদ্ভুতভাবে অর্থ লাভ করতাম।"

আগাবেক বেদনায় ভুরু কোঁচালেন এবং জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। খোজা নাসিরুদ্দিন যেন সেই ঘায়ে হাত দিলেন যেটা তখনও ব্যথা দিচ্ছিল।

"চেষ্টা করব যাতে এই টাকাটা বুদ্ধিমানের মত খরচ করা যায়।"

"আর কারও সঙ্গে আবার খেলতে বসে?" আগাবেক হিংসায় ফেটে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পয়গম্বর আমাকে সে ধরনের লোভ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন—এ ধরনের ভাগ্য দু বার হয় না। না, পছন্দমত আমি একটা উপায় বেছে নেব।"

"ব্যবসা?"

"ব্যবসাতে আমার খুব ঝোঁক নেই। কোন একটা নির্জন জায়গায় একটা চাকরি, যেখানে আমি জ্ঞানপূর্ণ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারব—সেটাই আমার মনের ইচ্ছা। কিন্তু টাকা জামীন ছাড়া কে আর একজন বিদেশীকে চাকরি দেবে। এখন আমি অবশ্য জামীনের সমস্ত টাকা দিতে পারব, যাইহোক......"

"তুমি তাহলে এই ধরনের কিছু একটা খুঁজছো?"

"আমি অবশ্য বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারি না। আমার গাধা ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছে এবং আবার পথ চলতে সুরু করার সময় হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মশায় সাড়ে সাতশো টাকার জন্য। এই যে সরাই-রক্ষক, আমার চা ও রাতে থাকা-খাওয়ার জন্য তোমার পাওনা কত?"

খোজা নাসিরুদ্দিন জিনটা তুলে নিলেন, রাতে সেটা বালিশের কাজ করেছিল; সেটা হাতে নিয়ে গাধাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। লোভের যে ফাঁসটা আগাবেকের গলায় পরিয়ে নিজের দিকে টেনে নিলেন সেটা বেশ শক্ত-ভাবেই টানা ছিল।

"থাম! অপেক্ষা কর!" আগাবেক যখন দেখলেন যে তাঁর টাকা

শয়তানের লেজে করে উধাও হবার উপক্রম হয়েছে তখন চীৎকার করে উঠলেন।
"এদিকে ফিরে এস, তোমাকে আমার একটা জরুরী কথা বলার আছে।"

লোভের ফাঁসটা শক্ত হয়ে লেগে গেল।

"তুমি চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছো—এই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"ও মশায়!" তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ফিরে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "সম্ভবতঃ আপনি এ ধরনের চাকরির খবর রাখেন—আমার কৃতজ্ঞতার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না যদি একটা চাকরি দেন।"

"ঠিক তাই।"

"উঃ আল্লা!"

"এবং খুব কাছে, একেবারে পাশের বাড়ীতে।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের মুখে শ্রদ্ধা-মেশানো কৌতূহল দেখা দিল।

"আমার মহামান্য ভাষ্যকার ধাঁধা করে বলতে ভালবাসেন যা আমার পাপী মন উদ্ধার করতে অসমর্থ।"

"প্রথমে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও পরে আমার কথার অর্থ কি বুঝিয়ে বলব," আগাবেক বললেন। তিনি সত্যিই ভেবেছিলেন যে তিনি ধাঁধা করে বলছেন। "উত্তর দাও—তুমি কি আগে কখনও আমাদের গ্রামে এসেছ?"

"আসিনি।"

"তোমার এখানে কোন আত্মীয় আছে?"

"না নেই। আমার আত্মীয়রা সকলে হেরাটে থাকেন।"

"বন্ধুদের কি ব্যাপার? নিশ্চয়ই আমাদের গাঁয়ে এমন কেউ আছে যার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে এবং অতীতেও ছিল?"

"এ ধরনের কোন লোক নেই। আমার বন্ধুরাও সকলে হেরাটে আছেন।"

"সম্ভবতঃ তোমার যে সব আত্মীয় হেরাটে আছে তাদের কোন বন্ধু এখানে আছে অথবা তোমার হেরাটের বন্ধুদের এখানে কোন আত্মীয় আছে?"

"আমার বাবার দাড়ির কসম খেয়ে বলছি যে, আমি অথবা আমার আত্মীয় এবং বন্ধু অথবা আমার বন্ধুদের আত্মীয় অথবা আত্মীয়দের বন্ধু, এমন কি আমার আত্মীয়দের বন্ধুর আত্মীয়দের বন্ধু কেউ এই গাঁয়ে কোনদিন ছিলেন না বা কোনদিন তাদের এখানে থাকতে শোনা যায়নি।"

"এখন শেষ প্রশ্নটা বাকী—তোমার হৃদয় কি বিদেশীদের প্রতি নির্বোধ সহানুভূতিতে কাতর হয়ে পড়ে ?"

খোজা নাসিরুদ্দিন তুরাখনের সমাধির বৃদ্ধ কর্মচারীর কথা মনে করলেন এবং উত্তর দিলেন :

"আমার মনের সব সহানুভূতি নিজের জন্যই খরচ করি, বিদেশীদের জন্য এক বিন্দুও পড়ে থাকে না।"

"বুদ্ধিমানের মত বলেছ ! এখন অদ্ভুত কিছু একটা শোনার জন্য তৈরি থাকবে যার জন্য তোমার হৃদ্‌পিণ্ড এখনই লাফাতে সুরু করবে। তুমি কি এখানে একটা হ্রদ দেখেছ এবং জান কি ওটার মালিক কে ?"

"হ্রদ দেখেছি কিন্তু মালিক কে জানি না।"

"আমিই মালিক। তুমি জামিনের বদলে একটা চাকরি খোঁজ করছিলে যাতে তোমার রুটির জোগাড় হয়—হ্রদের রক্ষকের পদ হলে কি রকম হয় ?"

সবশেষ সেই কথাটাই বেরিয়ে এল—যার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। "হ্রদের রক্ষক"—সফরের কানে যেন বাজ পড়ার প্রতিধ্বনি উঠল ; "হ্রদের রক্ষক"—ছাদের কার্নিসে তিতির পাখী পুনরাবৃত্তি করল ; "হ্রদের রক্ষক"—খাঁচার-কোয়েল উত্তর দিল ; "হ্রদের রক্ষক"—ধোঁয়ায় আড়াল থেকে রান্নার বাসন যেন ফিসফিস করে উঠল ; "হ্রদের রক্ষক"—বাতাস যেন নিশ্বাস নিয়ে বলল ; "হ্রদের রক্ষক"—গাছেরা মর্মর ধ্বনি তুলল।

দশ মিনিট হয়তো পেরিয়েছে এর মধ্যেই গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেই ঘটনাটা শুনল। "হ্রদের রক্ষক"—সর্বত্র সকলের মুখে একই কথা—মাঠেই হোক আর পরিষ্কার উঠোনেই হোক। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল ও ছেলেরা আনন্দে গুঞ্জন তুলছিল।

যখন আগাবেক ও খোজা নাসিরুদ্দিনকে সরাইখানা থেকে হ্রদের দিকে যেতে দেখল তখন যারা সামনে পড়ল সকলেই নিচু হয়ে তাদের সেলাম জানাল এবং ভয় মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে নতুন রক্ষকের দিকে চাইল ; তিনি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ও উদ্ধত ভাব দেখালেন এবং তাদের অভিবাদন লক্ষ্য করার উপযুক্ত বিবেচনা করলেন না।

তাঁরা চলে যাওয়ার পর বুড়ো সফরকে সরাইখানায় একা বেশিক্ষণ থাকতে হল না। গাঁয়ের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে এসে জড় হল এবং বুড়োকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল : আগাবেক নতুন রক্ষকের সঙ্গে কি নিয়ে কথা

বলছিলেন, তাঁরা কি ব্যবস্থা করেছেন, নতুন রক্ষক কি হিসেবে খাজনা পাবেন? তাদের পায়ের চাপে সরাইখানার মাচা মট মট করে উঠল, উনুনের পাশে যে চায়ের বাসনগুলো ছিল সেগুলো নড়ে ঝনঝন করে উঠল এবং ছাদ থেকে ঝুল নিচে এসে পড়ল।

"এক মিনিটের মধ্যেই তোমরা আমার সরাইখানা ভেঙে মাটিতে ফেলবে!" সফর চীৎকার করে উঠল। "তোমরা মাচা থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াও। যদি না কর তবে আমি কিছুই বলব না।"

গাঁয়ের লোকদের অনেকেই মাচা থেকে নেমে এল। সফর তাদের সমস্ত ঘটনা বলল। পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা সব ঘটনাই জানি।

সে তার গল্প শেষ করল কয়েকটি অশুভ কথা বলে :

"একজন খারাপ লোকই যথেষ্ট, আল্লা জানেন, এখন থেকে আমাদের মাথার উপর পাব দুজনকে।"

নীরবতাই ছিল তাঁর একমাত্র উত্তর, নীরবতা এবং দীর্ঘশ্বাস। যারা সরাই-খানায় এসে জড় হয়েছিল তারা আসন্ন দুঃখের এক আবছা এবং ভয়ংকর অপদেবতাকে দেখতে পেল যার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

সফর তার পাকা বুড়ো মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে তার বক্তব্য বলে চলছিল এবং তা থেকে একটা ভয়ংকর আস্বাদ নিচ্ছিল।

"শীঘ্রই এখানে বড় কাজ সুরু হবে—বেশ বড় কাজ! হায়, আমাদের খারাপ ছাড়া ভাল কিছু সূচনা করছে না। আমার নিজের ভয় হচ্ছে!"

বেশ চাপা প্রতিধ্বনির মত একজন উত্তর দিল :

"হ্যাঁ, অশুভ সূচনা করছে!"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

আগাবেক খোজা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে প্রধান নালার কাছে এলেন যেখানে একটা বড় কাঠের বাঁধ দেওয়া ছিল, বাঁধে একটা দরজা ছিল এবং ভিতরে জল আটকান থাকত।

"দেখ!" ছাতা পড়া দরজা, যেটা বয়স হওয়ায় কাল হয়ে গিয়েছিল, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে আগাবেক বললেন; দরজাটা দুটো সেগুন কাঠের খুঁটির খাঁজে

শক্ত করে বসান ছিল এবং উঠা-নামা করতে পারত। "তুমি এটা পাহারা দেবে এবং আমার অনুমতি ছাড়া কারও জন্যে খুলবে না।"

বাঁধের উপর একটা মরচে পড়া শিকলে বাঁধা একটা চরকি কল লাগান ছিল, নিচে দুটো লোহার আংটায় একটা বিরাট পিতলের তালা ঝুলছিল এবং এর ঠিক উপরে একটা ফাটল থেকে জল পরিষ্কার ভাবে ঝিরঝির করে ঝরছিল ও ছাতা পড়া কাঠের তক্তার উপর দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছিল। "চোখের জলের দরজা", খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে বললেন, তাঁর চিন্তা বার বার হতভাগ্য গ্রামবাসীদের উপর এসে পড়ছিল।

"কাউকে বিশ্বাস করে জল দিও না, এমন কি এক টাকার মত জলও দেবে না!" আগাবেক তাঁর নতুন রক্ষককে উপদেশ দিলেন। "এই নাও তালার চাবি—সব সময় লুকিয়ে রাখবে। কোন ধূর্ত বদমাস খাঁজগুলো মনে করে দ্বিতীয় একটা বানিয়ে নিতে পারে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন চাবিটা সরিয়ে রাখলেন, পরে আগাবেককে তাঁর খেলায় জেতা টাকাটা দিলেন, বললেন, "এই নিন আমার জামিনের টাকা।"

কাছেই একটা ঢিবির উপর একটা মাটির কুঁড়ে ঘর ছিল যার দরজা ছিল হ্রদের দিকে মুখ করে।

"তুমি ঐ কুঁড়ে ঘরে বাস করবে," আগাবেক বললেন। "প্রতি রাতে তুমি দরজার কাছে যাবে এবং দেখবে কেউ হাত দিয়েছে কিনা। বুঝতে পারছ, মনে থাকবে?"

"বুঝেছি, আমি মনে রাখব হুজুর।"

এই কথাগুলো বলে তাঁর নতুন কাজে যোগ দেওয়ার অনুষ্ঠান শেষ হল।

আগাবেক তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন, দাড়ির মাঝে দাঁত বার করে এবং বোঁচকার মধ্যে টাকার থলি নিয়ে; এত চালাকির সঙ্গে তাঁর সাড়ে সাতশো টাকা উদ্ধার করতে পেরেছেন ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছিল। "এক বা দেড় মাসের মধ্যেই একটা ওজর বার করে আমি তাকে বরখাস্ত করব এবং তার জামিনের টাকা নিজের কাছেই রেখে দেব, কারণ আমি যখন একটা বড় এবং শক্ত তালার সাহায্যে নিজেই সমস্ত দেখাশোনার কাজ করতে পারছি তখন একজন লোক রাখার কি দরকার?" আগাবেক ভাবলেন। "আমি আমার টাকা উদ্ধার করব, ব্যস তা হলেই হল।"

টাকা উদ্ধার তিনি করেছিলেন সত্যি, কিন্তু তার জন্য যা হারালেন তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

সেদিন সন্ধ্যায় খোজা নাসিরুদ্দিনকে নতুন বাড়ীতে বাস করতে দেখা গেল। কুঁড়েঘরের যে অংশে আলো বেশি ছিল সেই অংশটা তিনি বেছে নিলেন নিজের জন্য এবং কোণে তক্তার বিছানা পেতে ভাঙ্গা উনুনটা ভাল করতে বসলেন। বাড়ীর অন্ধকার অংশটা পপলার গাছের খুঁটির বেড়া দিয়ে গাধার থাকার জন্য ব্যবস্থা করলেন।

"নতুন ঘর পছন্দ হচ্ছে ?" গাধার খাবারের গামলায় ভুষি ঢালতে ঢালতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। "এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করে আমরা একই ছাদের নিচে তাল রেখে চলব ? আমি কি গাধার অবস্থায় এসে পৌছাব না তুমি বিশ্বাস করতে চলেছ যে তুমি একজন মানুষ ?"

কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই তিনি কথাগুলো বললেন। এর মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ যা কাজে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা করছিল। কখন এবং কি ভাবে সে কাজ রূপ নেবে খোজা নাসিরুদ্দিন নিজেও তা জানতেন না।

সন্ধ্যা যেন গলে গলে এসে হাজির হল ; এই রকম এক নরম সুন্দর সন্ধ্যায় পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেন ঐক্য গড়ে উঠল এবং সমস্ত পৃথিবী এক স্তিমিত আলোয় ভরে উঠল। খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কুঁড়ে ঘরের দরজার বাইরে একটা পাথরের উপর বসেছিলেন হ্রদের দিকে চেয়ে, হ্রদটা ক্রমশঃ গোধূলির আবছা নীল আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন যখন তাঁর অসংলগ্ন চিন্তার গম্ভীরতা থেকে সাঁতার কেটে তীরে এসে পৌছালেন তখন রাত হয়ে গিয়েছে। শিশিরের গন্ধ মেশানো বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে এবং ঘুমাবার সময় হয়ে এল ; তিনি আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুললেন এবং ভিতরে যাবার জন্য পিছন ফিরলেন।

কোণ থেকে একটা গলার স্বর আস্তে আস্তে ভেসে এল, "আমি—সৈয়দ।"

অন্ধকারে যুবকের চেহারা আবছাভাবে দেখা গেল।

"তুমি এখানে কেন ?" খোজা নাসিরুদ্দিন আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"লোককে বলতে শুনলাম আপনি নাকি হ্রদের রক্ষকের চাকরী নিয়েছেন, সেজন্যে আমি জানতে এলাম এটা কি সত্যি ?"

"ঠিক। মনে হচ্ছে তোমার কষ্ট হচ্ছে—কেন ?"

যুবক ইতস্ততঃ করল।

"আপনি এখন তাহলে……এই চাকরী, আপনি তাহলে…ভুলে…"

"তোমাকে আর তোমার অতুলনীয়া জুলফিয়াকে?" খোজা নাসিরুদ্দিন যেন তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন। "এই বোকা ছোকরা, বন্ধুকে বিশ্বাস করার শক্তি হারাচ্ছ—এই সব সন্দেহ কোথা থেকে আসছে? বিশ্বাস করতে শেখো—এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ যার জীবনে ভীষণ প্রয়োজন; ভাগ্য লোকের আরবের একটা মাদি ঘোড়ার মত; সে ভীতু অশ্বারোহীকে কষ্ট দেয় কিন্তু সাহসী কাছে আত্মসমর্পণ করে বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ, আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করো না। না ডাকা পর্যন্ত আসবে না। কেউ যেন আমাদের একসঙ্গে না দেখে। আমার খেলা নষ্ট করবে না। আমি বলছি আর তুমি শুনছ—এখন যাও!"

আর একবার—সেই ঘুমন্ত বাগান, রূপালি কুয়াশা, নাইটিংগেলের গলা-ভরা গান, টিকটিকির টিক টিক শব্দ এবং মাঠে উত্তেজিত ফিসফিস শব্দ:

"গতকাল বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে আমি তাঁকে দেখেছি—তিনি আগাবেকের সঙ্গে সবাইখানা থেকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বেশ কঠিন ও উদ্ধত লাগছিল। তাঁর প্রতিশ্রুতি শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম……"

"ও জুলফিয়া, একজন বন্ধুকে বিশ্বাস করার মত শক্তি কেন তোমার হৃদয়ে নেই? বিশ্বাস করতে শেখো—জীবনে এরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি! তুমি কি জান না ভাগ্য অনেকটা আরবের মাদি ঘোড়ার মত; ভীতু অশ্বারোহীকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে কিন্তু সাহসীর কাছে আত্মসমর্পণ করে!"

"কেমন সুন্দরভাবে চালাকির সঙ্গে তুমি কথা বল সৈয়দ—আমাদের পুরোনো মোল্লাও এর চেয়ে ভাল বলতে পারত না!"

"সব সময় মনে রাখবে জুলফিয়া আবছা শীতের পর রোদে ভরা বসন্ত আসে এবং মনে রাখার মত এই হচ্ছে একমাত্র নিয়ম; এর উল্টো নিয়মটা ভুলে যাওয়াই ভাল।"

"একেবারে কাব্য, সৈয়দ। তুমি নিজে লিখেছ এবং আমার জন্য?"

নাইটিংগেল গান থামাল, গুঞ্জনরত টিকটিকিরা একটা গাছের গর্তে ঢুকে ঘুমাতে গেল; আকাশের তারারা তাদের স্থান অনেকটা পরিবর্তন করেছে, কাল জলের উপর বাষ্প জমা হল—রাত্রি পশ্চিমের দিকে যাত্রা করল।

ছুদিন পরে হ্রদের রক্ষক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল।

সে এল দুপুরের পর যখন আগাবেক সরাই-রক্ষকের সঙ্গে প্রতিদিনের দাবা খেলার পর চলে গেছেন এবং গাঁয়ের লোকেরা তখন শান্তিতে সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে।

তাদের সেলামের কোন জবাব না দিয়ে হ্রদের রক্ষক সেজে রুটিওয়ালার কাছে গেল; সে তখন তাকে দেখে তার জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সাদা ধূসর রংএর রুটিটা সবার উপরে রাখল। হ্রদের রক্ষক একটা দুটো বা তিনটে কিনল না, সমস্ত ঝুড়িটাই কিনে ফেলল। ঠিক একই ভাবে সে কাঠবাদাম বিক্রেতার কাছ থেকে ঝুড়ি সমেত কাঠবাদাম কিনে সেখান থেকে চলে গেল।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল, এই কেনাকাটা নিয়ে সরাইখানায় আলোচনার ঝড় উঠল। কেন সে এত জিনিস এক সঙ্গে কিনল? সে কি ভীষণ অলস এবং তার কুঁড়ে ঘর থেকে দীর্ঘ দিন আর নাব হবে না?

কিন্তু একই ঘটনা পরের দিনও ঘটল। দুপুর বেলায় দুটো খালি ঝুড়ি হাতে নিয়ে হ্রদের রক্ষক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল এবং একটা রুটি ও অন্যটা কাঠবাদাম দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে চলে গেল এবং আগের মতই তাদের সেলামের কোন উত্তর দিল না।

সরাইখানা উত্তেজনায় ভরে গেল। গতকাল যা কিনেছিল তা দিয়ে সে কি করল? খেয়েছে? কিন্তু যা ছিল তা পাঁচজনের পক্ষে যথেষ্ট! এ এক বিরাট ধাঁধা! চোরাকের ভীতু অধিবাসীদের একঘেঁয়ে জীবনে এই ঘটনা এক অশুভ রহস্যের রূপ নিল।

ঘটনাটা আরও খারাপের দিকে গেল যখন একজন রাখাল আলোচনার এই আগুনে তেল ঢালল। মাঠ থেকে গাঁয়ে আসছিল ভূষি কিনতে, আসার পথে সে হ্রদের ধারে কুঁড়ে ঘরটার দিকে তাকিয়েছিল। যা দেখল তাতে তার সমস্ত বুদ্ধি থ' মেরে গেল। হ্রদের নতুন রক্ষক তার গাধাকে রুটি ও কাঠবাদাম খাওয়াচ্ছে, বাদামগুলোর খোলা আগেই ছাড়ানো হয়েছিল এবং ছুরি দিয়ে গর্ত করে বীচি বার করা হয়েছিল। রাখাল তার দুপুরের খাবার কিনতে কিনতে দোকানদারকে এই গল্প শোনাচ্ছিল; দোকানদার এই কথা শুনে প্রায় নাচতে নাচতে দোকান বন্ধ করে সরাইখানার দিকে এই মুখরোচক খবর নিয়ে ছুটে গেল।

গাধাকে খাওয়াচ্ছে! গাধাকে সাদা রুটি ও কাঠবাদাম খাওয়াচ্ছে। সরাই-রক্ষক সফর বিবর্ণ হয়ে গেল। পশমের ব্যবসায়ী বোকা রহমতুল্লা চিৎ হয়ে শুয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল, হাসির চোটে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম। মিল মালিক ও মাখনওয়ালা একথা বিশ্বাস করল না।

একজন বেপরোয়া ছোকরা নিজের চোখে দেখতে যাবার জন্য রাজী হল। সে ছিল ভাগ্যবান—দেখা না দিয়ে সে চুপি চুপি ভিতরে ঢুকল, তখন গাধাটা রাতের খাবার খাচ্ছিল। রাখাল যেমনটি বলেছিল সেই রকম গাধাটা তখন সাদা পাঁউরুটি ও কাঠবাদাম খাচ্ছিল আর হ্রদের নতুন রক্ষক অনবরত গাধাটাকে সেলাম করে যাচ্ছিল ও নিজের হাতে রুটি ও খোলা ছাড়ান বাদাম খাওয়াচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে তাকে 'মহানুভব', 'খানদানী আদমী' ও 'জাঁহাপনা' বলে ডাকছিল।

বেপরোয়া ছোকরা সরাইখানায় ফিরে এসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা দেখেছিল সব বলল। সরাইখানা আর একবার গুঞ্জনরত মৌচাকে পরিণত হল। তাহলে এসব সত্যি! কিন্তু এর অর্থ কি? কুমোর শিরমাত নিজের মাথায় টোকা মারল। তার যুক্তিই স্বাভাবিক বলে মনে হল কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হল যে ধূর্ত সম্রাট আগাবেক হ্রদের নতুন রক্ষকের এই দুর্বলতা বুঝতে পারেননি? এছাড়া সেই দাবা খেলা? পাগল লোকেরা এইভাবে খেলতে পারে না! সে এবং আগাবেক কি গোপনে কোন সলাপরামর্শ করেছেন যাতে এসব হচ্ছে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার ছল? কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি তাঁরা এঁটেছেন, কারই বা বিরুদ্ধে? কারণ একটিই হতে পারে—তাঁরা সমস্ত জমি ও বাগান দখল করে নিতে চান।

"আর আমার সরাইখানাও সেই সঙ্গে," সফর মুখ গম্ভীর করে বলল। "গত বছর এর দাম হিসাবে দেড়শো টাকা দিতে চেয়েছিল, তখন বেচে দিলে ভালই করতাম।"

খোজা নাসিরুদ্দিন যে রকম পরিকল্পনা করেছিলেন সবকিছু সেই ভাবেই ঘটে চলল। একদিন দাবা খেলার সময় সফর আগাবেককে হ্রদের পাশের কুঁড়ে ঘরে গাধাটার ভোজনপর্বের কথা জানাল।

নিজের চোখে রুটি ও কাঠবাদাম কেনা দেখবার জন্য আগাবেক অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু দেরীতেই সরাইখানায় এলেন।

তিনি সব কিছু দেখলেন! খোজা নাসিরুদ্দিন ইচ্ছা করেই তাঁর চোখের

সামনে ছুটোর বদলে চার ঝুড়ি কিনলেন এবং এগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্য রুটিওয়ালার সাহায্য চাইতে হল। এসব করবার সময় খোজা নাসিরুদ্দিন এমন ভাব দেখালেন যে তিনি আগাবেককে দেখতে পাননি, কিন্তু নিজে মনে মনে ভাবলেন : "আজ নিশ্চয়ই সে আমার ঘরে আসবে।"

সন্ধ্যের দিকে মাটির মেঝেতে তিনি জল ছড়া দিলেন, টাটকা কাটা কিছু নল-খাগড়া বয়ে নিয়ে এলেন এবং এসব দিয়ে গাধার বিছানা বানালেন। পরে কাঠবাদামগুলোকে দু টুকরো করে কাটলেন এবং সফরের কাছ থেকে আট টাকায় কেনা একটা বিরাট মাটির থালায় সেগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন।

আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আগাবেক কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

আকাশে যেন আগুন লেগেছে এবং সূর্য এই আগুনের সমুদ্রে যেন ডুবে যাচ্ছে; জ্বলন্ত আকাশের উল্টোদিকে একটা কাল ছায়া ফেলে আগাবেক ভারিক্কী চালে জড় পিণ্ডের মত দাঁড়িয়েছিলেন যেন একটা পাথর কেটে খোদাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি পাথরেরই নির্দিষ্ট হাতুড়ি আছে। অস্তগামী সূর্য সামনের দেওয়ালটাকে একটা হলুদ রংয়ের আলোয় রাঙ্গিয়ে তুলেছিল; পাঁউরুটির গন্ধে গাধাটা কান খাড়া করল, লেজের ডগার চুলগুলো উজ্জ্বল আলোয় খোদাই হয়ে যেন খাড়া দাঁড়িয়েছিল।

"দাঁড়াও, অপেক্ষা করতে পারছ না!" খোজা নাসিরুদ্দিন রেগে বললেন, গাধার নাকটা ঝুড়ির কাছ থেকে জোরে ঠেলে দিলেন।

দেওয়ালের আলোটুকু একটা কাল ছায়া যেন শোষণ করে নিল। আগাবেক দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

"হে মহানুভব, হে মহান সম্রাট", একটা পাঁউরুটির টুকরো গাধাটার মুখের সামনে ধরে খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন, "এই দূর গাঁয়ে এর চেয়ে আর কিছু ভাল পাওয়া গেল না। যে সব পাঁউরুটিওয়ালা রাজপ্রাসাদে রুটি করা কখনও দেখেনি তাদের কাছে আর ভাল কি আশা করা যায়! কাঠবাদামগুলো অবশ্য খুব ভাল এবং একটাতেও পোকার গর্ত নেই; বিশ্বাস করি সেগুলো আপনার রুচিসম্মত হবে।"

কাঠবাদাম রুচি সম্মত হয়েছিল, কারণ এক মুহূর্তেই সেগুলো থালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন মহান প্রাণীটা পাঁউরুটির দিকে ফিরল এবং এক

নিশ্বাসেই চারটে খেয়ে নিল। তার খিদে বেড়ে চলল, সে ক্রমাগত বেশি খেতে চাইল; খোজা নাসিরুদ্দিনের ভুরু কোঁচকাল ও তিনি রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন।

অস্তগামী সূর্যের আলোয় পড়া ছায়াটা নড়ে উঠল।

পিছনে খসখস শব্দ শুনলে যেমন হয় সেভাবে খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মুখে ভয় ও বিহ্বলতার একটা ছায়া পড়ল। ইচ্ছা করে বিশ্রীভাবে তিনি গাধাটাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন; গাধাটা তখন একটা রুটি খাচ্ছিল, আধখানা তখনও মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল।

আগাবেক পা ফেলে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন এবং কঠিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চেয়ে রইলেন।

গাধা কিন্তু তখনও চিবাচ্ছিল; মুখের মধ্যে চিবান রুটিটা সে বেশ তাড়াতাড়ি মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিল।

"আচ্ছা," টেনে টেনে আগাবেক বললেন, আগের মত কাজীর মেজাজে এমন-ভাব দেখালেন যেন তিনি সব বোঝেন, আসলে কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। "ঝুড়ি ঝুড়ি পাঁউরুটি ও কাঠবাদাম নিয়ে তুমি কি কর এখন বুঝতে পারছি!"

"আমি……আমি কিছুই করি না," তোতলাতে তোতলাতে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমি খাবার হিসেবেই ব্যবহার করি।"

"খাবার জন্য ব্যবহার কর!" দাড়ি দুলিয়ে ও মুখ ভেঙ্গিয়ে আগাবেক বললেন। "দু ঝুড়ি পাঁউরুটি ও দু ঝুড়ি কাঠবাদাম প্রতিদিন!" খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন যার অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি গোপন ও পাপ কাজের গন্ধ পেলেন। "সত্যি বল, আমি নিজে দেখেছি—তুমি তোমার গাধাকে পাঁউরুটি ও কাঠবাদাম খাওয়াচ্ছিলে।"

"চুপ!" পিছনে সরে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন এবং তাঁর মাথাটা আগাবেকের কাঁধের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিলেন যেন দাঁতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। "খোদার কসম, হে মহামান্য প্রভু, এ ধরনের বাজে কথা বলবেন না; এখানে এসব বলা অভদ্রতা।"

"অভদ্রতা? চোপ রাও! সামনে একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে, আমি একটা গাধা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি এটাকে গাধাই বলব।"

"তিনবার বললেন ? হে অলৌকিক শক্তি ! চলুন আমরা বাইরে যাই এবং দরজার বাইরে নিভৃতে কথা বলি।"

"আমরা কি এখানে নিভৃতে নেই ? নিশ্চয়ই তুমি গাধাটাকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ধরছ না ?"

"আবার, হে দয়াময় আল্লা ! চলুন হুজুর বাইরে যাই, আসুন।"

তিনি এক রকম জোর করেই আগাবেককে বাইরে নিয়ে এলেন এবং দরজা বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হল।

"আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। এটা অত্যন্ত গোপনীয় যার সঙ্গে এই পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা লোকও জড়িত।"

"খ্যাতনামা লোক ? যদি তাই হয় তবে তুমি আমাকেও গোপন কথা জানাতে পার, কারণ আমিও তাদের একজন।"

"আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে ; বাস্তবিক এখানে, চোরাকে, আপনি একজন বিরাট লোক কিন্তু যাদের কথা বললাম তাদের সঙ্গে যখন তুলনা করি তখন আপনি একটা মাছি মাত্র, ঠিক হল না একটা পিঁপড়ে······"

"কি আমি একটা পিঁপড়ে ! এই ধরনের কথা বললে তোমার জিভ টেনে তিনটে গিঁট বেঁধে দেব।"

"আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু এমন হতে পারে আমি যার কথা বলছি তাতে রাজ-সেলামির প্রয়োজন······"

"রাজ-সেলামি ?" আগাবেক বললেন, অধৈর্যের হুঁকা যেন জ্বলছিল আর তার ধোঁয়াটা বুকে এসে লাগছিল। "তুমি আমার চাকর—আমার কাছে কোন কিছুই গোপন করবে না।"

খোজা নাসিরুদ্দিন মাথা নিচের দিকে করলেন যেন এটা ফেটে দু টুকরো হয়ে দুটো বিপরীত আবেগের মাঝে ঝুলছিল।

"আমি কি করব ? একদিকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে তাঁর গোপন কথা জানা অত্যন্ত অন্যায় হবে—আমার বাবা এইভাবেই উপদেশ দিতেন······"

"তিনি ঠিকই উপদেশ দিতেন। মনে হয় তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত মানুষ।"

"অন্যদিকে অত্যন্ত গোপনীয়—শক্তিশালীর ক্রোধ, সাংঘাতিক ক্রোধ যা আমাদের দুজনকেই ভস্মে পরিণত করতে পারে।"

"আমি কাউকে বলব না।"

"যদি শপথ নিতে অনুরোধ করি তবে সেটা অবাধ্যতা বলে মনে করবেন না।"

"এই পৃথিবী থেকে মুক্তির নামে আমি শপথ নিচ্ছি।"

আগাবেক খোজা নাসিরুদ্দিনের খুব কাছে সরে এলেন যাতে গোপন কথাটা শুনতে পান।

খোজা নাসিরুদ্দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্য এর সময় এখনও হয়নি, অর্থাৎ ফল এখনও পাকেনি; ফলটা আরও কিছুদিন এইভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

আগাবেক যতই পীড়াপীড়ি করুন না কেন, খোজা নাসিরুদ্দিন জিদ বজায় রাখলেন। এক সপ্তাহের আগে নয়; তার আগে তিনি বলতে পারেন না, এমন কি এই জায়গা থেকে হ্রদের রক্ষকের চাকরী ছেড়ে চলে যেতে হলেও না।

"এই জায়গা ছেড়ে যাবে? কেন? আরে না, না!" আগাবেক ভয়ে ভয়ে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জুড়লেন, "তাই যদি হয় তবে আমি অপেক্ষা করব!"

রহস্যে আবৃত হয়ে তিনি আরও জোরে আসন গেড়ে বসলেন।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

সব কিছুই অতিবাহিত হয়, সবকিছু; ঢাক বাজে এবং হাট নিস্তব্ধ হয়ে যায় —আমাদের জীবনের আনন্দ-মুখর ব্যস্ত হাট। ব্যর্থতা ও ক্ষুদ্র ইচ্ছার বিপনি একের পর এক বন্ধ হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সারি সারি দোকান, আশার চক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মেলা খালি হয়ে পড়ে; চারদিক নিঝুম হয়ে পড়ে, নিঝুম ও জনশূন্য এবং আকাশ তার বিষণ্ণ ও বিদায়ী আলো নিয়ে আসে জমির উপর—সন্ধ্যা হয়ে আসে, লাভ, লোকসান খতিয়ে দেখার সময় হয়ে এল। বরং বলা চলে শুধুই লোকসান, কারণ এই গল্পের দুঃখ-কাতর গ্রন্থকার সত্যের অপলাপ না করলে কিছুতেই গর্ব করে বলতে পারবেন না যে জীবনের হাট থেকে লাভের অংক দিয়ে তাঁর টাকার থলি ভরিয়ে তুলেছেন।

পৃথিবী তার নিজের পথে গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে; মুহূর্তে এসে মেশে মুহূর্ত, মিনিটে মিনিট, ঘণ্টায় ঘণ্টা—গড়ে ওঠে এক বিরাট বন্ধন দিনের, মাসের এবং বছরের—কিন্তু আমরা, দুঃখ-কাতর গ্রন্থকাররা তাকে আটকাতে পারি না, এই চলন্ত বন্ধন থেকে স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই সঞ্চয় করতে পারি না—স্মৃতির

সেই ক্ষীণ রেখাগুলো যেন গলে যাওয়া বরফের উপর খোদাই করা আছে। তিনিই সুখী ও ভাগ্যবান যিনি জীবন-সায়াহ্নে দেখবেন এই ক্ষীণ রেখাগুলো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি; কারণ যে দিন চলে গিয়েছে তার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ তিনি পান তাঁর দ্বিতীয় যৌবন, প্রথম যৌবনের অশরীরি কল্পনা বিলাস। তাঁর মুখের বলি রেখা মুছে ফেলতে অথবা তাঁর দেহের মাংস পেশীতে শক্তি জোগাতে, তাঁর পদক্ষেপে ক্ষিপ্রতা আনতে বা তাঁর গলার স্বরে অনুনাদ আনতে এই কল্পনাবিলাস অসমর্থ; এর রাজত্ব হচ্ছে কেবল আত্মা। কখনও কি কোন বুড়ো মানুষ দেখেছেন যার চোখ ছুটো পরিষ্কার উজ্জ্বল? এ হচ্ছে আত্মার মধ্যে ফিরে পাওয়া যৌবন, যেন আপনার দিকে চেয়ে আছে; নিভে যাওয়া তারার আলোর মত এ যেন অতীত থেকে ফিরে পাওয়া চুম্বন; এ হচ্ছে কোন তারের দীর্ঘ অতীতে ভুলে যাওয়া প্রতিধ্বনি, যে তার এখন আর বাজে না এবং যে প্রতিধ্বনি দীর্ঘ পথ ঘুরে শেষে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আমরাও কি ক্ষতি ও যন্ত্রণার বিনিময়ে আশীর্বাদ পাব? যৌবনের ছাপ কখনও যেন আমাদের মনে বিকৃত না হয় যাতে জীবন-সায়াহ্নে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসে চিনে নিতে পারে সেই ঘর যে ঘরে একদিন সে বাস করেছিল। পৃথিবীতে এক দেশ আছে যার নাম কারখানা, হৃদয়ের সোনালি স্বপ্নের দেশ, যে দেশ পরিত্যক্ত হলেও কখনও যাকে ভোলা যায় না! এ হচ্ছে তার স্মৃতি, হৃদয়ের তন্ত্রীতে খোদাই করা তার ছাপ—তার জলন্ত সূর্য, বিচিত্র বর্ণের হট্টগোলে ভরা বাজার নিয়ে তার সহর, সবুজ বাগানের মাঝে ডুবে থাকা তার গ্রামগুলো, বরফে আচ্ছন্ন চারপাশে মেঘে ঢাকা তার পাহাড়ের চূড়াগুলো, বরফ জলে ভরা দুরন্ত ছোট নদীগুলো, তার মাঠ, হ্রদ এবং বালির স্তূপ, স্বচ্ছ পাথরের পাথায় ভর করা প্রত্যুষ, জলন্ত উচ্ছ্বাসে সমুজ্জ্বল সূর্যাস্ত, তার আলোকিত রাত্রি, ধোঁয়ায় ভরা তার সরাইখানা, তার রাস্তা, মনে হত যাদের প্রত্যেকটিই নিয়ে যেত আরামের পথে—আনন্দে মুখরিত সেই আশ্চর্য দেশ······এ সবই হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। আমি কি কোন দিন ফিরে এসে আবার এসব দেখতে পাব? কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বোঝাপড়ার—দ্বিতীয় যৌবনের। আমরা কোন দিনই ফিরে আসব না কিন্তু তাকে জয় করব······

স্মৃতির বেদনাদায়ক রোমন্থন থেকে এবার আমাদের সরে আসা যাক তা না হলে আমরা কি ছু'বার বার্ধক্যকে অনুভব করব—একবার সাময়িকভাবে, অন্যবার বাস্তবে? আমাদের হাতে বেশি দিন সময় নেই যাতে বর্তমানের

পরিবর্তে ভবিষ্যৎ নিয়ে অদূরদর্শীর মত সময় কাটাতে পারব। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু সূর্যাস্ত এখনও অনেক দূরে; বাজার এখনও ব্যস্ত এবং কোলাহল মুখর, দোকানগুলো এখনও কেনাকাটা চালিয়ে যাচ্ছে, দোকানের সারিগুলো মানুষে ভর্তি, চক মানুষের গুঞ্জনে পরিপূর্ণ, ভিস্তিওয়ালাদের চীৎকার মিশে গিয়েছে ভিখারীদের কাতরানি ও দরবেশদের মন্ত্রের সঙ্গে। গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, উটের গর্জন, ঘোড়ার খুরের খটখট, নর্তকীদের ঝনঝন এবং ভাঁড়েদের তম্বুরার শব্দে আকাশ বাতাস ভরে গিয়েছে। খাবারের দোকানগুলো ধোঁয়ার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, স্বর্ণ রেশমের কাপড়, মখমলের ঢেউ এবং দামী কার্পেটে ঝলমল করছে—বাজারের কোন শেষ নেই, শেষ নেই এর ঐশ্বর্যের!

যে দোকানদার তার জিনিসের গুণাগুণ নিয়ে নিশ্চিন্ত তার অবশ্য ভাল। তার শঠতার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই, রং করার বা খদ্দেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে বোকা বানাবার বা জিনিসের ভালটা খদ্দেরকে দেখিয়ে খারাপটা কাউন্টারের নিচে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই; এবং ক্রেতার পক্ষেও ভাল যে, সে তার বোঁচকার ভিতর টাকার ভারী বোঝাটা সব সময় অনুভব করে। কিন্তু জীবনের কোলাহল মুখর বাজারে সে কি করবে যেখানে ব্যবসার সামগ্রী হচ্ছে মূল্যবান অনুভূতি ও আবছা স্বপ্ন এবং সোনা ও রূপোর টাকার বদলে তার থলি সন্দেহ ও নির্বোধ প্রশ্নে ভর্তি, যথা—সব আরম্ভের প্রথম আরম্ভ কোথায় বা সব শেষের শেষ কোথায়, অস্তিত্বের অর্থ কি, পৃথিবীতে অন্যায় কাজের উদ্দেশ্য কি এবং অন্যায় ছাড়া সৎ কাজ চেনাই বা যাবে কি করে? যে ব্যবসায়ে লিপ্ত নয়, কেনাকাটা বা দর হাঁকাহাঁকি যে করে না তার কাছে এসব জিনিস বা মুদ্রার প্রয়োজন কি, কি-ই বা প্রয়োজন তাদের কাছে যারা টানাটানি করে হাঁকায়, বিক্রী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে, চীৎকার ও আর্তনাদ করে, ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে; সুযোগ বুঝে হতভাগ্য নির্বোধকে প্রতারণা করা মোটেই অন্যায় নয়। এ ধরনের মানুষ নিজের লাভ রেখে কিছু বিক্রী করে না বা কেনে না—তার স্থান হচ্ছে ভিখারী ও দরবেশদের মাঝে।

মনে হয় আমরা এখনও সরাইখানায় বসে আছি জীবনের চিন্তায় বিভোর হয়ে—সেই দুঃখে ভরা সরাইখানা যেখানে মানুষ পান করে অসম্ভব আশার পাত্র থেকে, ধূমপান করে দীর্ঘসূত্রতায় ভরা অনুতাপের হুঁকা থেকে। আসুন, বাজারে চলুন! হে রক্ষক, তোমার বিস্বাদ চায়ের দাম নাও; তোমার সরাই-খানায় না এলে বা তোমার বিস্বাদ চা পান না করলেই ভাল হত; বরং তাতে

আমাদের মুখের বলিরেখার সংখ্যা কম হত! তাড়াতাড়ি বাজারে চলুন, চীৎকারে ও ধুলোতে, ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে, বিচিত্র বর্ণের, শব্দের ও গন্ধের সমাবেশে, যার আবর্তে ব্যবসার এই যন্ত্র ঘুরছে। এই ভিড়েই সেই এক-চোখো চোরকে খুঁজে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক তাকে খোজা নাসিরুদ্দিন যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা সে কেমনভাবে করছে।

ন্যায়পথে চার হাজার টাকা! ন্যায় পথে টাকা! সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হয়ে এক-চোখো চোর কোকান্দের বাজারে দু দিন ধরে পায়চারী করছে। তার চারপাশে শয়ে শয়ে, না, হাজারে হাজারে টাকার থলি রয়েছে। কোকান্দের অলস হাঁ-করা লোকদের পকেট বা বোঁচকায় লুকিয়ে থেকে তারা তার নিপুণ হাত দুটোকে যেন লোভ দেখিয়ে ইশারা দেখাচ্ছিল, তার হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল এমন কি মনে হচ্ছিল যেন অল্প অল্প মোচড় দিচ্ছে এবং চাপা গলায় বলছে, "আমাদের নাও! খোদার কসম খেয়ে বলছি—এই সংকীর্ণ কারাগার থেকে আমাদের মুক্ত কর; আবার যেন সূর্যের আলোয় শুয়ে থাকতে পারি—এর কল্যাণময় আলোকে আমাদের সোনা ও রূপো তখন কত উজ্জ্বল হয়ে আনন্দে ঝলমল করে উঠবে!" হয়ত এক-চোখো চোর টাকার একটা থলি নিয়ে নিতে পারত, হাতের বেশ সহজ প্যাঁচেই নিতে পারত যখন পরে এর মালিক রঙীন সিল্কের পোশাক ও লাল-ফিতা সমেত মাথার টুপি পরে কোন রকম সন্দেহ না করে বাজারের মধ্যে অনেকক্ষণ দিব্যি চাঁদের মত ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন জিনিষের দাম জিজ্ঞাসা করার পর কোন একটা জিনিষ কিনে দাম দিতে গিয়ে টাকার থলি খুলে বড় বড় চোখ করে ও দাঁত কপাটি লাগিয়ে দেখত যে একটা ময়লা ছেঁড়া কম্বলে মুড়ি দিয়ে পাথরের নুড়ি রাখা আছে। এ ধরনের হাতের প্যাঁচ এক-চোখো চোরের পক্ষে অত্যন্ত পুরোনো ও সোজা কিন্তু সে যে কারণে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তা হচ্ছে টাকা হতে হবে ন্যায়সংগত। এ যেন কাউকে শুকনো জল বা ঠাণ্ডা আগুন আনতে বলা!

সে একটা চীনা দোকানের সামনে অনেকক্ষণ পায়চারী করতে করতে নিজের মনে এই বলে যুক্তি দেখাতে লাগল যে অন্যান্য টাকার চেয়ে চীনা টাকাকে কেন বেশি যুক্তিসংগত বলা হবে। মাথায় সুসজ্জিত পাগড়ী ও তাতে একটা সোনালি পালক লাগানো এক ভারতীয়ের পাশে আনাগোনা করে তার ভাগ্য ফিরল না। ভারতীয়ের কাছ থেকে সে কাল দাড়ি-ওয়ালা এক পাহাড়ীর কাছে এল যে সোনার গুঁড়ো বিক্রী করে; সোনার গুঁড়ো সে অন্ধকার খাদ

থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে ; পাহাড়ের উঁচু মেঘ, বরফ ও হিমবাহের মাঝখান দিয়ে এই খাদ চলে গিয়েছে ; এই সোনা পাহাড়ীর কাছে নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত —সুতরাং চোর না থেমে তার দিকে এগিয়ে গেল।

তার মন খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল এবং সে একটা থলিতেও হাত দিতে পারল না। খোজা নাসিরুদ্দিনও কাছে ছিলেন না যে উপদেশ দেবেন। এইসব অবিবেচনার বোঝার নিচে যখন তার চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছিল তখন দূরে সে মোটা মুদ্রা-বিনিময়কারীকে দেখতে পেল ; তিনি কাউন্টারে বসে এক আরব বণিকের কাছ থেকে রূপোর টাকা গুণে নিচ্ছিলেন।

ন্যায়সংগত টাকা—এইখানে তবে আছে ! খোজা নাসিরুদ্দিন নিজেও এখান থেকে টাকা নিতে নীতির দিক থেকে ইতস্ততঃ করেননি। যদি এ টাকা একবার ন্যায়সংগত হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয়বারই ন্যায়সংগত হবে না কেন ? "আমি আর কোথাও যাচ্ছি না," চোর মনে মনে বলল ও উল্টো দিকের একটা সরাইখানায় ঢুকে এবং সেখানে বসে বণিককে লক্ষ্য করতে লাগল।

তার ভাগ্য ছিল ভাল—বাজার শেষ ঘোষণা করে ঢাকের আওয়াজ হবার আগেই বণিক দোকান বন্ধ করলেন এবং একটা মোটা ভারী থলে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললেন।

চোর তাঁর পিছনে গুড়ি মেরে চলল।

বাজার সূর্যের দিকে খোলা থাকায় শুকনো নিশ্বাস বন্ধ করা গরমে ভর্তি ছিল। ভীষণ ভাবে ঘামতে ও হাঁসফাঁস করতে করতে মুদ্রা-বিনিময়কারী একটা গলিপথের দিকে বাঁক নিলেন যেটা ছিল ধনীদের আবাসস্থল এবং ফাঁকা দেওয়ালে ওয়ালনাটের দরজা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। এখানে সেখানে কাঠবাদামের গাছ থেকে সোনালি ফল ঝুলছিল অথবা আঙুরের খেত থেকে কচি কচি শাখাগুলো ঝুলছিল ও সূর্যের আলোয় সবুজ হয়ে জ্বলছিল। দূরের বাজারের চীৎকার ও গুঞ্জন কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং একটা গভীর শান্তি এখানে বিরাজ করছিল ; মেয়েদের অকারণ চীৎকার ও ছেলেদের কান্নায়—যা গরীব বস্তিগুলোতে হামেশাই দেখা যায়—এখানকার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল না। এমন কি বেড়ার নিচে জল এখানে একটা ভীরু গুঞ্জন তুলে বয়ে যাচ্ছিল এবং প্রধান নালা থেকে কঠোর পাত্রে করে তোলবার সময়ও থলথল শব্দে কোন আবর্ত না তুলে হালকাভাবে বয়ে যাচ্ছিল।

একচোখো চোর কোকান্দ ভালভাবেই চিনত কিন্তু এই গলিপথে কখনই

আসেনি। সমস্ত বাঁক ও মোড়গুলো সে ভালভাবেই লক্ষ্য করল। তারা একটা পুরোনো মসজিদের পাশ দিয়ে একটা সরু ভাঙ্গা কাঠের সেতু পেরিয়ে এল ; পরের বাঁকেই রাস্তা শেষ হয়ে এল ; দূরে সবুজ গাছপালার মাঝে একটা কবরখানা দেখা যাচ্ছিল। এইখানে চারপাশে গাছে ঢাকা একটা সেতুর ঠিক উল্টো দিকে মুদ্রা-বিনিময়কারীর বাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল।

লোহার একটা গোল আংটা দিয়ে মুদ্রা-বিনিময়কারী দরজায় আঘাত দিলেন। একজন বুড়ো লোক দরজা খুলল। "একজন চাকর," চোর লক্ষ্য করল। "এক জন না অনেক ? বসে দেখা যাক।"

সে সেতুর উপর একটা ছায়ার নিচে শুয়ে পড়ল ও মাথার টুপিটা মুখের উপর রেখে ঘুমাবার ভান করল।

তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সূর্য তখন স্থান পরিবর্তন করেছে এবং আলোর চওড়া রেখা নিচু হয়ে জলাশয়ের সবুজ গভীরে এসে পড়ল যেখানে অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণী ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—লক্ষ লক্ষ ছোট প্রাণী এবং গুঁড়ো গুঁড়ো আলোর টুকরোকে যেন মহাশূন্য থেকে নিয়ে এসেছে হলুদ রংয়ের এই সূর্যের কিরণ।

একচোখো অপেক্ষা করছিল। ধৈর্য হচ্ছে তার উপজীবিকার প্রধান গুণ। প্রয়োজন হলে সে একটা বিড়ালকে অনুকরণ করতে পারে যে কখন কখন ইঁদুরের গর্তের মুখে সারারাত বসে থাকে এমনকি গোঁফটাকে একটুও মোচড় না দিয়ে।

তার ধৈর্য পুরস্কৃত হল। কোঁচ করে শব্দ হল ও দরজা খুলল। সে মুদ্রা-বিনিময়কারীকে দেখতে পেল। তার হাতে এবার টাকার থলি ছিল না কিন্তু রেশমের কোমরবন্ধনী উরু পর্যন্ত ঝুলছিল ; টাকার ভারে দুই দিকেই ঝুলে পড়েছিল।

মুদ্রা-বিনিময়কারীর পিছনে চোর একজন মেয়ের অনাবৃত মুখ দেখতে পেল—বড় বড় কাল চোখ, পুরু কাল ভুরু এবং চুলের লম্বা বিনুনি। চোর অনুমান করল যে সে সুন্দরী আরজি-বিবি, মুদ্রা-বিনিময়কারীর স্ত্রী। তার মনে পড়ল গরীব বিধবার কথা যে তার সমস্ত ধনরত্ন হারিয়েছে, রাজপুরুষ ও তার দোদুল্যমান আকর্ষণীয় গোঁফের কথা, মনে হবে গোঁফের তীক্ষ্ণ খোঁচা দুটোতে অসংখ্য রমণীর হৃদয় আটকান আছে।

নিশ্বাস বন্ধ করে চোর শুনল।

"তুমি কখন ফিরে আসবে ?" রাগের স্বরে আরজি-বিবি তাঁর স্বামীকে

মত নরম গলায় গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। "আমি কি আজও গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং তোমার কিছু হয়েছে কিনা এই ভেবে উদ্বেগে থাকব?"

"আমার কি হতে পারে?" মুদ্রা-বিনিময়কারী উত্তর দিলেন। আমি ভখিরের সঙ্গে পাশা খেলতে যাচ্ছি। গতবার সে আমার কাছ থেকে তিনশো সত্তর টাকা জিতেছিল এবং আমার ইচ্ছা টাকাটা উদ্ধার করি।"

"তার মানে আবার রাত পর্যন্ত খেলা!" তিনি অবাক হয়ে বললেন। "আল্লার দিব্যি তোমার পাশা আমাদের ভিখারী করবে। যাও, আমার একা অবহেলায় থাকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একটা সন্ধ্যাও তুমি আমার জন্য রাখতে পার না, একটা সন্ধ্যাও না।"

পরের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, কেমন করে মোটা বিরক্তিকর স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবেন এই চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তিনি সারাদিন করেননি; কিন্তু কে আর তাঁর চোখের জলের শব্দ ও তাঁর গলার নিভৃত ঈর্ষা অনুভব করে নিজের মনকে অপ্রয়োজনীয় সন্দেহে ভরিয়ে তুলতে সাহস করবে।

"পাশা, ঘোড়া, বাজার—কিন্তু আমার জন্যে······আমার জন্যে তোমার নিষ্ঠুর হৃদয়ে কোন স্থান নেই!" অত্যন্ত বেদনার স্বরে তিনি বললেন; তাঁর এই বলা সত্যিকারের হতে পারে, কারণ নিজের বা স্বামীর কাছে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করার ক্ষমতা মেয়েদের আছে, এ এক অদ্ভুত অবস্থা যা তাদের শঠতাকে শক্তি জোগায়।

দরজা লাগিয়ে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

মুদ্রা-বিনিময়কারী জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন, হাতের রুমাল দিয়ে মুখ ও মোটা কাঁধের পিছন দিকটা মুছলেন, পুরু ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নাড়লেন যেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা মনে মনে ভাবছেন, পরে খানিকটা রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ভখিরের বাড়ীর দিকে চললেন তাঁর আগের হারানো তিনশ সত্তর টাকা উদ্ধার করতে।

এতক্ষণ চোরটা তার শরীরের কোন অংশ নাড়ায়নি, এমন কি এক সেকেণ্ডের জন্য তার কপট নাক ডাকা থামায়নি—কিন্তু সেই সময় কেউ যদি তার টুপিটা সরিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে উঁকি মেরে দেখত তবে ভয়ে অবাক হয়ে পিছিয়ে আসত, "একি দেখছি? শয়তান ছাড়া অন্য কারও চোখে কি এত তীব্র হলুদ রংয়ের আলো জলতে পারে?" একচোখোকে আবার আগের রোগে ধরল, চুরির চিন্তাগুলো আবার তার মনে দপ করে জলে উঠল এবং পাহাড়ে জুলাই

মাসের বিদ্যুতের মত একের পর এক খেলে গেল। চামড়ার থলেটা তাহলে বাড়ীতেই আছে! কোথায় লুকানো আছে? বাড়ীটা কি একবারও পাঁচ মিনিটের জন্য খালি ছিল?

দরজা আর একবার খুলল। দুজন রাস্তায় নেমে এল—সেই পুরোনো দারোয়ান যাকে চোর আগেই দেখেছে এবং তার পিছনে আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে এবং পা টানতে টানতে অল্প বয়সের আর একজন চাকর যার চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, চুল উসকো খুসকো এবং হাতে একটা রঙ্গীন চীন দেশীয় মাটির কলসী।

"এখন বলছেন কিনা টাটকা খেজুর চাই," অভিযোগ করে বুড়ো লোকটা বলল; একটা লাউয়ের খোলের তৈরি নস্যির বাক্স বার করে বেশ অনেক পরিমাণ নস্যি হাতের তালুতে নিল; নস্যি হচ্ছে তামাক, চূর্ণ ও অন্যান্য ওষুধের মিশ্রণ। "যাও এবং নিয়ে এস যেখানে পাও!" মুখ খুলে জিভের নীচে নস্যিটা ঢেলে দিল সুন্দরভাবে হাত নাড়িয়ে। "শয়তান যেন তাকে ও তার খেজুরকে এক সঙ্গে গ্রাস করে! আমি কোথায় খুঁজে পাব?" সে অনেকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত বলতে লাগল শুধুমাত্র ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে, কারণ তার জিভটা তখন মুখের ভিতর নস্যিটাকে চাপ দিতে ব্যস্ত ছিল।

"আমাকে ভারতীয় শরবৎ আনতে পাঠিয়েছেন," ছোকরা চাকরটা ঘুমের ঘোরে নাকি সুরে বলল তার চোখ দুটো হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে। "লোকে ঘুমাতেও পাবে না!"

গাছের ডালে বসে থাকা একটা ভোমরাকে উদ্দেশ্য করে বুড়ো লোকটা সবুজ থুতুর ধারা পিচ কেটে ফেলল. কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হল। ভোমরা উড়ে গেল।

"কি করতে হবে বলছি," বুড়ো লোকটা বলল, "চল কোন সরাইখানায় গিয়ে বসা যাক, পরে আলাদা আলাদা বাড়ী ফিরে বলব যে কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"তুমি বসে থাকবে আর আমি ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেব!" অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয় চাকরটা বলল।

এই বলে তারা দুজনে চলে গেল।

চোর তাদের কথাগুলো প্রায় হজম করে এনেছে এমন সময় দরজা আবার খুলল এবং মুখ খুলে দুজন ঝি রাস্তায় নেমে এল। তারা খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখীর মত ছুটে চলল এবং হেলেদুলে আনন্দ করতে করতে চলল যেন তাদের ছোট্ট প্রবালের মুখের ভিতর মুক্তোর মত সাদা দাঁতের পিছনে দশটা জিভ আছে। মুখটা বিকৃত করে চোর সব শুনছিল।

"তিনি তাঁর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন," প্রথম জন পাখীর মত কিচির মিচির করে বলল। "তাঁর যে এমব্রয়ডারী করে তার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন যেন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না, কাল তাঁর যে এমব্রয়ডারী করে সে নিজেই এখানে আসবে।"

"আমাকে পাঠিয়েছেন আরব চকে, যে লেস তৈরি করে তার কাছে," দ্বিতীয় জন বলল। "হঠাৎ লেসের এত দরকার কেন বুঝলাম না।"

"বুঝলে না? কামিলবেককে ভুলে গিয়েছ?"

দুজনেই খিল খিল করে হেসে উঠল, পরে হাসিতে ফেটে পড়ল; তাদের তরুণ চোখে যেন হাসি ঝলক মারছিল।

"আমার মনে হয় আমাদের কোথাও যাওয়া উচিত হবে না," প্রথম ঝি ভেবে বলল। "আমার কাকীমা কাছেই থাকে—চল তার কাছে যাই। আমরা ঘণ্টা দুয়েক গল্প গুজব করব, পরে একটি ওজর বার করে নেব। উনি একাই থাকুন।"

"খালি ঘরে—ঠিকই হবে!"

একা! কথাটা চোরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিহরণ তুলল। একা! যদি তাকে লোভ দেখিয়ে বাড়ী থেকে সরান যায়!

ঝি দুটোর গলার স্বর দূরে মিলিয়ে গেল।

পরে, হঠাৎ······চোরের দম বন্ধ হয়ে এল।

আর একবার দরজা খুলল।

বাস্তবিক এদিন ছিল চোরের পক্ষে সৌভাগ্যের দিন। বাড়ীর কর্ত্রী আরজি-বিবি স্বয়ং এলেন।

চোর নড়তে বা বিশ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছিল। সে প্রায় বিশ্বাসই করতে চাইছিল না যে তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

আরজি-বিবি চারদিকে চাইলেন। তিনি চোরকে দেখতে পেলেন না। বোরখার সামনের পর্দাটা ঝুলিয়ে দিলেন যাতে তাঁর মুখ ঢাকা থাকে এবং দরজায় তালা দিলেন, পরে তাঁর পূর্ণ নিতম্ব অল্প দোলাতে দোলাতে সোজা বাজারের দিকে দ্রুত হাঁটলেন।

চোর কনুইয়ে ভর দিয়ে অল্প উঠল, পরে তার হলুদ রংয়ের চোখ থেকে তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল।

এখনই হচ্ছে সময়! রাস্তা নির্জন, বাড়ী খালি। আল্লার মহিমা প্রশংসিত

হোক, তিনি সর্বশক্তিমান! প্রার্থনা করি হে আল্লা, আপনার রক্ষণাবেক্ষণের আবরণ যেন আমাকে ঘিরে থাকে—এগিয়ে চল! চোর দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। হে পয়গম্বর মোহাম্মদ, হে ধর্মের আশ্রয়—সামনে! এক সেকেণ্ডের মধ্যেই চোর পাঁচিলের উপর। আর এক সেকেণ্ড, সে উঠোনে।

সে দাঁড়িয়ে শুনল। কোন চীৎকার নেই। কেউ তাকে দেখেনি।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

সে যুগের প্রথা অনুযায়ী বাড়ীর দরজা ও জানালাগুলো বাগানের দিকে মুখ করে থাকত। জানালাগুলোতে ঝিলিমিলি ছিল এবং ভিতর থেকে খিল লাগান ছিল এবং দরজায় ঝুলছিল এক বিরাট তালা। কিন্তু পৃথিবীতে কি এমন কোন তালা বা খিল আছে যা কুশলী চোরকে ফাঁকি দিতে পারে? হাতে একটা ঝক-ঝকে ছুরি নিয়ে ঝিলমিলির শেষ প্রান্ত দিয়ে সে গলিয়ে দিল এবং উপরে চাপ দিয়ে নিচে চাপ দিতেই খট করে শব্দ করে ঝিলমিলি খুলে গেল।

তার লক্ষ্যবস্তু চামড়ার থলির পথ এখন মুক্ত!

জানালার চওড়া নিচু চৌকাঠ পেরিয়ে চোর ঝিলিমিলি ভেজিয়ে দিল কিন্তু বন্ধ করল না। প্রয়োজন হলে সে যেন সহজে পালাবার পথ পেতে পারে।

সে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এল। ছাদের ছিদ্র থেকে আলোর তীব্র রেখা পিছনের দেওয়ালে সোজা এসে পড়ছিল যেখানে একটা তুরকী কার্পেটের রঙীন নকসা খোদাই করা ছিল। গাদা গাদা সিল্ক ও সাটিনের বিছানার ঢাকা কুলঙ্গিতে রাখা ছিল এবং মাঝের একটা ছোট কুলঙ্গিতে রূপো দিয়ে বাঁধানো একটা হুকা রাখা ছিল।

চোর তাড়াতাড়ি সমস্ত কুলঙ্গিগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বিছানার ঢাকা বা কম্বলগুলোর নিচে কোন চামড়ার থলি দেখতে পেল না। সে সিন্দুকগুলোর দিকে ছুটল, প্রত্যেকটির তালা খুলতে, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে ও আবার তালা লাগাতে তার দু মিনিটের বেশি সময় লাগল না। সিন্দুকগুলো মখমল, সাটিন ও রেশমি বস্ত্রে ভর্তি ছিল, কিন্তু চোর তাদের মধ্যে কোন চামড়ার থলি দেখতে পেল না।

সে পরের ঘরটায় গেল, সেখান থেকে তৃতীয় ঘরে। সে প্রতি সিন্দুকের কাছে গেল। সর্বত্র রেশমী বস্ত্র, ভেলভেট, মোরোকো, কিংখাপ। কিন্তু টাকার থলি কোথায়?

আর একটি ঘর। এখানে বাতাস কস্তুরী, অগুরু এবং আতরের গন্ধে পরিপূর্ণ এবং কুলঙ্গিগুলো পিচকারী বোতল, টাকা ও অলংকারের বাক্সে ভর্তি। ছোট ছোট জিনিসগুলো এধারে ওধারে এমনভাবে ছড়ান আছে যে ঘরটা একটা তালগোল পাকানো পাখীর বাসার মত লাগছিল; এক কোণে সিল্কের ঢাকা দেওয়া ছোট কিন্তু চওড়া একটা কৌচ ছিল যার উপরে একটা আয়না অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছিল।

আরজি-বিবির ঘর—চোর অনুমান করল। সে টাকার বাক্সগুলো তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। উঃ কি আনন্দ—তার চোখে সোনায় প্রতিফলিত আলো ঝলক দিয়ে উঠল, মণিমুক্তা চকচক করে উঠল। তখুনি সে সেগুলো চিনতে পারল—দরিদ্র বিধবার ধনরত্ন। সে আনন্দে নেচে উঠল। এর চেয়ে ন্যায়সঙ্গত আর কি হতে পারে!

যা পেয়েছিল তা নিয়ে সে হয়তো সন্তুষ্ট থাকতে পারত এবং সেখান থেকে চলে যেতে পারত, কিন্তু চামড়ার থলিটা খোঁজ করার প্রতিচ্ছবি যেন তার ভিতরের চোখের সামনে একটা লোভ দেখিয়ে তুলছিল। সে কৌচের নিচে এবং পর্দার পিছনে দেখল। উল্টো দিকের কোণে একটা বিরাট সিন্দুক দাঁড়িয়েছিল। এটা কি জন্যে এখানে রাখা আছে। এমনকি তালা দেওয়া নেই। চোর ডালাটা খুলে ফেলল। একটা ছেঁড়া পালক-ভরা বিছানা ছাড়া কিছুই নেই। নিপাত যাক! আর কোথায় সে দেখবে? চিমনিতে? সত্যি, সে চিমনিগুলো দেখতে পারত এবং দেওয়ালগুলো টোকা মেরে মেরে দেখতে পারত যতক্ষণ না সেই থলিটা পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই মুদ্রা-বিনিময়কারী ভেল্কি দেখিয়ে টাকার থলিটা অদৃশ্য করেননি, সে থলিটা দেখে নিয়ে নিতে পারত……

উঠোন থেকে তালা খোলার একটা শব্দ এল, সেই সঙ্গে দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। আরজি-বিবি ফিরে এসেছেন! আর একবার তালার শব্দ হল—এবার বেশ কাছে। সামনের দরজা!

পালাও! কিন্তু কোথায়? সমস্ত কৌশল জানলেও একটা দেওয়াল ভেদ করে ঘর থেকে পালানর উপায় চোর শেখেনি। পালিয়ে যাবার জন্য যে দরজার খিল খুলে রাখা হয়েছিল সেটা এখন অনেক দূরে এবং বাড়ীর অন্য প্রান্তে।

সিন্দুক—সেখানেই আছে তার নিরাপত্তা!

সে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল, শব্দ না করে ডালাটা লাগিয়ে দিল এবং চুপ করে বসে রইল।

আগে অনেকবার এভাবে সিন্দুকের ভিতর সে বসেছে এবং একটা বিশ্বাসের ভাব নিয়ে ভিতরে বসে থাকতে সে অভ্যস্ত। ভিতরে বেশ আরাম করে বসল এবং পা দুটো ছড়িয়ে দিল। পকেটে হাত দিল—মণিমুক্তাগুলো ঠিক ভাবেই আছে।

একটা হাই তুলে বেশ কিছুক্ষণ সিন্দুকের ভিতর বসবার জন্ম তৈরি হল।

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ। গলার স্বর। দরজা খোলা হল। কর্ত্রী সুন্দরী আরজি-বিবি ভিতরে এলেন এবং তার সঙ্গে মানুষ। চোর একটা তিক্ত আনন্দের হাসি হাসল—এঃ, কি মেয়ে!

কিন্তু শোন, মানুষের পায়ের শব্দের সঙ্গে ঝনঝন করে কি যেন শোনা যাচ্ছে? সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেল যখন চোর লোকটির চাপা কিন্তু পরিষ্কার গলার স্বর শুনতে পেল। ইনি হচ্ছেন সেই মহান রাজপুরুষ, সুন্দর কামিলবেক কোতোয়াল প্রধান, তার পদক এবং তরোয়ালই ঝনঝন করছিল।

"অসংগতভাবে ভৎ´সনা করে কি নিষ্ঠুরভাবে তুমি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছ!" কামিলবেক বলে চললেন আগের কথাবার্তার জের টেনে। "বার বার বলছি—আমার হৃদয় ও আত্মা তোমারই।"

"মিথ্যা বলবে না!" বাধা দিয়ে আরজি-বিবি বললেন। তাঁর গভীর নরম গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠল। "আমাদের এই শেষ দেখার সময় জীবনে অন্ততঃ একবার সত্যি কথা বলবে।"

"শেষ দেখা? কেন, আমার হৃদয়ের সুন্দরী সুলতানা?"

"তুমি নিজেই জান কেন?"

"অত জোরে নয় অতুলনীয়া আরজি-বিবি! কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে।"

"বাড়ীতে আমরা একা।"

"ঠিক জান?"

"কি ভীতু তুমি!" তিনি বিরক্তির সঙ্গে হাসলেন। "নিজে দেখ!" তাড়াতাড়ি নরম পা ফেলে তিনি ঘরের ভিতর হাঁটলেন। কৌচের পর্দার পিতলের আংটাগুলো ঝনঝন করে উঠল। "দেখ, ওখানে কেউ নেই, তুমি সিন্দুকটা দেখতে পার।"

চোর ভয়ে কেঁপে উঠল।

"ঐ শিশি-বোতলগুলোও একবার দেখতে পার," আরজি-বিবি বিদ্রূপ করে

বললেন। "বাস্তবিক আমি ভেবেছিলাম মাননীয় কামিলবেক অনেক সাহসী। মনে হচ্ছে তুমি একটা ভীতু খরগোশ।"

আঁতে ঘা লাগায় রাজপুরুষ রাগে বড় বড় পা ফেলে ঘরের ভিতর এক কোণ থেকে অন্য কোণে পায়চারী করতে লাগলেন, সমস্ত ঘর পদকের ঝনঝন শব্দে ভরে গেল।

"আমি ভীতু নই, সাবধানী। তুমি নিশ্চয়ই জান কি ভয়ংকর শাস্তি আমাদের দুজনকে পেতে হবে যদি আমরা······"

"যখন আমি ভালবাসি, শাস্তির কথা ভাবি না!" আরজি-বিবি উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন। "ফারখার যখন শিরিণকে পেতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল তখন ভয় পায়নি, মজনু শাস্তির কথা ভাবেনি যখন সে তার লায়লাকে চেয়েছিল। যাইহোক, হিসেবী কিন্তু অতি সাবধানী কামিলবেকের সঙ্গে ফারখার বা মজনুর তুলনা দূরে থাক। আমি তোমাকে অন্য কারণে এখানে ডেকেছি—আমি সত্যি কথা জানতে চাই।"

"আসল সত্যি কথা আমি তোমার কাছে বলার চেষ্টা করছি। যে বিপদ আমাদের দুজনের সামনেই দেখা দিয়েছে তার জন্য তোমাকে সাবধান করতে চাই।"

উত্তেজিত আরজি-বিবি তাঁর কথা শুনলেন না। চুপ করে না থেকে তীব্র ভর্ৎসনা মুখ থেকে বার করলেন, প্রতিটি কথা ছিল ঈর্ষার আগুনে উত্তপ্ত।

"আমি জানতে চাইছি আগে কেন শাস্তির কথা তুমি ভাবনি এবং হৃদয়ের আবেগে আমার কাছে আসতে অভ্যস্ত ছিলে? হঠাৎ তুমি কেন এত ভয় পেলে এবং গত দু সপ্তাহ ধরে আমার কাছে আসনি—পুরো দুই সপ্তাহ? আজ সমস্ত লজ্জা ও ভব্যতা ভুলে গিয়ে আমি নিজে বাজারে গিয়ে প্রহরীদের ঘর থেকে বুড়ো ভিখিরী মেয়েটাকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বল—কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করতে ও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে যেতে সুরু করেছ? যদি আমার স্মৃতিশক্তি লোপ না পেয়ে থাকে তবে বলব আমাদের মিলনে একদিন তুমি অত্যন্ত আনন্দ পেতে। অথবা আমি ভুল বুঝেছিলাম তুমি ভাণ করেছিলে। চুপ করে আছ? ঠিক আছে, আমি নিজেই উত্তর দেব। তুমি আর আমাকে ভালবাস না এবং তোমার কঠিন ও চঞ্চল হৃদয়ে আমার স্থান এখন অন্য কারও দখলে! এই হচ্ছে আসল কারণ। না, কোন ওজর-আপত্তি

দেখাবে না, মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে না—তোমার কাজ তোমার কথার চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার।"

"ও অপূর্ব আরজি-বিবি, তুমি ভুল বুঝেছ! আমার চিন্তা ভাবনায় তুমি হচ্ছ সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ! আমি কি অন্ধ যে তোমার সৌন্দর্য দেখতে পাব না, আমি কি পাগল যে তোমার সঙ্গে দর কষাকষি করব অন্য মেয়ের বদলে?"

"কিন্তু তুমি করেছিলে!"

"আমি নিজের আত্মসম্মান, পূর্বপুরুষদের মর্যাদার কসম খেয়ে বলছি।"

"তবে কেন তুমি আসনি? কারণ কি?"

"তোমার উপযুক্ত স্বামী।"

"আমার স্বামী? সে তো আগেও ছিল, তখন তো কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি।"

"অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া দুটো নিয়ে তার সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথা কি তোমার মনে আছে?

"আমাকে কিছু কিছু বলেছিল, কিন্তু আমার তখন ঘুম পাচ্ছিল, আমি তার কথায় কান দিইনি। আমার তখন বোঝা উচিত ছিল যে আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার মন আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে।"

"আমার কথা শোন। সে সন্দিহান······"

"সন্দিহান? সে?"

"হ্যাঁ। সে আমাদের প্রণয়ের আঁচ পেয়েছে। সে লক্ষ্য করছে। সেই জন্য ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার পর আমি আর আসিনি যদিও বাজপাখী যেমন আকাশের দিকে ছুটে যায় সেইভাবে আমার মন তোমার দিকে ছুটে যেত।"

"কিন্তু ঘোড়া, ঘোড়দৌড় বা আমার স্বামীর এ ধরনের অন্যান্য নির্বোধ কাজকর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? আমাদের প্রেমের সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধ কি?"

দুর্গ প্রাকারে জ্যোতিষীর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল রাজপুরুষ সংক্ষিপ্ত ভাবে তা আরজি-বিবিকে জানালেন।

"তোমার কি মনে আছে কেমন করে তোমার মুখের আবরণ আমার সামনে খুলেছিলে? মনে করছ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই সে তা করেছিল? না সে আমাদের পরখ করছিল। পরস্পর প্রণয়ে উদ্বেলিত হয়ে আমরা একে অন্যের দিকে যখন চেয়েছিলাম, আর সে তখন আমাদের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করছিল, প্রতিটি হৃদকম্পন অনুভব করছিল।"

"অসম্ভব!" আরজি-বিবি বললেন। "তোমার জ্যোতিষী এক নির্লজ্জ

মিথ্যাবাদী। আমি আমার স্বামীকে জানি, আমি তার শঠতা, কৌশল ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। সে গোপনে আমাকে লক্ষ্য করছে? কেন, যদি সে কেবল লক্ষ্য করে!"

"হ্যাঁ এবং সে লক্ষ্য করেছে।"

"না, না, না," আরজি-বিবি চাপা হাসি হেসে বললেন। "না, তুমি ভূত দেখে ভয় পাচ্ছ কামিলবেক।" তাঁর গলার স্বর ছিল শান্ত; ঈর্ষা তখন তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছে। "সেই মিথ্যাবাদী জোতিষীর জন্য তুমি আমাকে এত কষ্ট দিলে?"

"আরজি বিবি সম্ভবতঃ আমরা এক মরণ-খাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আরে না, না, আমরা ফুলে-ভরা এক প্রেমের বাগানে বসে আছি। আমার পাশে এসে বস কামিলবেক, আমি শীঘ্রই প্রমাণ করব তোমার ভয় কত অমূলক। আরও কাছে এস। এস, তুমি কি তোমার তলোয়ার আর খোঁচা খোঁচা পোশাক খুলবে না!"

"কিন্তু কেউ যদি আসে?"

"কেউ আসবে না। আমরা এখন একা।"

"আর তোমার স্বামী?"

"সে গিয়েছে ভখির মহাজনের কাছে পাশা খেলতে। অনেক রাত পর্যন্ত তারা খেলবে।"

চোর বকলসের ঠুনঠুন এবং কিংখাপের খসখস শব্দ শুনতে পেল। রাজ-পুরুষ তাঁর পোশাক ও তলোয়ার খুলে রাখলেন। তার উপর মায়াবিনী আরজি-বিবি তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে তাঁর ভয়ের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে লাগলেন। আমরা এই সব প্রমাণের বিশদ বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকব শুধু এইটুকুই বলব যে তাঁরা যত বিলম্ব করতে লাগলেন ততই একে অন্যের কাছ থেকে সরে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সিন্দুকের ভিতরের ভ্যাপসা গরম এক বেদনাদায়ক পর্যায়ে এসে পৌছাল। চোর ঘেমে নেয়ে গেল। পালক ও পেঁজা তুলোর টুকরো তার মুখে আটকে গেল এবং গলা দিয়ে নামতে লাগল। ভদ্রমহিলার উন্মাদনা তাকে তিনবার সুযোগ দিল ডালা খুলতে এবং টাটকা বাতাসে জোরে নিশ্বাস নিতে।

চতুর্থ সুযোগ বেশ অনেকক্ষণ ধরে আসেনি। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মেয়েদের প্রতি যথেষ্ট অশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সে সিন্দুক থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে

রাজপুরুষের সাহায্যে আসার জন্ম তৈরি ছিল। অবশ্য আরজি-বিবির রূপের জন্ম নয়, টাটকা বাতাসের জন্ম!

শেষে সে ডালাটা একটু খুলল। বাতাস, বাতাস, মুহূর্তের আশীর্বাদ! সে জোরে, স্বাধীনভাবে, বুক ভরে নিশ্বাস নিল এবং কেউ শুনতে পাবে ভেবে একটুও ভয় করল না। কিন্তু শোন, ঐ অদ্ভুত শব্দটা কিসের! এটা কি ঘরের ভিতরে না বাইরে?

শব্দ বাইরে থেকে আসছিল, এ যেন এক শোচনীয় ঝড়ের পূর্বাভাস! চোরটা যখন ডালাটা নামিয়ে আর একবার অন্ধকারে শ্বাসরোধকারী গরমে ডুবে গেল এবং ঘরে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল কেবল মাঝে মাঝে নিঃশেষিত প্রেমের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছিল তখন দরজার কড়া আবার বেজে উঠল এবং মুদ্রা-বিনিময়কারীর গলা শোনা গেল:

"কেউ কেন খুলছে না! তোমরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছ!"

গলার স্বর পাওয়া মাত্র ঘরের ভিতর যেন এক সন্ত্রাসের ঝড় উঠল যা ইতস্তত: পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল এবং সমস্ত কিছু ওলোট পালট করে দিল।

এই ঝড় যেন রাজপুরুষকে কৌচ থেকে উঠিয়ে দিল এবং ঘরের চারদিকে খরগোশের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

"তোমার স্বামী! রহিমবাই!" চাপা গলায় ফিসফিস করে রাজপুরুষ বলে উঠলেন এবং কার্পেট বিছান পাথরের মেঝের উপর খালি পায়ে শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। "কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই, শুধু ভগবান! সর্বশক্তিমান! হায় আল্লা, আমাদের ধরে ফেলেছে! আমি শেষ হয়ে গেলাম! আমার সর্বনাশ হল!"

সেই ভয়ংকর ও দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তে তিনি নিজের ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবছিলেন না এবং নিজের নিরাপত্তার চেষ্টা করছিলেন, প্রেমিক যেমন নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রণয়িনীর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনিও তাই করতে চাইছিলেন। দু একজন ছাড়া এ ধরনের বেশির ভাগ লোকই ইন্দ্রিয়াসক্ত।

আরজি-বিবি কিন্তু এভাবে বিপদের মুখোমুখি হলেন না। তিনি যথেষ্ট শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিলেন যা যে কোন রণ-কুশল যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য হতে পারত। সত্যি প্রেমের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কি একজন সাহসী যোদ্ধা নন?

ভয়ের অবস্থা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তিনি দুই থেকে তিন সেকেণ্ডের বেশি সময় নিলেন না।

এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি কৌচের উপর থেকে প্রণয়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেললেন।

"থাম, অত জোরে ধাক্কা দিও না—আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে," জানালার পাশ থেকে মুদ্রা-বিনিময়কারীর উদ্দেশ্যে ব্যথাতুর কণ্ঠে তিনি বললেন; মুদ্রা-বিনিময়কারী তখন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন। পাশে রাজপুরুষকে উদ্দেশ্য করে ফিসফিস করে বললেন: "পায়ের শব্দ করে ছোটাছুটি বন্ধ কর। ও শুনতে পাবে। আরে, শালোয়ার পরে নাও, সত্যি এসব অসভ্যতা! না, না, ওটা নয়—ওটা আবার বোরখা······এই যে এখানে—পরে নাও! আরে, উল্টো দিকে পরছ, উল্টে নাও!" পরে আবার জানলা দিয়ে স্বামীকে বলল: "এক মিনিট! আমার চটিজুতো কোথায় ফেললাম। দেখতে পাচ্ছি না।" ফিসফিস করে রাজপুরুষকে বললেন: "সিন্দুকে লুকাও! তাড়াতাড়ি! আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওর হাত থেকে রেহাই পাব।" জানলা দিয়ে বললেন, "আমি আসছি, এখুনি আসছি! হায় আল্লা, এ বাড়ীতে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি নেই!"

ভয়ে চোখ দুটো বিবর্ণ করে এবং কিছু না দেখে বা না বুঝে রাজপুরুষ সিন্দুকের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন।

"এখানে নরম কিছু একটা আছে।"

"আরে পালকের বিছানা। ভিতরে ঢোক!"

তিনি সিন্দুকের গরম স্যাঁতস্যেঁতে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর উপর ডালা বন্ধ করে দেওয়া হল।

আরজি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাজপুরুষ হাই তুলে এবং শরীরটা দুমড়ে সিন্দুকে বসলেন। হাঁটুর উপর ঠোঁট রেখে তিনি বসলেন ঠিক মায়ের পেটে বাচ্চা যেমন থাকে সেইভাবে। কিছু নরম জিনিষের জন্য পা সোজা করে বসতে পারছিলেন না—সম্ভবতঃ পালকের তোষকটা গোটা পাকিয়ে গিয়েছে।

সিন্দুকের দেয়ালটায় হেলান দিয়ে তিনি পা মেলে তোষকে চাপ দিলেন।

হঠাৎ ভিতরের অন্ধকার যেন সজীব হয়ে উঠল।

"সাবধানে, মশায়!" কাছেই একটা বিরক্তিকর ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলেন। "সাবধানে, নইলে আমার পেট ফাটিয়ে দেবেন।"

কোন্ ভাষায় রাজপুরুষের ভয় প্রকাশ করা যেতে পারে? তিনি পিছনে সরে এসে লাফ দিয়ে উঠলেন, মাথাটা শব্দ করে ডালায় ঠোকা খেল।

"অ্যাঁ? কি? ও কে? অ্যাঁ?" ভয়ে অত্যন্ত অবাক হয়ে এবং অন্ধকারে খোঁচা মারার মত আঙুলগুলো এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন।

"সাবধান!" সেই রহস্যজনক শব্দ ফিসফিস করে বলল। আপনি আমার কানে খোঁচা মারছেন।

কোন এক অদৃশ্য বস্তু জোরে রাজপুরুষের হাতের কব্জী ধরল।

"আরে? কি?" রাজপুরুষ বললেন, ভয়ে তাঁর দাঁত খট্‌খট্ করে উঠল এবং সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। "এ কে? অ্যাঁ? কে?"

"একটা কথা না! একটু শব্দ না! ওরা আসছে! আমাকে ভয় পাবেন না মাননীয় কামিলবেক—আমার কাছ থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না।"

দারুণ ভয় পাওয়ায় রাজপুরুষ কোন যুক্তি শুনলেন না।

এক অদৃশ্য হাতের ঘুঁষি তাঁর কপালে জোরে আঘাত করল।

"একেবারে চুপ নইলে আল্লার কসম, আমি ছুরি চালাব!"

রাজপুরুষ চুপ করে রইলেন, নড়তে সাহস করলেন না, এমন কি নিশ্বাস নিতেও না।

আরজি বিবি ও মুদ্রা-বিনিময়কারী ঘরে ঢুকলেন।

"কি ব্যাপার, আজ তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?" তিনি বললেন।

"ভথির বাড়ী ছিল না। কোন বিশেষ কাজ বা অন্য কিছু," মুদ্রা-বিনিময়কারী বললেন এবং সিন্দুকের উপর বসলেন, শরীরের ভারে ডালাটা নিচে চেপে বসল।

রাজপুরুষ ও চোরের কাছে আর কোন বাতাস যেতে পারল না।

"আমি বেশ অসুস্থ," আরজি-বিবি কাতরাতে কাতরাতে বললেন। "আমার ইচ্ছা তুমি একবার শহিদুল্লাহ্ ডাক্তারের কাছে যাও। তার বাড়ী বেশ কাছে মাত্র দু' মিনিটের পথ।"

"চাকরেরা কোথায়?"

"আমি তাদের বাইরে পাঠিয়েছি। অলসভাবে গালগল্প করে আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিল। আমি তখন একটু ঘুমাতে চাইছিলাম। একা, অন্ধকারে······"

"আমি সব মাটি করে দিলাম," বিদ্রূপ করে মুদ্রা-বিনিময়কারী বললেন। "তুমি দারুণভাবে ঘুমিয়েছিলে—তোমাকে জাগিয়ে দিলাম। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।"

তিনি উঠে দরজার দিকে গেলেন কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হতভাগ্য রাজপুরুষ সিন্দুকে বসতে অনভ্যাসের জন্য নড়ে উঠলেন।

চোর দারুণ জোরে তাঁর হাত চেপে ধরল।

তখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে, মুদ্রা-বিনিময়কারী শুনে ফেলেছেন।

"কিসের শব্দ ?"

"ইঁদুর," আরজি-বিবি উদাসীনভাবে বললেন।

বাস্তবিক, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জন্য তিনি রাজদরবারের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার উপযুক্ত, মুদ্রা-বিনিময়কারীর ঘরে বন্দী হয়ে থাকার উপযুক্ত নন।

"তুমি কি খবর শুনেছ ?" দরজার কাছে থেমে মুদ্রা-বিনিময়কারী বললেন ঃ "চামড়া-ব্যবসায়ী নিগমতুল্লাকে কি তোমার মনে আছে ? তুমি সেই মোটা লাল চুলের লোকটাকে চেন যার দোকানটা বাজারের প্রধান মসজিদের পাশে। হ্যাঁ, সে তার বৌয়ের ঘরে কাকে ধরেছে বলতে পার ? শহরের নদী ও পুকুরের প্রধান রক্ষককে !"

"কি ! একজন বাইরের লোক !" ভয়ে আরজি-বিবি চীৎকার করে উঠলেন।

"এটা খানের বিচার্য। আমি প্রধান রক্ষককে ঈর্ষা করি না।"

"ঠিকই হয়েছে, লম্পট !"

"আর সেই দুশ্চরিত্র মেয়েটাকে বেত মেরে শাস্তি দেওয়া হবে। পাঁচশো বেত—বেশিও না কমও না।"

"এটা যথেষ্ট নয়। এসব মেয়েকে আগুনে পোড়ান নয়তো ফুটন্ত কড়াই-এ ফেলে দেওয়া উচিত।"

"তুমি বড় নির্দয় আরজি-বিবি। একশো বেতই তার পক্ষে যথেষ্ট। এত হৈ-হট্টগোল করার জন্য নিগমতুল্লা এখন দুঃখিত। বৌয়ের জন্য তার মায়া হচ্ছে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে।"

"এ ধরনের দুশ্চরিত্র মেয়ের জন্য মায়া হওয়া কল্পনা বিলাস।"

"আমার মতে," নিরাপত্তার জন্য গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "পারিবারিক ব্যাপারে শাসন কর্তৃপক্ষের মাথা ঘামানো উচিত নয়।"

চোর হঠাৎ রাজপুরুষের হাতে একটা খিঁচুনির মত ভাব লক্ষ্য করল যার কবজি সে এতক্ষণ ধরেছিল—ভিতরের একটা ঝড়ের যেন বাইরের লক্ষণ—এক-

দুরাত্মাকে গ্রেপ্তার করার যেন স্বাভাবিক ইচ্ছা। এমন কি এখানে, সিন্দুকের ভিতর, নিজের যখন সর্বনাশ হতে চলেছে তখন আইন শৃংখলার রক্ষক যেন গ্রেপ্তার করার উৎসাহকে দমন করতে পারছেন না।

"তুমি যদি কোনদিন আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হও," বিদ্রূপের সুরে মুদ্রা-বিনিময়কারী বললেন, "তবুও আমি ঘাতকের হাতে তোমাকে দেখতে চাইব না। হতভাগা নিগমতুল্লা! আবার সেই শব্দ। মনে হচ্ছে সিন্দুকের ভিতর থেকে আসছে।"

"সিন্দুকে নয়, মেঝের নিচে থেকে। আবার ইঁদুর।"

"আমাদের একটা বিড়াল আনা উচিত। হয়তো ডাক্তারের কাছে একটা আছে—আমি তাহলে একটা নিয়ে আসি। তুমি উঠবে না, আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে যাব যাতে যখন ফিরে আসব তোমাকে কষ্ট দিতে না হয়।"

পরে একটা বিশ্রী ধরনের খকখক শব্দ করতে করতে তিনি বেরিয়ে গেলেন মনে হল যেন তাঁর জিভটা গলায় আটকে গিয়েছে।

নীরবতা বিরাজ করল।

কিছু একটা ঘটল। কিন্তু কি—সিন্দুকের ভিতর চোর তা বুঝতে পারল না। যখন মুদ্রা-বিনিময়কারীর কথা আর একবার শোনা গেল তখন সেটা অত্যন্ত কর্কশ ও চাপা মনে হল, কিন্তু বিদ্রূপে ভরা।

"কোথা থেকে এই কিংখাপের পোশাক এল? সোনায় বাঁধানো তলোয়ার?"

চোরের হৃদপিণ্ড যেন থেমে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। পোশাক ভুলেছ, তলোয়ার ভুলেছ, সব সামনে সাজিয়ে রেখেছ, উঃ কি বোকা!

সিন্দুকের উপর যেন এক ঝড় সুরু হল।

"এটা? এটা······" আরজি-বিবি তোতলাতে লাগলেন এবং কিছুই বলতে পারলেন না; অজান্তে ধরা পড়ে গেছেন। এমন কি তাঁর মত নির্ভীক মেয়েও ভয় পেলেন, তাঁর মত কঠিন লোক কেঁপে উঠলেন।

"হ্যাঁ, এটা, ঠিকই এইটা," বণিক বলে চললেন, রাগে তাঁর গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

"এটা একটা উপহার। আমি তোমার জন্য উপহার তৈরি করেছি······"

"উপহার? আমার জন্যে? তলোয়ার? পদক সমেত কিংখাপের পোশাক? মিথ্যা বলছ!" মুদ্রা-বিনিময়কারী গর্জন করে উঠলেন। "বল—কার পোশাক? কার তলোয়ার?"

"এসব তোমার, তোমার!" শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন "এত জোরে চীৎকার করো না, প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে।

"শুনুক, শুনতে দাও;" মুদ্রা-বিনিময়কারী গোঙাতে গোঙাতে বললেন। "তাদের জানতে দাও! বুঝতে পারছি, লম্পট শুধু নিগমতুল্লার ঘরেই ঢোকেনি! আমার অনুপস্থিতিতে কে এখানে এসেছিল? উঃ, তুমি চুপ করে আছ! বদমাস দুশ্চরিত্র! শয়তানের বাচ্চা! কে? কে আমি জিজ্ঞাসা করছি?"

নিরস্ত্র ও নিষ্পেষিত আরজি-বিবি কিছু বললেন না।

সিন্দুকের ভিতর রাজপুরুষ ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন এবং প্রাণহীন দেহের মত চোরের উপর ঢলে পড়লেন।

সব রকম কষ্টের সঙ্গে অভ্যস্ত হলেও চোরের যেন মৃত্যুভয় ধরল। সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল! কিছুক্ষণের মধ্যেই মুদ্রা-বিনিময়কারী লোক ডেকে এনে সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন। কারাগার, অত্যাচার, ঘাতক, ফাঁসি! সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল!

"কে?" গলা কর্কশ করে মুদ্রা-বিনিময়কারী চীৎকার করে উঠলেন, পা ঠুকে বললেন। "বল!"

আশংকা ও ভয় জয় করে চোর মনে মনে খোজা নাসিরুদ্দিনকে সিন্দুকের ভিতর আহ্বান করল ও প্রার্থনা করল, আমাকে রক্ষা করুন, অলৌকিক কিছু ঘটান!

সত্যিই তাই ঘটল! উদ্ধার করার মত একটা চিন্তা যা বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল ও সূঁচের মত তীক্ষ্ণ তার নির্বোধ মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। এটা তার নিজের চিন্তা নয়, অন্য কোথা থেকে তার কাছে উড়ে এসেছে: প্রথমে কোথা থেকে এল চোর বুঝতে পারল না এবং এই ভাবে কাজ করতে সাহস পেল না। যাই হোক, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্তির প্রেরণা যেন তার ভিতরে এল।

এর পরেই সব কিছু ঘটল, কথা ও কাজ যেন চোরের নিজের নয়, এল সেই রহস্যময় উৎস থেকে যাকে অনুসরণ করে চোর যেন স্বপ্নে কাজ করছিল, ভালভাবে বুঝতে পারছিল না সে কি করতে যাচ্ছে; সিন্দুকের ডালা তুলে এক গাদা পালক ও পেঁজা তুলোতে বোঝাই তার শরীরটা বণিক ও তার স্ত্রীর অবাক দৃষ্টির সামনে হাজির করল।

আরজি-বিবি ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন ও মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ দুটো ছাড়া বাকী সব কিছু যেন মৃত্যুর মত স্থির

হয়ে উঠেছে—বিরাট, কাল এবং স্থির চোখ দুটো······আশ্চর্য নয়, কারণ সিন্দুকে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন সুন্দর কামিলবেককে এবং সেখান থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল চেপটা মুখের এক-চোখো এক বদমাশ, বীভৎস চেহারার যা সখরের জিনের চেয়েও ঘৃণ্য !

ভিতরের রহস্যময় শক্তি চোরকে সিন্দুক থেকে নামিয়ে আনল এবং শব্দ করে ডালা বন্ধ করাল ও পরে তার মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বার করাল :

"আরজি-বিবি, সব কিছুই ফাঁস হয়ে গিয়েছে ! আমরা তোমার হিসেবী স্বামীকে আর ফাঁকি দেব না। এখন আমাদের অনুতাপ করা ও সবিনয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষার সময় হয়েছে।"

মুদ্রা-বিনিময়কারী যেন বাতাসে লাফিয়ে উঠলেন, পরে কাঁপতে কাঁপতে দাঁত কটমট করে উঠলেন।

দেওয়ালের কোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে তোতলাতে তোতলাতে আরজি-বিবি বললেন, "এ কে ? এ কে ?"

"কে ?" গোঁ গোঁ করতে করতে বণিক বললেন। "তুমি জান না কে ?"

"কসম খেয়ে বলছি আগে কখনও ওকে দেখিনি ! কখনও না ! আজ এই মুহূর্তের আগে জীবনে কখনও দেখিনি।"

সত্য উদঘাটন করার জন্য উপযুক্ত বাক্য খোঁজ করার কোন প্রয়োজন চোরের ছিল না—আপনা থেকেই তার মুখ হতে বেরিয়ে এল :

"যখন শুনলাম তোমার স্বামী আদর করে তোমাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলছে তখন আমার মন ঘৃণা ও লজ্জায় ভরে উঠল।"

"মিথ্যা বলছ !" আরজি-বিবি আঁতকে উঠে বললেন। "ওকে বিশ্বাস করো না ! এই মুহূর্তের আগে কখনও আমি ওকে দেখিনি, কখনও না !"

"ঘৃণিত দুশ্চরিত্র !" রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বণিক বললেন। "অবিশ্বাসীনী, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীকে ফাঁকি দিচ্ছ, যে তোমাকে ভিখারীর অবস্থায় একদিন পেয়েছিল ? তাকে ফাঁকি দিচ্ছ ! কার সঙ্গে ? না একটা বিশ্রী চেহারার শয়তানের সঙ্গে ! দেখ, একবার চেয়ে দেখ ওকি আমার চেয়ে দেখতে সুন্দর ?"

"মেয়েদের অনেক সময় অদ্ভুত বিকৃত রুচি থাকে," গলার সুর বেশ মিষ্টি করে চোর বলল।

উত্তরে আরজি-বিবি কিছু বললেন না শুধু গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। প্রথম

ধাক্কা তিনি এতক্ষণে কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। রাগে তিনি গরগর করছিলেন, তাঁর কাল চোখের অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে তিনি তাকে যেন ভস্ম করতে চাইলেন। তিনি যেন শক্তিহীন ও শিকলে বাঁধা, বাধ্য হয়েই চুপ করে রইলেন, কারণ সিন্দুকের ভিতর দ্বিতীয় আর একজন আছে।

"মিথ্যা বলছে," রাগে ফেটে পড়ে তিনি আবার বললেন।

"অস্বীকার করে কোন লাভ নেই আরজি-বিবি," চোর বলল। "আন্তরিক-ভাবে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাদের রক্ষা মিলবে না। তুমি কি এ বাড়ীতে আজ আমাকে ডেকে নিয়ে আসনি এই বলে যে তোমার স্বামী ভগির মহাজনের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছে হেরে যাওয়া তিনশো সত্তর টাকা উদ্ধার করার জন্য।"

"তুমি তাকে এ কথাও বলেছ গপ্পী মেয়ে!" দাড়ি দুলিয়ে বণিক চীৎকার করে উঠলেন, "এমনকি এটাও!"

অদৃশ্য শক্তি যেন তখনও কাজ করছিল এবং প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য চোরকে উপদেশ দিচ্ছিল।

"কসম খেয়ে বলছি আর কোন দিনও এ বাড়ীর চৌকাঠ পেরোব না যাতে এই মেয়েকে আর কোন দিনও দেখতে না হয় যার শরীর এত সুন্দর দেখতে কিন্তু মন এত বিশ্রী যার প্রমাণ মিলছে তার নির্লজ্জ অস্বীকারে। আমার মন ঘৃণায় তার কাছ থেকে সরে আসছে এবং আমি এখনই বিদায় নিচ্ছি।"

আস্তে আস্তে পা ফেলে মাথা নিচু করে যেন লজ্জায় ও ঘৃণায় নিষ্পেষিত হয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

পিছনে রেখে গেল ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন এক দৃশ্য।

"না, না, আমি তাকে চিনি না! কখনও না! কখনও না!" চোখের জলে কাঁদতে কাঁদতে আরজি-বিবি বললেন।

"মিথ্যা বলছ!" স্বামী গর্জন করে উঠলেন। "মিথ্যা বলছ, বদমাস! ও তোমার মুখের উপরেই এসব মিথ্যা বলেছে!"

তলোয়ারটা যেন চোরের পিছনে ঝনঝন করে উঠল এবং তার পিছনে পিছনে কিংখাপের পোশাকটা অনুসরণ করল।

"এসব নিয়ে যাও, অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী কলঙ্কিনী! বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন তোমার মুখ দেখতে চাই না!"

চোর আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

বাড়ী থেকে বার হওয়ার পরেই যেন সেই রহস্যময় শক্তি তাকে ত্যাগ করল। কিন্তু এখন তার কাছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি আছে সেইজন্য, তার সমস্ত শক্তি তার পায়ে লাগাল। জীবনে কোন দিনও যে বেগে ছোটেনি সেই বেগে সে আজ ছুটল। বাতাস তার কানে যেন শিস দিল, তার নিজের ছায়া যেন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। এক মুহূর্তে সে এক জলাভূমি পেরিয়ে গেল এবং কবরখানায় এল ও তুটো পুরোনো কবরের মধ্যের কাঁটা গাছগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রইল।

মুদ্রা-বিনিময়কারীর বাড়ীতে ধীরে ধীরে ঝড় কমে এল।

থতমত খেয়ে অবশ হয়ে এবং উসকো খুসকো দাড়িতে পেঁজা তুলো লাগিয়ে বণিক সিন্দুকের উপর এসে বসলেন, তাঁর পাগড়ীটা সরে গিয়েছিল; তুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন:

"আমি সব সময় তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম! কিভাবে যে বিশ্বাস করেছিলাম!"

তুই হাতে নিজের মাথা ধরে তিনি নাড়া দিলেন ও পরে এধার ওধার নাড়িয়ে ভগ্ন-হৃদয়ে কাতরাতে লাগলেন।

ঘরের মাঝখানে এসে রাগে তিনি ফেটে পড়লেন। রাগে চোখ বড় বড় করে দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে তিনি চড়া গলায় বললেন:

"কার সঙ্গে? কোথায় ওকে পেলে—ঐ ঘৃণিত বাঁদরটাকে?"

যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়ের এই চীৎকার যেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলল। তিনি পরে আর কিছু বললেন না—একটি কথাও না।

তাঁর এই বিভ্রান্ত স্ত্রীর জন্য কোন শাস্তি তিনি বেছে নেবেন? বেত্রাঘাত-কারীদের হাতে তুলে দেবেন? কিন্তু তিনি তাঁকে দারুণ ভালবাসতেন, সেজন্য তাঁর অমর্যাদা বা অপপ্রচার তিনি চাইছিলেন না। শাস্তির জন্য নিজেই বেত মারবেন? চাকরদের অনুপস্থিতিতে তিনি তা করতে পারতেন, কিন্তু 'মেয়েদের গায়ে যে হাত তোলে সে ঘৃণিত'—একথা তাঁর মনে পড়ল।

পরে তিনি তাঁকে তালাবন্ধ করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা করলেন। মনে মনে তাই ঠিক করে তিনি রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ও ফোঁস ফোঁস করতে করতে আয়নাটা দেওয়াল থেকে সরিয়ে নিলেন, কার্পেটটা ছিঁড়ে

ফেললেন এবং কুলঙ্গি থেকে পিচকারী-বোতল, অলংকারের বাক্স ও অন্যান্য বিলাস-সামগ্রী সরিয়ে ফেললেন।

একইভাবে তিনি কৌচের উপর থেকে গদি ছাড়া অন্যান্য সব কিছু সরিয়ে ফেললেন।

ঘরটা এক মুহূর্তে নিরানন্দ হয়ে উঠল যেন এখানে আগে কেউ বাস করত না।

আরজি-বিবি এক কোণে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বড় বড় চোখ করে তাঁর স্বামীর প্রতিহিংসামূলক কাজ দেখছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি দেওয়াল ও ছাদের দিকে গেল। আর কি তিনি ছিঁড়বেন? আহা কৌচের উপরের সিল্কের ঢাকা! সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাটা অন্যান্য ছেঁড়া জিনিসের উপর এসে পড়ল।

বিভিন্ন জিনিসের একটা বিরাট স্তূপ তৈরি হল। এসব নিয়ে কি করতে হবে? মুদ্রা-বিনিময়কারীর দৃষ্টি সিন্দুকের উপর এসে পড়ল—সবচেয়ে ভাল জায়গা ছেঁড়া জিনিসগুলো রাখার পক্ষে!

আরজি-বিবির রক্ত হিম হয়ে এল। আর একটা ঝড় যেন বইতে সুরু হবে।

পরে যা যা ঘটনা ঘটল একমাত্র নিজামী বা ফিরদৌসির কলম ছাড়া অন্য কারও বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। সিন্দুকের ভ্যাপসা গরমে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় রাজপুরুষ ভয়ের শোচনীয় স্তরে এসে পৌঁছেছিলেন, পরে যখন দেখলেন যে এবার তাঁর পালা তখন পাগল হয়ে গেলেন। রাতের বুনো পেঁচার মত চাপা গর্জন করে, ঘামে নেয়ে এবং গোটা পেঁজা তুলো লাগিয়ে তিনি সিন্দুক থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন, বণিকের ভুঁড়িতে এক গুঁতো মারলেন এবং সমস্ত জ্ঞান ও যুক্তি হারিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিলেন; চীনদেশীয় রঙীন শার্সিটা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

দরজা খোলা ছিল কিন্তু তিনি তা দেখেননি। বাগানের পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করলেন। পড়ে গেলেন। আবার টপকাতে গেলেন। গর্জন করে উঠলেন। উপরে উঠে এলেন, রাস্তার দিকে লাফালেন, পায়ের উপর দাঁড়ালেন, ধুলোয় ভর্তি হয়ে ছুটলেন; কোথায় জানেন না কিন্তু মাটির উপর পা দিয়ে যত জোর পারলেন তত জোরে ছুটলেন।

তাঁর দুঃসাহস কিন্তু এখানেই শেষ হল না। ভয়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি কবরখানার দিকে ছুটলেন। ভাগ্য তাঁকে কবরখানার সেইখানেই নিয়ে এল যেখানে চোর গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে এবং বুক ধড়ফড়

করতে করতে, মনে হচ্ছিল হৃদপিণ্ডটা যেন ফেটেই যাবে, রাজপুরুষ চোরের দুই পা দূরে লতার ঝোপে এসে লুকালেন ; চোর কবরখানার অন্য দিকে লুকিয়েছিল। যখন খানিকটা দম ফিরে পেলেন তখন উঁকি মেরে চেয়ে দেখলেন।

হায় সর্বশক্তিমান আল্লা! ঠিক সামনে তিনি দেখলেন একটা চেপটা চওড়া কুৎসিত মুখ ; সে বন্ধুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এবং চোখ দিয়ে ইশারা করছে।

তার মুখ অপরিচিত কিন্তু ফিসফিস করে যে গলার স্বর তিনি শুনলেন তা অত্যন্ত পরিচিত।

"আচ্ছা ওখানে বাড়ীর এখন খবর কি? আপনার পদক ও তলোয়ার আমার কাছে মশায়। আপনি এগুলো নিতে পারেন। কিন্তু আপনার পোশাকটা আমি বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে রেখে দিচ্ছি।"

এ সময়ে কেই বা পদকের কথা মনে রাখে কেই বা তলোয়ারের কথা মনে করে! একটা বন্য চীৎকার করে রাজপুরুষ আবার লাফিয়ে উঠলেন এবং চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে কবরখানার অন্য দিকে ছুটে পালালেন কবরখানার উপর লাফাতে লাফাতে ও কাঁটাগাছগুলো মাড়িয়ে। চোর বৃথাই বন্ধুর মত তাঁর দিকে হাতছানি দিয়ে ইশারা করল—রাজপুরুষ তাঁর সামনের দিকে ছোটা থামালেন না এবং ঝোপগুলোর ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সিন্দুক থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে রাজপুরুষ যেই না ছুটে পালিয়েছেন, নিস্তব্ধতার শিকল যেন আরজি-বিবির হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল এবং যতটা সম্ভব আবেগের সঙ্গে তিনি আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

"বুড়ো বোকা!" তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "বোকা মোটা পাগল, এই সব নির্বোধ দৃশ্যের অবতারণা করার পরিবর্তে এবং আমাকে বিশ্রীভাবে গালাগাল না দিয়ে তুমি তোমার টাকার থলির খোঁজ করতে পারতে। থলি কোথায়? তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি যে এরা চোর? যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন ভিতরে ঢুকেছে। টাকার থলি কোথায়?"

টাকার থলির উল্লেখ যেন বণিকের মনে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি এনে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে [illegible]স্থানের দিকে ছুটে গেলেন। আরজি-বিবিও যেখানে মণিমুক্তা রেখেছিলেন সেদিকে ছুটলেন।

টাকার থলি ঠিক ছিল কিন্তু মণি-মুক্তাগুলো ছিল না।

আরজি-বিবির চোরের উদাহরণের ফল ফলল এবং দুশ্চরিত্রার অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁর সততা যেন প্রমাণিত হল।

এর চেয়ে সুষ্ঠুভাবে মণিমুক্তাগুলো অদৃশ্য হওয়া যেন সম্ভব ছিল না। মণিমুক্তাগুলো হারিয়ে যাওয়াতে মনে মনে আরজি-বিবি খুব খুশী হলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রা-বিনিময়কারীকে দিয়ে পুনরায় ক্ষতিপূরণ করাতে পারবেন বলে সন্দেহ করলেন।

পরে কি ঘটেছিল বলার কোন প্রয়োজন নেই। স্বভাবতঃই আরজি-বিবি দারুণ কেঁদেছিলেন এবং কাঁধ নাচিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলেন; মুদ্রা-বিনিময়কারী অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন ও তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন; সমস্ত টাকা ও অলংকারের বাক্সগুলো আবার আগের জায়গায় রেখে দিলেন, দেওয়ালের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে রেশমের ঢাকা ও কার্পেট ঠিক ঠিক জায়গায় রাখলেন এবং তাঁর স্ত্রীর প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করলেন এবং মনে করলেন যে স্ত্রীর ক্রীতদাস হওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই নেই—এ যেন এক স্বীকৃতি যা ভালভাবে গ্রহণ করলেও এই অমৃতময় সতীত্বের কক্ষ থেকে ঈর্ষায় কিছুক্ষণ আগেও তিনি একে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

রাত এল, চাঁদ উঠল এবং তার পাণ্ডুর উজ্জ্বলতা কোকান্দের উপর ছড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল নিস্তব্ধ বাজারের উপর এবং মুদ্রা-বিনিময়কারীর বাড়ীর উপর, আলোকিত হয়ে উঠল সুন্দরী আরজি-বিবির মর্মর মুখ এবং বাড়ীর ভিতরে দেখা গেল নিদ্রাহীন নির্বাসিত বণিককে যিনি তখন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাহীন মন নিয়ে জেগে আছেন। তিনি ফিরে এলেন ঘুমন্ত সততার কাছে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে, নিজের চোখের কোণে জল এল, নীরবে বাতাস চুম্বন করলেন এবং দুঃখে মাথা নেড়ে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

অনেক দূরে শহরের প্রান্তে চাঁদের আলো এসে পড়ল চোরের মুখের উপর। পকেটে মণিমুক্তা নিয়ে এবং পলির কিংখাপের পোশাক ও তলোয়ার নিয়ে সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল যেখানে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

রহস্য! খোজা নাসিরুদ্দিন ভালভাবেই জানেন এই একটি শব্দ কি অদ্ভুত আকর্ষণীয় ক্ষমতা রাখে; তাঁর পরিকল্পনা সুন্দর ভাবে করা হয়েছে; আগাবেক এখন তাঁর কুঁড়েঘরে প্রতিদিনের অতিথি।

"এখনও দেরী আছে, আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরুন," খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর আগ্রহের উত্তরে বললেন।

আগাবেক অসন্তুষ্ট হলেও মেনে নিলেন।

আলোচনা আরও অনেক কিছু নিয়ে হল, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে গোপন ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু উদ্দেশ্য একই পথে, যদিও ঘোরাপথে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে।

"সুতরাং হেরাটে তোমার চাকরী হওয়ার আগে পর্যন্ত তুমি পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরেছ উজাকবাই। তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

"জ্ঞান। পৃথিবীর সব রহস্যের চাবি।"

"তোমার কথামত তুমি মক্কাও গিয়েছিলে। কেন তুমি তবে সবুজ পাগড়ী পর না?"

"আমার কোন অধিকার নেই, কারণ কাল পাথরের পাশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার আমি কোন সময় পাইনি।"

"তুমি ব্যস্ত ছিলে? কি নিয়ে?"

"একটা প্রাচীন বই খুঁজতে।"

"পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কি বই এটা?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এ দিয়ে অনেক বড় জিনিষ করা যায়—ভাল যাদু কাজ।"

"তুমি তাহলে যাদুকর?"

"না, ঠিক উল্টো। আমি একটা অন্যায় মোহ নষ্ট করতে চেষ্টা করি, সৃষ্টি করতে নয়।"

"কি যাদু এটা, আমাকে বল?"

"কিছুদিন আর বলব না, আপনি সে ক'দিন ধৈর্য ধরুন।"

একই ধরনের প্রশ্ন ঘুরে ফিরে বার বার করা হতে লাগল। স্বভাবতঃই তাঁর নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় না হলে খোজা নাসিরুদ্দিন তা নিয়ে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি নিজের প্রশ্ন নিয়ে আগাবেককে যাচাই করে দেখলেন। সত্যিই প্রবাদ আছে, "বোকা বাক্য বোনে আকস্মিকভাবে, কিন্তু ফসল তোলে বুদ্ধিমান!"

আগাবেকের প্রকৃতির অলিগলি পথ সব কিছুই খোজা নাসিরুদ্দিন লক্ষ্য করলেন, তাঁর জিভের প্রতিটি অপ্রাসঙ্গিক কথা খেয়াল করলেন, প্রতিটি আবেগ ও মনের ইচ্ছা নজর করলেন তাঁর মনের প্রকৃত তথ্য পাবার জন্য। ঠিক যেন আগাবেকের মোটা শরীর থেকে তাঁর আত্মাকে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে বার করতে চাইলেন, অনেকটা যেন জলাশয় থেকে একটা ডুবন্ত লোককে উপরে টেনে নিয়ে আসা সনাক্তকরণের জন্য ; প্রথমে জলাশয় ছিল অন্ধকার ও দুর্গম কিন্তু পরে জল আলোড়িত হয়ে একটা সাদা ধরনের কিছু যেন বেশ গভীরে দেখা গেল ; আর একবার জোরে টান দিতেই দেহটা উপরে ভেসে উঠল এবং দর্শকেরা জলে ফুলে ওঠা মৃতদেহের মুখটা দেখতে পেয়ে যেন ভয়ে আঁতকে উঠল। সকলে না দেখায় ও না বুঝতে পারায় আগাবেকের আত্মাটা ছিল অনেকটা যেন সেই ডুবন্ত লোকটার মত এবং আমরা যদি অনুমান করি যে সেই জলাশয় হচ্ছে পূতিগন্ধময় নোংরা আধার তবে আমাদের তুলনা, উদ্দেশ্য ও যুক্তির দিক থেকে ঠিক হবে।

আগাবেক ছিলেন উদ্ধত, অহংকারী ও চাটুবাক্যপ্রিয়। প্রাক্তন কাজী হয়েও তিনি অভিযুক্তদের অপবাদ দিতেন এবং সকলেই অপরাধী ভাবতেন যেন আল্লা স্বয়ং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সবার বিচার করতে। তিনি নিজের সম্বন্ধে যথার্থ ভাষা ব্যবহার না করে কখনও কিছু বলতেন না, তাঁর জাঁকজমক-পূর্ণ বিচারের দিনগুলো মনে করতেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে—এবং কখনও তিনি নিজেকে নিয়ে হাসতেন না বা ঠাট্টা করতেন না। এই সব থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে করলেন যে তিনি একদিকে নির্বোধ অন্যদিকে তাঁর বুদ্ধি ছিল ভোঁতা, তৃতীয়তঃ তিনি ছিলেন অসুখী এবং চতুর্থতঃ তিনি আশা করতেন যে আবার তাঁকে কাজীর লোভনীয় চাকরীতে পুনর্বহাল করা হবে।

খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে এই চতুর্থ কারণটি ছিল কোন মানুষের আত্মরক্ষাকারী ঢালে ছিদ্রের মত।

অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনি রাজদরবার, রাজকীয় পদ, পুরস্কার ও উন্নতি নিয়ে আলোচনার মোড় ঘোরালেন।

"কি একটা সুন্দর যুক্তি আল্লা আপনার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন হুজুর," কপট শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বললেন। "এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে এই রকম একটি উচ্চমন খোরেশম শহরে অবহেলিত হয়েছে এবং আপনাকে রাজপদ থেকে সরে যেতে দেওয়া হয়েছে।"

এই কথাগুলো ছিল আগাবেকের হৃদয়ে প্রলেপের মত—এমনকি তার চেয়েও বেশি, কারণ রাজপদ থেকে তাঁর অপসারণ ছিল অত্যন্ত বেশি উৎপীড়নের জন্য।

"আমি অবশ্য বুঝতে পারছি যে নগর কাজীর পদ ছিল আপনার পক্ষে অত্যন্ত তুচ্ছ," খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন। "তারা কি আপনার জন্য বড় একটা কিছু খুঁজে পেল না, যেমন ধরুন রাজদরবারের প্রধান কোষাধ্যক্ষের পদ? জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন রাজার পক্ষেই এ ধরনের কোষাধ্যক্ষকে দুই হাতে লুফে নেওয়া উচিত। রাজকোষে রাজস্ব সময়মত তুলে নেওয়া উচিত।'

"আবার অনেক নতুন কর বসান হয়!" আগাবেক বলে উঠলেন। "চোখের জলের উপর কর, যেমন ধর……"

"সুন্দর চিন্তা! চোখের জলের উপর কর বসালে চোখ দিয়ে আরও বেশি জল পড়বে এবং যার অর্থ হচ্ছে আরও বেশি টাকা। এর কোন শেষ নেই। কি অনন্ত জ্ঞান! এই চিন্তার জন্যই আপনাকে প্রধান উজিরের পদ দেওয়া উচিত!"

সমস্ত শক্তি সংযত করে আগাবেক তাঁর উচ্চ চিন্তার আর একটি পরিচয় দিলেন:

"আমি আর একটি কর বসাতাম—হাসির উপর কর!"

"হাসির উপর! সত্যিই খোরেশমের রাজা একজন প্রধান উজিরকে কি ভাবে হারালেন! আমার স্থির বিশ্বাস, কি হারিয়েছেন জানতে পারলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালিতে পেরেক ঢোকাতেন!"

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সমস্ত পৃথিবীকে রুক্ষ ঘুমে-ভরা উত্তাপে প্লাবিত করে উপত্যকা থেকে উষ্ণ গ্রীষ্ম এখানে এল। বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া যায় না, যেন বাতাস আর কোনদিনও উপরে উঠবে না; রং করা ইস্পাতের মত হ্রদটা চকচক করছিল, আয়নার উপর নিশ্বাস যেমন এসে পড়ে সেই রকম হ্রদের রুপালি জলের তলদেশে মাঝে মাঝে বেশ কষ্টে চেনা যায় এমন ছায়া এসে পড়ছিল; পরে আবার ঝলমলে আলোর স্রোতে সব ঠিক হয়ে যাচ্ছিল; একটা বাজপাখী উপরে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং একটা টিকটিকি সাদা পাথরের উপর চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। ঘাস শুকিয়ে হলুদ হয়ে গিয়েছে। একদিন সকালে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন পাহাড়ের ঢালু গায়ে যাযাবরদের সাদা তাঁবুর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না—কিরঘিজরা রাতে তাঁবু খাটিয়েছিল এবং সকালে দলবল নিয়ে পাহাড়ের উঁচু গোচারণভূমিতে চলে গিয়েছে।

পাহাড়ে সাদা বরফ ও নীল হিমবাহ গলতে সুরু করেছে। উপত্যকায় বয়ে

যাওয়া ছোট ছোট নদীগুলো জলে ভরে উঠেছে। কিন্তু চোরাকের অধিবাসীরা এক ফোঁটা জলও পায় না। আগাবেক সমস্ত জলটা ধরে হ্রদে জমা করে রাখতেন।

চোরাকের খেত-জমি উত্তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

জল সেচ করার সময় হয়ে এল।

আগাবেক একদিন গর্ব করে খোজা নাসিরুদ্দিনকে শোনালেন সেই সুন্দরীর কথা যাকে তিনি খুব শীঘ্রই বাড়ীতে আশা করছেন।

"সে অবশ্য অতি সরল গ্রামের সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তুমি যদি তাকে দেখ উজাকবাই, তুমি মনে মনে তাকে একটা গোলাপ-কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করবে। দু একদিনের মধ্যেই আমি সেই কুঁড়ি উন্মোচন করব।"

"কিন্তু সে কি বাগদত্তা নয়?"

"সে? বাগদত্তা?" এ ধরনের চিন্তা আগাবেকের মনে আগে কখনও ঢোকেনি; সুন্দরী মেয়েটার চিন্তা ও তাকে পাবার ইচ্ছাই মনে ঘুরত। তাঁর তুলনায় গ্রামের লোকেরা কি নিকৃষ্ট ধরনের কীটের তুল্য নয়? ভাগ্য কি তাদের সকলকে তাঁর ক্ষমতার মুঠোর মধ্যে এনে দেয়নি যাতে তাঁর সুখ ও ইচ্ছার কাছে তাদের সকলের সুখ ও ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হয়।

খোজা নাসিরুদ্দিন তার বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চাইলেন ও আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

রাতের বেলায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল। বৃষ্টিতে ভেজা দমকা বাতাস কুঁড়ে ঘরের ভাঙ্গা দরজায় এসে ধাক্কা দিল এবং শেষে ভেঙ্গে ফেলল; ভিতরে ঢুকে উনুনের ছাই উড়িয়ে পাক খাওয়াতে লাগল, ঘুমন্ত খোজা নাসিরুদ্দিনের মুখে এনে ফেলল এবং গাধাটাকে বিরক্ত করল; মনে হল গাধাটা যেন এই ঝড়েরই অপেক্ষা করছিল যাতে সে চীৎকার করে, কেঁদে, হাই তুলে, থক্ থক্ শব্দ করে রাতের বেলায় প্রতিধ্বনি তুলতে পারে।

খোজা নাসিরুদ্দিন জেগে উঠে মাথা তুললেন এবং দূরে বজ্রের গর্জন শুনলেন। খোলা দরজা দিয়ে তিনি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশ দেখতে পেলেন। উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে কাল মেঘ যেন বিদ্যুৎ দিয়ে আঘাত করছে এবং বিদ্যুতের ঝলকে তুষারের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ পাহাড়ের উঁচু চূড়া, কাল খাদ ও ফাঁক-গুলোর ছবি অল্পক্ষণের জন্য ভেসে আসছিল। "আমার একচোখো সঙ্গী এখন কোথায়?" খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন। "হয়তো সে এখন পাহাড়ের ধারে, ঝড়ের মাঝে—সর্বশক্তিমান আল্লা ওকে রক্ষা করুন।"

গত কয়েক দিন ধরে চোর তাঁর চিন্তায় ঘুরে বেড়াত। পাহাড়ের উপর দিয়ে ওঁদের দুজনের মধ্যে যদি একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যেত, তা যতই দুর্বল হোক না কেন, তবু তাঁদের মধ্যে একটা চিন্তা-ভাবনা, অন্ততঃ চিন্তার প্রতিধ্বনি বিনিময় করা সম্ভব হত। "এটা কি সত্য যে আমি তার সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছি?" খোজা নাসিরুদ্দিন ভাবলেন এবং মনে করলেন যে এ ধরনের কোন সম্পর্ক এত দূরে এর আগে খুব কমই তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাও তাদেরই সঙ্গে যারা ছিল তাঁর হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে।

গতকাল সন্ধ্যায় এ ধরনের একটা যোগসূত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল। খোজা নাসিরুদ্দিনকে হঠাৎ যেন একটা অস্বস্তি, অনেকটা ভয়ের মত, আচ্ছন্ন করে ফেলল। "কোকান্দে তার কি হয়েছে?" মনে মনে ভাবলেন, অবশ্য কোন অনুমান করলেন না।

এমনও হতে পারে যে ঠিক সেই সময়ে একচোখো চোর সিন্দুকের মধ্যে রাজপুরুষের সঙ্গে বসে ছিল।

"তার বিপদ হয়েছে! তার বিপদ হয়েছে!" বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে ভাবলেন।

তাঁর উদ্বেগ ছিল এত ভয়ানক যে তাঁর শক্তির এক অংশ কোকান্দে গেল, বণিকের ঘরের সেই বন্ধ সিন্দুকের ভিতর। এই শক্তিই হচ্ছে চোরের প্রেরণা যার জন্য চোর ডালা খুলে বেরিয়ে এল এবং তুলোর মেঘের মাঝে দাঁড়িয়ে বণিকের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে হাজির হল। পরে কি ঘটেছিল আমরা জানি, সে জন্য পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই; যোগসূত্রের এপাশে কুঁড়েঘরে বিশেষ কিছুই ঘটেনি শুধু খোজা নাসিরুদ্দিন সহসা যেন শান্তি ফিরে পেলেন। তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এই ভেবে যে কোকান্দে চোরের মাথার উপর যে বিপদ ঝুলছিল তা কেটে গিয়েছে। তাঁর হৃদয় সুস্থ হল এবং তিনি হেসে উঠলেন এই ভেবে যে চোর ফিরে এসে তাঁকে নতুন ধরনের গল্প শোনাবে।

ঝড়ের রাত পর্যন্ত খোজা নাসিরুদ্দিন বেশ আনন্দেই ছিলেন এবং যখন ঘুমিয়ে পড়লেন বেশ আনন্দের স্বপ্নই দেখছিলেন।

বিদ্যুৎ ও ঝড়ের শব্দে জেগে উঠে তিনি অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন চোরের কথা চিন্তা করে কিন্তু তাঁর মনে অশান্তির একটু লক্ষণও দেখা গেল না। এ থেকে বোঝা গেল সব যেন ঠিক আছে এবং চোর শীঘ্রই ফিরে আসবে।

দরজা লাগাতে গিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন সৈয়দকে দেখতে পেলেন।

যুবক ঘরে ঢুকে পড়ল এবং ফিসফিস করে আবেদনের ভঙ্গিতে বলল :

"আমাকে ক্ষমা করবেন সর্ত ভেঙ্গে আপনার কাছে আসার জন্য, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার চিমটায় আমার যুক্তি যেন চিঁড়ে চেপটা হয়ে যাচ্ছে। জলসেচের আর মাত্র তিনদিন বাকী আছে।"

"মনে আছে, সৈয়দ, মনে আছে।"

"জুলফিয়া কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, সে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।"

"বিশ্বাস হারিয়েছে? খুব খারাপ।"

"মনে হয় সময় থাকতে আমাদের পালিয়ে যাওয়া উচিত।"

"যদি পালিয়ে যেতেই হয় তবে আমরা তিনজনেই পালাব। না, চারজনে—কেমন করে গাধাটাকে ফেলে পালাব? না চার নয় পাঁচ—আর একজনের কথা ভুলে গিয়েছি যে এখন চোরাকে এবং যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে। এটা পলায়ন হবে না, হবে জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রা!" সৈয়দের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "তোমার জুলফিয়াকে বল সব ঠিক আছে এবং যা যা ঘটবার ঠিকমত ঘটে যাচ্ছে।"

"সে বিশ্বাস করবে না।"

"আমার নাম করে তাকে বলবে।"

"সে আপনাকে চেনে না।"

"কিন্তু তুমি সৈয়দ, তুমি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস কর?"

তিনি সৈয়দের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন, যা অন্ধকারে জ্বলে ওঠে এবং হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে—যেমন সূর্যের আলো বোঁজা চোখের ভিতরে গিয়ে পর্দায় আঘাত হানে। এ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত।

"আমি বিশ্বাস করি," সৈয়দ নরম স্বরে বলল।

"তাহলে সেও বিশ্বাস করবে। তোমার বিশ্বাস তার কাছে যাবে। যাও! মনে রাখবে—আমরা সকলেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। যাই ঘটুক না কেন আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব!"

সৈয়দ সেলাম করে বিদায় নিল।

শেষ রাতের দিকে সে জুলফিয়ার সঙ্গে দেখা করল।

তার বিশ্বাস তার মনে ঢুকল এবং সে আবার শক্তি ফিরে পেল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

আর একদিন পেরিয়ে গেল কিন্তু চোরের আবির্ভাব ঘটল না।

খোজা নাসিরুদ্দিন আঙুলে তাঁর যাত্রাপথ গুনলেন: তিন দিন সেখানে যেতে, তিন দিন ফিরতে ও দু' দিন কোকান্দে থাকতে। "যদি কাল সে এখানে না আসে তাহলে বাস্তবিক আমাদেরই পালাতে হবে। এটা কি হতে পারে যে আমার মনের চোখ আমাকে ভুল বুঝিয়েছে? না, তা অসম্ভব! সে নিশ্চয়ই বেশ কাছে এসেছে এবং ক্রমশঃ বেগে আসছে, ইতিমধ্যে সে নিশ্চয়ই গিরিপথের এপাশে!"

চোর হাজির হল। সে কুঁড়েঘরের দরজায় এসে হাজির হল যেন আকাশ থেকে পড়ল। এক মিনিট আগেই রাস্তার নিচের দিকে দেখবার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিন বেরিয়েছিলেন কিন্তু একটা জনপ্রাণীকেও দেখতে পাননি। এখন হঠাৎ চোর এসে হাজির। তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল এবং সারা শরীর ধুলোয় ভর্তি কিন্তু তার চেপ্টা কুৎসিত মুখ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত। কথায় যা প্রকাশ করা যেত তার মুখ যেন তার চেয়ে ভালভাবেই সব কিছু বোঝাতে চাইছে—সফলতা!

বিকেলবেলায় এটা ঘটল। চোর যখন তার কোকান্দের কাহিনী বলছিল, সূর্য পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল—জলসেচের আগের শেষ সন্ধ্যা। সময়ের এখন দাম অনেক।

"এস আমরা সব জিনিসটা পরিষ্কার করে নিই," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "গরীব বিধবার মণিমুক্তাগুলো আবার তার কাছে ফেরৎ পাঠানো হবে। রাজী আছ?"

"আমি ঠিক একই জিনিস ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু প্রথমে একে একবার হস্তান্তরিত করব। অবশ্য ন্যায়সংগত কাজের জন্য।"

"বুঝেছি!" চোর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে বলল। "আমি আপনাকে একটা জায়গা বলতে পারি যেখানে এটা সুবিধা মত করা যেতে পারে। উপত্যকার নিচের দিকে চোরাকের কিছু দূরে, ঐখানে একটা সরাইখানা আছে। সেখানে বিনা বাধায় দিনরাত পাশা খেলা হয়। বিরাট জুয়ার আড্ডা। যদি আমরা সেখানে একসঙ্গে যাই……"

"না আমরা হাত বদল করতে ওখানে যাব না। আমরা বাড়ীর বেশ কাছেই হাত বদল করব। আমরা অন্য খেলা খেলব, শুধু জেতার খেলা। বুঝতে পারছ, কিন্তু সাবধান কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।"

পতিত জমি ও পিছনের গলি ধরে তিনি চোরকে মামেদ আলির বাড়ীতে নিয়ে আনলেন। পুরু ঝোপের ভিতর থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠলেন ও বাগানের দিকে চেয়ে রইলেন।

বুড়ো বাগানেই ছিলেন এবং মাটি খুঁড়ে আপেল গাছের পাশে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন এইগুলোর মধ্যে একটা গাছ বুড়ো মামেদ-আলি মেয়ের জন্মদিনে পুঁতেছিলেন। সৈয়দ তাঁকে বলেছিল যে সাজাবার জন্য জুলফিয়া প্রতিদিন এক একটি রঙীন ফিতে দিয়ে আপেল গাছটা সাজিয়ে রাখত: শনিবারের দিন লাল ফিতে দিয়ে, রবিবার সাদা, সোমবার হলুদ, মঙ্গলবার নীল, বুধবার গোলাপি এবং বৃহস্পতিবার সবুজ ফিতে দিয়ে। শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় সমস্ত ফিতেগুলো একসঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। দশ বছর আগে হতে জুলফিয়া এই অনুষ্ঠান করতে সুরু করে এবং আজ পর্যন্ত ধরা-বাঁধা নিয়মেই তা করে আসছে; কোনদিন সকালে তার সমবয়সীকে শুভ-প্রভাত জানাতে বা তাকে সাজাতে কোনদিনই ভোলে না।

আজ শুক্রবার, মুসলমানদের সাবাথের দিন যে দিন আপেল গাছে ছয় রংয়ের ফিতে ঝুলে থাকার কথা। কিন্তু সে সব কোথায়? এক দৃষ্টিতে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন এই আপেল গাছটার সঙ্গে অন্য কোন গাছের তফাৎ বুঝতে পারলেন না। জুলফিয়া কি তবে ভুলে গিয়েছে?

না, জুলফিয়া ভোলেনি। আরও ভালভাবে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন যে কাছের একটা গাছে—যে গাছের চারপাশে বুড়ো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে রাখছিলেন—একটা সরু ছোট ফিতে ঝুলছে একটা কাল ফিতে।

জুলফিয়া ভোলেনি। সেদিন সকালে জুলফিয়া প্রিয়জনদের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের স্মৃতিতে এই চিহ্ন রেখে এসেছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিনের হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে উঠল। এই ছোট কাল ফিতেটা একটা দুঃখের বইয়ের চেয়েও বেশি করে যেন সবকিছু প্রকাশ করল। হতভাগা মেয়ে, এই ক'দিনে কত না কষ্ট পেয়েছে! তাকে এখনও না দেখে বা তার সঙ্গে কোন কথা না বলেও তাঁর মনে হল যে সে যেন তাঁর কত কাছের, কত-

আপন, যেন অনেকটা রক্তের সম্পর্ক। সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তিনি যেন তার দুঃখের অংশ নিলেন এবং আগে থেকেই সেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের ভাগ নিলেন যা তাঁর মাধ্যমে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই বাগান ভরে তুলবে।

"দেখতে পাচ্ছ, আপেল গাছের উপর কাল ফিতে?" ফিস ফিস করে তিনি একচোখোকে বললেন। "মিনিট পনেরর মধ্যেই এটা সরিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ছ'টা রঙীন ফিতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বাস কর সেই সব মুহূর্তগুলো বাঁচার পক্ষে কত আনন্দের!"

একচোখো কিছু বুঝতে পারল না। ফিতেটার রং এবং অর্থ দুই দিক থেকেই ছিল তার কাছে অন্ধকার।

"কি বলতে চাইছেন?"

"দেখে অনুমান কর।"

জুলফিয়া, বাগানের ছোট্ট মালিক, বাগানে এল। সে মনে করছিল বাগানের সঙ্গে তার যেন আর কোন যোগ নেই। দুঃখে তার মুখ কাল হয়ে গিয়েছে। বাগানের চারপাশে ধীরে বিদায়ের দৃষ্টিতে সে চাইল, ঝোপ, গাছ, পথ এবং ফুলের কাছে বিদায় নিল। খোজা নাসিরুদ্দিন দূর থেকে তাঁর চোখে জল দেখতে পেলেন।

"দেখুন।" কনুই দিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনকে খোঁচা মেরে চোর বলল। "আর একজন।"

সৈয়দ। বৃদ্ধের অলক্ষ্যে দরজা দিয়ে চুপি চুপি সে এসেছে এবং ঝোপের পিছনে জুলফিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য জুলফিয়াও এগিয়ে গেল।

"কি হবে?" খোজা নাসিরুদ্দিন তার ব্যাকুল প্রশ্ন অনুমান করলেন।

"সব কিছুই আজ ঠিক হবে," উত্তর এল। "হয় টাকা দেওয়া হবে নতুবা আমরা পালাব। তুমি কি যাবার জন্য তৈরি?"

জুলফিয়া সাহসের সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। হ্যাঁ, সে তৈরি! সহসা সে মনস্থির করেনি কিন্তু যখন সে মন স্থির করল তখন শেষ পর্যন্ত তার জিদ সে বজায় রাখবে। খোজা নাসিরুদ্দিন অবাক হয়ে তার প্রশংসা করলেন—তার মাথা নাড়ার দৃঢ় ভঙ্গির, তার চোখের উজ্জ্বল দীপ্তির।

বৃদ্ধ আপেল গাছের গোড়ায় মাটি দিতে দিতে চারদিকে চাইলেন এবং সৈয়দ ও জুলফিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন পরে মাটিতে খন্তাটা গুঁজে রেখে টলতে টলতে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সৈয়দ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে সেলাম জানাল।

বৃদ্ধ নীরবে সেলামের উত্তর দিলেন। তাঁর পক্ষে কথা বলা ছিল বেশ শক্ত। তিনি লজ্জা পেলেন; নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন।

"বাবা শোন—তুমি এখান থেকে চলে যাও। অকারণে আমার, জুলফিয়ার ও তোমার নিজের মনে আঘাত দিও না। সে আর আমাদের নয়।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের বেশিক্ষণ শোনার কোন সময় ছিল:

"জলদি!" তিনি চোরকে বললেন। "আপেল গাছের তলায় মনি-মুক্তাগুলো লুকিয়ে রাখ। সাপের মত গলে যাও, ঠিক ছায়ার মত!"

চোর পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতর ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল যেন ধরণী দ্বিধা হয়ে তাকে গিলে খেয়েছে। কেবল খালের নল খাগড়া গাছের মাথাগুলো নড়া থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারছিলেন সে কতটা এগিয়েছে আপেল গাছের দিকে। তার গতি ছিল দ্রুত ও শব্দহীন।

আপেল গাছের গোড়ায় কিছু একটা ঝকঝক করে উঠল পরে শুকনো নল খাগড়া আবার দুলে উঠল, এবার কিন্তু উল্টো দিকে বাঁকতে লাগল।

বাগানে নামবার সময় চোর ডালিম গাছের যে ডালটা বেয়ে নেমেছিল ফিরে আসার সময় সেই ডালটা তখনও দুলছিল।

"তাঁরপর কি?" সে ফিসফিস করে বলল। সে কাঁপছিল—ভয়ে নয়, অবশ্য চুরির উল্টো কাজ করার জন্যে।

সন্ধ্যার পরিষ্কার আলোয় ভরে থাকা বাগানে মামেদ আলির দুঃখে ভরা কথাগুলোর পর যেন রাতের অন্ধকার নেমে এল।

সৈয়দ চলে গেল। দরজার কাছে সে পিছন ফিরে চাইল ও হাত নাড়ল।

জুলফিয়া কেঁদে উঠল।

আস্তে আস্তে পা ফেলে বৃদ্ধ আপেল গাছের কাছে এলেন।

খন্তা নিয়ে আবার তিনি মাটি খুঁড়ে চললেন এবং ছোট ছোট টুকরো করে উল্টে দিতে লাগলেন। প্রত্যেকটি টুকরোকে তিনি বাঁট দিয়ে ভেঙ্গে দিতে লাগলেন যতক্ষণ না একটুও গোটা ছিল। দুঃখ যেন জগদ্দল পাথরের মত তাঁর বুকের উপর চেপেছিল এবং তাঁর চোখের শেষ আবছা আলোটুকুও যেন মুছে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু এতে তাঁর কাজ করার ক্ষমতা ব্যাহত হল না। কাজেই ছিল তাঁর সত্তা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অর্থ। আগের মত একই ভাবে আস্তে

আস্তে খন্তা নাড়তে নাড়তে যেগুলো তখনও গুঁড়ো করার দরকার সেগুলোর দিকে নজর দিলেন।

খন্তা কিছু একটা শক্ত জিনিসে আঘাত করল। বৃদ্ধ দেখবার জন্য ঝুঁকলেন কিন্তু দুর্বল দৃষ্টি শক্তির জন্য মণিমুক্তার থলিটা দেখতে পেলেন না। খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে চীৎকার করতে চাইলেন, "আরও ঝুঁক, বুড়ো। নিয়ে নাও, তুলে নাও!"

বুড়ো ছোট থলিটা শেষে দূর থেকে দেখতে পেলেন। তিনি থলিটা তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন এবং সোনার ঝলমলে ভাব এবং মণিমুক্তার ঠিকরে পড়া আলোয় বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

তিনি মণি-মুক্তাগুলো বার করে হাতে নিলেন—কাল, খেটে খাওয়া মাটি ভরা হাতে। একটা ব্রেসলেট মাটিতে পড়ে গেল এবং সেটা তুলতে গিয়ে বৃদ্ধ অন্যগুলোও মাটিতে ফেলে দিলেন। চুনীর নেকলেসটা একটা সাপের মত হাত গলে যখন নীচে পড়ে গেল একটা তেলের মত ঝলক দিয়ে উঠল সোনাটা, বরফের মত নীল আলো তুলল নীলোৎপল মণি এবং পান্নাগুলো সবুজ ঝলক তুলল।

"জুলফিয়া! জুলফিয়া!" বৃদ্ধ কম্পিত গলায় চীৎকার করে উঠলেন।

সে শুনতে পেয়ে উদ্বেগে ছুটে এল।

"কি ব্যাপার বাবা? শরীর খারাপ করছে?" সে বলে উঠল কিন্তু মণিমুক্তা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এর আগে মোট দুবার সে সোনা দেখেছে কিন্তু মণিমুক্তা কখনই দেখেনি।

"এটা কি?"

বৃদ্ধ ততক্ষণে তাঁর সম্বিৎ ও যুক্তি দুই-ই ফিরে পেয়েছেন।

"এগুলো পেয়েছি। এখনই, আপেল গাছের নীচে। তোর প্রিয় গাছটার নীচে। ওঃ, জুলফিয়া সর্বশক্তিমান আল্লা আমাদের প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন। স্বর্গের একটা পরী নিশ্চয়ই আমাদের জন্য এগুলো এনেছে। জুলফিয়া, পরীটা নিশ্চয়ই তোর অভিভাবক!!"

খোজা নাসিরুদ্দিন চোরের বাহু ধরলেন।

"শুনতে পাচ্ছ—তুমি হচ্ছ একটা পরী।"

কোন শব্দ না করে হাসির দমকে ফেটে পড়ে একচোখো খোজা নাসিরুদ্দিনের পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

ইতিমধ্যে বাগানের মধ্যে আনন্দের একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। "সৈয়দ! সৈয়দ!" জুলফিয়া মধুর কণ্ঠে বলে উঠল। যুবক তার ডাক শুনতে পেল—সে তখনও বেশি দূর যায়নি—এবং ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। যে তিনজন মণিমুক্তো এনেছে বলে অনুমান করেছিল সে তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু কি ভাবে সেগুলো গাছের তলায় এল তা সে বুঝতে পারল না।

সেদিনের সবচেয়ে যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে গাছটাকে আবার রঙীন ফিতে দিয়ে সাজানো! "তোমার মনে করা উচিত!" খোজা নাসিরুদ্দিন জুলফিয়ার উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন। সে যেন তার অন্তরে তাঁর কথা শুনতে পেল এবং ছুটে বাড়ীর ভিতর গেল। এক মিনিট পরেই ধূমকেতুর মত সে হাজির হল—উৎসাহী, আনন্দে উজ্জ্বল, সঙ্গে রঙীন ফিতের গুচ্ছ। সূর্য ইতিমধ্যেই অস্ত গিয়েছে কিন্তু সিল্কের ফিতে ঢেউ তুলে ঝকঝক করছিল যেন নিজেরই আলো বিকিরণ করছে। জুলফিয়া আপেল গাছটাকে সাজাল এবং তার উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকের নিচে কাল রংয়ের ফিতেটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।

ফেরার পথে চোর বলল:

"আমি ভেবেছিলাম এই মেয়েটা পরীর মত সুন্দরী কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ আরজি-বিবির ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।"

"সাদি কি বলেছেন শোন, 'লায়লার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হলে মজনুর চোখ দিয়ে তাকে দেখতে হবে,'" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

হ্রদের পাশে কুঁড়েঘরে তিনি চোরকে পাঁচটা পাঁউরুটি, একটা পুরোনো কম্বল এবং একটা রান্নার পাত্র দিলেন।

"কাছাকাছি কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নাও শোবার জন্য। কেউ যেন তোমায় না দেখে বা চোরাকে তোমার উপস্থিতি জানতে না পারে। তুমি আমার কাছে খাবার পাবে তাও কেবল রাতে। আমার প্রথম ডাকেই সাড়া দেবার জন্য সব সময় তৈরি থাকবে। প্রবেশ পথের সামনে একটা খুঁটি দেখেছ? একটা সাদা রুমাল বেঁধে যদি এটা উপর দিকে তুলি তবে বুঝবে এটা একটা সংকেত এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে।"

"বুঝলাম।"

এই বলে চোর রাতের মত একটা আশ্রয় খুঁজবার জন্য চলে গেল। কাছেই একটা ছোট্ট গুহার মত জায়গা খুঁজে নিতে বেশি সময় লাগল না। এর প্রবেশ পথ ছিল জঙ্গলে ভর্তি যা বাইরের লোকের দৃষ্টির সামনে পর্দার কাজ করছিল।

সেই গুহাটা আজও আছে যার নাম "ন্যায়পরায়ণ চোরের আবাসস্থল।" গ্রামবাসীদের মধ্যে আজ অবশ্য একজনও গুহার এই নামকরণের যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারে না : এই চোর কে ছিল এবং সে কি ধরনের চোর ছিল যে কালের বুকে তার অবিনশ্বর চিহ্ন রেখে গিয়েছে ? এই বই সেই পরিত্যক্ত স্থান সম্বন্ধে সকলের অজ্ঞতা দূর করবে না, কারণ আমাদের পার্থিব জ্ঞান অসংখ্য ক্ষুদ্র জ্ঞানের সংগ্রহ মাত্র এবং জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র কণাও অতিরিক্ত নয়।

রাত সুরু হওয়ার আগেই চোর কিছু শুকনো লতা নিয়ে এসে তার বিছানা করল। একটা উনুন ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিস আজও সেখানে পড়ে আছে। ইতিমধ্যে রাত হয়ে এসেছিল। চাঁদের সামনে ভেসে বেড়ান মেঘগুলোতে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ায় কুয়াশার মত মনে হচ্ছিল ? নরম থাবাওয়ালা চারপায়ের কোন ছোট জন্তু চাঁদের আলোয় ভরা ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা জেগে ওঠা বাচ্চা পাখী ঘুমের ঘোরে চীৎকার করছিল।

চোর তার পাতার বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। তার ভ্রমণ-ক্লান্ত শরীর দিয়ে অবসাদের ঢেউ যেন বয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং মাঝে মাঝে অল্প হেসে উঠছিল বোধহয় তুরাখন বাবার কথা চিন্তা করে।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কুঁড়ে ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন এক দোদুল্যমান আপেল গাছ ছ'টা রঙীন ফিতা দিয়ে যা সাজান ছিল।

আগাবেক ঘুমাচ্ছিলেন এবং ঘুমের ঘোরে কামাতুর আবেগে তাঁর পুরু ঠোঁট চেটে উঠলেন—তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন জুলফিয়াকে, যাকে পরদিন সকালে তিনি তাঁর জালে আশা করছিলেন। ঘৃণিত মাকড়সা, তোমার সব স্বপ্নই বৃথা! তোমার বীভৎস ও পৈশাচিক আহারের জন্য একটা প্রজাপতির বদলে একটা ভীমরুল রাখা হয়েছে। জাগরুকদের মধ্যে সে রাতে কেবল দুজনই ছিলেন না, ছিলেন তিনজন কারণ মামেদ আলিও সে রাতে ঘুমাননি—তাঁর মাথার নিচে বালিশের ভিতর লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তা পাহারা দিচ্ছিলেন।

সৈয়দ ও জুলফিয়া তাদের নির্ধারিত মিলন-স্থলে বসে গল্প করছিল—সেগুন গাছের ছায়ায় জলাশয়ের পাশে।

"জুলফিয়া, এখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে ?"

"হ্যাঁ সৈয়দ। বুঝতে পারছি না কিছুই! আমাদের রক্ষক ও বন্ধু, এই বিদেশী কে ?"

"জানি না জুলফিয়া। তিনি নিজের নাম বলেন নি। উঃ আমি কত সুখী।"

"আমিও আনন্দিত সৈয়দ!"

"চিরদিনের জন্য?"

"চিরদিনের জন্য! যদি তোমাকে আর ভালবাসতে না পারি তবে এই সেগুন গাছটা যেন আখ গাছে পরিণত হয়।"

সেগুন গাছ শুনল কিন্তু অবাক হল না: ঐ বেঞ্চিটার উপর অনেক প্রেমিক যুগলকেই সে দেখেছে, যুগ যুগান্তর ধরে অনেক ভালবাসায় ভরা কথা শুনেছে এবং সে জানত কত তাড়াতাড়ি—মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই—এই ব্যাকুল প্রেমিকের দল জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত দন্তহীন বৃদ্ধায় পরিণত হয়েছে। এখন কবরে যাবার আগে প্রায়ই তারা ছায়ার নিচে ঐ বেঞ্চিটার উপর এসে বসে; তারা কিন্তু আসে কেবল দিনের বেলায় যাতে সূর্যের উত্তাপ তাদের শীতল রক্তকে গরম করে তোলে, যে রক্ত একদিন তাদের দেহে নতুন মদের মত ফেনা তুলে ঝলক দিত।

ত্রিংশ অধ্যায়

"সেচ সুরু হওয়ার এই হচ্ছে সময়," আগাবেক মনের আনন্দে পরদিন সকালে খালের ধারে উপস্থিত হয়ে বললেন। "সত্যি, আজ আমি টাকার বদলে অন্য কিছু পাব অবশ্য অন্য সেচের কাজ পরে আসবে। আর্থিক ক্ষতির উশুল আমায় করতেই হবে। অবশ্য আমার হিসেবে ভুল হয়নি।''

হ্রদের জল নীল ও শান্ত দেখাচ্ছিল এবং তার উপর নীল ও স্থির আকাশ দেখাচ্ছিল একইভাবে শান্ত—গভীর, শীতল ও রাতের কুয়াশার জলীয় বাষ্পে ভরা—যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর নিশ্বাস।

"তোমাকে আজ এখানে সব দেখাশোনা করে নিতে হবে, কারণ আজ আমি খুব ব্যস্ত থাকব," আগাবেক বলে চললেন। "শীঘ্রই সেই সুন্দরীকে তারা আমার কাছে নিয়ে আসবে। আরে, ওরা তাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই আসছে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন গাঁয়ের দিকে তেরছা দৃষ্টিতে চাইলেন।

একদল লোক রাস্তা দিয়ে নেমে হ্রদের দিকে আসছিল।

"আমি তো কোন সুন্দরীকে দেখতে পাচ্ছি না," তিনি বললেন।

"কি বলতে চাইছ?"

আগাবেক নিচে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেন, পরে হতবুদ্ধির দৃষ্টিতে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চাইলেন।

"একটু ভালভাবে চেয়ে দেখ উজাকবাই, তোমার দৃষ্টি আমার চেয়েও তীক্ষ্ণ।"

"সবাই বুড়ো মানুষ," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"বুঝলাম!" আগাবেক গম্ভীর হয়ে বললেন। "তারা আবার প্রার্থনা জানাতে আসছে! আমি কিন্তু তাদের চাটুবাক্যে ভুলতে বা তাদের চোখে জল দেখে গলে যাবার মত বোকা নই। কেমন করে ওদের শায়েস্তা করি নজর রাখবে।"

বাহু দুটো ঝাঁকিয়ে সে জোরে নিশ্বাস নিল, তার চোখ দুটো স্থির হয়ে এল, দাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে এল, ঘাড়ের পিছন দিকটা লাল এবং শক্ত হয়ে উঠল এবং চুলে ভরা তার ঘাড়টা কাঁধের সঙ্গে সমান হয়ে এল।

বৃদ্ধেরা সামনে এগিয়ে এল।

সবার সামনে হাঁটছিলেন মামেদ আলি। মাত্র একদিন আগে গতকাল তিনি ছিলেন শোচনীয়ভাবে ভীত এক বৃদ্ধ, কিন্তু এক রাতেই মনে হচ্ছিল তিনি যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছেন। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আগাবেকের মুখের দিকে সাহসের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে চাইলেন।

তাঁর পিছনে আসছিল দুজন চাষী, কামার, কুমোর, এবং ঘোড়ার ডাক্তার আর সরাই-রক্ষক, সফর ছিল সবার পিছনে।

দাসসুলভ কোন মনোভাব না দেখিয়ে মামেদ আলি সুন্দর নমনীয় ভঙ্গিতে সেলাম জানাল।

"সেচের সময় হয়ে এসেছে এবং জল পেতে ইচ্ছা করছি।"

অন্যেরা হাত বুলিয়ে দাড়ি চিকণ করতে করতে আল্লার কাছে আগামী ফসল ভাল হবার জন্য প্রার্থনা জানাল।

"জল পেতে?" আগাবেক রাগের সঙ্গে জানতে চাইলেন। "কিন্তু কি দেবে ঠিক করেছ? আমার সর্ত নিশ্চয় নিশ্চয়ই জান বুড়ো—তোমার মেয়ে।"

"আমার মেয়ে তো আর ব্যবসার পণ্য নয়," মামেদ আলি সম্ভ্রম ও দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল, যা একদিন আগেও কেউ তার কাছে আশা করেনি।

খোজা নাসিরুদ্দিনের মনে হল তিনি যেন ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরেন এই নির্ভীক উত্তরের জন্য। বৃদ্ধ এক স্থির ধারণা করে নিয়েছিলেন; ক্ষুধা এবং ভয় থেকে মুক্তি—এই দুটো জিনিস রক্ত থেকে ক্রীতদাসসুলভ মনোভাব মুছে ফেলার জন্য যে কোন মানুষের প্রয়োজন।

আগাবেক অবাক হয়ে মামেদ আলির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কোথা থেকে বৃদ্ধ এত দুঃসাহস পেল ?

"তুমি কি দিয়ে পাওনা শোধ করতে চাইছ ?"

"এই যে !"

বৃদ্ধ একটা জরাজীর্ণ চামড়ার থলি বার করলেন তাঁর কোমরবন্ধনী থেকে।

"এটা কি ?"

"দেখুন।"

আগাবেক থলিটা নিয়ে সুতো ধরে টান দিলেন।

সফর, সবার পিছনে দাঁড়িয়ে তার হাড় জিরজিরে গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। তার স্থির বিশ্বাস ছিল এবং এখনও বিশ্বাস আছে যে কিছুই ভাল ফল হবে না এবং প্রমাণ হবে যে মণিমুক্তাগুলো সব নকল; সেদিন সকালে সরাইখানাতে সে এই কথাই বলেছিল। এই বিস্মিত লোকটা আনন্দ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হবে যখন আনন্দ নিজেই পাখায় ভর করে তার কাছে এগিয়ে এসেছে।

অন্যেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা জয়ে আনন্দ করতে বা অপমানে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

সোনা ও মণিমুক্তো দেখতে পেয়ে আগাবেকের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

"এসব কোথায় পেলে ?"

"আমি পেয়েছি।"

"পেয়েছ ? কোথায় ?"

"আমার বাগানের আপেল গাছের তলায় ?"

"মামেদ-আলি, আমাকে অলীক গল্প বলছ ?"

"আমার অলীক গল্প বলার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমি কোথায় পেয়েছি তাতে কি যায় আসে ?"

"অদ্ভুত······সন্দেহজনক," অলংকারের থলিটা হাতে নিয়ে আগাবেক বিড় বিড় করে বললেন। সকালের উজ্জ্বল আলোয় তারা আগের দিনের অস্তগামী সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি ঝলমল করছিল।

"যারা চেনে তারা বলছিল এগুলোর দাম চার হাজার টাকার চেয়ে অনেক বেশি," মামেদ-আলি বলে চলল।

"যারা চেনে!" আগাবেক বিদ্রূপ করে বললেন। "কারা এখানে চেনে, সবাই তো তোমার মত না-দেখা ভাঁড়ের দল!" তিনি মণিমুক্তাগুলো পকেটে পুরলেন। "ঠিক আছে, আমি রাজী। উজাকবাই, জল যেতে দাও!"

চাবি তালাতে লাগান ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন তালা খুলে নিলেন। বুড়ো লোকেরা—এক এক দিকে দুজন করে—চড়কির ডাণ্ডা ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করল। শিকলে মরচে পড়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, দরজা ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে সুরু করল, জলে ভেজা নালিগুলো চাপে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দরজার নিচের ঘুরন্ত ফানেলগুলোর ভিতর দিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ জল তীব্র বেগে জলপ্রপাতের মত এসে পড়ছিল। এর গুঞ্জন ক্রমশঃ গর্জনে পরিণত হল; ঝরণার শুকনো বুকের উপর দিয়ে জল ছুটল, সামনে জলের মুকুটের মত ফেনার রাশি শুকনো পাতা, ঘাস, লতা, পাখীর পালক এবং অন্য যা কিছু সামনে পেল ভাসিয়ে নিয়ে চলল। মনে হচ্ছিল ঝকঝকে রেশমের পর্দা যেন খালের উপর তাড়াতাড়ি বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

জল! দূরে যেখানে জল এসে গিয়েছিল সেখানে নিড়ানির পর নিড়ানির ঠুনঠুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত পরে সব দিক থেকেই একই ধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল—জল ছড়িয়ে পড়েছে সবদিকে, প্রাণ সঞ্চার করেছে গাছের, লতাগুল্মের আর তাদের মাধ্যমে মানুষের। মামেদ-আলি ঝরণার জলের উপর কুঁজো হয়ে তাঁর কপাল ও দাড়ি ভেজালেন। বৃদ্ধ আল্লার কাছে মোনাজাত করলেন।

সারা দিন ধরে সফরের সরাইখানা ছিল খালি—কারণ লোকেরা সবাই সেদিন ছিল মাঠে। বিকেল গড়িয়ে যাবার আগে যখন গোধূলি হয়ে এল তখন তারা বাড়ীর দিকে রওনা হল, পিছনে সেচের কাজ দেখার জন্য রেখে এল বিশ্বাসী বৃদ্ধদের যারা সততার জন্য বিখ্যাত। এই বৃদ্ধরা প্রধান নালা থেকে ছোট ছোট নালায় জল যাওয়ার উপর পাহারা দেবে সারা রাত ধরে পালা করে এবং দেখবে যে প্রতিটি ক্ষেত এবং প্রতিটি বাগান যেন জলের প্রাপ্য অংশ পায়, এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। জলের চোর কামিল, যে যুবক কাল থেকে জল চুরি করার জন্য নিজের গাঁয়ের বাসিন্দাদের কাছে মার খেয়েছে বহুবার, তাকে এবার মোল্লাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হল; তারা তাকে সকাল পর্যন্ত গম্বুজের মধ্যে বন্দী করে রাখল।

আকাশে উঠতি চাঁদ যেন নিচের সেই ক্ষেত ও বাগানের দিকে চেয়ে দেখল ; এখন তাদের উপর দিয়ে একটা সরু রূপালি সুতো যেন ঝুলছিল উপচে পড়া ঝরণার উপর, ঝকঝক করছিল এবং বিভিন্ন দিকে কখনও বা আড়াআড়িভাবে ছুটে বয়ে যাচ্ছিল। সে রাতের নীরবতাও ছিল যেন একটু বিশেষ ধরনের— ঢেউয়ের গুঞ্জন ও ছলাৎ ছলাৎ শব্দে চারদিক মুখরিত ছিল ; সময়ে সময়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল পৃথিবী নিজে যেন দেহের উপর জলের শীতল স্পর্শ পেয়ে ঘুমের ঘোরে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

সারা দিন ক্ষেতে পরিশ্রমের পর মানুষগুলো এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে যখন তারা বাড়ী পৌঁছাল তখন সোজা বিছানায় হাজির হল। সরাইখানায় কেবল চারজন বৃদ্ধ রাতের বেলায় গল্প করে সময় কাটাচ্ছিল যতক্ষণ না তাদের পালা এল সোজা মাঠে যাবার এবং জল পাহারা দেবার। আলোচনা অবশ্য বার বার মোড় নিচ্ছিল মামেদ-আলির পাওয়া মণিমুক্তা নিয়ে। সে অবশ্য নিজে আলোচনায় কোন অংশ নিচ্ছিল না। সে একই গল্প গ্রামের প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথক ভাবে এতবার বলেছে যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং সমর্থনের জন্য শুধু বাক্যহীন "হুঁ হ্যাঁ" শব্দ করছিল এবং আপত্তি করতে হলে জিভ দিয়ে শব্দ করছিল।

"ঐ রত্নগুলো নিশ্চয়ই আপেল গাছের তলায় জন্মায়নি!" সফর উত্তেজনায় শব্দ করে উঠল।

"সম্ভবতঃ সেখানে মাটির উপর যুগ যুগ ধরে পড়েছিল," একজন বৃদ্ধ বলল।

মামেদ-আলি জিভ দিয়ে শব্দ তুললেন। শতাব্দী সত্যিই! তিনি কি প্রতি বছরই আপেল গাছের তলাটার মাটি খোঁড়েন না তবে কখনও আগে তো কই দেখতে পাননি?

"তুমি খেয়াল করনি। থলিটাকে তুমি হয়তো মাটির চাই ভেবেছিলে।"

এই ধারণা মামেদ-আলির আত্মসম্মানে আঘাত দিল। তিনি বাগানের সেই সব চাষীর মত নন যারা গাছের গোড়া খুঁড়ে দেবার সময় মাটির চাঁই রেখে দেয়।

"কেন অনুমান করছ, কেন ভাবছ!" রাগ সামলাতে না পেরে তিনি বললেন। "এই রত্নগুলো কোথা থেকে এসেছে? অবশ্যই আল্লার কাছ থেকে! তিনি কি সর্বশক্তিমান নন, তিনি কি সব কিছু অলৌকিক ঘটাতে পারেন না?"

সফর ভয় পেল।

"আল্লা? কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললে মামেদ-আলি! তুমি কি বলতে চাও যে আল্লা স্বয়ং গতকাল তোমার বাগানে এসেছিলেন?"

"নিজে কেন? তিনি তাঁর কোন ফকিরকে পাঠাতে পারেন—যেমন ধর তুরাখনকে।"

তুরাখন বাবা! কিছুক্ষণ আগেই তাঁর উৎসব হয়ে গিয়েছে। কোকান্দ ও অন্যান্য জায়গার মত চোরাকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাগানে ও আঙুর ক্ষেতে তাদের মাথার টুপি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তুরাখন বাবা! বুড়ো মানুষদের মনে স্মৃতি যেন ভীড় করে এল—সেই সব আনন্দমুখর দিনগুলির প্রতিধ্বনি, যখন তাঁরা নিজেরাই উত্তেজনায় প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় নিজেদের টুপিতে রঙীন সুতো সেলাই করেছিলেন। মনের নিস্তেজ স্মৃতিতে সেই সব প্রতিধ্বনি হয়তো মুছে গিয়েছে বা ক্ষীণ হয়ে এসেছে কিন্তু হৃদয়ে—কখনও মুছবে না!

কালি ঝুলি মাখা ছোট্ট সরাইখানায় সময় এইভাবেই পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্মৃতির রোমন্থন বৃদ্ধদের যেন আবার শিশু বানিয়ে ফেলল। দন্তহীন, শুকনো ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধদের দেখে মনে হচ্ছিল তাদের বয়স হয়েছে কিন্তু তারা যেন দেহের দিক থেকেই শুধু জীবন-সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছে, হৃদয়ে ধরে রেখেছে প্রত্যুষের সোনালি আলোর আভা যে আলো তাদের প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিল তাদের দোলনার উপর। সহকর্মীদের উপর মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস যাঁদের আছে তাঁরা জানেন আমরা প্রতিদিন আমাদের মধ্যে কতখানি শিশুত্বকে বহন করে চলি।

"সম্ভবতঃ তুরাখন বাবাই এসেছিলেন?" একজন বৃদ্ধ ভেবে বললেন।

"কিন্তু মামেদ আলির বাড়ীতে তো আর কাচ্চা বাচ্চা নেই," আর একজন সন্দেহ করে বললেন।

"তাতে কি যায় আসে?" মামেদ-আলি বললেন জোর গলায়। "জুলফিয়া যখন ছোট ছিল তখন যদি তাঁকে তুরাখন বাবা ভালবেসে থাকেন তবে আজই বা বাসবেন না কেন?"

শেষে বুড়োরা এই সিদ্ধান্তে এল যে মামেদ-আলি ঠিকই বলছে—তুরাখনই সেখানে মণিমুক্তা রেখেছিল।

সাবা রাত এগিয়ে আসতে আলোচনায় বাধা পড়ল। বুড়োরা মাঠে গেল।

মামেদ-আলি নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে রাতের আকাশ ও তারাদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আনন্দে চোখের অশ্রুবাষ্প যেন তাঁকে অন্ধ করে তুলল, চোখ দুটো ফুলে উঠে গরম হল ও বন্ধ হয়ে গেল।

যে ক্ষেত ও বাগানগুলো তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল সেগুলো নালা থেকে ছিল অনেক দূরে। কাঁধে একটা নিড়ানি নিয়ে তিনি তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং প্রধান নালা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছোট ছোট নালাগুলো সযত্নে পরীক্ষা করছিলেন ও জলের স্রোত দেখছিলেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে নিড়ানির দু এক কোপ দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখে আবার পথ ধরে এগিয়ে চললেন। জল তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কখনও বা গাছের কাল ছায়ার নিচে লুকিয়ে আবার কখনও বা তারার গুচ্ছের মত রূপালি আলোর ঝলক তুলে বেরিয়ে আসছিল।

একটা আড়াআড়ি রাস্তা তাঁর পথে এসে পড়ল। একটু দূরে একটা পায়ে চলা সেতুর উপর দুজন রাতের পথচারীকে দেখতে পেয়ে তিনি থামলেন। তিনি ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। একটা গলার স্বর—আগাবেকের, তিনি চিনতে পারলেন। অন্যটা তাঁর ধারণা হল হ্রদের নতুন রক্ষকের।

"তাহলে কাল, উজাকবাই তুমি আমার কাছে সেই গোপন তথ্য প্রকাশ করবে?"

"হ্যাঁ, হুজুর, কাল মাঝ রাতে।"

"কথা যেন মনে থাকে।"

"আমার মনে থাকবে এবং আমি কথা রাখব।"

তাঁরা সেতু থেকে নেমে মামেদ-আলির দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মুখ দেখতে বৃদ্ধের ঘৃণা হচ্ছিল কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না।

"ওখানে কে?" আগাবেক বললেন।

"আমি মামেদ-আলি। জল পাহারা দিচ্ছি।"

"ওহো আমেদ আলি! বেশ বেশ। এখানে পাহারা দিলেও মেয়েকে পাহারা দিতে ভুলবে না! এই সেচের পর আবার তো সেচ হবে।"

বুড়োর মুখ রাগে জ্বলে উঠল। একটা যোগ্য উত্তর দেবার জন্য সে মাথা তুলল কিন্তু পরে আর গোলমাল করল না। তাঁর রক্তে মেশা বিষ যেন তখনও শান্ত হয়নি। সেদিন সকালে এ বিষ রক্তে এসে মিশেছে এবং সকালের ঔদ্ধত্যের যোগ্য প্রতিশোধ দেবার যেন সুযোগ খুঁজছে। এই বিষ যেন

আগাবেকের এবং পৃথিবীর অন্যায় ও দুর্নীতিপরায়ণ সকল আগাবেকের পরম শত্রু।

"প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে," কানের কাছে এরা যেন এসে বলে। এ কিন্তু মিথ্যা! যারা এই নিয়মে পৃথিবীতে বাঁচবার চেষ্টা করে তারা কখনও মহৎ কাজে অংশ নিতে পারে না!

বৃদ্ধ একটা পাথরের চাঁই-এর উপর বসেছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন। একটা বিপদ কেটে যেতে না যেতেই আর একটা বিপদের আশংকায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

আগাবেক যদি আবার জুলফিয়াকে দাবী করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করবেন। নিজের দাবীতেই তিনি তা করবেন, কারণ তিনি তো সকলের জন্য জলের মূল্য দিয়েছেন। এবার হবে অন্যের পালা। কিন্তু আগাবেক যদি টাকা নিতে অস্বীকার করে? তখন হয় জুলফিয়াকে পরিত্যাগ করতে হবে নয়তো জলহীন হয়ে থাকতে হবে। আর একবার বৃদ্ধেরা সরাইখানায় এসে জড় হয়ে বলবে, "মামেদ-আলি, তুমি একাই আমাদের রক্ষা করতে পার।" তখন কি করব?

"এর একটি মাত্র উপায় আছে এবং খুব সহজ উপায়," হঠাৎ তিনি খুব কাছে গলার স্বর শুনতে পেলেন।

বৃদ্ধ চমকে উঠলেন।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল হ্রদের রক্ষক। একা, আগাবেক ছাড়া।

"কি উপায়? কি থেকে?"

"যার থেকে মুক্তির কথা আপনি চিন্তা করছেন।"

"আমি কিছু ভাবছি না। আমি ঢুলছিলাম।"

"তাই হল—যার থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপনি ঢুলছিলেন। তাড়াতাড়ি সৈয়দের সঙ্গে জুলফিয়ার বিয়ে দিয়ে দিন—তাহলেই হল। ওরা যখন স্বামী স্ত্রী হবে তখন কে আর ওদের পৃথক করতে পারবে?"

বৃদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। কি করে হ্রদের এই রক্ষক তাঁর চিন্তার কথা জানতে পারল?

"অবাক হবেন না," রক্ষক বলে চলল, "আমি যাদুকর নই, ভেল্কিও দেখাই না। আপনি নিজের মনে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে জোরে জোরে চিন্তা করতে সুরু করেছিলেন।"

জোরে চিন্তা—কি অবিবেচনা! বৃদ্ধ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কি অসাবধানতা! কাল সমস্ত কিছুই আগাবেকের গোচরে আনা হবে।

"আমি কিছুই ভাবছিলাম না—আমাকে একা থাকতে দাও। আমার বা আমার ছেলেদের ব্যাপারে তোমার থাকার কি দরকার?"

"আহা! 'আমার ছেলেদের'—আপনি বললেন। এর অর্থ আপনি অনেক দিন আগে থেকেই তাদের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। যা বাকী আছে তা হচ্ছে মোল্লাকে ডাকা।"

আর একটি ভুল! সাংঘাতিক লোক হ্রদের এই রক্ষক। তার সঙ্গ বেশ বিরক্তিকর। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাকে দূরে রাখা।

বৃদ্ধ এক বিরাট হাই তুললেন এবং নিড়ানিটা কাঁধের উপরে তুলে নিলেন।

"আমি এবার জল দেখতে যাব।"

কিন্তু হ্রদের রক্ষককে এড়িয়ে চলা এত সোজা ব্যাপার ছিল না। সে তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগল।

"সত্যি বলুন, আমেদ-আলি—এই মণিমুক্তো কে আপনাকে দিয়েছে? দিব্যি করে বলছি আপনার গোপন তথ্য আমার সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করবে।"

আগাবেকের গুপ্তচর! আকাশে তুলে গোপন খবর নেবার চেষ্টা করছে।

"আমার বাগানের আপেল গাছের তলায় শিকড়ের নিচে আমি সেগুলো কুড়িয়ে পেয়েছি," বৃদ্ধ রাগের সঙ্গে বেশ রুক্ষভাবেই উত্তর দিলেন।

"কিন্তু কে সেখানে রেখেছিল?"

বৃদ্ধের ধৈর্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে হ্রদের রক্ষকের চোখের দিকে চাইলেন।

"কে রেখেছিল? নিশ্চয়ই একজন রেখেছিলেন যে তোমার বা তোমার মনিবের মত দেখতে নয়, নিশ্চয়ই তাঁর অন্তঃকরণ ছিল দয়ালু, যাঁর নাম সর্বত্র এবং সকল যুগে উচ্চারিত হয়। বুঝতে পারছ?"

এই বলে তিনি ফিরলেন, মনে করলেন যে রক্ষকের সঙ্গে তাঁর আলোচনা শেষ করার জন্য যেটুকু বলা উচিত তার চেয়ে বরং বেশিই বলা হয়েছে।

রক্ষক কিন্তু গেল না। পথ অবরোধ করে সে দাঁড়াল।

আমেদ-আলি তাকে শান্ত কিন্তু উদ্ধত ভঙ্গি দেখিয়ে পাশে সরিয়ে দিলেন।

"আমাকে যেতে দাও······" তিনি বললেন।

ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল : রক্ষক হঠাৎ বৃদ্ধের কাঁধ ধরে ধীরে ধীরে তিনটে টোকা মেরে বলল :

"কেন, অবশ্যই তিনি তুরাখন বাবা ! আমাকে অনুমান করতে বলছেন কেন ?"

হঠাৎ খুব দ্রুত সে মামেদ-আলির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে নিচের দিকে চলে গেল, প্রায় ছুটেই চলে গেল।

একটা পাগল ! বৃদ্ধ আর কোন অর্থ খুঁজে পেলেন না। আশ্চর্য যে আগাবেক বুঝতে পারেনি। সে কি অন্ধ হয়ে গিয়েছে ?

বেশ, যদি সে না দেখেই থাকে তবে সেটা তার অর্থাৎ মামেদ-আলির ভাবার কথা নয়। এটা তো আর তার মাথা নয় যেটা একদিন ঐ পাগল লোকটার নিড়ানির আঘাতে ফেটে দু টুকরো হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দুজনের কাছ থেকেই দূরে থাকা যায়—তাদের ব্যাপার তারা নিজেরাই মীমাংসা করে নিক। ঠিক এই সময় বৃদ্ধের চিন্তাসূত্র ভেঙ্গে গেল এবং তিনি জলের আশায় ধীরে নালার ধার বরাবর পিছন দিকে চলে গেলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন কিন্তু হাঁটছিলেন না, তিনি তাঁর কুঁড়ে ঘরে প্রায় উড়ে গেলেন।

চোর তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল, বাইরের কাঁটাঝোপের মধ্যে প্রায় গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে বসেছিল।

এটা একটা বিশেষ সাক্ষাৎকার। খোজা নাসিরুদ্দিন যখন বলছিলেন তখন চোর কৃতজ্ঞতায় প্রায় চোখের জলে ভাসছিল :

"হ্যাঁ, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে, এমন কি তাঁর অনুগ্রহের বিশেষ চিহ্নও দেখান হয়েছে। তুমি কি তুরাখনের গৌরবের কার্যাবলী প্রচারের জন্য আরও কিছু করতে চাও ?"

চোর চোখের জলে কেঁদে উঠল এবং বুকে জোরে একটা ঘুঁষি মেরে কেঁদে বলল :

"দাক্ষিণ্য দেখাতে এখন আমি এমন উৎসাহ পাচ্ছি যে এখন ইচ্ছা করলে মুদ্রা-বিনিময়কারীকে আস্ত আমি চুরি করে নিয়ে আসতে পারি, সঙ্গে নিয়ে আনতে পারি তার দুশ্চরিত্র স্ত্রী ও তার প্রণয়ীকে। আপনি শুধু আদেশ করুন।"

"তোমাকে যদি গাধা হতে বলি তবে কি করবে ?"

"পাখা ?" চোর কান্না চেপে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বলল। "সারা জীবনের জন্য ?"

"না অল্প দিনের জন্য। মন দিয়ে শোন।"

তাঁরা সকাল পর্যন্ত আলোচনা করলেন; প্রথমে আবছা মনে হচ্ছিল; সকালের আলো রাত্রির কাছে বাধা পেল যেন আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছিল; শেষে আলোর জয় হল এবং রাত্রির বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল, এদিকে অন্ধকার পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে আবছা পাহাড়গুলোর পিছনে লুকাল। সেই স্থান আলোকিত হোক! সূর্য উঠল এবং অসীম পৃথিবীর উপর অঝোর ধারায় আলোর বর্ষণ হল। পাখীরা জোরে গান গেয়ে উঠল।

চোর কুঁড়েঘর ছেড়ে বুকে নতুন আনন্দ ও আশার বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল।

একত্রিংশ অধ্যায়

দিন যেন যন্ত্রের পাখা মেলে উড়ে চলল আর রাত্রি ঝলমলে তারকা-খচিত আলখাল্লা পরে আর একবার সামনে সে হাজির হল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর কুঁড়ে ঘরের সামনে একটা পাথরের চাঁই-এর উপর বসেছিলেন, মনে মনে ভাবছিলেন সেদিনের নির্ধারিত কর্মসূচীর ব্যাপারে সব কিছু ঠিক আছে কিনা, যা করার তা করা হয়েছে কিনা।

রাস্তার নুড়ি মাড়িয়ে আসার ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। ইনি আগাবেক, গোপন খবর শোনবার জন্য কুঁড়ে ঘরের দিকে ছুটে আসছেন।

সেদিন রাতে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার উপযোগী গাম্ভীর্যের ও মর্যাদার সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর দিকে চাইলেন। তাঁর সেলাম ছিল সংযত ও সম্ভ্রমপূর্ণ, তাঁর চলাফেরা ছিল সুসংহত, তাঁর ভাষা ছিল স্বল্প কিন্তু হৃদয়গ্রাহী।

অতিথিকে বিছানায় বসিয়ে তিনি নিজে জ্বলন্ত উনুনের পাশে বসলেন এবং একটা ছোট পাত্রের মধ্যে ফুটন্ত কয়েকটা শিকড়কে একটা ছোট চামচ দিয়ে নাড়তে থাকলেন, একটা তীব্র গন্ধ বেরিয়ে আসছিল।

"এটা কি ?" আগাবেক জিজ্ঞাসা করলেন।

"যাদুকরের পাঁচন," তাঁর দিকে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন, তাঁর মুখের একদিকে উজ্জ্বল আলো ও অন্যদিকে ছায়া এসে পড়ছিল।

উনুনে আগুনের শিখা দপ্ দপ্ করে নিভে আসছিল ; কুঁড়ে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে এল ; কোণে গাধাটা অন্ধকারে আড়াল হয়ে পড়ল, তার উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছিল তার পেটের ঘর্ঘর শব্দ এবং নাকের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস থেকে।

খোজা নাসিরুদ্দিন পাত্রটা উনুন থেকে তুলে নিয়ে এক টুকরো শক্ত কাগজ দিয়ে ঢাকলেন।

"এটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হোক, ততক্ষণ আমরা গল্প করি," তিনি বললেন। "ইতিমধ্যে আপনাকে তৈরি করে নিই, তা নাহলে ভয়ে এবং আশ্চর্য হয়ে আপনার জীবন হয়তো শেষ হয়ে যাবে।"

"কেন, এ কি খুব বিপজ্জনক ?"

"নতুনদের পক্ষে—হ্যাঁ।"

তিনি ছাইয়ে ফুঁ দিয়ে একটা তেলের প্রদীপ ধরালেন এবং দেওয়ালে বেঁধে রাখলেন। এর আবছা আলোয় গাধাটা কোণের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল—প্রথমে তার গোল চোখগুলো সবুজ দেখাল, পরে তার লম্বা কান ও তার লোমে ভরা লেজ দেখা গেল।

সেদিন সে কেবল আধ ঝুড়ি পাউরুটি পেয়েছিল, বাকীটা উল্টো দিকে দেওয়ালের কোণে রাখা ছিল যেখান থেকে তাদের লোভনীয় গন্ধ তার নাকে ভেসে আসছিল। সে অধীর হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং মাটির মেঝেয় পায়ের আঘাত দিতে লাগল। খোজা নাসিরুদ্দিন যেন হার মানতে রাজি নন এবং তার দিকে চাইলেন না পর্যন্ত।

খোজা নাসিরুদ্দিন অন্য ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ডুবে ছিলেন।

"আলিফ! লাম! মিম!" তিনি অত্যন্ত কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠলেন ফলে আগাবেক লাফ দিয়ে উঠলেন। "আলিফ! লাম! রা! কাবাহাস, চিনোজা, টুনজুহ, চুনজুহ!"

হাত উপর দিকে তুলে তিনি কুঁড়েঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতি কোণে একবার থামলেন, পরে সযত্নে দরজা বন্ধ করে নিজের আসনে এসে বসলেন।

"এখন আমাদের কথা কেউ আর শুনতে পাবে না।"

"কে আর আমাদের কথা শুনতে পারত?" আগাবেক প্রশ্ন করলেন। "আমরা দুজন ছাড়া এখানে আর কেউ ছিল না, অবশ্য গাধাটাকে বাদ দিয়ে।"

"চুপ করুন হুজুর! কতবার না আমি আপনাকে বলেছি ঐ বাজারে কথা জোরে জোরে না বলতে!"

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গাধাটাকে সেলাম করলেন। গাধাটাও তৎক্ষণাৎ কান খাড়া করে ও লেজ নেড়ে আনন্দে নেচে উঠল।

কোন পাঁউরুটি পাবার আশা অবশ্য ছিল না।

"না হুজুর, আমরা এখানে তিনজন আছি, দুজন নয়," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আপনি হয়তো জানেন না যে দেখা যায় এমন প্রাণী ছাড়াও পৃথিবীতে অসংখ্য অদৃশ্য প্রাণী আছে যারা মানুষের ভাষা কিন্তু কোন অংশে কম বোঝে না?"

"অদৃশ্য? কে মানুষের ভাষা বোঝে? ওরা কারা?" আগাবেক বিদ্রূপ করে বললেন যেন তাঁর মনের সাহস ও নির্ভীক ভাব দেখাতে চাইলেন।

"এরা হচ্ছে যারা অপমৃত্যুতে মরে, বিশেষ করে ফাঁসিতে, তাদের আত্মা," ব্যাখ্যা করে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "স্বর্গে মহান বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ খুঁজতে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। তারা সর্বদা একজন জীবন্ত মানুষকে আঁকড়ে ধরে এবং তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে যতক্ষণ না সেই জীবন্ত মানুষ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। আপনার পক্ষে, হুজুর, এরা বেশ বিপজ্জনক," তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বললেন।

"আমার পক্ষে কেন?" তিনি ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমাকে বলুন—খোরেশমে শহরে প্রধান কাজীর পদে যখন ছিলেন তখন কি কাউকে কোনদিন ফাঁসীর হুকুম দেননি?"

কথাগুলো যেন আগাবেকের মাথায় এসে কম্বলে ঢাকা একটা মুগুরের মত আঘাত করল—নরম হলেও সংজ্ঞাহীন করার অবস্থা। দুর্বোধ্য বিদ্রূপ তাঁর মুখ থেকে মুছে গেল এবং তিনি ভয়ে ভয়ে অন্ধকারে চারদিকে চাইতে লাগলেন; মনে হল চারপাশের অন্ধকার যেন হঠাৎ জীবন্ত, রহস্যময় গভীর এবং পাপময় হয়ে উঠেছে।

"বেশ, হ্যাঁ······কর্তব্যের খাতিরে······"

"তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন! কিন্তু তাদের আত্মার পাপমুক্তির জন্য আপনি কি প্রার্থনার আদেশ দেননি?"

"প্রার্থনা? এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে সর্বনাশা হতে পারত, কারণ খোরেশমে সহরে বিভিন্ন ধরনের আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

"সেইজন্যই অদৃশ্য আত্মারা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তুমি কি করে জানলে যে তারা আমার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে?"

"কারণ অভ্যস্ত চোখে তাদের মাঝে মাঝে দেখা যায়—খানিকটা চিহ্ন মাত্র, কাঁচের মত স্বচ্ছ কিছু একটা যেন বাতাসে ভাসছে। বহু দিন আগে থেকেই আমি তাদের আপনার মাথার কাছে ঘেরাফেরা করতে দেখেছি। আপনি নিশ্চয়ই একাধিক বার তাদের দেখে থাকবেন কেবল আপনি জানেন না যে তারা কারা।"

স্থূলকায় হওয়ার জন্য আগাবেক সাদা সাদা ছোট পোকা বহুবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে দেখেছেন, বিশেষ করে সেই সব সময় যখন তিনি কিছুটা কুঁজো হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন।

"হ্যাঁ আমি দেখেছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এসব জন্মেছে বেশি রক্ত হওয়ার জন্য।"

"যদি বেশি রক্ত হওয়ার জন্য হত তবে তাদের রং লাল দেখতে পেতেন, আপনি কিন্তু রংহীন অবস্থায় দেখতে পান, যেন তাদের কোন অস্তিত্ব নেই," খোজা নাসিরুদ্দিন অনেক ভেবে বললেন।

এ ধরনের প্রবল যুক্তির বিরুদ্ধে আগাবেক কিছুই বলতে পারলেন না। খোজা নাসিরুদ্দিনের যুক্তিতে তাঁর চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেল।

তিনি উপর দিকে চাইলেন কাঁচের মত স্বচ্ছ পোকাগুলো তাঁর ধার কাছ থেকে সরে গিয়েছে কিনা দেখাবার জন্য। তাঁর মোটা ঘাড়ের পিছন দিকটা শক্ত হয়ে উঠল এবং রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল যখন তিনি অসংখ্য পোকা সামনে দেখতে পেলেন। তিনি ভয় পেলেন।

"দেখ উজ্জাকবাই!" তিনি করুণভাবে চীৎকার করে উঠলেন। "ঐ যে ওরা ওখানে! ওরা এখানে! ওরা চলে যায়নি!"

"শান্ত হোন হুজুর, মনে শক্তি আনুন!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। আগাবেককে ভয় দেখান তাঁর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। "এসব অজ্ঞ জিনিস, এগুলো কিছুই না। সেই ভয়ংকর পোকাগুলো চলে গিয়েছে এবং ক্ষতিকর নয়।"

"ঠিক আছে, কিন্তু ওরা যদি ফিরে আসে তবে কি হবে—সেই ভয়ংকর

লোকগুলো। ওদের এড়াবার জন্য আমি তো আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কুঁড়ে ঘরে কাটাতে পারি না! এই উজাকবাই, এই মূর্খ, আমাকে বললে কেন? আমি বেশ ছিলাম, কিছুই জানতাম না……”

“আপনি খুব সহজেই তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় মোল্লাদের দিয়ে প্রার্থনা করাতে পারেন। এক বছর এখনও আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের দক্ষিণা দিয়ে দেবেন তাহলেই যথেষ্ট।”

এই উপদেশ দিতে গিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিনের উদ্দেশ্য ছিল আগাবেকের পয়সায় চোরাকের মসজিদটা ভাল করে নেওয়া, কারণ তার জীর্ণ দেওয়াল, মলিন ছবি এবং ঘুণ ধরা খুঁটিগুলো বহু দিন ধরেই প্রার্থনায় সমবেত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আগাবেক ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী সদস্য কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট—সুতরাং তাঁর শাস্তি হওয়া দরকার।

“হ্যাঁ আমি দিয়ে দেব!” একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। “এমন কি আমার যদি হাজার টাকাও লাগে তবুও দেব।” দেখ, লোকগুলো কত বড় পাপী এমন কি মারা যাবার পরেও তারা তাদের পাপ কাজ বন্ধ রাখেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে……”

“দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দ্বিতীয়বার ফাঁসী দেওয়া সম্ভব নয়,” খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর হয়ে কথাটা শেষ করলেন।

“ফাঁসির প্রয়োজন নেই। আল্লা তাদের অন্যভাবেও শাস্তি দিতে পারেন।”

জেল দেওয়া বা বেত মারার চিন্তায় ভরা তাঁর পাপ-মন এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করতে পারে না, এমনকি তখনও পারত না, যদি এই পার্থিব সংসারের বাইরে যে রহস্যময় জগৎ আছে সেখানে যদি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত।

আগাবেক এখন খোজা নাসিরুদ্দিনের ইচ্ছামত তৈরি হয়ে উঠেছেন, ফলে খোজা নাসিরুদ্দিন এখন তাঁকে আসল কাজের কথায় আনতে চাইলেন অর্থাৎ যে গোপন তথ্য আগাবেক জানতে চেয়েছেন সেই তথ্য জানাতে।

বাস্তবিক গোপন তথ্য খুব আশ্চর্যজনক মনে হল, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যেন সম্পূর্ণ লোপ পাইয়ে দেয়। গোপন তথ্য হচ্ছে কোণে যে গাধাটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা আসলে গাধা নয়, মিশরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, মিশরের বর্তমান সুলতান হুসেন আজির একমাত্র পুত্র; যাদুমন্ত্রে গাধায় পরিণত হয়েছে।

আগাবেককে সমস্ত ঘটনা বলতে গিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন নিজেই অবাক হয়ে

যাচ্ছিলেন যে এত সুন্দর ও সহজভাবে কথাগুলো কি করে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"সেই জন্যই আমি ওকে কাঠবাদাম ও দুধ পাউরুটি খাওয়াই অন্য কোন ভাল খাবার এই গণ্ডগ্রামে পাই না বলে। উঃ আমি যদি রোজ এক ঝুড়ি মধুতে ভেজান গোলাপ ফুলের পাপড়ি পেতাম!"

আগাবেকের মাথা আগে থেকেই ভারাক্রান্ত ছিল, এখন মনে হচ্ছে যেন ঘুরছে। তিনি কাঁচের মত স্বচ্ছ পোকার কথা বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু এটা তিনি বিশ্বাস করেননি।

"মাথা ঠিক রাখ উজ্জাকবাই! কি ধরনের যুবরাজ সে? ও একটা পুরোদস্তুর গাধা!"

"শ-শ-শ! আপনি কি আর অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না হুজুর? আপনি কি বলতে পারেন না 'চারপেয়ে' বা 'লেজবিশিষ্ট' বা 'দীর্ঘকর্ণ' অথবা 'লোমে ঢাকা'।"

"ঐ চারপেয়ে লেজবিশষ্ট বড় কানওয়ালা চামড়ায় ঢাকা গাধাটা!" আগাবেক সংশোধন করে বললেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন হতাশায় মুখ নিচু করলেন।

"যদি আপনি সংযত হতে না পারেন, হুজুর, তবে অন্ততঃ চুপ করে থাকুন।"

"চুপ করব?" বিদ্রূপ করে আগাবেক বললেন। "আমি? আমার নিজের জমিদারীতে? তাও কিনা এক বদমাস……"

"সংযত হন, হুজুর, আমি প্রার্থনা করছি!"

"গাধা!" অনিচ্ছায় আগাবেক শেষ করলেন যেন একটা ভোঁতা পেরেক গর্তে ঢোকাচ্ছেন।

নিস্তব্ধতা প্রায় মিনিটখানেক বজায় ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর জামা খুলে পপলার গাছের খুঁটির উপরে বিছিয়ে রাখলেন যাতে গাধার আস্তাবলের সামনে সেটা পর্দার কাজ করে।

"এখন আমরা আরও খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব, অবশ্য যদি আপনি আপনার শিঙার মত কর্কশ গলাটা একটু নামিয়ে নেন। আপনি যদি ঐ অবাঞ্ছিত কথাটা আবার উচ্চারণ করতে চান তবে ফিসফিস করে বলবেন।"

"ঠিক আছে," বিদ্রূপ করে আগাবেক বললেন। "আমি চেষ্টা করব। সত্যি বলতে কি আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না……"

"শীঘ্রই বুঝতে পারবেন। আপনি কি অবাক হয়েছেন? আপনি যুক্তি দিয়ে বুঝে উঠতে পারছেন না কি করে লম্বা কান ও লেজ সমেত একটা ধূসর চামড়ার মধ্যে একজন আস্ত মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, তাও কি না রাজ-পরিবারের লোক? আপনি কি কখনও রূপ পালটানোর গল্প শোনেননি?"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সে যুগে মুসলমান জগতে এ ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও তখন এই সব নিয়ে মোটা মোটা বই লিখতেন। এদিকে বাগদাদ শহরে আল-ফারুখ-ইবন-আবদাল্লা নামে একজন লোক ছিলেন যিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর নিজের দেহেই এ ধরনের রূপান্তর তিনি বহুবার করেছেন—প্রথমে মৌমাছি, পরে মৌমাছি থেকে কুমীর, কুমীর থেকে বাঘ এবং পরে বাঘ থেকে আবার নিজের দেহে ফিরে এসেছিলেন। একটি রূপান্তরই আল-ফারুখ কখনও করতে পারতেন না, তা হচ্ছে বদমাসকে সাধু ব্যক্তিতে রূপান্তর করা—এটা অবশ্য অন্য ধরনের গল্প যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আবার আমাদের কুঁড়ে ঘরে ফেরা যাক।

"শুনেছি বটে তবে মনে হত এ সব অলস মনের কল্পনা," আগাবেক বললেন।

"এখন আপনি নিজের চোখে দেখছেন।"

"কিন্তু তার প্রমাণ কই?" আস্তে বললেন—"গাধাটা কি রাজ পরিবারে জন্মের কথা কিছু বলে?"

"কেন তার লেজ? লেজের ডগায় সাদা চুল?"

"সাদা চুল? ব্যস এই প্রমাণ? কেন আমি যে কোন গাধার লেজের ডগায় শ' খানেক সাদা চুল বার করতে পারি!"

"চুপ করুন, হুজুর, চুপ করুন—ফিসফিস করে বলুন। আপনি কি আরও নিশ্চিত প্রমাণ চান?"

"হ্যাঁ চাই! যদি ঐ গাধাটা রাজপুত্র হয় তবে তাকে আমার চোখের সামনে মানুষে পরিণত কর অথবা অন্য কোন মানুষকে গাধায় পরিণত কর। তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।"

"আজ আমি তাই করতে ইচ্ছা করছি—তাকে তার রাজরূপে কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে আনব। আল্লার মাহাত্ম্যে যদি অন্য কোন মানুষকে গাধায় রূপান্তরিত করতে চান তাও করা যেতে পারে।"

"তাহলে সুরু কর। এখন প্রায় মাঝরাত।"

"হ্যাঁ, মাঝরাত। আমি সুরু করছি।"

তিনি সুরু করলেন। তিনি জানতেন যে আগাবেকের মোটা বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করা সোজা ব্যাপার নয় তাই তিনি কোন উদ্যম বা উৎসাহ দেখালেন না। তিনি কুঁড়েঘরের চারপাশে ঘুরলেন, কর্কশ গলায় মন্ত্র পড়তে লাগলেন, নিজের শরীরকে দেওয়ালে আছড়ে আবার সামনের দিকে প্রতিফলিত হয়ে এলেন, তিনি পায়ের ধাক্কা দিতে লাগলেন এবং পরে মেঝের উপর পড়ে যন্ত্রণায় হাত পা দুমড়াতে ও মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে লাগলেন। পরে ঘেমে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি গাধার উপর সেই পাঁচনের জলটা ঢালতে লাগলেন; জন্তুটা ফোঁস ফোঁস করে ও মাথা নেড়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করল।

"কাবাহাস!" আস্তাবলে ঢুকে খোজা নাসিরুদ্দিন রুদ্ধকণ্ঠে বললেন। "সুফ! চিমোজা দোচিমোজা, কালামাই, জামনিহোজ!"

ঠিক সেই সময় আগাবেকের অলক্ষ্যে তিনি জামার নিচে থেকে একটা সুগন্ধী মুখরোচক পাঁউরুটি বার করে গাধার নাকে গুঁজে দিলেন যাতে সে তার দাঁতের মধ্যে সেগুলো আনতে না পারে। এই সহজ উপায়ে তিনি গাধাটাকে প্রায় উন্মাদ করে তুললেন। জন্তুটা লেজ তুলে এবং খুঁটিতে পা দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে কর্কশ স্বরে চীৎকার করতে লাগল।

"সুৎসুগু! লিমচেজু!" শেষ লাইনটা উচ্চারণ করার সময় খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন এবং সমস্ত গা দিয়ে ঘাম ছড়াতে ছড়াতে আগাবেকের দিকে ছুটে গেলেন।

"আসুন, হুজুর। এবার আসুন! রূপান্তরিত হওয়া যেন কেউ না দেখে। এর শাস্তি হচ্ছে অন্ধত্ব! দুরারোগ্য, চিরজীবনের মত অন্ধত্ব!"

তিনি আগাবেককে কুঁড়েঘর থেকে বার করে নিয়ে আনলেন এবং নিজেও বেরিয়ে এলেন; আসবার সময় সযত্নে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

"আমাকে অনুসরণ করুন হুজুর। আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া যাক। এখানে থাকা বিপজ্জনক।"

রূপান্তরিত হওয়ার অনুষ্ঠানে কিছুটা বিহ্বল হয়ে বিনা প্রতিবাদে আগাবেক তার কথা মেনে চললেন।

যে পথটা নালার দিকে মোড় নিয়েছে সে দিকে তাঁরা বাঁকলেন। খোজা নাসিরুদ্দিনের এখানে হঠাৎ কাশির বেগ এল। রাত্রি যেন কোয়েল পাখীর

ডাক দিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। এটা একটা সংকেত যার অর্থ, "আমি প্রস্তুত!" সব কিছুই ঠিকভাবে চলল।

জলাশয়ের ধারে তাঁরা পাশাপাশি দরজা লাগান খুঁটিটার উপরে এসে বসলেন। রূপান্তরণ অনুষ্ঠানের পরেও নিশ্বাস নিতে খোজা নাসিরুদ্দিনের কষ্ট হচ্ছিল তাই তিনি বেশ পেটুকের মত জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে তাঁর হৃদপিণ্ড সতেজ হল এবং নিশ্বাস ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে এল।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাস আগাবেকের উপরও প্রভাব বিস্তার করল; তাঁর মাথার মোটা হাড়ের ভিতর যাদুবিদ্যার যে ধোঁয়া এতক্ষণ জমা হয়েছিল তা ক্রমশঃ দূর হয়ে যেতে লাগল। প্রকৃতির দিক থেকে অবিশ্বাসী হওয়ায় এবং মানুষের সমস্ত কার্যকলাপই বদমায়েসী এই তথ্যে বিশ্বাসী হওয়ায়, তিনি কুঁড়েঘরে একেবারে সন্দেহমুক্ত ছিলেন না এবং এখন এখানে মুক্ত বাতাসে, যেখানে আকার পরিবর্তনের কোন ঝামেলা আর নেই—তিনি আবার খানিকটা বিনয়ী ভাব ফিরে পেলেন। তাঁকে বোকা বানানোর জন্য বিরক্তির সঙ্গে খানিকটা রাগ এসে মিশল।

তিনি বিদ্রূপ করে হেসে উঠলেন।

"আচ্ছা, উজাকবাই, তোমার অলৌকিক ঘটনার খবর কি?"

"এখনও হয়নি হুজুর। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

"অপেক্ষা করে লাভ হবে না। তোমার বদমায়েসী বুদ্ধি ব্যর্থ হয়েছে। গাধা গাধাই থাকবে, কিন্তু তুমি হ্রদের রক্ষক আর থাকবে কি না আমার সন্দেহ আছে।"

মনে মনে তিনি ভাবলেন: "তার জামিনের টাকা ফিরিয়ে না দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এই একটা চরম সুযোগ। সে আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছিল কিন্তু নিজেই বোকা বনে গেল।"

আগাবেকের এইসব বিশ্বাসঘাতকাপূর্ণ চিন্তা অবশ্য খোজা নাসিরুদ্দিনের আগে থেকেই জানা, যেন তিনি আগে থেকেই জানতে পেরেছেন। মনে মনে তিনি অল্প হাসলেন কিন্তু চুপ করে রইলেন।

জল ফেনা তুলে ও পাক খেয়ে তাঁদের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল জলাশয়ের দিকে, সেই সঙ্গে মঞ্চটাকে কাঁপাচ্ছিল; যে খুঁটিটার উপর তাঁরা বসেছিলেন সেটাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিনের নীরবতাকে আগাবেক তাঁর আগের দিনের কাজীর ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন।

"তোমার উত্তর দেওয়ার কিছু নেই, আছে কি? এখন তুমি আমাকে বল যদি তুমি যাদুকর হও তবে আমার কাছে প্রতিদিন এক টাকার বিনিময়ে তোমার চাকরী করার প্রয়োজন কি? যাদুবলে তুমি হাজার টাকা রোজগার করতে পার। চুপ করে আছ। তুমি নিঃসন্দেহে ভুলে গিয়েছ, উজাকবাই, যে, তুমি খোরেশম শহরের প্রধান কাজীর সঙ্গে এখন কথা বলছ যিনি তোমার চেয়েও অনেক বেশি বদমায়েসি বুদ্ধি একদিন ধরেছিলেন।"

আগাবেকের গলায় পরিষ্কার সেই রাজকর্মচারীদের স্বর শোনা যাচ্ছিল যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক এবং বিচারের রায় দেন আসামীর অপরাধের জন্য নয়, উপর মহলের লোকদের খুশী করার জন্য বা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। এইসব বিচারকের মনে কি বিরক্তির আলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলে উঠে না? কি করে তাঁরা ভান করেন যে তাঁরা সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার করেন? কি করে তাঁরা সঙ্কুরণশীল বিবেকের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন?

"আহা, তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ!" আগাবেক বলে চললেন, গলার স্বরে বিরক্তি ক্রমশঃ চড়াতে লাগলেন। "তুমি মনে করছ আমি তোমার প্রথম কথায় ভণ্ডামি ধরতে পারিনি? তুমি আমাকে ঠকাতে পারনি! আমি তখনই বুঝেছিলাম এটা পুরোমাত্রায় বদমায়েসি। তবুও আমি সব কিছু ঘটতে দিয়েছিলাম তার কারণ আমি আমার অনুমান সত্য কিনা পরখ করে দেখতে ও তোমাকে ধরতে চেয়েছিলাম। এখন তোমার ফন্দী ফাঁস হয়ে গিয়েছে! এটা পরিষ্কার যে তুমি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী! এবং তোমার সেই স্বচ্ছ কাঁচের মত পোকার দল......"

কিন্তু এখানে, ঠিক এই কথাটার উপর তিনি থামলেন, তাঁর জিভ থেমে গেল! জিভ ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি চুপ করে গেলেন। তিনি ভয় পেলেন!

রাত্রির স্থরভিত নীরবতা হঠাৎ গুপ্তস্থান থেকে এক অমানবিক চীৎকারে ভেঙ্গে গেল যা মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্ত জমিয়ে দেয়।

এই চীৎকার কুঁড়েঘর থেকে আসছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন হাঁটু মুড়ে বসে বললেন, "ধন্যবাদ, সর্বশক্তিমান আল্লা, আপনার দয়ার সাহায্যের জন্য!" পরে উঠে দাঁড়িয়ে আগাবেককে বললেন, "হয়ে গিয়েছে! আসুন হুজুর!"

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

আগাবেক কুঁড়েঘরে যা দেখলেন তাতে ভয়ানক ভয়ে তিনি কেঁপে উঠলেন। গাধার জায়গায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে! কিংখাপের দামী পোশাক পরে একজন মানুষ, অসংখ্য তবক ও পদকে সে ভূষিত!! একজন মানুষ যার মাথায় লাগাম!!! তলোয়ারের কোমর-বন্ধনী লাগান!!! একটা দামী তলোয়ার সোনার জল করা!!!

খোজা নাসিরুদ্দিন তার দিকে নুয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

"হে তেজোময় রাজকুমার, আজ আপনার এই আকার-পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি কত সুখী।"

লোকটি কোন উত্তর দিল না। সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল, যেন মৃগীরোগীর মত যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মোচড দিচ্ছে। সে দাঁত কড়মড় করছিল এবং তার এক চোখ আগাবেকের উপর নিবদ্ধ ছিল; চোখটা বন্যভাবে ঘুরছিল এবং একটা তীব্র হলুদ আভা বেরিয়ে আসছিল; তার মুখ থেকে ফেনা ঝরে পড়ছিল।

কিছু বলার আগে সে তার কম্পিত হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তার মুখ থেকে মানুষের ভাষার বদলে কান-ফাটা গাধার চীৎকার বেরিয়ে এল।

আগাবেক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা ধরে ফেললেন। তিনি এসব ছেড়েছুড়ে ছুটে পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তার পা যেন ভেঙ্গে পড়ল, ঠিক যেন পায়ের হাড়গুলো গলে গিয়েছে।

রূপান্তরিত মানুষের পাশে খোজা নাসিরুদ্দিন যেন গুন গুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর সঞ্জীবনী সুধা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

ধীরে ধীরে রূপান্তরিত মানুষের কাঁপুনি ও ছটফটানি ক্রমশঃ কমে এল এবং তার মুখ থেকে ফেনাও দূরে সরে গেল। খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি তাকে কিছু জল দিলেন। সে আগ্রহের সঙ্গে জল খেল, কিছু জল চিবুকে ও পোশাকে এসে পড়ল। পরে সে কাঁপা কাঁপা ও ভাঙ্গা গলায় এক বৃদ্ধার মত ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল:

"এই অসাবধানী ও কুঁড়ে ক্রীতদাস, আর কত দিন আমাকে তুমি এই আকস্মিকভাবে আকার পরিবর্তন করে বিরক্ত করবে? তুমি কি জান না প্রতিবার আকার পরিবর্তনে আমার কত কষ্ট হয়?"

খোজা নাসিরুদ্দিন আরও নিচু হয়ে অভিবাদন জানালেন।

"আমাকে, এই অধম ক্রীতদাসকে ক্ষমা করুন, হে দীপ্তিমান রাজকুমার এবং ভাবী সুলতান, আমি কিন্তু যথেষ্ট শক্তির পাঁচনের রস তৈরি করে উঠতে পারিনি।"

"চার বছর ধরে একই জিনিস চলছে।"

"অবশেষে আমি এই গাঁয়ের চারপাশে একটা শিকড় খুঁজে পেয়েছি, যে শিকড় পাঁচনের রসে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাবে। এখন হে তেজোময় রাজপুত্র আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে এবং আপনার আকৃতির শেষ পরিবর্তন এই শরতের আগেই হবে—যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনার সূর্যের মত দীপ্তিমান, বিনম্র কিন্তু অজেয় পিতা হুসেন আলির রাজদরবারে গিয়ে পৌঁছাব।"

"ততদিন আমাকে এই গাধার চামড়ায় থাকতে হবে?"

"হায় রাজপুত্র এখানে আমি একেবারে অক্ষম। আপনার চূড়ান্ত আকার পরিবর্তন মিশর ছাড়া অন্য কোন দেশে হওয়া এবং আপনার পিতামাতার অনুপস্থিতিতে হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর চুম্বনই কেবল আমার যাদুকৌশলকে স্তব্ধ করে দিতে পারে এবং তখন থেকে আপনি আপনার জন্মলব্ধ রাজরূপে চিরদিন থাকতে পারবেন।"

"সম্ভব নয়, আমাকে তবে অপেক্ষা করতে হবে," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাজকুমার বলল। "ওখানে কাঠের খুঁটির মত দাঁড়াবে না! আমার মুখ থেকে এই লাগাম সরিয়ে নাও, তলোয়ারও সরিয়ে নাও! তলোয়ারটা কোথাও লুকিয়ে ফেল, কারণ যখন আমি আবার নতুন আকৃতি পাব তখন এগুলো আমার শরীরের ভিতর ঢুকে অসহ্য কষ্ট দেবে।"

খোজা নাসিরুদ্দিন লাগাম সরিয়ে নিলেন ও তলোয়ারটা খুলে ফেললেন।

"তুমি আমার কাছে গত চার বছর ধরে কাজ করছ কিন্তু এখনও কিছু শেখনি!" রাজকুমার বলে চলল। "রাজপরিবারের লোকদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তা তুমি জান না। আমার ভয় হয় যখন তুমি প্রধান উজির ও রাজকোষের প্রধান অধ্যক্ষ হবে তখন তোমার বেশ কিছুদিন দুঃসময় যাবে। আমার পিতা হুসেন আলি রাজদরবারের পদস্থ কর্মচারীদের আদব কায়দার ব্যাপারে বেশ কড়া নজর। রাজপ্রাসাদে একটা বিশেষ কামরা আছে যেখানে উজির ও সাম্রাজ্যের আমীর ওমরাহদের বেত মারা হয় আদব-কায়দা

অমাস্থ করলে। আমার ভয় হয় তোমাকেও হয়তো সেখানে একদিন যেতে হতে পারে!"

"হে দীপ্তিমান রাজকুমার!"

"তুমি এমন কি ঠিকমত দাঁড়াতেও পার না। রাজপুরুষের সামনে কে অমনভাবে দাঁড়ায়? তোমার চোখে বিশ্বস্ততার দীপ্তি কোথায়, নীচ বংশের কুলাঙ্গার? পিছনে বিনয়ের চিহ্ন কোথায়?"

"হে দয়াময় রাজকুমার!"

"চোপরাও!" রাজকুমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল। "কি দুঃসাহস যে আমার কথায় বাধা দিচ্ছ! আজ একটা রুটি কেন বেশি সেঁকা হয়েছিল? কয়েকটা কাঠবাদাম কেন সবুজ ছিল, এদিকে আবার অন্যগুলো ছিল বেশি পাকা। গতবার আকার পরিবর্তনের সময় আমি যে খেজুরের কথা বলেছিলাম তাই বা কোথায় গেল? কোথায়? আমি খেজুর চাই—শুনতে পাচ্ছ অসাবধানী, অলস ক্রীতদাস! আমি কোন ওজর শুনতে চাই না। তুমি কি একটা সোজা সত্যি কথা বুঝতে পারছ না—আমি, মিশরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যদি খেজুর খেতে চাই তবে তোমাকে তাও নিয়ে আনতে হবে এমন কি তার জন্য এক বিরাট শকটবাহিনী যদি মিশরে পাঠাতে হয় সো ভি আচ্ছা।"

এই সময় চোরের দৃষ্টি—অবশ্য সেই রাজকুমার আমাদের পুরোনো বন্ধু একচোখো চোর ছাড়া কেউ নয়—আগাবেকের উপর এসে পড়ল।

"ওখানে কে? কে এই লোক? কোথা থেকে সে আসছে? এখানে কি করছে?"

"উনি এখানকার বাসিন্দাদের একজন," খোজা নাসিরুদ্দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন। "এখানে সেই শিকড় খোঁজার ব্যাপারে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, ফলে তিনি আমার রাজপ্রভুরও সেবা করেছেন। সেই জন্যই তাঁকে আপনার সামনে আসতে দেওয়া হয়েছে।"

"নাম?" চোর আগাবেকের কাছে জানতে চাইল, তিনি তখন বেঁচে থাকার বদলে মরার মত হয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাতে পড়ে না যান।

"টা···টা···বা···বা···ডা···বেক," দুরাত্মা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, যেন জিভ নেই।

"অ্যাঁ? কি? শুনতে পেলাম না।" চোর তাড়াতাড়ি বলল অধীর হয়ে

এবং গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতে যেন একজন নীচ বংশোদ্ভূত লোককে বলছে। "টাটাবেক ? টারাবেক ?"

"সা···ভা···কা···বেক ?"

"কি ? অ্যাঁ ? ফিভাবেক ? মাগোবেক ?"

"আগাবেক," খোজা নাসিরুদ্দিন পরিষ্কার গলায় বললেন।

"আগাবেক ? এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বেশ, বেশ !" চোর গম্ভীর গলায় বলল। "তাহলে নাম হচ্ছে আগাবেক। বেশ যদি আগাবেক হয় তবে আগাবেকই হোক। কাছে এস, ভয় পেও না।"

আগাবেক এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন !

"ঐ যে, দেখ," চোর খোজা নাসিরুদ্দিনকে উপদেশ দিলেন। "এই লোকটি গাঁয়ের বাসিন্দা, কিন্তু রাজপরিবারের লোকদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় সে ব্যাপারে সে পারদর্শী। তার মেরুদণ্ডের ভাঁজ দেখ, দেখেছ মোটা শরীর সত্ত্বেও কি উৎসাহ নিয়ে রাজপদে সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। আর তুমি ?"

"হে দেদীপ্যমান রাজপুত্র, আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য দু একটা কথা বলার অনুমতি কি পেতে পারি ? এই লোকটি চিরদিন গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন না। মাত্র কিছুদিন আগেই তিনি উঁচু রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই জন্যেই তিনি উঁচু বংশের লোকদের সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয় জানেন। কিন্তু আমি······"

"উঁচু পদে ছিল ? খুব স্বাভাবিক। তুমি তার কাছে সব শিখে নিও যাতে মিশরের উজির হওয়ার পর তোমাকে ঘন ঘন গোপন ঘরে যেতে না হয়। ওঠ !" রাজপুত্র আগাবেককে নরম স্বরে বলল। "তোমার মুখ দেখে বিশ্বাস আসে। অবসর সময়ে এই মূর্খকে রাজদরবারের নিয়মকানুন শিখিয়ে নিও, বিনিময়ে আমি মিশর থেকে তোমার কাছে পুরস্কার পাঠাব।······আই ! ওহ ! ওউ-উ-উ ! উঃ-উ-উ !"

চোর তার দাঁত কড়মড় করে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল এবং তার ফেনা-ভরা মুখ থেকে গাধার চীৎকার বার হতে লাগল। আগাবেককে অবাক করে দিয়ে সে তার কান দুটো ঘোরাতে লাগল—যে কৌশল সে ছেলেবেলায় শিখেছিলেন—সেই সঙ্গে সে তার হলুদ চোখের মণিটাও ঘোরাতে লাগল।

"সুরু হয়েছে!" হতবুদ্ধি আগাবেককে দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে বলে উঠলেন। "আবার রূপান্তর সুরু হয়েছে। শীগ্রি, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলুন যাতে অন্ধ হতে না হয়।"

আগাবেকের পা কিন্তু চলতে চাইছিল না এবং তিনি দারুণ কাঁপছিলেন যেন তিনি নিজেই গাধার আকৃতি নিতে চলেছেন। তাঁর মোটা মুখ থেকে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল এবং তাঁর বুক থেকে হুস হুস শব্দ করে নিশ্বাস বেরিয়ে আসতে লাগল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে খাবারের থলির মত জোর করে ঘর থেকে বার করে নিয়ে আনলেন এবং ঘরের মুখটায় যে পাথরের চাঁইটা পড়েছিল তার উপর তাঁকে দেয়ালের দিকে পিঠ করে ধুম করে বসিয়ে দিলেন।

টাটকা বাতাস, মালিশ, ঠাণ্ডা জলের ছিটা এবং নাকে কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে ধাতস্থ হলেন। তিনি তাঁর যুক্তি আবার ফিরে পেলেন।

"যুবরাজ কেমন আছে?" এই হল তাঁর প্রথম প্রশ্ন। "তিনি কি…… ইতিমধ্যে?"

"মনে হয়। আসুন একবার দেখা যাক।"

আগাবেক ইতস্ততঃ করলেন। ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল এসে মিশল, কিন্তু শেষে কৌতূহলেরই জয় হল।

"আপনি আগে যান।"

খোজা নাসিরুদ্দিন দরজা খুলে ভিতরে চাইলেন।

"হ্যাঁ সব কাজ হয়ে গিয়েছে," তিনি বললেন।

আগাবেকও ভিতর দিকে চাইলেন। কুঁড়েঘরের ভিতর সব কিছু নিস্তব্ধ ও শান্তিপূর্ণ ছিল; সেখানে কিছুক্ষণ আগেও তিনি নিজের চোখে মিশরের যুবরাজকে দেখেছেন এমনকি নিজের দাড়ি দিয়ে তিনি তাঁর পায়ের ধুলো ঝেড়ে দিয়েছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ধূসর রংয়ের একটা গাধা, আগেরটার তুলনায় যার কোন পরিবর্তন হয়নি।

এটা অবশ্য বাইরের গঠনের ব্যাপার। ভিতর থেকে তাকে এত গম্ভীর ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যে আগাবেক দেখামাত্র কেঁপে উঠলেন এবং আর একবার তার সামনে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন যখন গাধাটাকে পাঁউরুটি ও কাঠবাদাম খাওয়াচ্ছিলেন আগাবেক তখন যে মানসিক উত্তেজনা থেকে কষ্ট পাচ্ছিলেন তা থেকে মুক্তি

পাবার চেষ্টা করছিলেন। সময় নষ্ট না করে আবার তিনি কাজীর কূটনৈতিক চাল চালবার চেষ্টা করলেন। তাঁর চিন্তা যে কোন পথ ধরে এগোচ্ছে বুঝতে কোন কষ্ট হল না। এখানে একজন রাজকীয় পদের লোক আছেন যার অনুগ্রহ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে; এক শুভ মুহূর্তে তিনি সেই ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন এমন কি তাঁর উপর কিছু কাজের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। এই সুযোগের সবটা নিজের জন্য সদ্ব্যবহার না করা মূর্খের কাজ হবে। এক মুহূর্তও দেরী না করে তাঁর কাজে লেগে যাওয়া উচিত।

অসংখ্য মহৎ ব্যক্তির মত তিনিও অতি দ্রুত শোচনীয় ভয় থেকে নির্লজ্জ কাজে নেমে পড়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নিজে কুঁড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন এবং গাধার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন।

"ক্ষমা করুন, মাননীয় রাজকুমার, আপনার রাজকীয় আহারের সময় বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন; এই লোকটার নোংরামির জন্য আমি মনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। এইভাবে কি কোন রাজপুত্রকে সেবা করতে হয়?" খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চেয়ে তিনি জানতে চাইলেন। "আমাকে পাঁউরুটিগুলো দাও। রাজপুত্রের ইচ্ছা অনুযায়ী এই হচ্ছে তোমার প্রথম শিক্ষা। কাঠবাদাম-গুলো আমার হাতে দাও। দেখ এবং শেখ!"

তিনি সুন্দর ভাবেই সেবা করলেন! যখন রুটিগুলো দিচ্ছিলেন তখন আগাবেকের শরীরে কি সুন্দর ভাঁজ হচ্ছিল, কি সুন্দরভাবে তিনি কাঠবাদাম-ধুয়ে পরিষ্কার করে দুভাগ করে বীচি সরিয়ে ফেলছিলেন। কি মিষ্টি, এবং তোষামোদ ভরা তাঁর কথাবার্তা। বাস্তবিক, পৃথিবীতে কোন গাধাকে এত সম্মান কোন দিনই দেওয়া হয়নি। এমন কি যুধার পয়গম্বর ইসাইয়া যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর সেই গাধাটাকেও দেওয়া হয়নি।

যখন দুটো ঝুড়িই খালি হয়ে গেল, আগাবেক একটা তোয়ালে চেয়ে নিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তি ভরে গাধার পাছার দিকটা মুছিয়ে দিলেন। নতুন কিছু খেতে দেওয়া হচ্ছে এই ভেবে গাধাটা তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে সুরু করে দিল কিন্তু নতুন খাবারে নিরাশ হয়ে তোয়ালেটা ফেলে দিল।

"মাননীয় রাজপুত্র তাঁর আহার শেষ করেছেন!" আগাবেক ঘোষণা করলেন এবং বিজয়ীর আনন্দে ও আত্মগরিমায় খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে চাইলেন। রাজদরবারে অবশ্য এ ধরনের ঘটনা হামেশাই হয়—যাঁরা রাজাকে সিংহাসনে আরোহণ করান তাঁরা সরে আসেন, কিন্তু চাটুকারের দল সামনে এগিয়ে যায়।

পরে তাঁরা অনেকক্ষণ পাথরটার উপর বসেছিলেন। প্রথম সাফল্যের আনন্দে আগাবেক গাধার লেজে চোরকাঁটা লেগে থাকার জন্য খোজা নাসিরুদ্দিনকে ধমক দিলেন। তিনি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা একটা ছোটখাটো ব্যাপার নয় এবং কুঁড়েঘরের বাইরের পথ সোজা চলে গিয়েছে মিশরের দিকে একেবারে রাজসিংহাসনের সামনে। যে সব অনুভূতি দিয়ে তাঁর শরীর তৈরি ছিল যথা দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ ও ক্ষমতা লিপ্সা—সবগুলোই একসঙ্গে যেন নেচে উঠল। সমস্ত ক্লান্তি এবং গভীর রাতের কথা ভুলে তিনি অনবরত খোজা নাসিরুদ্দিনকে প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন কি করে এবং কোন অবস্থায় রাজকুমার গাধায় পরিণত হয়েছিলেন, সেই সময় খোজা নাসিরুদ্দিন কোথায় ছিলেন এবং কার কাছ থেকে মিশরের সিংহাসনের উপর ঘনিয়ে আসা এই বিপদের কথা তিনি জানতে পারলেন; কোথায় তিনি দেখা পান এবং অন্য সব গাধা থেকে পৃথক করেন কি ভাবে। এই সব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে ভেবে না রাখলে খোজা নাসিরুদ্দিনকে হয়তো উত্তর দিতে বেগ পেতে হত। উত্তরে তিনি আগাবেককে এক দীর্ঘ কিন্তু জটিল গল্প বললেন যার পুনরাবৃত্তি আমরা এখানে করতে চাই না, কারণ প্রত্যেকেই নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী একটা উপযুক্ত গল্প ভেবে নিতে পারেন।

"যখন আমি তাকে প্রথম দেখি পাঞ্জাবের পাহাড়ে, একবোঝা জ্বালানী কাঠের ভারে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন থেকে চার বছর আমাকে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আল্লাকে অনেক ধন্যবাদ, আমার কষ্টের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে—সেই যাদু-করা পাঁচন তৈরি হয়েছে! দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি গ্রামে ফিরে যাব সেই শিকড়ের খোঁজ করতে, কারণ এখানে ছাড়া অন্য কোথাও সেটা জন্মায় না। পরে মিশরে ফিরে যাব। যেদিন আমি মহান সুলতানের সামনে আমার কাজ শেষ করব এবং তাঁর উত্তরাধিকারীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেব সেদিন হবে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন।"

"সত্যি!" আগাবেক বললেন। "না প্রধান উজির ও রাজকোষের প্রধান অধ্যক্ষের পদ পুরস্কার পাবার আনন্দে।"

"আপনাকে কে বলল যে এই চাকরী পাবার ইচ্ছা আছে আমার? সুলতান হয়তো অনুগ্রহ দেখাতে পারেন, কিন্তু আমি নিতে চাই না!"

"তুমি নেবে না? কি করে লোকে জানবে যে তুমি প্রধান উজিরের পদ প্রত্যাখ্যান করতে চাইছ?"

"অবশ্যই আমি করব। স্বাধীনতা ও নির্জনতা ছাড়া জীবনে আমার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার ধারণা আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সেও প্রত্যাখ্যান করত, যদি সে রাজপুত্রকে আমার মত ভালভাবে চিনতে পারত।"

তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে উঁকি মেরে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

"রাজপুত্র ঘুমাচ্ছে, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে কথা বলতে পারি। বিশ্বাস করুন, হুজুর, এই পৃথিবীতে যত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু বাস করে রাজপুত্র হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে জরাগ্রস্ত প্রাণী। একগুঁয়েমির দিক থেকে একেবারে গাধার সমতুল্য। রাজপুত্র না হলে আমি তাকে মানুষের আকারে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কিছুতেই নিতাম না, কারণ বর্তমান রূপই তার যোগ্য রূপ। সে বিরক্তিকর, ঝগড়াটে বদরাগী ও মুখরা, এক কথায় পরের দোষ দেখতে অভ্যস্ত; তার অন্তরে গাধা ও মানুষের যত দোষ আছে সব মেশানো আছে। তার মাননীয় পিতা আরও খারাপ মানুষ। এখন নিজেই বিবেচনা করে দেখুন—রাজদরবারের ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্রে অনভিজ্ঞ আমার মত মানুষ কি করে সেখানে উজিরের চাকরী নিতে পারি? আজ উজির কাল মুণ্ডুহীন মানুষ?"

নিশ্বাস বন্ধ করে আগাবেক তাঁর বক্তৃতা শুনে গেলেন, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভাগ্য যেন তাঁর দিকে সাঁতার কেটে আসছে, নিজেই নিজেকে তাঁর দিকে ঠেলে দিচ্ছে!

"আমি দরবারের সভাসদ নই," খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন! "ক্ষমতা লাভের জন্য আমার জন্ম হয়নি, আমার জন্ম হয়েছিল নির্জনতা ও ধ্যানের জন্য, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। যাদুবিদ্যা শেখার জন্য আমি জীবনে কুড়ি বছর কাটিয়েছি এবং তা যে বৃথা হয়নি আজ তার প্রমাণ পেলেন। আমি কি এখন এসব ছেড়ে দেব? কেন? প্রতিদিন সেই গোপন কক্ষে যাবার জন্য?"

যে মানুষ দীর্ঘ দিন শিক্ষা ও তপস্যায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলো না বেরিয়ে যদি অন্য কারও মুখ থেকে বার হয়ে আসত তবে তাকে বিশ্বাস করতে আগাবেক হয়তো দ্বিধা করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস করলেন, কারণ এই ধরনের মানুষেরা—জ্যোতিবিদ, জ্ঞানী, কবি,

জীবনের রহস্য-সন্ধানী এবং দার্শনিক যাঁরা পরশ-পাথর দিয়ে সীসাকে সোনায় পরিণত করতে পারেন—তাঁরা সকলেই দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে বোকা বলে পরিগণিত হতেন, কারণ তাঁরা ব্যবহারিক জীবনের কিছুই জানতেন না। মনে হত তাঁদের যুক্তি যেন পাখার বদলে আশিটি ছোট ছোট ক্ষিপ্রগামী পায়ের সঙ্গে লাগান ছিল এবং প্রয়োজন মত মাটিতে ঢোকা বা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার উপযোগী ছিল।

"ঠিকই বলেছ," দারুণ গাম্ভীর্য নিয়ে আগাবেক বললেন। তিনি ইতিমধ্যেই খোজা নাসিরুদ্দিনকে নিজের ন্যায্য শিকার বলে ভাবতে সুরু করেছেন এবং তাঁর পাশে গুন গুন করে তাঁর মাকড়সার জাল ছাড়তে সুরু করলেন। "বিশ্বাস কর, উজিরের পদে কাজ করা তোমার ক্ষমতার বাইরে।"

"আমি নিজেও তা জানি। আমি সেই জন্য যা করব ভাবছি তা হচ্ছে: সুলতানকে তাঁর প্রথম সন্তান ফিরিয়ে দেব, সমস্ত চাকরী ও সম্মান প্রত্যাখ্যান করব এবং প্রতিদানে পুরস্কার হিসাবে চাইব একটি ছোট নির্জন জায়গা এবং সারা জীবনের জন্য অল্প আয় যা দিয়ে কোনমতে খেয়ে বেঁচে থাকা যায়।"

আগাবেককে লোভে পেয়েছে বুঝতে পেরে খোজা নাসিরুদ্দিন সাবধান হলেন এবং সোজা নিজের উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেন স্বেচ্ছায় আগাবেকের পাখা ও পা মাকড়সার জালে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন।

"আমি এখনও প্রকৃতির রহস্য বিশেষভাবে উদ্ঘাটন করতে পারিনি," তিনি বললেন। "সেই উদ্দেশ্যেই আমি আমার তপস্যার জন্য একটু নির্জন স্থান চাই। মানুষের নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে, যথা পিঁপড়ে, মৌমাছি, জোঁক, ছারপোকা ও মাছিতে, রূপান্তর নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। বড় জন্তুদের রাজ্যেও গবেষণা চালিয়েছি যার সাক্ষী আজ আপনি নিজেই ছিলেন কিন্তু মানুষের ব্যাং, মাছ বা ব্যাংচাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়ে বিশেষ কিছু শিখিনি।"

"তাহলে একজন মানুষ মাছি বা মৌমাছি বা পিঁপড়ার আকৃতি নিতে পারে?

"কিছু না, বেশ সোজা! আপনার উপর তবে পরীক্ষা চালাই।"

"না, কোন প্রয়োজন নেই!"

"আপনি কোন কষ্ট পাবেন না। আপনি টের পাওয়ার আগেই মৌমাছি হয়ে যাবেন। শুধু একদিনের জন্য, পরের দিন আবার মানুষের রূপে আপনাকে নিয়ে আসব।" খোজা নাসিরুদ্দিনের অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল এবং এইভাবে তিনি

আগাবেকের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছিলেন। "থামুন, এখনই আমি মন্ত্র-পড়া পাঁচন নিয়ে আসছি।"

"না, সম্ভব হলে অন্য সময়," আগাবেক তাড়াতাড়ি বলে উঠে পড়লেন। মৌমাছি হবার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না বিশেষ করে এই সময় যখন মিশরের রাজপ্রাসাদের আবছা ছবি তাঁর চোখের সামনে লোভনীয়ভাবে ঝুলছিল। "আমরা দুজনেই বেশ ক্লান্ত, আজকের মত বিদায়," আগাবেক বললেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর সঙ্গে প্রধান নালা পর্যন্ত গেলেন। পূবদিকে প্রত্যুষের আলো ইতিমধ্যেই ঝলমল করছিল।

"সেই কাঁচের মত স্বচ্ছ পোকাগুলো আবার ঝাঁকে ঝাঁকে আপনার কাছে আসছে," তিনি বললেন।

আগাবেক উদ্বেগের সঙ্গে ঘাড়ের চারপাশে মাথা ঘোরাতে লাগলেন। নিদ্রাহীন রাত্রি জানিয়ে দিচ্ছিল—এই পোকাগুলো বিপুল সংখ্যায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে যাবার সময় এই পোকাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না কারণ তিনি আগে হতেই জানতেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত মিশরের স্থায়ী বাসিন্দা হবেন।

"আজ সকালে আমি মোল্লাদের কাছে গিয়ে মৃতদের জন্য এক বছর আগে প্রার্থনার ব্যবস্থা করব।"

"তাঁকে বলবেন যেন মসজিদটার সংস্কার করে।"

"আমি বলে দেব।"

এইভাবে চোরাকের অধিবাসীরা মসজিদের সংস্কার করার খরচের হাত থেকে রেহাই পেল। খোজা নাসিরুদ্দিন তাদের যা যা উপকার করেছিলেন এটি তাদের সামান্য একটি—এছাড়া আরও অনেক বড় এবং মহৎ কাজ তিনি করেছিলেন। এখন সে সব বলার সময় আসেনি। যাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁরা অনুমান করতে পারেন অন্যেরা অপেক্ষা করতে পারেন। আগাবেক বিদায় নেওয়ার পর খোজা নাসিরুদ্দিন অনেকক্ষণ চোখ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাঁর কাল ভুরু দুটো আনন্দে বেঁকে গেল, পরে তিনি কুঁড়েঘরে ফিরে এলেন। তিনি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলেন না এবং আধ ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁর পোষাক ও জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর পিছনের দরজা আধাখোলা অবস্থায় ছিল; দরজা লাগানোর কথা তিনি ভেবেছিলেন কিন্তু লাগাবার মত কোন শক্তি যেন তাঁর আর ছিল না।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন এবং ঘুমের মধ্যেই নতুন দিন ও পৃথিবীতে নতুন আলো দান করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মোয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। পরিষ্কার ও ঘণ্টার মত সুন্দর মোয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বর মেঘের পাশাপাশি আকাশে ভাসছিল ; যেন বিরাট পাখা মেলে সূর্যের দিকে উড়ে যেতে চাইছে এবং ধীরে ধীরে পাহাড়ের পিছন থেকে অনন্ত ও অমলিন রূপ নিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। "তোমার করুণা অসীম, তোমার ক্ষমতা অপার !"—মোয়েজ্জিন উদার কণ্ঠে বললেন, এবং পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস যেন তাদের হৃদয়ে মেলে ধরল—মানুষ পশু, পাখী এমন কি নীরব গাছেরাও বাতাসে কেঁপে ও গুঞ্জন তুলে সূর্যের আলোয় নিজেদের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি গরম করে নিতে লাগল।

বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দিন সুরু হল। দখিণা, উত্তুরে, পূব ও পশ্চিমা বাতাস আবার গান গাইতে সুরু করল, পাহাড়ের তুষারাবৃত চূড়াগুলো আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল, সমুদ্র আবার পরিষ্কার নীল আলো নিয়ে জ্বলছিল, পাহাড়ের ধার দিয়ে জল বয়ে এসে আবার উপত্যকায় এসে পড়ল, মাঠে ফসল আবার পাকতে সুরু করল, বাগানে ফলগুলো ভারী হতে সুরু করল, এবং আঙুর ফল পরিষ্কার সোনালী গোছা নিয়ে জন্মাতে সুরু করল।

কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুমাতে থাকলেন এবং সকালের নামাজ পড়তে ভুলে গেলেন ; এরকম তার অনেক সময় হয়। এই পাপ থেকে অবশ্য তাঁকে ক্ষমা করা হত, কারণ তাঁর স্বপ্ন ছিল পরিষ্কার এবং রামধনুর রঙে রঙীন ; ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যের যে আলো তাঁর মুখের উপর পড়ে তাঁর চোখের পাতার ভিতর দিয়ে আত্মাকে বা আত্মার একটি অংশকে রঙীন করে তুলেছিল মহামতি আল-কাদিরের মতে তাই আমাদের ভাবাবেগ ও স্বপ্নকে প্রভাবিত করে।

তৃতীয় খণ্ড

সৎ মানুষের জন্যই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, এবং সমস্ত অসৎ মানুষ একদিন নিশ্চিহ্ন হবে।

জৈনদ্দিন-ইবন-আবুসৈয়দ

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

আরবে অনেক নদী আছে যাদের স্রোতের মাঝখানটাই শুধু মানুষের গোচরে আসে কিন্তু যাদের আরম্ভ ও শেষ পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। খোজা নাসিরুদ্দিনের জীবনও এমনি এক নদীর মত; তাঁর সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি তা তাঁর মাঝ বয়স নিয়ে, বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের ইতিহাস, এদিকে তাঁর শৈশব ও বার্ধক্য রয়েছে আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আটটি স্মৃতিসৌধ তাঁর মহৎ নামের সাক্ষ্য বহন করেছে, কিন্তু এদের মধ্যে কোনটা আসল এবং অদ্বিতীয়? এমনও হতে পারে যে এই আটটার একটিও নয়। তিনি কি তবে সমুদ্রে বা কুয়াশায় ভরা পাহাড়ের খাদে কোন উপযুক্ত সৌধ খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে অন্ত্যেষ্টি সংগীত গাইত কোলাহল মুখর ঝড়বাতাস অথবা হিমবাহদের ধীর, ভয়াবহ এবং অবিশ্রান্ত গর্জন?

তাঁর জীবনে যেটুকু আমরা জেনেছি তা হচ্ছে তিনি বোখারায় জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছিল কোথায়—কোন মহাশিল্পী তাঁর হৃদয়কে রূপ দিয়েছিলেন, কোন শিক্ষক তাঁর মানসিকতাকে ধারালো করেছিলেন, কোন দরবেশ নিজের শৌর্য ও দীপ্তি তাঁর সামনে মেলে ধরেছিলেন—সে সব তথ্য আজও আমাদের জানা নেই।

বইয়ে লেখা: "আজ আমাদের যা অজ্ঞাত কাল তা প্রকাশিত হবেই।" খোজা নাসিরুদ্দিন যেখানে যেখানে তাঁর পায়ের চিহ্ন রেখেছিলেন সেসব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে আমরা এই কথাগুলোয় সত্যতার প্রমাণ পাই। তাঁকে নিয়ে যেসব উপকথা ছড়িয়ে আছে সেসব সংগ্রহ করে আমরা তাঁর শৈশব জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। এসব তথ্য এত অল্প যে শৈশব নিয়ে একটা আলাদা বই লেখা সম্ভব নয় তবে একেবারে চুপ করে থাকার কোন যুক্তিসংগত

কারণ নেই। তাঁর শৈশবের দিনগুলি নিয়ে তবে এই বইয়ের তৃতীয় ভাগ শুরু করা যাক।

গল্প বলার সোজা পথ ছেড়ে হঠাৎ মোড় নেওয়ার জন্য অনেকেই হয়ত আমাদের ভর্ৎসনা করবেন, কবির ভাষায় আমরা তাঁদের কথায় উত্তর দিব, "সোজা পথের অল্প দূরে সোনা পড়ে থাকলেও যে মানুষ না কুড়িয়ে সামনে হেঁটে যান তাঁর নিজের কাজের সমর্থনে যুক্তি খুবই কম।" অনেকে আবার বলবেন যে আমাদের বই-এ অত্যন্ত অসংগত ভাবে এমন এক গল্পের অবতারণা করেছি যা অন্যত্র হলেই ভাল হত। এ নিয়ে আমরা কোন বিতর্কের সৃষ্টি করব না, শুধু বলব "ডান থেকে বাঁ পকেটে নিয়ে এলেও একটা টাকা দিনারে পরিণত হয় না।"

এই ভাবেই তাঁর শৈশবের গল্প সুরু হল।

প্রথমেই আমরা বহু প্রচলিত এক তথ্যকে অস্বীকার করব, তা হচ্ছে খোজা নাসিরুদ্দিন বোখারা শহরে শির-মামেদ নামে এক গরীব কোচোয়ানের ঘরে জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন। এখানে দুটো ভুল আছে: প্রথমতঃ শির-মামেদ কোচোয়ান ছিলেন না, ছিলেন কুমোর; দ্বিতীয়তঃ খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর ঘরে জন্মাননি শুধু মানুষ হয়েছিলেন। শির-মামেদ খোজা নাসিরুদ্দিনের বাবা হিসেবে প্রচলিত হলেও আসলে তিনি ছিলেন পালক পিতা।

এইখানেই আমাদের গল্প সুরু হবে।

কুমোর শির-মামেদ নিপুণ শিল্পী ছিলেন, বিশেষ করে তানোউর তৈরি করতে; তানোউর হচ্ছে মানুষের মত আকৃতির মাটির কলসী যাতে জল রাখা হত। কোন শিল্পীর দক্ষতা বিচার করা হত তার তৈরী মাটির কলসীতে জল কতখানি টাটকা ও ঠাণ্ডা থাকে তা নিয়ে—বিশেষ করে আবহাওয়া যত গরম হত জল ততই ঠাণ্ডা হত। উপযুক্ত পরিমাণে মাটি বালি, পাথরগুড়ো ও পোড়া ছাই মেশানো এবং তাদের চুল্লিতে সেঁকা ও পরে ধীরে ধীরে তাদের ঠাণ্ডা করার গুপ্ত রহস্য শির-মামেদ যেন জেনে নিয়েছিলেন। অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রে ভরা এই কলসীগুলো সুন্দর শব্দ তুলে চুল্লি থেকে বেরিয়ে আসত, গরম হাওয়ায় ঘামত ও সিল্কের কাপড়ের মত জলীয় বাষ্পের আবরণের সৃষ্টি করত। এই কলসী থেকে তাঁর যথেষ্ট আয় হত এবং এই বুড়ো বয়সেও একটি বাড়ী, একটা বাগান, আঙুর খেত, দু সিন্দুক ভর্তি জিনিষ-পত্র করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অসুখী মনে করতেন, জীবন তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর—কারণ তাঁর বাড়ীতে কোন ছেলেমেয়ে নেই।

প্রার্থনা, মসজিদে অকৃপণ দান, তুকতাক, মন্ত্রপড়া—সবকিছুই শির-মামেদ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী একটি ছেলে দিয়ে আনন্দ দিতে পারলেন না। এইভাবে তাঁরা দুজনে বুড়ো হয়ে গেলেন। পূর্ণ শৃংখলা ও শান্তি বাড়ীতে বিরাজ করত; চিনে মাটির বাসন-পত্র কুলুঙ্গিতে রাখা ছিল, বছরের পর বছর আর নতুন কেনা হয়নি, কারণ একটি কাপও এতদিনে ভাঙ্গেনি; সিল্কের ঢাকনাগুলো মনে হত যেন কালই কেনা হয়েছে। এত শৃংখলা আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছাড়া অন্য কাউকেই খুশী করতে পারত না, শির-মামেদও খুশী হতে পারেননি। যদি কোন দিন অসতর্কভাবে একটা বল ছুঁড়ে সমস্ত চিনে মাটির বাসন ভেঙ্গে দেওয়া হত বা ভালভাবে দেখার জন্য যদি কোন ধূমায়িত কাঠ নিয়ে এসে সিল্কের ঢাকনাগুলোতে গর্ত করা হত বা নষ্ট করে ফেলা হত তবে তিনি কত খুশীই না হতেন।

এক সময় তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কথা বলতেন এবং নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ বোধ করতেন; বার্ধক্য ক্রমশঃ এগিয়ে আসার জন্য তাঁদের আশা প্রায় শেষ হতে চলেছিল; তাঁরাও এ নিয়ে আলোচনা ক্রমশঃ কমিয়ে এনেছিলেন, একে অন্যের সামনে নিজেকে অপরাধী মনে করতেন এবং নির্জনে বসে দুঃখ বোধ করতেন।

একদিন, এপ্রিল মাসের শেষের দিকে, যখন নাসপাতি, কাঠবাদাম ও আপেল ফুলের পাপড়িগুলো বাগানে ছড়াতে সুরু হয়েছে, কেবল টক আপেলগুলো শাখায় শাখায় তখনও তাদের গোলাপি আভা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, শির-মামেদ দুপুরের খাওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে নিজেদের মধ্যে আর কোন দিনও বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আলোচনা করবেন না এই বোঝাপড়া অজান্তে ভুলে গিয়ে বলে উঠলেন:

"আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান? তিনি বললেন। "স্বপ্ন দেখলাম আমাদের একটি ছেলে হয়েছে—কর্কশ স্বরে চীৎকার করা একটা ছোট্ট বাচ্চা।"

বৃদ্ধা ভয় পেলেন এবং আবেদনের ভঙ্গিতে তাঁর দিকে চাইলেন, মনে হল যেন বলতে চাইছেন, "ক্ষমা কর!" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে চলে গেলেন। বাস্তবিক তাঁরই ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।

সারাটা সন্ধ্যা এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

বৃদ্ধা যখন রাতের খাবার তৈরি করেছিলেন, শির-মামেদ তখন ছ'টা নতুন কলসী পরখ করে দেখছিলেন; যেগুলো বাগানের দেওয়ালের কাছে পরদিন

সকালে বাজারে বিক্রীর জন্য খাড়া করে রাখা হয়েছিল। এই তানোউরগুলো সাধারণ কলসীর চেয়ে বড় ছিল।" ভয় হচ্ছে গাড়ীতে তিনটের বদলে দুটো করে ধরবে", তিনি মনে মনে বললেন ও বাজারে সেগুলো নিয়ে যেতে গাড়ী খরচ কত পড়বে ভাবছিলেন।

পরে রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে তাঁরা ঘুমোতে গেলেন।

মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে শির-মামেদ দেখলেন যে বৃদ্ধা জানলার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছেন। চাঁদের আলোর বন্যায় তাঁর সমস্ত শরীর ভেসে যাচ্ছিল, এমন মুখের একটা তিল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল! তিনি প্রার্থনা করছিলেন। শির-মামেদ তাঁর প্রার্থনা শুনছিলেন। তিনি আল্লার কাছে একটা বাচ্চার জন্য প্রার্থনা করছিলেন—মেয়েটা কি পাগল, ষাট বছর এখন বয়স! ফিসফিস করে তাঁর আবেদনও ছিল পাগলামির লক্ষণ—তিনি নিজেই জানতেন না যে আল্লার কাছে কি বলছেন বা কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করছেন। সারা জীবনের যন্ত্রণা, মাতৃত্বের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, একাকীত্ব, হতাশার দুঃখ—সবকিছুই সেই চাপা আবেদনে মেশানো ছিল। তবুও সবকিছু সত্বেও এবং যুক্তি বিরোধী হলেও সেই আবেদনে বিশ্বাস ছিল। "সর্বশক্তিমান আল্লা!" মাথার গোছা গোছা চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আর্তনাদে মুখ নিচের দিকে করে তিনি বলছিলেন। বাক্য যেন বন্ধ হয়ে গেল। শির-মামেদের মন বৃদ্ধার প্রতি করুণা ও দুঃখে ভরে উঠল এবং চোখের জল বন্ধ রাখতে তিনি বিছানায় শুয়ে বালিশ কামড়ে ধরলেন।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা বিছানায় তাঁর পাশে এসে শুলেন। শির-মামেদ নড়লেন না; দুজনেই জানতেন যে অন্যজন ঘুমাচ্ছেন না এবং ঘুমের ভান করে ও এই সৎ কপটতার আশ্রয় নিয়ে একে অন্যের দুঃখের অংশ নিলেন। সকাল পর্যন্ত কেউ একটিও কথা বললেন না, কিন্তু কথা ছাড়াই অনেক কিছু যেন বলা হয়ে গিয়েছিল এবং একে অন্যকে ক্ষমা করলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন যে দুজনে মিলে তাঁরা এক সত্ত্বা—তিনি বৃদ্ধার জন্য ও বৃদ্ধা তাঁর জন্য এবং তাঁদের একক জীবনের পৃথক সত্ত্বা অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে রাত ছিল শির-মামেদের পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গেই তিনি উষাকে অভিনন্দন জানালেন। আশা করলেন যে সারাদিনের কাজে দুঃখ-পূর্ণ ও সান্ত্বনাদায়ক চিন্তা ভুলে যাবেন।

তখন ছিল খুব সকাল, সকালের আলোয় তখনও নীল ছাপ ছিল এবং

আকাশে উষার আলো তখনও ঝলমল করছিল; শির-মামেদের বাজার যেতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরী। তিনি ভাবলেন কলসীগুলোকে আর একবার টোকা মেরে পরীক্ষা করে দেখবেন। ভাঙ্গা বা অন্য কোন দোষ থাকলে যেমন একটা ভোঁতা শব্দ উঠে তার বদলে তাঁর ছড়ির আঘাতে কলসীগুলোতে বেশ সুন্দর শব্দ উঠছিল। এইভাবে তিনি পাঁচটা কলসী পরীক্ষা করে শেষটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি আশ্চর্য! ষষ্ঠ কলসীটা টোকার উত্তরে কোন শব্দ না তুলে কোঁ কোঁ শব্দ করে উঠল। দারুণ অবাক হয়ে শির-মামেদ কলসীটায় আবার আঘাত করলেন। আবার তিনি কোঁ কোঁ শব্দ শুনতে পেলেন। এবার কিন্তু একটা জিনিষ পরিষ্কার হল যে কলসীটা কোঁ কোঁ শব্দ করছে না একটা কোন জ্যান্ত জিনিষ কলসীর ভিতর এই শব্দ করছে।

ভিতরে কে ঢুকেছে? বিড়ালের বাচ্চা? কুকুরের বাচ্চা? পাখীর বাচ্চা? কি করেই বা ঢুকল? যাইহোক না কেন, এটা ভিতরে আছে এবং কর্কশ স্বরে চীৎকার করছে।

শির-মামেদ কলসীর ভিতর উঁকি মারলেন কিন্তু অন্ধকার ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেলেন না। তিনি ভিতরে হাত ঢোকালেন। কলসীটা ছিল বেশ গভীর এবং একেবারে নিচেটা ছোঁবার জন্য তিনি হাত বাড়ালেন। শেষে তাঁর হাত কাপড়ে জড়ান কোন কিছুতে লাগল······তিনি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলেন এবং পরীক্ষা করে দেখলেন।

দাঁতের চিহ্ন! কলসীর ভিতরের জিনিষটা বুড়োর আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছে। সেই জিনিষটা শুধু চেঁচায় না কামড়ও দেয়!

ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে লাগল ভিততে কি আছে, কিন্তু শির-মামেদ বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি একটা ছেনি ও কাঠের হাতুড়ি নিয়ে কলসীর গায়ে একটা গর্ত করতে সুরু করলেন সেটাকে বার করার জন্য। বৃদ্ধের হাত কাঁপছিল, ছেনিটা ফসকে পড়ে গেল ও লাফিয়ে উঠল, এবং আঘাতগুলোও সরে সরে যাচ্ছিল। সেই বস্তুটা কিন্তু স্থির হয়ে বসেছিল। যখন ছেনির আঘাত পাওয়া টুকরোগুলো খসে গিয়ে ভিতরে আলো ও বাতাস গিয়ে ঢুকল—একটা কান-ফাটানো কান্না বৃদ্ধের কানে এসে লাগলো। শির-মামেদ জ্যান্ত পুঁটলিটা ধরে বাইরে নিয়ে এলেন এবং সেটা হাতের ভিতর ছটফট করতে করতে চীৎকার করতে সুরু করল।

বৃদ্ধা মেয়েটা ভয়ে ও কৌতূহল নিয়ে ছুটে এলেন।

"এটা কি? কোথা থেকে এল? হায় আল্লা কি করে ধরে আছ—আমাকে দেবে?"

শির-মামেদের হাত থেকে তিনি কাপড়ের জ্যান্ত পুঁটলিটা তুলে নিলেন এবং সেটা যাদুমন্ত্রের মত চুপ করে গেল।

"কোথায় দেখতে পেলে? কথা বলছ না কেন?"

ভয় বিবর্ণ হয়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটায় বাক্য হারা হয়ে শির-মাম্মেদ কেবল কলসীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন।

ইতিমধ্যে কান্নার শব্দ শুনে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী ছুটে এসে বাগানের নিচু দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি মারছিল। অন্য প্রতিবেশী ছাদে ঘুমাচ্ছিল, শব্দ পেয়ে ঘুম-জড়ানো স্বরে চীৎকার করে উঠল, "কি ব্যাপার ওখানে? চোর? আগুন?"

বৃদ্ধা চারপাশে একবার ঈর্ষাতুর দৃষ্টি মেলে চাইলেন, পরে জ্যান্ত বস্তুটাকে সোহাগ করে তাঁর শুকনো স্তনের উপর চেপে ধরলেন ও তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

প্রতিবেশীদের কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়ে চলল—আরও দুজন দেয়ালের অন্য দিক থেকে উঁকি মেরে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছিল।

"আমি কলসীর ভিতর দেখতে পেয়েছি······" শির-মামেদ বার বার বলতে লাগলেন। "কলসীর ভিতর শুয়েছিল। কলসী ভেঙ্গে বার করতে হল······"

এর বেশি তিনি কিছু বলতে পারলেন না, কারণ মন গড়িয়ে কথা বলার শক্তি তাঁর ছিল না। এদিকে ঘটনাটা এমনই অসাধারণ যে একে বুঝিয়ে বলা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। পাড়াপ্রতিবেশীরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই সে দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলেন এবং চারদিক তাদের উত্তেজিত কণ্ঠে ভরে গেল।

এক মিনিট হয়ত পেরিয়েছে এমন সময় দুজন প্রতিবেশী দেখতে ছুটে এল এবং দরজায় করাঘাত থেকে তাদের ব্যগ্রতা বোঝা গেল। পরে আরও দুজন এল, পরে আর একজন······। ছোট্ট উঠোনটা লোকে ভরে উঠল। তারা কলসী, মাটি এবং দরজা পরীক্ষা করে দেখল কিন্তু কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক ঘটনা! কেউ হয়ত ভাববে যে সে সোজা আকাশ থেকে কলসীর ভিতর পড়েছিল!

ভিতর থেকে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শির-মামেদকে ডাকছেন। প্রতিবেশীদের অতৃপ্ত কৌতূহল এড়িয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে তিনি সেটা দেখলেন, একটা সিন্দুকের উপর তোষক বিছিয়ে তার উপর শোয়ান আছে। তিনি তখনই তাকে চিনতে পারলেন, এ সেই তাঁর স্বপ্নে দেখা ছেলে।

"দেখ," বৃদ্ধা মিষ্টি স্বরে বললেন, "দেখ শির-মামেদ—ওর দাঁত আছে!"

শির-মামেদ সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখেই বাচ্চা ছেলেটা পা ছুঁড়তে লাগল, হাত নাড়তে লাগল এবং বিরাট হাঁ করে কাঁদতে লাগল—বিহ্বল শির-মামেদ তাঁর মুখে দু পাটি ঝকঝকে সাদা, শক্ত, তীক্ষ্ণ দাঁত দেখতে পেলেন। এ যেন এমন একটা কিছু যা সমস্ত যুক্তিকে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় এবং মনকে বিহ্বল করে তোকে—দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার মুখে দাঁত।

এক অলৌকিক ঘটনা যেন বাড়ীতে ঘটল। শির-মামেদ ও বৃদ্ধার কাছে তাই মনে হল। তিনি তাঁর স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে ফিসফিস করে চোখের জলে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম এ রকম একটা কিছু ঘটবে। আমি সব সময়েই জানতাম। শুধু জানতাম না কখন এবং কি করে।"

বোখারার নিয়ম অনুযায়ী কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে তিন মাস না যাওয়া পর্যন্ত পোষ্য নেওয়া চলবে না, যদি না এই সময়ের মধ্যে তার বাবা মাকে জানা যায়।

তিন মাস ধরে ঘোষকরা বোখারার জনসাধারণকে জানিয়ে শহরের চকে চকে ঘোষণা করল যে শহরের কুমোর পট্টিতে শির-মামেদ নামে এক কুমোরের ঘরে একটা মাটির কলসীর ভিতর পাঁচ মাস বয়সের একটা ছেলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যার বিশেষ চিহ্ন হচ্ছে বয়সের অনুপাতে মুখ ভর্তি দাঁত। এই ফরমান ঘোষকরা দিনে তিনবার করে—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা—তিন মাস ঘোষণা করল। বাস্তবিক বেশির ভাগ লোকই এই গণ্ডগোলের মধ্যে আসতে চাইল না। খোজা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে এই হট্টগোল যেন তাঁর ভাবী জীবনের পূর্ব-সূচনা।

সেই অনন্ত তিন মাস যেন শির-মামেদের কাছে উৎপীড়ন হয়ে দাঁড়াল, বিশেষ করে সেই হতভাগা বৃদ্ধার কাছে যাঁর মন গুমরে গুমরে উঠছিল। প্রতিদিন সকালে সেই ভয়াবহ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত—ওরা কি আসবে, ওরা কি তাকে নিয়ে যাবে? দরজার শব্দে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন এবং অনেকটা মাদি নেকড়ে-বাঘের মত হয়ে পড়তেন যেন বাচ্চাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বেন না। প্রতিবেশীদের উপদেশে তিনি তাঁর বিয়ের একজোড়া

দুল বাজারের এক মুহুরীর কাছে নিয়ে গেলেন যে বাচ্চা খোজা নাসিরুদ্দিনের বাবা হিসেবে যারা পরিচয় দিতে আসবে তাদের কাছে অনেকগুলো শঠতা-পূর্ণ প্রশ্নের এক তালিকা যেন পেশ করে। বৃদ্ধা আগে থেকেই তাদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণা পোষণ করতে সুরু করলেন এবং ভাবতে সুরু করলেন যে যারা আসবে তারা প্রতারক ছাড়া কেউ নয়। মুহুরী শুকনো চেহারার বাজে উকিল যার মুখখানা শিয়ালের মত হলুদ রংয়ের এবং এই সব বাজে কাজে সে অভ্যস্ত; সে খুব চালাকির সঙ্গে ছিয়াশীটা প্রশ্ন পর পর সাজিয়ে রাখল; এইভাবে সাজিয়ে যে কোন মানুষের সামনে ধরলে সে হয় ডাকাত, নয়ত অসংখ্য বদ কাজের উদ্যোক্তা যেমন রাস্তায় ডাকাতি বা শিশুহত্যার অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হবে।

তাঁদের ভয় অবশ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। শেষ নব্বই দিনটিও পেরিয়ে গেল এবং কেউ বাচ্চাটার দাবী নিয়ে এগিয়ে এল না এবং নব্বই দিনের দিন মোল্লা ডেকে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর সামনে পোষ্যপুত্র নেওয়ার অনুষ্ঠান শেষ করা হল।

এই ভাবেই খোজা নাসিরুদ্দিন শির-মামেদের বাড়ীতে আবির্ভূত হলেন। এটাও জানা গিয়েছিল যে কুমোর-বস্তিতে যে সব মেয়েদের কচি বাচ্চা ছিল তারা সকলেই পাল্লা করে তাঁকে মানুষ করত। আমরা জানি না এই ধরনের রক্তের সম্পর্কের ভাই-বোনের সংখ্যা তাঁর কত ছিল, তবে এটুকু জানি যে তাঁর অসংখ্য পালিত ভাই ও বোন ছিল। এই থেকেই তাঁর জীবনের পূর্ব-সূচনা করা যেতে পারে: দোলনায় থাকার সময়েই তিনি সমস্ত কুমোর পাড়াকে নিজের আত্মীয় করে নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে যেমন সমস্ত পৃথিবীকেই নিজের আত্মীয় ভেবেছিলেন। লোকে বলে যে শৈশবেই তাঁর শক্ত দাঁত থাকলেও এবং যা মুখে পেতেন দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেও তাঁর ধাত্রী-মায়ের স্তনের বোঁটা কোন দিনও কামড়ে দেননি।

তিনি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠলেন। তিন বছর বয়সে পাঁচ বছরের মত দেখাত, বুদ্ধি ছিল আরও বেশি। তিন বছর বয়সেই অনেক কথা শিখেছিলেন এবং সব বয়স্কদের কথা বলার ভঙ্গি দেখিয়ে অবাক করে দিতেন। চারপাশের জিনিষ-পত্র যথা, টাকু, কুড়াল, করাত, চিমটে, তুরপুণ, ইস্ত্রির লোহা প্রভৃতি দেখে অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাদের কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে দিতে পারতেন। চার বছর বয়সে তিনি প্রথম কুমোরের চাকার পাশে বসে শির-মামেদকে অবাক করে দিয়ে এত সুন্দর নিখুঁত একটা পাত্র তৈরি করলেন যে সেটা সোজা বাজারে নিয়ে যাওয়ার মত। সমস্ত জিনিষের রহস্য তাঁর কাছে যেন

খুলে পড়ত এবং মনে হত তিনি যেন পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করছেন না, সব জিনিষ আবার নতুন করে চিনে নিচ্ছেন যেন তিনি পৃথিবীতে নতুন আসেননি, পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন যেভাবে মানুষ দীর্ঘ ভ্রমণের পর তার ভুলে যাওয়া জগতে আবার ফিরে আসে।

তাঁর শৈশব জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ছিল সন্ধ্যাবেলায় চিন্তামগ্ন ভাব। সেই সময়ে তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি এমন স্বচ্ছ হয়ে উঠত যে মনে হত সপ্তর্ষি মণ্ডলের আগে পৃথিবীর কাছের কোন জিনিষ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বয়স এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে চার বছর বয়সের শিশুর এই নিঃসঙ্গ ভাব কোন চিহ্ন না রেখেই ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল—হয়ত বার্ধক্যে আবার ফিরে এসে উত্তুঙ্গ নক্ষত্রমণ্ডলে উঠে যাবে এই আশায়। অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে তিনি সূর্য ভালবাসতেন—যে ভালবাসা পরে ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল, যখন কোলের শিশু তখনও চোখ পিট পিট না করে সূর্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারতেন এবং তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে উঠত না—এই ক্ষমতা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ঈগল পাখীরই আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণী যথা পশু, পাখী, গুবরে পোকা বা অন্যান্য সকলের সঙ্গেই ক্রমশঃ তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। শির-মামেদ দেখে অবাক হয়ে যেতেন ছোট্ট ছেলেটা শান্তভাবে গাছের ডাল থেকে একটা ভোমরা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে এবং মোটা কুৎসিত পোকাটা তার ভয়ংকর হুল নিয়ে আত্মরক্ষা করার পরিবর্তে ছাড়া পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। পাখীরা তাঁকে দেখে ভয় পেত না এবং একবার দেখা গেল যে তিনি দেয়ালে হেলান দেওয়া একটা মইয়ে উঠে চড়ুই পাখীদের কার্নিসে বাসা বাঁধতে সাহায্য করছেন এবং তারাও তাঁর সাহায্য নিচ্ছে। যারা জানত যে এই প্রফুল্লচিত্ত পাখীরা কত সাবধানতার সঙ্গে তাদের বাসা পাহারা দেয় তারা এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যেত। বাসায় যখন ছোট ছোট পাখীদের তা দেওয়া হত এবং বাইরে এসে তাদের যখন উড়বার সময় হত তখন তাদের উড়তে শেখাবার সময় বাবা-মা পাখীদের সাহায্যে আসতেন ছোট্ট নাসিরুদ্দিন। যারা উড়তে না পেরে মাটিতে এসে পড়ত খোজা নাসিরুদ্দিন তাদের তুলে নিয়ে আকাশে ছুড়ে দিতেন। বাগানের এক কোণের একটা কাঠবাদাম গাছের শিকড়ের নিচে এক সজারু থাকত—সে ছিল তাঁর পরম বন্ধু; প্রতি সকালে একটা ভাঁড়ে করে তিনি তাঁর জন্য দুধ নিয়ে আসতেন। ইঁদুরদের মধ্যেও তাঁর বন্ধু ছিল।

একদিন শির-মামেদের সঙ্গে পুরোনো কবরখানা দিয়ে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তখন রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা ঝোপের দিকে যাবার সময় একটা সাপকে খালি পায়ে মাড়িয়ে দিলেন ; হিসহিস করতে করতে সেটা হাঁটু পর্যন্ত তাঁর পা জড়িয়ে ধরল ; ভয়ে শির-মামেদের রক্ত হিম হয়ে এল কিন্তু বালক শান্ত-ভাবে চলে গেল যদিও সেটা তখনও রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করছিল ; কারণ মাড়ানর জন্য তার লেজটা তখনও ব্যথা দিচ্ছিল। ঠিক একইভাবে তিনি অন্যান্য চারপেয়ে, বুকে হাঁটা জন্তু এবং মশা ছাড়া সমস্ত উড়ন্ত প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পচা আবর্জনায় জন্ম নিয়ে এই ঘৃণ্য প্রাণীরা তাঁকে তাঁদের নিজেদের লোক বলে মনে করত না এবং তাঁকে কামড়ে চোখে প্রায় জল এনে দিত।

চারপাশে পৃথিবীর সঙ্গে তিনি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, চিরদিন তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন এবং সর্বদা সচেতন ছিলেন যে ইথার দিয়ে এই পৃথিবীর সবকিছু গঠিত এবং ইথারই ইচ্ছে প্রকৃত বস্তু যা দুর্বার গতিতে বয়ে যাচ্ছে এবং কোন বস্তুতে স্থির হয়ে থাকছে না ; সূর্য থেকে বয়ে চলেছে ভোমরার মাঝে, ভোমরা থেকে মেঘে, মেঘ থেকে বাতাসে অথবা জলে, জল থেকে পাখীতে, পাখী থেকে মানুষে এবং সেখান থেকে আবর্তিত হচ্ছে একই পথে। এই জন্যই ছোট নাসিরুদ্দিনের পক্ষে ভোমরা এবং বাতাস, সূর্য এবং চড়ুই পাখীকে বোঝা এত সোজা ছিল, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন তাদের অংশ। পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতার এই উদাহরণ কেবলমাত্র মুনি ঋষিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাও তাঁদের বার্ধক্যে তাঁদের সকল পরিশ্রম ও তপস্যার পুরস্কার হিসেবে, কিন্তু অমৃতের পুত্র খোজা নাসিরুদ্দিন এই জ্ঞান পেয়েছিলেন জীবনের প্রারম্ভেই।

সমবয়স্কদের মধ্যে কুমোরপাড়ার পালিত ভাইদের প্রতি তাঁর অনুভূতি ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, যদিও তিনি সেই অল্প বয়সেই মানবজীবনের অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন। যে লোকেরা খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে অলৌকিক ঘটনা দাবী করতেন তাদের হয়ত তিনি আশ্বাস দিতে পারতেন কিন্তু তিনি সে পথে যেতেন না, কারণ তিনি জানতেন যে তা সম্ভব নয়। অনেক বছর পরে যখন তিনি বয়স্ক হয়েছিলেন তখন মহাজ্ঞানী ইব্রাহিম-ইবন-হাতারের বইয়ে নিচের উক্তিটা দেখতে পেয়েছিলেন : "মানব-জীবনের যাইহোক না কেন তবু সেটা সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে সে তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে,

কারণ সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র তারই নিজের আত্মা শুদ্ধিকরণের ক্ষমতা আছে। 'অশুদ্ধি' কথাটা মানুষের প্রতি প্রয়োগ করা হলেও এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে উচ্চ মার্গে তার উঠবার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে স্বীকার করে নেওয়া···।"
খোজা নাসিরুদ্দিন এই তথ্য জানার পর আনন্দে চীৎকার করে উঠতেন, "এই হচ্ছে একমাত্র সত্য যা আমি সব সময়েই চিন্তা করি!"

আবার তাঁর ছেলেবেলার গল্পে ফিরে আসা যাক। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক তখ-ই দেখা যেত। আট বছর বয়সেই তিনি কারও সাহায্য না নিয়ে কেনাবেচা করতে পারতেন। শির-মামেদ সম্পূর্ণরূপে তার উপর নির্ভর করতেন এবং কেনাবেচা যখন বেশ জোর চলত তখনও তিনি হয়ত কোনও সরাইখানায় গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। নাসিরুদ্দিন বেশ জোর ব্যবসা চালাতেন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করার জন্য বৃদ্ধকে কোন সময়ে অনুতাপ করতে হয়নি।

একদিন যখন নাসিরুদ্দিন একাই দোকানে ছিলেন তখন এক বণিক দোকানে এসে মধু নেবার জন্য একটা ছোট পাত্র পছন্দ করলেন। বিরাট বিরাট তানোউর সাজিয়ে রাখা আছে এবং প্রত্যেকটিই বিক্রেতার দ্বিগুণ আকৃতির দেখে বণিক মন্তব্য করলেন, "কলসীগুলো বিরাট, কিন্তু বিক্রেতা অনেক ছোট।"

নাসিরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে একটা বয়েতের প্রথম লাইন আউড়ে বণিককে উত্তর দিলেন :

"ক্রেতা বিরাট, কিন্তু কিনছেন ছোট্ট জিনিষ।"

চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে বণিক আনন্দ পেলেন; অবসর সময়ে তিনি নিজেও বয়েত লেখেন এবং তাদের রস গ্রহণ করতে পারেন! তিনি আরও পাঁচটা কলসী কিনলেন এবং কোনরূপ দরদস্তুর না করে ভাল দাম দিলেন।

আর একটি বয়েত আবৃত্তি করে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে বিদায় জানালেন :

হাল্কা মাটির তৈরী কলস নাই বা থাকুক তরিবৎ,
যাই রাখ না উঠবে হয়ে মিষ্টি মধুর শরবৎ······

এর উত্তরে বণিক আনন্দে অভিভূত হয়ে আরও দুটো বয়েত লেখার কষ্ট মাথায় তুলে নিলেন যে দুটো আজও কালের বুকে অমর হয়ে আছে।

নাসিরুদ্দিন ছিলেন বাজারের প্রকৃত সন্তান। বাজারের হট্টগোল, গুঞ্জন বা ভীড়ের চাপ তাঁকে কখনও ক্লান্ত করত না; এই হট্টগোলের স্রোতে তিনি যেন দিনের পর দিন সাঁতার কাটতে পারতেন। এই বাজারেই একদিন এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে তাঁর নিজেরই মন এবং হৃদয় তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হল।

একদিন বিকেল বেলায় তিনি উটের হাটের দিকে গিয়েছিলেন। তখন কেনাবেচার চাপ কম ছিল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দুপুরের গরমটা চলে যাবার অপেক্ষা করছিল। চারদিকে শুধু উট আর উট, বাতাসটা তাদের ঘামের তীব্র গন্ধে ভরে উঠেছিল; ছোট্ট নাসিরুদ্দিন নির্ভয়ে চকটা পেরিয়ে গেলেন, উটদের হলুদ রংয়ের কুঁজের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন এবং তাঁর লাল ঝুঁটি বাঁধা টুপিটা পরে আর এক জায়গায় দেখা দিলেন। নিদ্রালু হাটটা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারল না। তিনি একটা বাচ্চা উটকে বিরক্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু গরমে সেটা এমন ঢুলছিল যে, নিস্পৃহভাবে তাঁর দিকে একবার চাইল এমন কি একবার থুতু ফেলার চেষ্টাও করল না।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তেমাথার সেতুর দিকে বাঁক নিলেন যেখানে সদ্য আগত দড়ির উপর হাঁটার খেলা দেখান বাজীকররা তাঁবু খাটিয়েছে। একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তখন চীৎকার, হাসি ও কর্কশ শব্দ শুনতে পেয়ে থামলেন। তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল, তিনি সেদিকে ছুটলেন।

তিনি দেখলেন তাঁর সমবয়সী বাজারের একদল ছেলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এক নিষ্ঠুর খেলা খেলছে। জিপসীদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত লুলি উপজাতিদের এক বৃদ্ধা ভিখারী মেয়ে দুপুরের রোদে সরাইখানার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। ছেলেরা হেসে ও মুখ ভেংচে তাকে বিরক্ত করছে; আজেবাজে কথা বলছে এবং তার মুখে শুকনো মাটি ছুড়ে দিচ্ছে।

বুড়ো মেয়েটা দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ও দেখলেই একটা বিরূপ ভাব আসে। তার খোলা চুলের ভিতর দিয়ে সাদা টাক দেখা যাচ্ছিল, নীল মাংসল ঠোঁটের ভিতর হলুদ রংয়ের দাঁতগুলো বেরিয়ে ছিল, তার নাক ছিল বাঁকা ও নীল, তার চোখের পাতা দুটো যেন জ্বলছিল, ভুরু দুটো ছিল লাল ও লোমহীন, তার চোখ দুটো ছিল গোল ও দুষ্টামিতে ভরা; এছাড়া তার কোলের উপর ছিল তারই মত দেখতে কুৎসিত একটা বিড়াল, একটা কাল ডোরাকাটা বিড়াল, লোম

নেই বললেই চলে। এক কথায় সে ছিল সত্যিকারের ডাইনী, সেই ভয়ংকর ডাইনীদেরই একজন যারা ছোট বাচ্চা ধরে তাদের রক্ত চুষে খেয়ে নেয়।

ছোট্ট নাসিরুদ্দিনও এই খেলায় মেতে উঠতে একটুও সময় নষ্ট করলেন না। তিনিও চীৎকার ও কর্কশ শব্দ করতে লাগলেন, কখনও গর্জন করতে এবং কুকুরের মত ডাকতে লাগলেন। তিনি জিভটা বার করে এক পায়ে লাফিয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগলেন। অন্যদের নজরেও আনলেন না। বুড়ো মেয়েটা অভিশাপ দিতে লাগল এবং হাড় জিরজিরে মুঠো দুটো আকাশে ছুড়তে লাগল। বিড়ালটা পিঠ বাঁকিয়ে থুতু ফেলতে লাগল—এবং সমস্ত মিলিয়ে দৃশ্যটা এতই মজার যে ছেলেরা হো হো করে হাসতে লাগল।

অবশেষে বুড়ী মেয়েটাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা তেমারলেন সেতুর অন্যান্য আকর্ষণের দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমে তারা পড়ি কি মরি করে ছুটতে সুরু করল এবং সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দড়িতে হাঁটার খেলা দেখতে ঠিক সময়েই হাজির হল। বুড়ী মেয়েটা ও তার বিড়ালকে সকলেই ভুলে গেল—সত্যিই কানে যখন ছোট বড় ঢাকের কান-ফাটানো শব্দ, বাঁশীর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ও শিঙ্গার ভোঁ ভোঁ শব্দ এসে পৌঁছাচ্ছে তখন তাদের কেই বা আর মনে রাখে; তখন বাজীকররা বাঁশের বিরাট খুঁটি নিয়ে আকাশের নীচে দড়ির উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবছা ছায়ার মত একবার কেবল খোজা নাসিরুদ্দিনের মনে পড়ল বুড়ীটাকে, কিন্তু পরক্ষণেই সব মন থেকে মুছে গেল, মুছে যাবার সময় মনে যেন একটা দাগ কেটে গেল।

এই আনন্দ সারাদিন ধরে চলল। খোজা নাসিরুদ্দিন অন্য পথ ধরে বাড়ী ফিরলেন, ফলে বুড়ীটাকে আর দেখতে পাননি। কিন্তু সারাদিনের ঘটনা শির-মামেদকে বলতে গিয়ে তিনি বুড়ীটাকে মনে করে তোতলাতে লাগলেন।

"বেশ, থামলে কেন?" শির-মামেদ বললেন।

"আমি লুলিদের একটা বুড়ী মেয়েকে দেখেছিলাম, একজন ভিখারী," খোজা নাসিরুদ্দিনকে উত্তর দিলেন। "তার একটা কাল বিড়াল ছিল······পরে আমরা তেমারলেন সেতুর দিকে যাই।"

তিনি সোজাসুজি মিথ্যা অবশ্য বলেননি, কিন্তু সত্যিও বলেননি—এটা ছিল আধা-সত্যি, যা হচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যা। তাঁর মনে আর একটা যেন দাগ পড়ল।

এই বলে তিনি বিছানায় ঘুমাতে গেলেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর

তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে মাঝ রাতে জেগে উঠলেন। সেই বুড়ী মেয়েটা কুৎসিত ভাঙ্গ করে তাঁকে তাড়া করে ধরে ফেলল এবং টানতে টানতে এক গর্তে এসে ফেলল যেখানে এক বিরাট কাল বিড়াল আগুনের ভাটার মত চোখ নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ও থুতু ফেলতে ফেলতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই স্বপ্ন তাঁকে যেন আবিষ্ট করে ফেলল এবং তিনি অদ্ভুতভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন; শির-মামেদের দীর্ঘশ্বাস ও নাক ডাকার শব্দে তিনি ভিতরে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা অনুভব করলেন যেন বুড়ীর বিড়ালটা তাঁর বুকের ভিতর ঢুকে তার তীক্ষ্ণ থাবাটা তাঁর হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিয়েছে।

এই প্রথম তিনি বিবেকের ডাক শুনতে পেলেন এবং জানলেন যে তাঁর অন্তরে তিনি এক অদৃশ্য তুলাদণ্ড বয়ে চলেছেন যা দিয়ে তাঁর নিজের যে কোন অপরাধ ওজন করা চলে এবং তুলাদণ্ড একদিকে হেলে পড়লে তাঁর মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।

মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তাকে সজারু ও চড়ুই পাখীদের সঙ্গে খেলার মাঝে আবদ্ধ রাখতেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা! বুড়ী মেয়েটার কথা চিন্তা করতে না গিয়ে তিনি অন্য কিছুই চিন্তা করতে পারতেন না।

পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল; যতই তিনি সেই বুড়ী মেয়েটার চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠতে লাগলেন ততই নিজেকে হারিয়ে তিনি বুড়ীটার রূপে নিজেকে ভাবতে সুরু করলেন যেন নিজের সত্তা হারিয়ে বুড়ীটার মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে লাগলেন। পরদিন সকালে তিনি যেন তিন চতুর্থাংশ, সেই বুড়ীও এক চতুর্থাংশ নিজেকে মনে করতে লাগলেন। যখন নিজেকে তিন চতুর্থাংশ ভাবতে লাগলেন তখন নিজেকে বুড়ীটার মতই একাকী মনে করলেন, এদিকে তাঁর নিজের এক চতুর্থাংশ সত্তা দিয়ে বুড়ীর জন্য এমন মায়া বোধ করতে লাগলেন যে চোখ দিয়ে গরম জল পড়তে লাগল।

তিনি এখন সব কিছুই বুঝতে পারলেন—সেই বুড়ীটার একাকীত্ব, অনন্ত দুঃখ—যার এই পৃথিবীতে বন্ধুত্ব করার মত একজন প্রাণীও নেই। লুশি উপজাতির ঘরে জন্ম নেওয়ার জন্য বা দেখতে কুৎসিত হওয়ার অপরাধ কি তার? তবে সে কেন সারা জীবন ধরে শাস্তি ভোগ করবে? এই ভিড়ের বাজারটা তার কাছে যেন নির্জন মরুভূমি—না তার চেয়েও খারাপ, সমস্তটা যেন ঘৃণা ও শত্রুতার ভর্তি। কেন? সে কুঁজো হয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটে এবং সব সময়ই যেন

আঘাত আশা করছে—চাবুক, কথা বা হাসির আঘাত। এই পৃথিবীতে একমাত্র কাল বিড়ালটাই তার নিজের বলতে ছিল; সেইজন্যই তারা একসঙ্গে বাস করত—দুজনেই বৃদ্ধ, অক্ষম, চির ক্ষুধার্ত, অনাথ এবং এই বিশাল পৃথিবীতে তারা দুজনের জন্যে দুজনে ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

কোন দৃষ্টি নিয়ে তিনি এসব দেখেছিলেন, তিনি কি নিজের দিকে নিজে চেয়েছিলেন, তাঁর নির্লজ্জ মুখ ভঙ্গির দিকে, তাঁর অপমানজনক কথাবার্তার দিকে এবং জিভ বার করে এক পায়ে লাফানর দিকে। তিনি ভয় পেয়ে উঠলেন। নিজের চেহারা নিজের কাছে এমন নির্লজ্জ ও বিরক্তিকর রূপে দেখা দিল যে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না এবং জোরে গোঁঙাতে গোঁঙাতে বালিশের নিচে মুখ লুকালেন।

সকালে তাঁকে অত্যন্ত দুঃখী ও চিন্তান্বিত দেখা গেল। তিনি তাড়াতাড়ি একটা পাঁউরুটি ও কিছু দুধ খেয়ে বাজারের দিকে ছুটলেন। কোমরের একটা থলিতে তামার কিছু পয়সা ছিল, সব মিলিয়ে আড়াই টাকার মত হবে। অনেকে হয়ত ভাববে জ্ঞানের মিতব্যয়িতা? না, জুয়াখেলার ভাগ্য!

তিনি বুড়ীটার দিকে ছুটলেন। পথে কত লোভনীয় জিনিষ ছড়িয়ে ছিল—কুলপি, মিছরি, হালুয়া। পূর্ণ মানুষের মত তিনি সেসব লোভ জয় করলেন এবং কোন কারণেও কোমরের টাকার থলি খুললেন না। এমন কি যেখানে ছেলেরা লিয়াঙ্গা নামে এক মজার চীন দেশীয় খেলা খেলছিল সেখানেও তিনি থামলেন না বা বাজী রাখার জন্য টাকার থলি খুললেন না। এই খেলায় ছোট্ট নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে এঁটে উঠবে এমন আর একজনও ছিল না, তবুও তিনি অন্য দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলেন।

বুড়ীটাকে সরাইখানার পাশে একই জায়গায় দেখতে পেলেন। বিড়ালটা তার কোলে শুয়েছিল। মাটির তৈরী ভিক্ষার ভাঁড়টা আগের দিনের মতই খালি ছিল। বুড়ীটা বিড়ালটাকে আদর করতে করতে তার সঙ্গে কথা বলছিল এবং বিড়ালটাও করুণ সুরে মিউমিউ করছিল—কোন সন্দেহ নেই সে তখন ক্ষুধার্ত ছিল।

ছোট নাসিরুদ্দিন একটা দেয়ালের ফাঁকে লুকিয়ে রইলেন, হঠাৎ নিজেকে তাঁর অত্যন্ত ভীরু মনে হল। কেমন করে বুড়ীটার সামনে যাবেন, কিই বা বলবেন? একটা কথা মনে হল যে, টাকার থলিটা তার সামনে ছুড়ে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু এ কাজ সেই সময়ের উপযোগী বলে মনে হল না।

বুড়ীটার পাশ দিয়ে অনেক রকমের লোক গেল কিন্তু কেউ তাকে একটা তামার পয়সাও দিল না; এমন কি পচা রুটির টুকরোও না। নাসিরুদ্দিন দেখে অবাক হলেন যে মানুষেরা কত অবিবেচক ও নির্দয় হতে পারে।

তাঁর হতবুদ্ধি ভাব বিরক্তিতে পরিণত হল। কত লোকই না পাশ দিয়ে গেল কিন্তু বুড়ীর ভাঁড়টা খালিই থেকে গেল। ছোট্ট নাসিরুদ্দিনের মুখে যেন রক্ত ছুটে এল—তিনি তার শিশু মন নিয়ে নিঃসন্দেহে যা বুঝতে পেরেছেন লোকেরা কেন তা বুঝতে চাইছে না।

বুড়ীর নীল নাক বা হলুদ রংয়ের দাঁত দেখার মত কোন চোখ আজ আর তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর মানসিক দৃষ্টি এই সব তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের অনেক উপরে উঠেছে এবং যেখানে অসহায় ভাব, নির্জনতা ও কষ্ট, সেখানে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাগ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে তিনি ভয় দূর করে হাতে টাকার থলিটা নিয়ে বুড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

যত কাছে আসতে লাগলেন এগিয়ে যাওয়া ততই কষ্টকর হয়ে উঠল। মনে হল তাঁর পা যেন মাটিতে আটকে গিয়েছে।

বুড়ী তাকে চিনতে পারল—মেয়েটার চোখের দৃষ্টি দেখেই তিনি তা বুঝতে পারলেন। সে ভয়ে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে মাথাটা কাঁধের ভিতর লুকিয়ে নিল, আশা করছিল গতকালের মত এখনই ইঁট ও গালাগালি এসে পড়বে।

"এই যে, ঠাকুমা, এটা নাও," তোতলাতে তোতলাতে তিনি গুন গুন করে বলে উঠলেন; কোমরের টাকার থলিটা খুলে মেয়েটার কোলে ফেলে দিলেন, তামার পয়সাগুলো বিড়ালটার গায়ে বৃষ্টির মত এসে পড়ল।

তিনি সাহস হারিয়ে ফেললেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট দিলেন এবং সরাইখানা থেকে অনেক দূরে হার্ডওয়ার গলিতে না আসা পর্যন্ত ফিরে চাইলেন না।

এইভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি সারাদিন এই কথাই ভাবছিলেন। নির্জনে বসে বসে ভাবছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছুটছিল দু দিকে—এক চিন্তা ছিল বুড়ী মেয়েটাকে নিয়ে অন্য চিন্তা হল নির্দয় লোকদের ব্যাপারে, যারা বুড়ী মেয়েটাকে কোন সাহায্য দিচ্ছিল না। এক জনের জন্য করুণা হচ্ছিল, অন্যদের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা। যদি তিনি কেবল করুণা ও ঘৃণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন হয়ত তাঁর ভবিষ্যৎ অনুপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠত। প্রতিকার তাঁকে করতেই হবে, কিন্তু কি করে?

এখানেই তিনি নিজের মানসিক কাঠামোকে প্রথম আবিষ্কার করলেন। সুরুতে তিনি তাঁর সমস্ত অনুভূতি তাঁর চিন্তা থেকে দূর করলেন যাতে অনুভূতি চিন্তা শক্তিকে তাড়া দিয়ে না চলে ; পরে তিনি তাঁর চিন্তার জট খুলে তাদের সহজভাবে পর পর সাজিয়ে রাখলেন যেমনটি একের পর এক ভাবনাগুলো এসেছিল সেইভাবে। বাজারের সরাইখানায় ধাঁধা শুনে তিনি বার বার বিচার করার এই শক্তি পেয়েছিলেন। দাবার ছকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে চাল দিতে হয় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কারণ সেখানে বিরুদ্ধ পক্ষের চালে বাধ্য হয়েই তা করতে হয়। ছোট্ট নাসিরুদ্দিনও একই রকম ভাবলেন। যদি বোখারার লোকেরা নিজের ইচ্ছায় দয়ার পথ না নেয় তবে সে পথ অনুসরণ করতে তাদের বাধ্য করা হবে।

নিজের ভাবী কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে গিয়ে তাঁর পরবর্তী চিন্তাধারা কোন খাতে বইবে তাও ঠিক করলেন। এই পরিকল্পনা হচ্ছে—বোখারার মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে এক খেলার আশ্রয় নিতে হবে। বোখারার অসংখ্য নির্দয় মানুষকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি ঠিক করলেন বোখারার সমস্ত মানুষকে এক সঙ্গে মিশিয়ে এক বিরাট মানুষ হিসেবে কল্পনা করবেন।

সমস্ত ব্যাপারটা এই ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোখারার সমস্ত মানুষকে এক সঙ্গে কল্পনা করে, যত বড় মানুষই হোক না কেন, ব্যাপারটা খুব সোজা হয়ে দাঁড়াল। নাসিরুদ্দিন সেই বিরাট মানুষের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সেই বিরাট মানুষ যে আবরণ দিয়ে তার মনের ও হৃদয়ের কাঠামোকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিল যাতে দয়া ও সহানুভূতি প্রবেশ করতে না পারে, সেই আবরণে ফাটল খুঁজতে লাগলেন।

বিরাট বোখারা মানুষের গভীরতা অতলস্পর্শী বলে মনে হল না। এই গভীরতা নির্ধারণ করতে এবং সেই অতল গহ্বরে দুর্গন্ধে ভরা লালসার ক্লেদ, কৃপণতার খোলস এবং স্বার্থপরতার দুরারোগ্য শেওলা আবিষ্কার করতে দু তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। বোখারার মানুষটি তাঁর কাছে এমন পরিষ্কার হয়ে দাঁড়াল যে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার সব নোংরা ও গুপ্ত ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন। আকৃতির দিক থেকে সে গম্বুজের চেয়েও বড়, কেবল আরও মোটা—তার কোমরের বন্ধনী যেন কদাচিৎ একত্রিত হয় ; সে ছিল মোটা এবং লাল টকটকে, ফুলো ফুলো গাল এবং কোটরে বসা খুদে খুদে চোখ দুটো নির্বোধের মতো উদাসীন হয়ে চেয়ে থাকত ; একটা পরিষ্কার শূন্য হাসি তার

ঠোঁটের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যেত এবং যখন সে মুখ খুলত তখন বোঝা যেত একটা পুরু বিশ্রী মোটা জিভ নড়ছে। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়ার জন্য অনবরত সে হাঁফাচ্ছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে; তার হাতে ছিল এক বিরাট পাঁউরুটি, আকৃতিতে প্রায় রেলগাড়ীর ওয়াগনের মতো এবং রুটিটা মধু দিয়ে মাখান; যখন সে কামড় দিচ্ছিল তখন আর্তনাদের মত ঘড় ঘড় শব্দ করছিল যেন আনন্দে এখনই মূর্চ্ছা যাবে এবং কনুই দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখছিল ও চারপাশে চেয়ে দেখছিল যাতে কেউ যেন কেড়ে নিতে না পারে বা এক টুকরো না চায়।

বুড়ী মেয়েটার প্রতি উদাসীন হওয়ায় ছোট্ট নাসিরুদ্দিন বোখারার লোকদের উপর রেগে গিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই বোখারার বিরাট মানুষটার প্রতি তিনি এত বিরূপ ছিলেন। যাইহোক রাগ হচ্ছে সরলতার অনুশাসক; বাস্তবিক এই রকম ধারণার পিছনে যুক্তি খুব কমই আছে, কারণ বোখারার বেশির ভাগ লোকরাই ভদ্র এবং দয়ালু। বুড়ীটাকে কোন সাহায্য দিতে তারা অস্বীকার করেছিল নিজেদের কোন স্বার্থের জন্য নয় ববং বুড়ী মেয়েটার বিশ্রী চেহারার পিছনে তার দুঃখ কষ্টের গভীরতা বুঝতে অসমর্থ ছিল বলে; যদি পারত তবে কোন রকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত; তাদের বেশি চিন্তা করার মত শক্তি ছিল না। ছেলেটারও এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় ছিল না। প্রতিটি বড় লড়াইয়ের মত এখানেও তিনি বোখারার বিরাট মানুষকে চেপে ধরে তার পাপ ও ঘৃণা বুঝে উঠবার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন।

বোখারা বিরাট মানুষের আবরণটা ভালভাবে দেখতে গিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন সেখানে সুস্পষ্ট ফাটল দেখতে পেলেন। যে সব চারিত্রিক ত্রুটি বোখারার বিরাট মানুষকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে অলস কৌতূহল এবং বিজাতীয় ঘটনার প্রতি অতৃপ্ত অনুরাগ।

এখন প্রয়োজন হচ্ছে এই ফাটলে আঘাত করা।

পরদিন সকালে ছোট নাসিরুদ্দিনকে আবার সরাইখানায় দেখা গেল। নিজের চতুর পরিকল্পনায় উত্তেজিত হয়ে তিনি খুব সকালেই সেদিন ছুটে এলেন— বুড়ী তখনও এসে হাজির হয়নি। প্রায় আধ ঘণ্টা তাঁকে অপেক্ষা করতে হল। অধৈর্যের জন্য রেগে ও উত্যক্ত হয়ে তিনি বার বার ছুটে সরাইখানার চারপাশ দেখছিলেন এবং চৌরাস্তায় যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে চারটি

রাস্তায় চেয়ে বুড়ীটাকে খুঁজছিলেন। সকালের রোদ গরম ছিল না, বাতাস ছিল পরিষ্কার এবং হালকা, ছায়াভরা জায়গাগুলোতে রাতের গন্ধ ভরা শীতলতা তখনও ছিল এবং ভিস্তিওয়ালাদের জলে ভিজে মাটি তখনও গরম বাষ্প তুলছিল। মিনারের টালিগুলো গলে গলে পড়া আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে তুলছিল এবং মাথার উপরের জড় নীল আচ্ছাদন কেঁপে কেঁপে উঠছিল এবং এক ঘর্মাক্ত দিনের আশ্বাস নিয়ে এল। প্রতি মুহূর্তে কর্কশ গুঞ্জন ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল, শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভরিয়ে তুলছিল এবং ধুলো সমেত আকাশের দিকে উঠে আল্লার দরবার যেন কাঁপিয়ে তুলছিল ও পরীদের মিলিত ঐকতান স্তব্ধ করে দিচ্ছিল। এ ছিল যেন বোখারার সেই বিরাট মানুষের রুটি খেতে খেতে ঘর্ঘর শব্দ।

ইতিমধ্যে বুড়ীটা এসে হাজির হল। সঙ্গে ছিল কাল বিড়ালটা। ছোট্ট ছেলেটা এই ভেবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে বাড়ি থেকে বিড়ালটার জন্য এক টুকরো কলিজা আনতে ভুলে গিয়েছেন। বোখারার বিরাট মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঘায়ে ভরা এই বিড়ালটাই হচ্ছে এখন তাঁর প্রধান সঙ্গী।

সময় নষ্ট না করে ছোট্ট নাসিরুদ্দিন সাহসের সঙ্গে বুড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"সুপ্রভাত, ঠাকুমা," তিনি বললেন। "রাত ভাল কেটেছে ?"

"তোমাকেও সুপ্রভাত জানাই," বুড়ী উত্তর দিল তার পিচুটি মাখান চোখ দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে। "রাত ভালই কেটেছে কিন্তু দিন অশান্তিতে কাটবে মনে হচ্ছে।

সে কিসের ইংগিত দিচ্ছে খোজা নাসিরুদ্দিন ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু এমন ভাব করলেন যেন কিছুই বোঝেন না। কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে এই ভেবে আর একবার মাথা নিচু করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

"তোমার বিড়ালের রাতও কি ভালভাবে কেটেছে ?"

"বিড়াল ভালভাবে ঘুমায় না, কারণ সারারাত সে ইঁদুর ধরে," বুড়ী উত্তর দিল ছেলেটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে।

তার সেই দৃষ্টির সামনে তিনি অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর সাহস উবে গেল এবং যে সব কথা বলবেন বলে তৈরি হয়ে এসেছিলেন সে সব তাঁর জিভ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার দম নিলেন

এবং বুঝতে পারলেন যে শুধু তাঁর মুখটাই গরম হয়ে ওঠেনি পেটটাও হয়েছে। শেষে অনেক চেষ্টা করে তিনি আধা-ফিসফিস স্বরে বলে উঠলেন :

"আমি সেই ছেলেটা। কালকের ছেলেদের একজন। পরশুরও।"

বুড়ী চুপ করে গেল, তার চোখ দুটো তাঁর মুখের উপর স্থির হয়ে এল। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কোনক্রমে বোঝা যায় এমনি গলায় তিনি বললেন :

"যে তোমায় জ্বালাতন করেছিল। মনে পড়ছে?"

বুড়ী তখনও চুপ করে থাকলে তিনি হয়ত আগের দিনের মত ঘুরে ছুটে পালিয়ে যেতেন।

কিন্তু বুড়ী তখন উত্তর দিল।

"আমার কি তোকে মনে পড়ছে?" সে বলল। "আমার এটা বসে ভাবা উচিত, আমি তাই এখন ভাবব। তুই তোর জিভটা অনেকটা বার করেছিলি, আমি কাল ভাবছিলাম কত বড় জিভ রে বাবা!"

এই কথাগুলো ছেলেটাকে হয়ত দগ্ধ করে দিত এবং তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত কিন্তু বুড়ীটার হাসি—সুন্দর মিষ্টি হাসি ছেলেটার মুখ সকালের সূর্যকিরণের মত রাঙিয়ে তুলল।

"কাছে আয়," বুড়ী বলল। "তুই ভাল ছেলে, তোর দয়ার শরীর, কিন্তু আমি যা দেখছি ভয়ানক বদমাস। এবার সত্যি করে বল দেখি—কি জন্যে এখানে এসেছিস, কি চাস? আগে থেকেই বলে রাখি যদি কালকের মত আবার টাকা নিয়ে এসে থাকিস তবে তোর টাকা নিয়ে এখনই পালিয়ে যা। গরীবদের সাহায্য করা দয়ার কাজ, কিন্তু বাপের টাকার থলিতে সেই উদ্দেশ্যে হাত ঢোকান ছেলেদের উচিত নয়। তা নইলে কোথা থেকে তুই রোজ দু টাকা জোগাড় করিস?"

ছোট্ট নাসিরুদ্দিন অপমান বোধ করলেন কিন্তু তাঁর মনে পড়ল বুড়ীটা লুলি উপজাতিদের এবং সে তার উপজাতির ছেলেদের দিয়েই তাঁকে বিচার করতে চাইছে।

"উঁহু, না," তিনি বললেন। "আমি আজ দু টাকা আনিনি। আমি কখনও বাবার টাকার থলিতে হাত দিই না। তিনি প্রায়ই তাঁর দোকানে কলসী বিক্রী করতে আমাকে রেখে যান, কিন্তু আমি তাঁকে সমস্ত টাকার রসিদ দিয়ে দিই।"

"খুব ভাল," অনুমোদনের স্বরে বুড়ী বলল।

"ছুটির দিনে বাবা আমাকে একটা সিকি দেন, কখনও কখনও আধুলিও দেন।"

"ওটা তুই নিতে পারিস, ওটা নেওয়া পাপ নয়," বুড়ী বলল। "আমি ভুল করেছিলাম জেনে আনন্দ হচ্ছে। রাগ করিসনি যেন।"

এরপর তাঁদের মধ্যে আলোচনা বেশ সহজ ও সুন্দর ভাবে এগিয়ে চলল। কাঠের যন্ত্রের দাঁতওয়ালা চাকায় দাঁতগুলো একটা আরেকটাকে যেমন জড়িয়ে ধরে সেইভাবেই কথার জাল এগিয়ে চলছিল। ছোট্ট নাসিরুদ্দিন বুড়ীটার পাশে এসে বসলেন, বিড়ালটাকে আদর করলেন, তার ঘড়ঘড় শব্দ শুনলেন। এবং উচ্চকণ্ঠে তার প্রশংসা করলেন।

"ও কি দুধ আর কলিজা খেতে ভালবাসে?"

"তা আমি বলতে পারি না, কারণ এ দুটো কখনই আমি ওকে খাওয়াইনি।" বুড়ী হেসে উত্তর দিল। "আমি নিজেই কত বছর সে সব দেখিনি।"

এই তিক্ত স্বীকৃতি বালকের কাছে যেন সেতুর মত কাজ করল; তাঁর মনের গভীরে যে উদ্দেশ্য ছিল তা সফল করতে যেন এর উপর দিয়েই হেঁটে যেতে হবে। উত্তেজনায় তোতলাতে তোতলাতে তিনি বোখারার বিরাট মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর যে পরিকল্পনা বুড়ীকে জানালেন।

বুড়ী প্রথমে কৌতূহল নিয়ে শুনছিল, পরে মনে বিশ্বাস এল, শেষে আবেগে চোখে জল এল।

"আল্লা তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে বাছা, বুড়ো বয়সে আমাকে সান্ত্বনা দিতে! মনের দিক থেকে তুই একেবারে নির্লজ্জ বদমাস, আমাদের গোষ্ঠিতে তোর জন্ম হলে নিশ্চয়ই সর্দার হতিস। হৃদয়ের দিক থেকে তুই একেবারে খাঁটি এবং আল্লা করুন তোর মন যেন সব সময় তোর হৃদয়ের ক্রীতদাস হয়ে থাকে।"

নাসিরুদ্দিনের পরিকল্পনায় কিছু প্রাথমিক খরচ ছিল—প্রায় পনের টাকা, এমন কি কিছু বেশিও হতে পারে। বুড়ী মেয়েটা ছেলেটাকে এতই বিশ্বাস করেছিল যে তার ময়লা ন্যাকড়ার ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় টাকা বার করে ছেলেটার হাতে দিতে দ্বিধা বোধ করল না।

"আমার কাছে এই আছে," সে বলল, তার হাত কাঁপছিল।

"ব্যস্ত হবে না ঠাকুমা, সুদ সমেত তোমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে," ছোট্ট নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন।

প্রথমে তিনি চীনাপট্টির দিকে চললেন যেখানে সব পুরোনো জিনিষ বিক্রী হয়। সেখানে উপযুক্ত দামে—আট আনায়—তিনি একটা কাঠের খাঁচা কিনলেন

বেশ বড় আকারের ; এই ধরনের খাঁচায় সরাই রক্ষকরা পাহাড়ী কোকিল পাখী রেখে থাকে যাদের গলার স্বর অনেকটা কাঁচের ঠুনঠুন শব্দের মত। পরে ছেলেটা কাঠপট্টির দিকে চললেন যেখানে খাঁচাটায় কিছু অদল বদল করার জন্য এক ছুতোর লাগালেন—যাতে আর একটা আধুলি খরচ হল। আর একটা আধুলি খরচ হল রংয়ের কারিগরকে দিয়ে খাঁচাটা রং করাতে যাতে তার কাছে যে কয়টা রং ছিল সব কয়টাই লাগান হল—সবুজ, নীল, লাল, হলুদ এবং সাদা। শেষের দিকে কারিগর চারপাশটায় সোনালি রং লাগিয়ে দিল এবং নিজের কাজের আনন্দে নিজেই বলে উঠল।

দেখ, বাছা এবার লেজে হীরার পালক সমেত এক আগুন রংয়ের বার্শিটমোর পাখীকে তোমার ধরতে হবে।"

"আমি ইতিমধ্যেই ধরেছি," নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "বোখারায় কখনও দেখা যায় না এমন এক লাল রংয়ের বার্শিটমোর পাখী—চার পা আছে এবং গায়ে কাল লোম।"

বুড়ীর কাছে খাঁচা নিয়ে (সে খাঁচাটা দেখে আশ্চর্য হয়ে আনন্দে হাত তুলল) ছোট্ট নাসিরুদ্দিন আর একবার বাজারের দিকে ছুটলেন।

এবার দুপুরের আগে ফিরে এলেন না।

"এস, ঠাকুমা, সব ঠিক আছে," তিনি বললেন।

বুড়ী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়াল, ঘুমন্ত বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিল ; বিড়ালটা তার হলুদ রংয়ের একটা চোখ খুলল, এদিকে ছেলেটা খাঁচাটা তুলে নিলেন এবং সকলে বাজারের দিকে চলল।

তে-রাস্তার মোড়ে চীনা পট্টিতে তারা থামল। এইখানে সুরু হয়েছে তিনটে কর্মব্যস্ত ব্যবসা-পট্টি—তাঁত, জুতো ও লোহাপট্টি। তে-রাস্তার একপাশে চারটে খুঁটির উপর নল-খাগড়া দিয়ে তৈরি একটা ছাউনি বুড়ি দেখতে পেল। দুটো দরজা, মোটা ত্রিপলের কাপড় দিয়ে ছাদ ঢাকা আছে। ছাউনির বাইরে ঘরামিটা বসেছিল—বাজারের এক বুড়ো যে নাসিরুদ্দিনের কাছে দুটো টাকা পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেখান থেকে সরে গেল।

বালক নাসিরুদ্দিন বুড়ীকে ছাউনির ভিতর নিয়ে এলেন। মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটির উপর কাঠের একটা বোর্ড লাগান ছিল যেটা খাঁচা রাখার জায়গা হিসেবে কাজ করল। ছাউনির ভিতর আর কিছুই ছিল না। ছাদের একটা গর্ত দিয়ে আলো ভিতরে এসে পড়ল।

"এখানে কিছুক্ষণ থাক, ঠাকুমা," নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমার আর একটা জিনিস দেখতে বাকী আছে—এইটাই অবশ্য শেষ।"

বুড়ীকে একা রেখে তিনি জুতো পট্টির দিকে ছুটলেন, সেখানে এক গলির ভিতর ইয়েসকি-হজ নামে জলাশয়ের পাশে দরখাস্ত, অভিযোগ প্রভৃতি লেখা, বিশেষ করে খবর লেখা, বিশেষ করে খবর লেখা, মুহুরীরা সেসব দিনে বসত।

বাজারের এই জায়গাটা ছিল কর্কশ হট্টগোলে ও পরস্পর বাদ-বিসম্বাদে গর্বে কথা বলা নিয়ে ব্যস্ত এবং বাতাস এদের মিথ্যা কথায় ভারী হয়ে উঠত। মুহুরী-দের মধ্যে এমন একজনও নেই যারা একদিন ইস্তানবুল, তেহেরাণ বা খোরেশম শহরের আদালতগুলিতে পেশকারের চেয়ে নিচে কোন রাজপদে চাকরী করেছে; যখন উজির থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য রাজকর্মচারীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত তখন এরাই রাজাকে উপদেশ দিত এবং অনেককেই 'রাজসিংহ' পদক দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল......"

মক্কেলরা সাধারণতঃ বিকেলের দিকে জলাশয়ের পাশে এসে হাজির হয় এবং পরে হট্টগোল কিছুটা কমে; কারণ মুহুরীরা তখন তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছোট্ট নাসিরুদ্দিন অবশ্য সেখানে দুপুরের আগেই এলেন যখন চারদিকে দারুণ চীৎকার, চেঁচামেচি ও হট্টগোল; সে সময় কে কার সঙ্গে ঝগড়া করছে বা কে কার বিরুদ্ধে শপথ নিচ্ছে বোঝা ভার, কারণ প্রত্যেকেই অন্য জনকে অভিশাপ দিচ্ছে; চারপাশে এমন একটা বন্য চীৎকার হচ্ছিল যে এই অভিসম্পাত ও অপবাদের ঝড়ে ইয়েসকি-হজের জল শান্ত ছিল সেটাই আশ্চর্য।

"এই নোংরা হায়েনার বাচ্চা," একজন দুর্বল বৃদ্ধ তার পাশের লোকটির দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠল; বুড়োটার চেহারা অনেকটা 'সিম' অক্ষরের মত পাকানো ও কাহিল। "এই ঘৃণ্য মূর্খ 'আলিফ' অক্ষরটাও ও শুদ্ধ করে লিখতে পারিস না। সকলেরই মনে আছে গত শীতে আদালতে তুই কি দরখাস্ত পেশ করেছিলি। 'শাসন ও করুণার আলো' লিখেছিলি 'কাব্যের নোংরা লেখক'—তাই না?"

"কে লিখেছিল 'কাব্যের নোংরা লেখক'? আমি?" রাগে গর গর করতে করতে পাশের লোকটা বলে উঠল। এই লোকটা দেখতে ছিল যে অক্ষরের মত......ঠিক করে বলা কঠিন কোন অক্ষরের মত, বরং বলা চলে সমস্ত আরবী অক্ষরের মত, কারণ সে তার শরীরের অংশগুলো মোচড় দিয়ে পাল্টাত—তার মাথা, পা, হাত, বাহু এবং পিঠ; মনে হচ্ছিল তার নাড়িভুঁড়িগুলো তার পেটের

চারপাশে নড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "তুই ভুলে যাচ্ছিস গতবার কি লিখে তুই তোর মক্কেলের সর্বনাশ করতে চলেছিলি? আমীরকে সম্বোধন করতে গিয়ে 'ইয়োর ম্যাজেষ্টি'র বদলে তুই লিখেছিলি 'মোর যাজেষ্টি'?"

চারপাশের সকলে খিলখিল করে হেসে উঠল, যেন প্রত্যেকটি স্বরেই তান উঠল। 'মিম' অক্ষরের মত দেখতে মুহুরীটা মুখ ভেংচিয়ে দাঁত কড়মড় করে যোগ্য উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছোট্ট নাসিরুদ্দিন তার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেলেন।

এই বিদ্বেষপূর্ণ বাগ-বিতণ্ডার লু ঝড়ের মধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন সহজেই এক বয়স্ক মুহুরীকে দেখতে পেলেন যে এইসব ঝগাঝাঁটিতে অংশ গ্রহণ করেনি—তার নিরীহ প্রকৃতি বা অধিক জ্ঞানের জন্য নয়—বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সূক্ষ্ম কারণের জন্য। সে শুনছিল। তার লম্বা গলাটা বকের মত সামনে এগিয়ে দিয়েছিল এবং রোদে তার চুলহীন টাকটা চকচক করছিল—মনে হচ্ছিল তার টাকটা তার হাড় জিবজিরে মুখের চেয়ে ওজনে ভারী; সে বসে বসে শুনছিল এবং পরস্পর ঝগড়ার সময় অসতর্কভাবে উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা যেন লুফে নিচ্ছিল। সে যথাস্থানে অভিযোগ করার জন্য সাংকেতিক ভাষায় লিখে নিচ্ছিল যাতে তার সহকর্মীরা কিছু বুঝে উঠতে না পারে। যখন ছোট্ট নাসিরুদ্দিন তার কাছে এলেন তখন সে 'মোর যাজেষ্টি' কথাটা লিখছিল। যখন তার খাপের কলমে আঁচড় দিচ্ছিল তখন সে ফিসফিস করে উচ্চারণ করছিল এবং হিংসায় ভরা সাপের মত কুৎসিত হাসি তার পাতলা ঠোঁটের কোণে খেলে যাচ্ছিল; অদূর ভবিষ্যতে তীব্র ঝালে ভর্তি যে খাবারটা তিনি তৈরি করছিলেন তা যেন আগে থেকেই চেখে দেখছিলেন।

ছোট্ট নাসিরুদ্দিনের চোখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি দরকার বাছা?"

"চীনা কাগজের উপর ভারতীয় কালিতে লেখা আমি একটা ছোট্ট সাংকেতিক চিহ্ন চাই।"

"একটা ছোট্ট চিহ্ন!" মুহুরি আনন্দে বলে উঠল একটা মক্কেল পেয়েছে ভেবে এবং ছেলেটি যে কোন পক্ষেরই নয় ও তার সামনে ফাঁস হয়ে যাবার ভয় না থাকায় সমস্ত লেখাগুলোই বিছিয়ে দিতে পারা যায় ভেবে। "তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ, বাছা, যে তুমি আমার কাছে এসেছ, কারণ চীনা কাগজের উপর ভারতীয় কালি দিয়ে লিখতে আমার মত পারদর্শী এই বোখারা শহরে আর একজনও নেই। যখন আমি বাগদাদ শহরের দেওয়ানের প্রধান কেরাণী

ছিলাম এবং আমার রাজকর্মচারীর পোশাকের উপর খলিফার দেওয়া হীরা বসান সোনার 'রাজসিংহ' পদক এঁটে ঘুরে বেড়াতাম......"

তার অহংকারে ভরা মিথ্যা কথাগুলো বাধ্য হয়েই ছোট্ট নাসিরুদ্দিনকে শুনতে হচ্ছিল তবে আমাদের শোনার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এ ধরনের কথা অহর্নিশি আমাদের শুনতে হয়। জীবনের নিম্ন স্তরে যেসব মানুষকে বাধ্য হয়েই আসতে হয় অতীত জীবন নিয়ে তাদের মিথ্যা ভাষণ একই ভাবে বংশ পরম্পরাক্রমে শুনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে তার ভাগ্যের পরিবর্তন এবং শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে শেষে জিজ্ঞাসা করল:

"কি ধরনের চিহ্ন তুমি চাও বাছা? বল, আমি তোমাকে খুশী করব।"

"বড় বড় অক্ষরে তিনটে কথা," নাসিরুদ্দিন বললেন। "বিড়াল নামে পশু।"

"কি? আবার বল। 'বিড়াল নামে পশু'? হুঁ......"

মুহুরী মুখ কুঁচকে তার খুদে খুদে চোখ দিয়ে বালকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল।

"আমাকে বল কেন তুমি এ ধরনের চিহ্ন চাও? সে জিজ্ঞাসা করল।

"যে টাকা খরচ করছে সে জানে কেন টাকা খরচ করছে," উদাসীনভাবে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তোমার ক' টাকা লাগবে?"

"দেড় টাকা," উত্তর এল।

"এত বেশি? মাত্র তিনটে কথার জন্য?"

"কিন্তু কথাগুলো কি ধরনের!" মুহুরী উত্তর দিল। "পশু!" মুখ বিকৃত করে বলল। "নামে?" সে ফিসফিস করে কথাগুলো বলল। "বিড়াল!" সে ভয়ে ভয়ে বলল এবং যেন সাপে হাত দিয়েছে এইভাবে পিছিয়ে এল। "কে আর তোমার কাছে এর চেয়ে কম নেবে?"

ছোট্ট নাসিরুদ্দিনকে দেড় টাকা দরেই রাজী হতে হল যদিও তিনি তাঁর চিহ্নগুলির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন।

মুহুরী তার মাদুরের নিচে থেকে হলুদ রংয়ের চীনা কাগজ বার করল, ছুরি দিয়ে সেটা কেটে নিল, হাতে তুলি তুলে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল; মনে মনে অবশ্য সে দুঃখ করছিল এইজন্য যে, যে তিনটি শব্দ লেখার দায়িত্ব সে নিয়েছে তার থেকে গুপ্ত সংবাদ দেবার মত কিছুই নেই।

ফিরে আসার পথে ছোট্ট নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি জুতোপট্টিতে গেলেন এবং মুচিদের কাছ থেকে আঠা নিয়ে একটা মসৃণ বোর্ডের উপর কাগজটা এঁটে দিলেন।

ছাউনির বাইরে কাগজটা দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল।

"ঠাকুমা, এবার টাকা রোজগার কর," ছোট্ট নাসিরুদ্দিন বললেন।

ছাউনির ভিতরে রাখা খাঁচায় বিড়ালটা ভয়ংকরভাবে নিরানন্দে মিউ মিউ করতে লাগল।

ঠিক প্রবেশপথে বুড়ী তার মাটির ভাঁড় হাতে বসে রইল।

প্রায় তিন পা দূরে রাস্তার ধারে ছোট্ট নাসিরুদ্দিন এসে দাঁড়াল এবং ফুসফুস ভর্তি করে জোরে নিশ্বাস নিল, পরে নিশ্বাসের বাতাস এত জোরে ছাড়ল যে বুড়ীর কানটা যেন জ্বালা দিয়ে উঠল।

"বিড়াল নামে পশু!" নাসিরুদ্দিন তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলেন, পরিশ্রমে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠল। "খাঁচায় বসে আছে। চারটে থাবা আছে! ধারালো নখের চারটে থাবা, ঠিক যেন ছুঁচ! লম্বা লেজ ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে ঘোরাফেরা করে যে কোন আকৃতি নিতে পারে—হুক বা বেড়ির মত! বিড়াল নামে পশু! পিঠ বাঁকায় এবং গোঁফ নাড়ে! পিঠে আছে কাল জামা! হলুদ চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলে! খিদে পেলে বিশ্রী এবং পেট ভর্তি থাকলে সুন্দর চীৎকার করে। খাঁচায় বসে আছে, শক্ত খাঁচায়! কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে যে কেউ দু পয়সা দিয়ে তাকে দেখতে পাবে! খুব শক্ত খাঁচা! বিড়াল নামে পশু!"

কিন্তু মিনিট তিনেক পরেই তাঁর পারিশ্রমিক আসতে সুরু হল। বাজারের এক ভবঘুরে লোহাপট্টি থেকে এসে সেখানে কিছুক্ষণ থেমে সব শুনল, পরে ফিরে ছাউনির দিকে গেল। দেখতে সে বোখারার বড় মানুষের প্রায় দ্বিগুণ—অবশ্য ছোট স্কেলে—বোখারার বড় মানুষের ছোট ভাই বলা চলে—ঠিক তেমনই মোটা, লাল টকটকে এবং তার মতই উদাসীন ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি। সে নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে হাত দুটো শরীরের বাইরে রেখে বোকার মত চেয়ে রইল। দাঁত বার করে নির্বোধের মত একটা আনন্দের হাসি তার মুখে খেলে গেল এবং তার চোখ দুটো কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে এল।

"বিড়াল নামে পশু!" নাসিরুদ্দিন ঠিক তার মুখের উপর বললেন। খাঁচায় বসে আছে! মাত্র দু পয়সা!"

বোখারার ছোট মানুষটা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকটা জড়পদার্থের মত এইসব চীৎকার শুনছিল, পরে তার কোমরের থলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দুটো পয়সা বার করে সোজা বুড়ীর কাছে গিয়ে তার ভাঁড়ে ফেলে দিল।

পয়সা দুটো ঠুন ঠুন করে উঠল। উত্তেজনায় খোজা নাসিরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ল। এই হচ্ছে প্রথম জয়!

বোখারার ছোট্ট মানুষটা পর্দা একপাশে টেনে সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

নাসিরুদ্দিন চুপ করে গেলেন, রুদ্ধ নিশ্বাসে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বোখারার ছোট্ট মানুষটা ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। সে যে ভিতরে কি করছিল কেউ জানে না; সম্ভবতঃ ধ্যান করছিল। যখন সে আবার ফিরে এল তখন তার মুখের উপর বিরক্তি ও বিহ্বলতার ছাপ পড়েছিল—যেন ছাউনির ভিতর কেউ তার মাথায় জুতো পরাতে গিয়েছিল বা তাকে সাবান গোলা জল খাওয়াতে চাইছিল। সে আর একবার ছোট্ট নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে তার হাত দুটো দুই পাশে ছড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল; নাসিরুদ্দিন তখন আবার চীৎকার করতে সুরু করেছেন। আগের সেই নির্বোধের মত আনন্দের জায়গায় বোখারার ছোট মানুষটির মুখে দেখা দিল বিরক্তিকর বিহ্বলতার ভাব। সে বুঝতে পারল যে তাকে বোকা বানান হয়েছে, কিন্তু কি করে তা সে বুঝতে পারল না।

সেখান থেকেই বোখারার ছোট মানুষটি চলে গেল। ছাউনির সামনে আরও তিনজন কে আগে ভিতরে ঢুকে জন্তুটা দেখবে এই নিয়ে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিল।

এবারে মজা ছিল আরও বেশি; ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে শেষের লোকটি হাসতে শুরু করল। যারা ঠকে তারা সব সময়েই মনে করে যে অন্যেরা যেন তার বেশি চালাক না হয়, ফলে বেরিয়ে আসার পর প্রত্যেকেই দরজায় প্রতীক্ষারত অন্য দুজনের কাছে একটি কথাও বলল না।

সারাদিন ধরেই জন্তুটাকে দেখতে লোক আসতে শুরু করল। দেখতে এল কারিগর, চাষী, এমন কি উপর দিকে উঁচু করে সাদা পাগড়ী বেঁধে ইসলাম ধর্মের জ্ঞানী ব্যক্তির দল। খাবার আগেই দেখার কাজ চলল, কারণ খাবার সময়ে জন্তুটা বিশ্রী চীৎকার সুরু করল এবং একটা কলিজা খাওয়ার পর আর একবারও চীৎকার শোনা গেল না; সে তখন জিভ চাটতে ও পোকা ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাতের সময় জানিয়ে জয়ঢাক বাজার আগে ছাউনি বন্ধ করা হল না। বুড়ী তার সারাদিনের জমা টাকা গুনতে বসে গেল। উনিশ টাকা! প্রথম দিন সমস্ত খরচ বাদেই অনেক রইল, দ্বিতীয় দিন সবই লাভ।

বুড়ী মেয়েটার জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এল। তার এখন মাথা গুঁজবার ছাদ আছে, কারণ ছাউনিটা এখন তার নিজস্ব সম্পত্তি। রাতটা সে এর নিচেই কাটাল। খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বিড়ালটা লেজ খাড়া করে মিউ মিউ করতে করতে নতুন বাড়ীর কোণে কোণে ঘুরতে লাগল।

ছোট্ট নাসিরুদ্দিন আরও তিনদিন কুঁড়ে ঘরটার বাইরে এইভাবে চীৎকার করলেন, পরে বুড়ীকে জানালেন যে বাড়ীতে কাজ থাকার জন্য তাঁকে এখন বাড়ী ফিরতে হবে; সে যেন পয়সা দিয়ে একজন লোক রাখে। ফলে দৈনিক তিন টাকা দিয়ে বৃদ্ধ এক প্রাক্তন মোয়েজ্জিনকে রাখা হল। সে জোরেই চীৎকার করল বটে তবে অনেকটা আজানের সুরে, ফলে বেশী লোক আকৃষ্ট করার জন্য তাকে একটা ঢাক কিনে দিতে হল।

বালক নাসিরুদ্দিন অবশ্য বুড়ীকে ভোলেননি, সপ্তাহে একদিন করে তাকে দেখতে আসতেন। দুজনের পক্ষেই এই সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত আনন্দের। বুড়ী নাসিরুদ্দিনকে ক্রমশঃ তার টাকা জমা হওয়ার কথা জানাল এবং প্রতি বারই তাকে মোট টাকার অর্ধেক দিতে চাইল। নাসিরুদ্দিন কিন্তু নিতে চাইলেন না, শুধু বুড়ীর মনে কষ্ট না দিতে মিষ্টি খাবার জন্য একটি করে টাকা নিলেন।

চলে যাবার আগে বালক নাসিরুদ্দিন একবার ছাউনির দিকে চেয়ে বিড়ালটাকে দেখতেন। প্রতিদিন মাংসের কলিজা খেয়ে বিড়ালটা চিকণ এবং মোটা ও অলস হয়ে পড়েছিল; তার জন্যে আনা একটা মাদুরের উপর বসে বসে সে ঘুমাত। বালক বিড়ালটাকে খাঁচা থেকে বার করে আস্তে আস্তে টোকা মেরে আদর করতেন এবং তার রেশমের মত নরম লোম দেখে অবাক হয়ে যেতেন। বিড়ালটা চোখ অল্প খুলে তার লেজের ডগাটা অল্প তুলে নাচাত এবং পরে আবার ঘুমোতে সুরু করত।

শীত আসতে বালক নাসিরুদ্দিন ও বুড়ির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে নামাঙ্গানে চলে গেল যেখানে তার জিপসী উপজাতির অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। সে একটা ঢাকা গাড়ীতে চেপে চলে গেল—এর মধ্যে কত টাকাই না সে জমিয়েছে! বিদায়ের সময় ছোট্ট নাসিরুদ্দিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী কত কান্নাই না কাঁদল! শেষবারের মত বালক খাঁচার ভিতর মাদুরে বসে থাকা বিড়ালকে দেখলেন—গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেক দিন পর সাদির জন্মস্থান শিরাজে এসে একদিন খোজা নাসিরুদ্দিন (তখন তিনি খোজা হয়েছেন) হঠাৎ বাজারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার শুনতে পেলেন, 'বিড়াল নামে পশু! খাঁচায় পশু বসে আছে!' মনের উত্তেজনায় তিনি বাজারের দিকে ছুটলেন এবং বাজারের চকে একটা ছাউনি দেখতে পেলেন। ঠিক প্রবেশ পথে একজন জিপসী তরুণী বসে আছে—প্রফুল্লচিত্ত সুন্দরী তরুণী, কানে দুল ও গলায় পুঁতির মালা; সামনে রং করা তামার থালা পয়সা ফেলার জন্য রাখা আছে। উল্টো দিকে অন্য প্রবেশ পথে একটা বুড়ী বসে ঢুলছে; বয়সের ভারে সে ভয়ংকর নুয়ে পড়েছে, পার্থিব অস্তিত্বের সদর পথ সে যেন পেরিয়ে গিয়েছে যার ওপারে স্বপ্ন ও বাস্তব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এভাবে এসে মিশেছে। খোজা নাসিরুদ্দিন একটা রূপোর টাকা থালার উপর ছুড়ে দিলেন যাতে টাকার খুচরো গুনতে তরুণীর বেশি সময় লাগে এবং ততক্ষণ তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। সে অবশ্য এটা বুঝতে পারল এবং ভাঙ্গানি গুনতে একটু বেশি সময়ই নিল, কারণ সে খুব ছোট পয়সাগুলো বেছে গুনছিল; ভেলভেটের মত চোখের পাতায় ঢাকা বিনয় নম্র চোখ দুটো তার গোলাপের মত টাটকা ঠোঁট দুটোর উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া হাসি লুকাতে পারল না। খোজা নাসিরুদ্দিন ছাউনিতে ঢুকে বিড়ালটা দেখলেন—সেই আগের বিড়ালটা, কেবল তার মনিবের মতই বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত। খোজা নাসিরুদ্দিন তাকে ডাকলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না, বয়সের সঙ্গে সে কালা হয়ে গিয়েছে।

ছাউনির অন্য প্রান্তে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন প্রবেশ পথের দিকে ফিরলেন। জিপসী তরুণী ভাবল তিনি তার কাছেই ফিরে আসছেন এবং সাদা দাঁতগুলো বার করে প্রকাশ্যেই হেসে উঠল। কিন্তু তার ভয়, বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের মধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন বুড়ীর সঙ্গে কথা বলা বেশি পছন্দ করলেন। তার সামনে ঝুঁকে তিনি নরম সুরে বললেন:

"সুপ্রভাত, ঠাকুমা। বোখারার কথা তোমার মনে আছে, নাসিরুদ্দিন নামে বাজারের একটি ছেলের কথা তোমার মনে আছে······"

বুড়ী চমকে উঠল এবং হঠাৎ মুখের উপর যেন আলোর আভা এসে পড়ল। জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে ঝুঁকে সে চীৎকার করে উঠল ও সামনের দিকে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল যেন বাতাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন সেখান থেকে সরে গেলেন ও মনে মনে চিন্তা করলেন,

"এটা তার কাছে অতীতের অপস্রিয়মান প্রতিধ্বনি হয়ে থাক বা অনন্ত ঘুম তার চোখ দুটো চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার আগে ক্ষণিকের স্বপ্ন হয়ে থাক।" তিনি চারপাশে চাইলেন। বুড়ী তখনও হাঁপাচ্ছিল, কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে বাতাস চেপে ধরতে চাইছে; এদিকে তরুণী মেয়েটা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে ও হতবুদ্ধি হয়ে একবার বুড়ির দিকে ও অন্যবার ভীড়ের দিকে চাইতে লাগল যে ভীড়ের মধ্যে সেই বিদেশী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

তিনি আর ফিরে চাইলেন না এবং বাজার যেন তার কোলাহলমুখর ফুটন্ত কড়াইয়ে তাঁকে গ্রাস করে নিল।

বোখারা বাজারে আর একটি ঘটনা তাঁর শৈশবে ঘটেছিল।

তিনি বাজারের দোকানের সারিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অসম্ভব গরমে তিনি জলাশয়ের দিকে গেলেন। পুরু পর্দায় মুখ ঢেকে এক মহিলা তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে তিনি চারপাশে চাইলেন।

"শোন!" মহিলা কাঁপা গলায় বললেন এবং সামনে এগিয়ে এসে মুখের পর্দা পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর শুকনো গরম হাত দুটো তাঁর মুখে বুলিয়ে নিজের দুঃখ ক্লিষ্ট শুকনো মুখ তাঁর মুখের কাছে নিয়ে আনলেন এবং নাসিরুদ্দিনের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন যেন তাঁর আত্মার কিছু অংশ তাঁর মধ্যে ঢেলে দিতে চান অথবা উল্টোভাবে বলতে গেলে তাঁর থেকে কিছু অংশ পান করতে চান। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্র মহিলা কি চান? তাঁর কাল এবং বড় চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল।

"যাও!" তাঁকে আস্তে ঠেলে দিয়ে তিনি ফিসফিস করে বলে উঠলেন। "আল্লা তোমাকে সব সময় ও সবখানে যেন রক্ষা করেন। যাও!"

তিনি তার পর্দা নামিয়ে পাশের একটা রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। যেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে। খোজা নাসিরুদ্দিন কিছুই না বুঝে তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাজারের সেই চিরন্তন কোলাহলের মধ্যে তিনি মহিলাকে ভুলে গেলেন এবং তাঁর কথা আর একবারও মনে পড়ল না।

অনেক বছর পর, তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছেন, বেইরুট ও বসরার মাঝে এক সরাইখানায় তিনি রাত কাটাচ্ছিলেন এবং রাতে এক ভদ্রমহিলাকে

স্বপ্নে দেখলেন—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলা তিনি চিনতে পারলেন যেন বলছেন, "আল্লা যেন তোমাকে সব সময় ও সর্বত্র রক্ষা করেন।"

হৃদয়ে যন্ত্রণা নিয়ে তিনি জেগে উঠলেন, বুঝতে পারলেন যে এই ভদ্রমহিলাই তাঁর নিজের মা। এ যেন অনুমান নয়, এ হচ্ছে স্পষ্ট অনুধাবন, পরিষ্কার এবং বিতর্কের অতীত, যা তাঁর কাছে এসেছে রহস্যজনকভাবে। মনে মনে ভাবলেন কোন দিনও তিনি তাঁকে একটি কথাও বলেননি; তাঁর প্রতি ভালবাসা ও সান্ত্বনায় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং ছোট ছেলেরা যেমন মার উদ্দেশ্যে কথা বলে সেইভাবে ভক্তি ভালবাসার কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। তাঁর দীর্ঘ অতীত শিশু জীবনের দরজা যেন হঠাৎ খুলে গিয়েছে এবং কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে; তিনি কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন ও রাতের বাতাস চুম্বন করতে লাগলেন; তাঁর বিশ্বাস হল যে মহিলা যেন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং মাতৃ হৃদয়ের কষ্ট ও কাঁপুনি নিয়ে তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছেন।

এইভাবেই স্বপ্নে তিনি তাঁর মায়ের দেখা পেলেন কিন্তু কোন দিনই তাঁর নাম জানতে পারলেন না এবং কোন দিনই তাঁর কবরও দেখেননি। সত্যিই কোথায় তিনি সেই নামহীন কবর খুঁজবেন আর কেনই বা খুঁজবেন যখন তিনি নাসিরুদ্দিনের মনে চিরদিনের জন্য বেঁচে আছেন।

আমরা খোজা নাসিরুদ্দিনের শৈশব কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। গল্প অবশ্য অসমাপ্ত এবং টুকরো টুকরো—যেটুকু আমরা সংগ্রহ করছি তার চেয়ে বেশি সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের অনুসরণ করছেন এমনও অনেকে আছেন যাঁরা নতুন কিছু জানতে পারবেন এবং একই জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁদের সংগ্রহ নিয়ে আসবেন। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে খোজা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে নতুই বই হয়ত বেরিয়ে আসবে—তাঁর শৈশব নিয়ে নতুন বই। আমাদের ভূমিকা হয়ত যৎসামান্য,কিন্তু কঠিন ভিত্তির উপর তাঁর স্থান; সেই অনাগত লেখক যিনি সেই বই লিখবেন এবং এর প্রথম পাতায় নিজের নাম স্বাক্ষর করবেন, তিনি আমাদের সামান্য পরিশ্রমকে হয়ত নীরবে এড়িয়ে যাবেন না—এবং সেইখানেই রয়েছে আমাদের পুরস্কার, আশা ও সান্ত্বনা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

চোরাকে খোজা নাসিরুদ্দিনের কাজ এবং সেখানে তাঁর দিন কি ভাবে কাটছে এই আলোচনায় ফিরে এসে আবার আমরা গাধাটাকে নিয়ে গল্প সুরু করব।

গাধাটার দিনগুলো কাটছিল দারুণ আনন্দে। আগে কখনও জীবন এত অসীম আনন্দ এবং অপূর্ব ভাগ্য নিয়ে হেসে ওঠেনি। প্রথমে তাকে সেই মাটির কুঁড়েঘর থেকে হ্রদের ধারে আগাবেকের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে প্রাসাদের সবচেয়ে ভাল অংশে তাকে রাখা হল; ঘরের একটা দরজা বাগানের দিকে খোলা ছিল যার ভিতর দিয়ে উঁচু ও বড় বড় ধাপের উপর পা ফেলে এবং ঘাসের বড় চাপড়া ও ফুলের মাঝখানে যে কোন সময় সে নিচে নেমে যেত এবং কোন মার বা ধমকের ভয় ছিল না; এ ছাড়া তার খিদের পরিতৃপ্তির জন্য থালায় সাজিয়ে পাঁউরুটি, কাঠবাদাম, গাজর, তরমুজ, এ ছাড়া চোরাকের উর্বর মাটির অন্যান্য ফলমূল সামনে রাখা হত। পান করার জন্য রাজার উপযুক্ত গোলাপজল মেশানো জল ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া হত না। গাধার রূপান্তরের ব্যাপারে খোজা নাসিরুদ্দিন আগাবেককে এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি আগাবেক তার জন্য একটা সঙ্গিনী খোঁজার কথাও চিন্তা করছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের পথে অনেক সন্দেহ এসেছিল—কারণ তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি এই ব্যাপারে গাধার রূপান্তরিত বাইরের রূপ বা তার ভিতরের আসল রূপ কোনটাকে অনুসরণ করবেন ?

অন্য ব্যাপারে আগাবেক অবশ্য কোন সময় নষ্ট করেননি। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা, কথা বা শঠতা একই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল—তা হচ্ছে রূপান্তরিত রাজপুত্রের মনোযোগ খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে নিজের দিকে নিয়ে আনা! এই উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন তিনি গাধার পাশে কাটিয়েছেন, নিজে তার পরিচর্যা করেছেন এবং নীরবে সকল রাসভ অপকর্ম সহ্য করেছেন এই ভেবে যে "আত্মাবলে যা উপযুক্ত রাজদরবারে সে কাজ বিরক্তিকর।" খোজা নাসিরুদ্দিন যাতে গাধার সঙ্গে একা থাকতে না পারেন এবং থাকলেও সময় যতটা সম্ভব কমানোর জন্য যা যা করা দরকার সবই তিনি করেছিলেন। 'জ্যোতির্ময় রাজপুত্র এখন ক্লান্ত," বা "রাজপুত্র এখন রাজকাজের চিন্তায় ব্যস্ত"—খোজা নাসিরুদ্দিনকে সরিয়ে দেবার সময় তিনি গম্ভীর গলায় এসব বলতেন।

খোজা নাসিরুদ্দিনও তাঁর হুকুম সব সময় মেনে চলতেন, যদিও তাঁর জানবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যখন আগাবেক একা থাকেন তখন গাধাকে কি বলেন। এক-দিন তিনি সব শুনতে পেলেন। অসময়ে একদিন বাগানে আসার সময় দুজনকে খুব মনোযোগের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেন। ফুলের জায়গাগুলোর উপর দাঁড়িয়ে এবং সুন্দর সুগন্ধী ফুলগুলো পায়ে মাড়িয়ে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, গাছের পাতা চিবিয়ে এবং পেট ঘর ঘর করতে করতে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল ; একের পর এক তরমুজের টুকরোগুলো তার মুখে এগিয়ে দিতে দিতে আগাবেক তার লম্বা কানের কাছে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"এবং তারপর হে মাননীয় রাজপুত্র" আগাবেক ফিসফিস করে বললেন, "সে আপনার রাজকীয় সম্মানের প্রতি কটাক্ষ করার মত ঔদ্ধত্য দেখাল, এমন কি আপনার গৈরিক পোশাক পরিহিত পিতার প্রতিও দেখাতে লাগল। সে বলল ·····না', সে যেসব পাপ কথা বলেছিল সেসব উচ্চারণ করতে আমার জিভ অস্বীকার করছে। সে রাজপুত্র নির্বোধ এবং পরের দোষ দেখে বেড়ায়। সেই বলল, আমি সেসব বলিনি। রাজপুত্র বদরাগী, নীচ, একগুঁয়ে, এবং তার ভিতরটা যেমন সেই অনুযায়ী তার বাইরের রূপও উপযুক্ত হয়েছে। তার মনে অসৎ উদ্দেশ্য আছে যে মিশর যাবার পথে মাননীয় রাজপুত্রকে কোথাও ছেড়ে যাবে অথবা—তার চেয়েও খারাপ উদ্দেশ্য হয়ত আছে—সামান্য একটা গানের বদলে কোন রাখালের কাছে সাধারণ একটা গাধার মত বিক্রী করে দিবে—বড় বড় কান এবং চার পাওয়ালা সাধারণ গাধার মতই বিক্রী করবে মিশরের একমাত্র ও ন্যায্য অধিকারীকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এবং সে আরও বলল······"

মধুভরা চীন দেশীয় ফুলের লতাঝোপের আড়াল থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন আগাবেকের অলক্ষ্যে সরে গেলেন।

সেই দিন রাতে তিনি চোরকে বললেন, "আমার বিশ্বাস আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে।"

"আগের মতই একটুও ভুল না করে সব কাজ আপনি ঠিক ঠিক করেছেন," চোর বলল। "অনুনয় করে বলছি, জেতার জন্য আপনি তার মনে কোন ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছেন ?"

"ঈর্ষা। যে সব নির্বোধ ও অনিষ্টকর অনুভূতির উত্তরাধিকারী হচ্ছে মানুষ, এটি হচ্ছে সেই অনুভূতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ! একটা ভারতীয় প্রবাদ

আছে : আল্লা একজন মানুষকে বললেন, তুমি কি বর চাও বল, আমি তোমাকে তাই দিব, কিন্তু এক সর্তে—তোমাকে যা দিব তোমার প্রতিবেশীকে তার দ্বিগুণ দিব। তুমি যদি একটা বাড়ী চাও, সে পাবে দুটো, তুমি যদি একটা ঘোড়া নাও, তার হবে একজোড়া। এখন বল তুমি কি চাও? 'হে সর্বশক্তিমান,' লোকটি উত্তর দিল, 'আমি প্রার্থনা করি—আমার একটা চোখ নষ্ট করে দাও।' "

তখন তৃতীয় প্রহরের মুরগীর ডাক শোনা গেল—ঠিক প্রত্যূষের আগের ডাক। চোর উঠে খোজা নাসিরুদ্দিন সেলাম জানিয়ে বলল :

"আমার যাবার সময় হয়েছে। আপনার কি হুকুম জানান, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে আপনার ইচ্ছা বলুন।"

"তোমাকে আর একবার কোকান্দে যেতে হবে।"

"হায় আল্লা! প্রতি বার যেতে একজোড়া জুতোর দরকার। পাথরে জুতোর তলা ক্ষয়ে যায়।"

"এইবারই শেষবার। তোমাকে এখানে ফিরে আসতে হবে না। আমি কোকান্দে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

"ঠিক আছে। কখন যেতে হবে?"

"যখন যেতে হবে তোমাকে জানাব।"

আগাবেকের বাগানের নিচের দিকে একটা ছোট কুঞ্জের মত আছে। সেখানে কোন ফুল ছিল না, মালিও কোন দিন কাঁচি হাতে সেখানে আসত না, এখানে প্রচুর আঙুর ও মাধবীলতা জন্মাত; সকালে শিশির ভেজা সজীবতা অনেকক্ষণ ধরে থাকত, বাতাসে ভিজে মাটি ও পদিনার গন্ধ ভেসে বেড়াত, পাখীরাও চারপাশে অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়ে বেড়াত, কারণ ঘন গাছের শাখা-প্রশাখা গরম সূর্যের ছটাকে অনেকক্ষণ আড়াল করে রাখত। এই কুঞ্জেই আগাবেকের সঙ্গে খোজা নাসিরুদ্দিনের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল।

একটা পুরোনো চাকর—অন্ধ, কালা এবং বেশ চুপচাপ—তাদের সামনে একটা জাগে মদ ও দুটো পাত্র রাখল; একমাত্র তাকেই বাড়ীতে রেখে অন্য চাকরদের সেদিন ছুটি দেওয়া হয়েছিল যাতে আকৃতি-পরিবর্তনের গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে। এখন গুপ্তচরদের কোন ভয় না করে তিনি মাতাল হওয়ার জঘন্য পাপে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এবং খোজা নাসিরুদ্দিনকেও করার চেষ্টা করলেন।

"হুজুর, আপনি তো রাজপুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন না," আগাবেকের হাত

থেকে মদে ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমার চলে যাবার সময় হয়ে এল, কিন্তু আপনি আমাকে উজির ও কোষাগারের প্রধান অধ্যক্ষের পদে বসাবার জন্য কিছুই করছেন না।"

"এখনই বিদায় নেওয়ার কথা চিন্তা করছ কেন?"

"মিশরে যাবার পথ দীর্ঘ।"

"কিন্তু খুব অল্প দিন আগেই তুমি বলেছিলে যে উজিরের চাকরী তুমি নেবে না। তুমি তোমার অধ্যয়ন, নির্জন বাসস্থান এবং বাকী জীবনের জন্য আয়ের কথা চিন্তা করছিলে?"

"আমি এখনও তাই ভাবি; কিন্তু সুলতান হয়ত রাজী নাও হতে পারেন। তিনি হয়ত বলবেন, 'হয় চাকরী নাও নয়ত ফাঁসীতে লটকাও!' তাঁর সঙ্গে তো আর তর্ক করা চলে না। সুতরাং আমি ঠিক করেছি এক্ষেত্রে চাকরী নেওয়ার জন্য তৈরি থাকাই ভাল।"

আগাবেক অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটো কোঁচকালেন এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন।

"গোপন কক্ষের কি হবে?" তিনি বললেন।

"ঠিক এই নিয়েই আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—সবচেয়ে ভাল হয় যদি এড়িয়ে যেতে পারি। আপনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক বড়—আপনি আমাকে উপদেশ দিন। উপহার হিসেবে—আমি দিব্যি করে বলছি—মিশর থেকে আপনাকে একটা সোনার কাজ করা হুঁকো ও একটা রূপোর তৈরি মদের পাত্র পাঠাব।"

একটা হুঁকো এবং একটা পাত্র! মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত লোকের কাছে যেন দু ফোঁটা জল ফেলে দেওয়া। আগাবেক হুঁকো বা পাত্রের স্বপ্ন দেখেননি, বরং মিশরের রাজপ্রাসাদে সোনায় ভর্তি সিন্দুকের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া টাকার চেয়েও দামী সেই সম্মান ও ক্ষমতা!

খোজা নাসিরুদ্দিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন; তিনি আগাবেকের মুখের দিকে চাইলেন, তাঁর দৃষ্টি আগাবেকের হাতের উপর ছিল। তার মোটা আঙুলের কাঁপুনি ও তাঁর স্ফীত শিরা উপশিরার ধুকপুক শব্দ থেকে তিনি যাদুর মত তাঁর মনের কথা যেন জানতে পারলেন। সেজন্য আগাবেকের পরের কথা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না।

"উজ্জাকবাই, তোমার রাজপুত্রকে কেন আমাকে দিয়ে দাও না?"

সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া খারাপ হবে। কিছুক্ষণ বঁড়শিতে গেঁথে খেলানো দরকার।

"আপনি ?" বিদ্রূপ করে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "অনেক বড় মানুষে একই প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু প্রথমতঃ রাজপুত্র আমি ছাড়া অন্য কাউকে পথের সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেন না, দ্বিতীয়তঃ······"

. "রাজপুত্রকে রাজী করান যেতে পারে। তা ছাড়া যতদিন তিনি গাধার রূপে আছেন······"

"আপনি বলতে চান তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যেতে পারে ? প্রতারণা করতে চান ? হায় হুজুর !"

"আমি এ ধরনের কিছু ভাবিনি। তাঁর উত্তর অবশ্য যে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারেন না······"

"আহা, আপনি কি তাঁর লেজ নাড়া ও মুচড়ান ভুলে গিয়েছেন ?"

"এসব অবশ্য যে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে।"

"বাস্তবিক, হুজুর, আপনি বিচারকের কাজের জন্যই জন্মেছিলেন ! এ ছাড়া দ্বিতীয় এক বাধা আছে, যেটা আপনি নিজে।"

"আমি ?"

"আপনি কি ভাবে আমাকে পুরস্কার দেবেন ?"

মিশরের উজির হওয়ার ইচ্ছা আগাবেকের মনে এমন ভাবে জেগে উঠল যে তাঁর জিভও সঙ্গে সঙ্গে সরস হয়ে উঠল।

"তুমি নির্জনতা চাও ?" খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে ঝুঁকে তিনি বললেন। "এর চেয়ে আর কোথায় তুমি বেশি নির্জন ও শান্তির জাগয়া খুঁজে পাবে ?" বাস্তবিক চারপাশে যে নির্জনতা বিরাজ করছিল তা অনেকটা স্বপ্নের মত। "তুমি সারা জীবনের জন্য অল্প আয় খোঁজ করছ ? আমার হ্রদ থেকেই তুমি ভালভাবে জীবন কাটানোর পথ খুঁজে পাবে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু হ্রদ ও জল বিলিয়ে দেওয়া নিয়ে আমার অসুবিধার কথা ভেবে দেখুন," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমি আমার জ্ঞান অন্বেষণ থেকে অনেক দূরে সরে যাব।"

"একটা রক্ষক রাখ। অল্প বেতনের বদলে সে সব কিছু করবে।"

"দারুণ খাঁটি কথা ! আমার একবারও খেয়াল হয়নি যে আমি একজন রক্ষক রাখতে পারি।"

"আরও সত্যি যে তুমি তার উপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে যাদু কাজের গাছগাছড়া খুঁজে বেড়াতে পারবে।"

"যাদু কাজের গাছগাছড়া!" খোজা নাসিরুদ্দিন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। "যাদু কাজের গাছগাছড়া সংগ্রহ আমি ঠিক তাই চাইছি!"

"ঠিক তাই!" আগাবেক আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আসল জায়গায় ঘা দিতে পেরেছেন ভেবে অত্যন্ত খুশী হলেন; তাঁর যুক্তি, যা এতক্ষণ শঠতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন যেন চারপায়ের উপর ভর করে নড়েচড়ে ও আনন্দে নেচে উঠল। "এখানে যাদু কাজের গাছগাছড়ার কোন শেষ নেই—আমি অনেক দিন ধরেই জানতাম, তোমাকে অবশ্য বলা হয়নি। এখানে সব জায়গায় তারা জন্মায়! কেবল একটাই তুমি খুঁজে পেয়েছ। কিন্তু এটা কিছুই নয়, প্রায় একশো ভাগের এক ভাগ!"

"তাই বুঝি?" অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন ফিসফিস করে বললেন।

"হাজার! হাজার ভাগের এক ভাগ! তোমার কোন ধারণাই নেই যাদু কাজের এই গাছগাছড়াগুলো এদিকে কি মাত্রায় জন্মায়," মদের ঝোঁকে আগাবেক তাঁর জিভকে নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটালেন, অবশ্য ভয় পাচ্ছিলেন যেন মিথ্যা ধরা না পড়ে, কারণ তাঁর সামনে বসে আছেন এক জ্ঞানী ব্যক্তি; অবশ্য বসে আছেন এমন এক লোক সাধারণ জীবনে যিনি শিশুর মত সরল এবং যাঁকে দোষ থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। আসলে বসে আছেন খোজা নাসিরুদ্দিন যিনি মানুষের আত্মার সর্বোত্তম বিকাশের সঙ্গে মনের শঠতাকে মেশাতে সক্ষম এবং পৃথিবীতে যে ধূর্ত নির্বোধ ঘুরে বেড়ায় তাদের তাঁবেদার হয়ে চলতে যিনি নারাজ। পৃথিবীর সকল জ্ঞানী ব্যক্তি, ঋষি এবং কবিদের প্রাত্যহিক জীবনে এ হচ্ছে এক শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ।

"ঐ যে, ঐ দেখ মাধবীলতা," নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আগাবেক বলে চললেন। "এটাও যাদু কাজের গাছ! ঐ যে চোরকাঁটার গাছ ওগুলোও! চারপাশের প্রায় সব গাছই যাদুর কাজে লাগে। একটি গাছও পাবে না যেটা যাদুর কাজে লাগে না। তোমার আগে এখানে একজন যাদুকর ছিল, সেই আমাকে এসব বলেছে। তার চেয়েও ঐ যে পাথরগুলো দেখছ ওগুলোও যাদুর কাজে লাগে। শুধু তুলে নেওয়ার জন্য তারা যেন অপেক্ষা করছে! সেই যাদুকর দু-বস্তা পাথর ও দু কমণ্ডলু ভর্তি জল নিয়ে গিয়েছিল! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—খুব

ঘুরে নয় কাছেই একটা জলাশয় আছে যার জল যাদুর কাজে লাগে। বেশ কাছে। সব কিছুই এখানে অলৌকিক, সব কিছু!"

যাদুর গাছগাছড়া, যাদুর পাথর ও যাদুর জল—সব মিলিয়ে কোন মানুষ আর বেশিক্ষণ লোভ সামলাবে?

খোজা নাসিরুদ্দিনও পারলেন না। হ্যাঁ, তিনি হ্রদ, হ্রদের বাড়ী, বাগান এবং দশ হাজার টাকার বিনিময়ে রাজপুত্রকে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন।

"আমার কাছে এখন সাত হাজার টাকা আছে," আগাবেক বললেন। "মাত্র সাত। আর মিশর যাবার পথে সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু রাখব।"

"সম্প্রতি মামেদ-আলির কাছে যে মণিমুক্তো পেয়েছিলেন সেগুলোর কি হবে?" খোজা নাসিরুদ্দিন মনে করিয়ে দিলেন।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকায় রফা করলেন। বাকী দু হাজার মণি-মুক্তোগুলো আগাবেক সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

"রাজপুত্র গররাজী হবেন না!" আগাবেক বললেন। "শেষ কয় দিনে তিনি আমাকে ভালভাবেই জেনেছেন। যদি না রাজী হন, তবে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করা অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে তুমি মরে গিয়েছ। আমরা এমনভাবে ব্যবস্থা করব যে তিনি সন্দেহ করতে পারবেন না এবং কিছুই জানতে পারবেন না।"

খোজা নাসিরুদ্দিনের মরবার কোন ইচ্ছা ছিল না—তা সে সত্যিই হোক আর ভান করেই হোক।

"এর প্রয়োজন নেই," তিনি বললেন। "এত বড় একটা ন্যায় কাজে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কি হবে? রাজপুত্রকে রাজী করার চেষ্টা করা যাক।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রাজী করতে এগিয়ে গেলেন। প্রচুর কান মোচড়ান ও লেজ নাড়ান হল। সেগুলোর যথাযোগ্য ব্যাখ্যাও করা হল। তাঁরা পরে কুঞ্জে ফিরে এলেন।

"এখন একটা ছোট্ট কাজ বাকী আছে," আগাবেক আনন্দে বললেন। "প্রতি বসন্তে কাজী আব্দুরহমান, ইয়াঙ্গী-মাজার নামে এক গণ্ডগ্রাম থেকে এই অঞ্চলে আসেন; সেই গ্রামেই তিনি বসবাস করেন। তিনি মামলা-মোকদ্দমা দেখাশোনা করেন এবং কেনাবেচার দলিল সম্পাদন করেন। তিনি কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও আছেন; আমি কালই ঘোড়সওয়ার পাঠাব তাঁকে নিয়ে আনতে। ইতিমধ্যে, তুমিও উজাকবাই যত পার এইসব গাছ-গাছড়া

অনুগ্রহ কর। একটা কাগজের উপর সমস্ত মন্ত্র লিখে রাখ যাতে আমি ভুলে না যাই।"

"রাজপুত্র আপনার হয়েই গিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আমার নতুন বাড়ী এখনও দেখিনি," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন।

"এস, তোমাকে দেখাব।"

তাঁরা বাড়ীটা দেখলেন। এটা খুব ভাল বাড়ী, অনেক দিন যাতে টিকতে পারে সেজন্যে মজবুত করে বানানো। "সেই পাগল দম্পতি—সৈয়দ ও জুলফিয়ার এটা হবে বিয়ের উপহার; তাদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য সেখানে যথেষ্ট জায়গা হবে!" খোজা নাসিরুদ্দিন মনে মনে ভাবলেন আগাবেককে অনুসরণ করার সময়। বাড়ীটা ছিল শান্ত, পরিষ্কার, বড় ও খোলামেলা। বড় বড় জানলার ভিতর দিয়ে দুপুরের সূর্য আলো ঢেলে দিত এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের পায়ের কাছে যেন উষ্ণ হলুদ রংয়ের কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছিল। আলোর চুমকি দেওয়ালের উপর বাতাসে নাচছিল এবং বাগানের দিক থেকে বাতাস ছুটে এসে জানলার চৌকাঠগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছিল।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সেই দিন থেকে আগাবেক আর পুরোনো আগাবেক ছিলেন না। সময়ের প্রভাবে তিনি মিশরের রাজপ্রাসাদের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন; নিজের নতুন নাম নিলেন মিশরের উজির খোরেশমের আগাবেক-ইবন-মুরতাজ। ইতি-মধ্যেই নিজের কাঁধের উপর তিনি যেন সোনার সূক্ষ্ম কাজ করা পোশাকের ভার অনুভব করছিলেন। কল্পনায় তিনি তাঁর বুকের উপরের পদকগুলোর এবং কোমরের পাশে সোনার জল করা তলোয়ারের ঠুনঠুন শব্দ শুনতে পেলেন। সেদিন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে চোরাকে একটি দিন কাটানো মানে ভাবী জাঁকজমকপূর্ণ একটি দিন থেকে বঞ্চিত হওয়া। প্রতিটি ভাসমান মিনিট যেন সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আগামী দিনের প্রত্যাশিত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও সুযোগ-সুবিধা যা কোন দিনই পূরণ করা সম্ভব নয়। তিনি অহমিকা-পূর্ণ ঔদ্ধত্যে ফেটে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা খোজা নাসিরুদ্দিনের পক্ষে উৎপীড়ন হয়ে উঠল। একমাত্র চাকর হিসেবে আগাবেক রাখলেন সেই অন্ধ ও কালা বুড়োটাকে যে প্রতিদিন সকালে তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াত। গাধার সামনে তিনি আর একবারও খোজা নাসিরুদ্দিনকে যেতে দিলেন না।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের জীবন গতানুগতিকভাবেই এগিয়ে চলল। বাগানের ফল আবার মিষ্টি রসে ভরে উঠল, গুটির ভিতর পশমের পোকা প্রথম ও দ্বিতীয় বারের মত নিজেদের আবৃত করল, মাঠে ভেড়াদের বাচ্চা প্রসব করার সময় হয়ে এল। প্রত্যেক গ্রামবাসী কাঁধের উপর গরম পোশাক তুলে নিল; সন্ধ্যে-বেলায় সফরের সরাইখানায় মাত্র কয়েকজন গ্রামবাসী আসত—পাঁচ বা ছয়-জনের বেশি হবে না; বাকী লোকেরা সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আকাশে সূর্য থাকতেই বিছানায় শুতে যেত।

চোরাকের লোকেরা ইতিমধ্যেই হ্রদের নতুন রক্ষক ও তার অদ্ভুত ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল; সরাইখানায় ইদানীং মাঝে মাঝে তাঁর কথা উল্লেখ করা হত। কিন্তু গ্রামবাসীদের মনে আগাবেকের এক পাপমূর্তি প্রতি-নিয়ত ভাসত, কারণ আবার সেচের সময় হয়ে আসছিল সেই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা ও ভয়ের দিনগুলো।

কিন্তু হঠাৎ একটার পর একটা ঘটনা বিনামেঘে বজ্রপাতের মত তাদের সামনে এসে হাজির হল, যার প্রত্যেকটি আগেরটার চেয়ে বিস্ময়কর।

প্রথম খবরটি দিলেন স্থানীয় মোল্লা শুক্রবার সকালের নামাজের পর। আগাবেক হঠাৎ আল্লার চিন্তায় মন দিয়েছেন এবং মসজিদকে পনের হাজার টাকা দান করেছেন আর হুকুম দিয়েছেন সামনের সারা বছর মৃত ব্যক্তিদের জন্য মোনাজাত করতে হবে।

পনের হাজার! সেচের ঠিক আগে! তাহলে সেচের জন্য কত টাকা দাবী করবেন? মৃতদের জন্য প্রার্থনা! কিন্তু মৃত কে? সেই স্বচ্ছ পোকাদের জন্য অবশ্যই, যদিও গ্রামবাসীরা সেসব কিছুই জানত না এবং তারা নানারকম জল্পনাকল্পনা করতে লাগল। "বাস্তবিক এই মোনাজাত কি তাদেরই জন্য যাদের তিনি ভবিষ্যতে অনাহারে মেরে ফেলতে চান?" মুখ গম্ভীর করে সফর ভবিষ্যদ্বাণী করল।

দ্বিতীয় খবর এল খোদ আগাবেকের কাছ থেকে। কয়েক দিনের মধ্যেই হজ্জ করতে তিনি চোরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—তীর্থের জন্য যাবেন কাবার পবিত্র পাথর দেখতে। এইভাবে আগাবেক তাঁর মিশর যাত্রা গোপন রাখলেন।

নতুন ভয়, আবার জটিলতা! তিনি কি সেচের আগেই চলে যাবেন, না সেচের পরে? আসল জিনিষ হচ্ছে—এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সেচের জন্য তিনি কত টাকা চেয়ে বসবেন?

শেষ খবরটা ছিল সবচেয়ে অশুভ ও ভয়ংকর: কাজী আব্দুরহমানের খোঁজে আগাবেক তিন দিকে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন। তিনি কাজীকে-চোরাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কি জন্য? বিদায়ের আগে কার বিরুদ্ধে-তিনি মামলা ভরতে চান বা কোন জিনিষ কেনাবেচা করতে চান?

এই ব্যাপারে সরাইখানায় এক বিরাট জনসমাবেশ হল। বাগান, মাঠ বা গোচারণ-ভূমির কথা সকলে ভুলে গেল। সফর আবার ভবিষ্যদ্বাণী করল, "অপেক্ষা কর, দেখবে যাবার আগে সে সর্বনাশ করে যাবে।" এইসব আশংকার মধ্যে একমাত্র মামেদ-আলিরই আনন্দ হচ্ছিল। যাই ঘটুক না কেন, তিনি আর আমার জুলফিয়াকে দাবী করবেন না!

ঠিক হল ভাগ্যকে মাঝ পথে আটকানই ভাল, সেজন্য আগাবেককে জিজ্ঞাসা করা দরকার সামনের সেচের জন্য তিনি কত টাকা দাবী করবেন। চারজন বৃদ্ধকে তাঁর কাছে পাঠান হল।

বৃদ্ধেরা তার দেখা পেল না—তিনি দেখা করতে রাজী হলেন না। হ্রদের নতুন রক্ষক প্রভুর হয়ে কথা বলল। তার কথাবার্তা আরও অদ্ভুত, ফলে তাদের মনে কোন বিশ্বাস এল না।

"তোমরা জল পাবে," সে বলল। "আগে থেকে কিছুই বিক্রী করবে না। তোমাদের নিজের নিজের কাছে যা টাকা আছে তাই যথেষ্ট।"

কিন্তু তাদের কাছে আর কত টাকা আছে। সমস্ত চোরাকে খুব জোর দেড়শো টাকা। বৃদ্ধেরা রক্ষককে সে কথা জানাল। সে হেসে উত্তর দিল:

"তোমাদের কত টাকা আছে আমি জানি—সে সব ছাগলের দুধের শুকনো স্তনের মত। আমি আবার বলছি: কিছু বিক্রী করবে না। তোমরা যাও এবং আমার কথা অন্যদের কাছে পৌছে দাও।"

এ ধরনের উত্তর তাদের উদ্বেগ কমানোর চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিল।

ঠিক সেই সময় ঘোড়সওয়াররা এই খবর নিয়ে ফিরে এল যে কাজী আব্দুরহমান ওলতি-আগা গ্রামে তাঁর কাজ শেষ করে পরদিন সন্ধ্যায় চোরাকে পৌছাইবেন।

আগে শোনা যায়নি এমন কোনও ঘটনা শীঘ্র ঘটতে যাচ্ছে এই ভয়ে চোরাক-গ্রাম ঝিম মেরে রইল।

চোরাকের মাত্র দুজন অধিবাসী এই উদ্বেগে কোন অংশ নেয়নি—তারা সৈয়দ ও জুলফিয়া। কেন অংশ নেয়নি, যে কেউ অনুমান করতে পারেন। যুগের আশ্চর্য প্রতিভা হামাধানি নামে খ্যাত বদি-উজ-জামান তাঁর *দি সেন্ট অফ মর্ণিং রোজেস* বইয়ে সুন্দরভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন: "প্রেম যদি আবেগপূর্ণ হয় তবে তার সঙ্গে খানিকটা মানসিক বিকৃতি থাকবেই, অনেকটা পাগলামির মত, যাতে কোন রকম গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল, কারণ এটা বিপজ্জনক নয় এবং কোন রকম ক্ষতিও করে না—বাস্তবিক, এ ছাড়া আর কি হতে পারে, কারণ প্রেম হচ্ছে আল্লার দেওয়া এক স্বর্গীয় অনুভূতি: আল্লার কাছ থেকে পাওয়া কোন জিনিষ কি অনিষ্টকর হতে পারে? সেজন্য কোন প্রেমিক যুবকের দেখা পেলে তার বিভ্রান্ত অবস্থা বা তার অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে কেউ যেন আশ্চর্য না হন, কারণ তার নিজের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতির এক আলোড়ন চলেছে যার পরিণতি হচ্ছে অপ্রতিভ অবস্থা যা সকলকেই নিরাশ করে এবং নিজেকেও খুব কম করে না। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং তার সঙ্গে তর্ক না করাই ভাল, বিশেষ করে তার প্রণয়িনীর ব্যাপারে, কারণ যতক্ষণ সে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ততক্ষণ এক বোকা ছাড়া অন্য কেউ তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে না।" সেইভাবে এই জ্ঞানী ব্যক্তির কথা আমাদের অনুসরণ করা যাক এবং প্রেমিক যুগলকে সব রকমের প্রশ্রয় দেওয়া যাক; রাতের বাগানে তারা পাশাপাশি বসে থাকুক এবং তাদের আলোচনার বর্ণনা আমাদের না দেওয়াই ভাল, কারণ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করতে গেলে তাদের আবেগ ও চিন্তা 'সকলকেই নিরাশ করবে'।

বৃদ্ধ কাজী আব্দুর রহমান বহু বছর ধরে কুটিল জীবনযাপন করে এবং জটিল কাজের বিচার করে শেষে নিজেই কুটিল হয়ে পড়লেন—মনে, শরীরে ও মুখে। এমন কি তাঁর ঘাড়টাও ছিল জটিল ধরনের, মাঝখানে ছিল খানিকটা মাংসপিণ্ড; তাঁর নাকটাও ছিল জটিল, ঠিক ডগায় একটা গর্ত। মুখটা ছিল বিশ্রী ধরনের বাঁকা এবং তাঁর ছোট হালকা দাড়িটাও ছিল বাঁকা। বাঁ পায়ে বেশ পরিষ্কার খোড়া এবং হাঁটতেন দুলে দুলে। সেইজন্য সাধারণ কথাবার্তায় সকলে তাঁকে ডাকত—'কুটিল কাজী আব্দুর রহমান' বলে। এ ছাড়া তিনি সব সময় দু চোখের যে কোন একটা ঘোরাতেন তাঁর বিচার্য কাজের অবস্থা বুঝে—ডান চোখটা ঘুরত ঘুষের আশায় এবং বাঁ চোখটা ঘুরত পাওয়ার পর।

যেহেতু তিনি নিঃসন্দেহে এই দুটো অবস্থা মেনে চলতেন—ঘুষ নেওয়ার আগের ও পরের অবস্থা—সেইজন্য তিনি পৃথিবীর যে কোন জিনিষ একচোখে দেখতেন।

তিনি একটা ছ্যাকড়া গাড়ীতে চেপে চোরাকে এলেন যার চাকাগুলো ঢুলতে থাকার ফলে সেগুলো রাস্তায় চাকার গর্ত ধরে চলছিল এবং প্রতিটি মোড়ে এসে গর্ত থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করছিল। বলগার জোরাকাটা টাট্টু ঘোড়াটা ছিল হাড় জিরজিরে কীটদষ্ট এবং বেঁটে চেহারার ছোট্ট জন্তু যার লেজ ছিল লোমহীন ও চোখ ছিল বিড়ালের মত ছোট; গাড়োয়ান তার খোঁড়া পা'টা মুড়ে বসেছিল ও অন্য পা'টা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজী নিজে তাঁর পর্দা লাগানো গাড়ীর ভিতর বসেছিল যে হচ্ছে কাজীর সব গোমমেলে ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী। কেরানীটা ব্যক্তিগতভাবে কুটিল না হলেও তার মুখ ছিল পাকান এবং কুঞ্চিত, ঠিক যেন কেউ তাকে আছড়ে কেচে নিংড়িয়ে নেওয়ার পর মেলে শুকাতে দিতে ভুলে গিয়েছে, ফলে শুকিয়ে একটা তাল-পাকানো পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

কাজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আগাবেক তাঁর চাকরকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কাজী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; মিথ্যা অপবাদের কলংক থেকে নিজের পক্ষপাতহীন পবিত্রতা রক্ষার জন্যই তিনি তা করেছিলে। তিনি সরাইখানায় এসে আশ্রয় নিলেন। সফর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সমস্ত কৌতূহলী লোকদের সরিয়ে দিয়ে কাজীর তত্ত্বাবধানের ভার সৈয়দের উপর দিলেন এবং নিজে কম্বল খুঁজতে বাড়ীর দিকে গেলেন। তখনকার প্রথা-নুযায়ী সম্মানিত অতিথির বিছানা বিভিন্ন তোষক দিয়ে তৈরী হওয়া উচিত এবং সফরের বিবেচনায় কাজীর বিছানা অন্ততঃ বারটা তোষকের কম হওয়া উচিত নয়।

যথারীতি পরিষ্কার হয়ে নিয়ে চা খাওয়ার পর কোন কথা না বলে কাজী তাঁর কেরানীর দিকে একচোখে চাইলেন—ডান চোখে। কেরানীও কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে আগাবেকের বাড়ীর দিকে হাঁটলেন।

তিনি ফিরে এলেন রাত পড়তে যখন সরাইখানায় বারটার বদলে চৌদ্দটা তোষক স্তূপাকারে রাখা ছিল এবং কাজী তাদের উপর হেলান দিয়ে পশমের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন। কেরানী কোন কথা না বলে তাঁকে আড়াইটা আঙুল দেখাল। এর অর্থ আড়াইশো। কাজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান চোখ বন্ধ করলেন ও বাঁ চোখ খুললেন যা তার 'প্রথম' অবস্থা থেকে 'দ্বিতীয়' অবস্থার ইংগিত দিচ্ছিল।

পরে ফিসফিস করে তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হল যাতে সরাই-খানার কোন লোক তাদের কথা না শুনতে পায়।

"কিসের মামলা ?" কাজী জিজ্ঞাসা করলেন।

"মামলা নয় হস্তান্তর;" কেরানী উত্তর দিল।

"হস্তান্তর ?" কাজী আশ্চর্য হয়ে বললেন। "এত উদারতা কেবল হস্তান্তরের জন্য ?"

"মনে হয় বেশ মোটা দাঁও মেরেছে," ফিসফিস করে কেরানী বলল। "আমার মনে হচ্ছে পিছনে সে মোটা লাভ করেছে।"

"নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত। আমরা কালই সব শুনতে পাব," তিনি কথা শেষ করে পাশ ফিরলেন ও বাঁ চোখ বন্ধ করলেন; ঘুমাবার সময় তাঁর চোখ দুটো অবশ্য 'আগের' ও 'পরের' অবস্থার কোন ইংগিত দেয় না।

বৃদ্ধ কাজী আব্দুরহমান আজ পর্যন্ত জীবনে কেনাবেচার যত দলিল লিখেছেন বা সম্পাদন করেছেন তার মধ্যে এইটিই ছিল সবচেয়ে বেশি জটিল। একটা লোভনীয় হ্রদ, বাড়ী এবং বাগান হস্তান্তর করা হচ্ছে একটা তুচ্ছ ও জঘন্য গাধার বিনিময়ে! ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য আছে, এবং আইন অনুযায়ী গোপন উদ্দেশ্যপূর্ণ যে কোন গোলমেলে হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে কড়া নিষেধ আছে। তবুও এইসব বিনিময় রেজেষ্ট্রী করতে হবে এবং এমন নিপুণতার সঙ্গে করতে হবে যে তাঁর উপরে খান যেসব চতুর ও অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীকে নিযুক্ত করেছেন কাজীদের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁরা যেন কোন রকম সন্দেহ না করেন।

আগাবেক যখন পরিষ্কার গলায় একটা গাধার বিনিময়ে তাঁর হ্রদ, বাড়ী ও বাগান হস্তান্তর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন সরাইখানার বাইরে সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন, অনেকটা একটা বিরাট মৌচাকের বাইরে আলোড়নের পর যে ধরনের শব্দ উঠে সেই রকম শব্দ শোনা গেল। সরাইখানার মঞ্চের সামনে গুঞ্জন উঠে ক্রমশঃ পিছন দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সকলকে উত্তেজিত করল, পরে একটা ঝোড়ো বাতাসের মত বেড়ার কাছে যেসব ছোট ছেলেমেয়েরা বসে ছিল তাদের উপর দিয়ে বয়ে পাশের বাড়ীগুলির ছাদ দিয়ে পরে বয়ে গেল এবং ছাদে ছাদে আনন্দে মেয়েদের রুমাল নাড়তে দেখা গেল। একটা গাধার বদলে হ্রদ! একটা গাধার বিনিময়ে আগাবেক হ্রদ

দিচ্ছেন! চোরাকে সেদিন একজনও মেয়ে বা পুরুষ ছিল না যার যুক্তি সেদিন ধোঁয়াটে হলেও বিভ্রান্ত হয়নি এবং যার বুকে সেদিন কাঁপুনি দেখা দেয়নি।

কিন্তু কুটিল কাজী আব্দুর্রহমান এই করেই তাঁর চুল পাকিয়েছেন; ফলে তিনি একটুও আশ্চর্য হননি। সফরের জোগাড় করা বারটা কম্বলের উপর হেলান দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে মঞ্চের উপর থেকে নিচের জনতার দিকে চাইলেন। নিচে বসেছিল কেরানী, তার দীর্ঘ ভয়াবহ নাকটা কাজীর দলিলপত্রের দিকে ছিল। সেও তার প্রভুর মত কোন রকম ব্যাকুলতা না দেখিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল।

কাজী কঠিন দৃষ্টিতে জনতার দিকে চাইলেন।

গুঞ্জন ক্রমশঃ কমতে লাগিল, পরে ক্রমশঃ সরে যেতে যেতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

ভয়ে ও প্রত্যাশায় সকলে উঠে দাঁড়াল।

"উজাকবাই, বাবাজানের পুত্র!" কাজী ঘোষণা করলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন গাধাটার লাগাম ধরে ক্রমশঃ মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"মুরতাজের পুত্র আগাবেকের কথার উত্তরে তুমি কি বলতে চাও?" কাজী জিজ্ঞাসা করলেন। "তুমি কি বিনিময়ে রাজী আছ?"

"হ্যাঁ রাজী।"

জনতার মধ্যে আবার একটা গুঞ্জন দেখা দিল। সে রাজী! কেই বা হবে না? বাজারে যে গাধাটার দাম বড় জোর তিরিশ টাকা তার বদলে এত সম্পত্তি!

ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, কোন রহস্যময় অন্যায় কাজ। জনতার মধ্যে একজন নিজেকে সামলাতে না পেরে আর্তনাদের মত শব্দ করে উঠল।

কাজী আগের মতই নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

"দু পক্ষেরই বিনিময়ে সম্মতি আছে!" কাজী ঘোষণা করলেন। "আইনের প্রথম প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে। এখন এই গ্রামের যে কোন অধিবাসী যিনি যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়ে এই বিনিময় কেন হতে পারে না বলতে পারবেন তিনি সামনে এগিয়ে এসে সকলের সামনে তা ঘোষণা করুন।"

একজনও এগিয়ে এল না।

কাজী দু এক মিনিট অপেক্ষা করে ঘোষণা করলেন:

"আমি প্রমাণ সাপেক্ষে ঘোষণা করছি যে এই বিনিময় সিদ্ধ হতে কোন বাধা নেই।"

এখন শুধু দলিল বইয়ে লেখা বাকী। এটা এমনভাবে লিখতে হবে যে সামান্যতম শঠতাও যেন প্রকাশ না পায়।

বৃদ্ধ কাজী এইখানে তাঁর বিচার বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিলেন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন। তাঁর বুড়ো মাথায় এই চিন্তা কোন দিকে যাচ্ছিল বা কোন পথ ধরে ছুটছিল বলা বেশ শক্ত, কিন্তু তাঁর পাগড়ী যে কোন এক পথ ধরতে গিয়ে বাঁ দিকে ঝুলে পড়ে একটা কান ঢেকে দিল, তাঁর চশমা বাঁ দিকে হেলে পড়ল, পরে তিনি নিজেই কম্বলগুলোর উপর বাঁ দিকে হেলে পড়লেন, অবশ্য সেগুলো ঠিক ঠিক জায়গাতেই ছিল এবং সফরকে অনেক ধন্যবাদ যে সেগুলো গড়িয়ে পড়েনি, কারণ সে নিজের কাঁধে করে ঠেকা দিয়ে সেখানে বসেছিল।

পরে কাজী যখন কথা বললেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এক উত্তুঙ্গ মনের অহমিকা প্রকাশ পেল।

"বিনিময়ের জন্য দুই পক্ষের নাম লিখে রাখ," তিনি কেরানীকে আদেশ দিলেন।

কেরানী তাঁর কলম নিয়ে আঁচড় দিয়ে চলল, খাতার উপর ঝুঁকে নিজের কাজে সে এমন ব্যস্ত ছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন তার নাক দিয়ে খাতার উপর আঁচড় কেটে চলেছে।

ইতিমধ্যে কাজী নিজের মনে তন্ন তন্ন করে উপযুক্ত কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যাতে চুক্তি সম্পাদন করতে আইনগত রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে।

"একটা লোভনীয় হ্রদ যার সঙ্গে আছে একটা বাড়ী ও বাগান," তিনি একটা আঙুল তুলে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার ভঙ্গিতে বললেন। "ঠিক আছে, এবার আমাদের লিখে ফেলা যাক!" সম্রাটের ভঙ্গিতে তিনি কেরানীকে ইসারা করলেন।

"আমরা এইভাবে এটা লিখে ফেলব: একটা বাড়ী ও বাগান সমেত জলাশয়। কে বলবে যে এই হ্রদটা একটা জলাশয় নয়? উল্টো দিকে যদি জলাশয় সমেত বাড়ী ও বাগান লেখা হয় তাহলে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে জলাশয়টি বাড়ী ও বাগানের সঙ্গে সংলগ্ন। আমি যেমন বলছি লেখ: বাড়ী, বাগান ও তৎসংলগ্ন জলাশয়।"

এটা বেশ চমৎকার প্রস্তাব, কারণ এক টোকাতেই সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে গেল। কথার মারপ্যাঁচে হ্রদটা, যাদুমন্ত্রের মত, কোন বাগানের মধ্যের বা

বাড়ীর সামনের একটা তুচ্ছ জলাশয়ে পরিণত হল। এই বিনিময়ে এখন আসল দামী জিনিস হচ্ছে বাড়ীটা, তার পরে বাগান আর জলাশয়ের যেন কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে আসলে যার কোন দামই নেই।

এইভাবে এক পক্ষের সম্পত্তির দাম কমিয়ে একশ ভাগের এক ভাগে আনা হল। বিনিময়ে অন্য পক্ষের সম্পত্তিরও তালিকা করা দরকার। এটাকে ঠিক মত সাজানর জন্য পণ্ডিত কাজী অন্য পক্ষের সম্পত্তি পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলেন।

এখানেও তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির সূক্ষ্মতার পরিচয় দিলেন।

"বাবাজানের পুত্র উজাকবাই, এবার আমাকে বল তুমি তোমার গাধাকে কি নামে ডাক?"

"আমি তাকে সব সময় জ্যাকগাধা নামে ডাকি।"

"জ্যাকগাধা," কাজী চীৎকার করে উঠলেন। "এত দামী গাধাটার কি বিশ্রী নাম, যার বিনিময়ে তোমার ভাগ্য খুলে যেতে চলেছে! এর একটা ভাল নাম দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যা শুনতে ভাল লাগে, যেমন ধর সোনালি অলতিন বা রূপালি কিউমিশ?"

"আমার কোন আপত্তি নেই," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন কাজীর চিন্তাকে মাঝ আকাশে লুফে নিয়ে ভাব দেখালেন যেন, "এতে আমার কিছু এসে যায় না, তার তো আরও কম।"

"লেখ!" কাজী কেরানীকে বললেন। "উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি—বাড়ী, বাগান ও তৎসংলগ্ন জলাশয় মুরতাজের পুত্র আগাবেকের অধিকারে ছিল, এখন ইহা বাবাজানের পুত্র উজাকবাইয়ের কাছে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে রূপালি কিউমিশের বিনিময়ে যার ওজন······বল উজাকবাই," বিজয়ীর গর্বে শিঙার মত গলা বাড়িয়ে কাজী বললেন, "বল তোমার গাধার ওজন কত?"

"প্রায় দেড়শো পাউণ্ডের মত।"

"আমি ঠিক ওজন চাই।"

"ঠিক আছে—একশো সাতান্ন পাউণ্ড দশ আউন্স, বেশি ওজনটা তার কুঁড়েমি ও পাঁউরুটির জন্যে।"

"লেখ!" কেরানীর দিকে চেয়ে কাজী শিঙার মত বেজে উঠলেন। "একশো সাতান্ন পাউণ্ড দশ আউন্স রূপোর বিনিময়ে উপরিউক্ত হস্তান্তরের চুক্তি আমি রহুলের পুত্র কাজী আব্দুর্রহমান বর্তমান আইন অনুযায়ী ও রাজকীয় আদেশ বলে সম্পাদন করলাম।

খোজা নাসিরুদ্দিন ভয়ে কাজীর দিকে চাইলেন। তাঁর কাজ—যদিও চাতুরি ও শঠতায় ভর্তি—একেবারে খাঁটি এবং প্রশংসা না করে পারা যায় না।

"এই চুক্তি সরকারী শিলমোহর ও আমার স্বাক্ষর দ্বারা সরকারীভাবে নথিভুক্ত করা হল!" কাজী শিঙার মত বেজে উঠলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর সরাইখানা পূর্ণ করে জনতার সামনের জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল, এদিকে তিনি নিজের অগোচরে একটু একটু করে ক্রমশঃ বাঁ দিকে হেলতে লাগলেন; ঠিক সময়, ভাগ্যের খেলাও বলা চলে, সফর ভুলে গিয়ে কাঁধের ঠেকাটা সরিয়ে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে কাজী পনেরটা কম্বল সমেত মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন।

বিনিময় হয়ে গেল। হ্রদটা এখন খোজা নাসিরুদ্দিনের এবং গাধাটা আগাবেকের।

উভয় পক্ষকেই কাজী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দিয়ে দিলেন।

গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে সারাদিনের ঘটনা আলোচনা করতে করতে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হল।

সরাইখানার সামনের রাস্তাটা জনশূন্য হয়ে গেল। পরে সরাইখানাও জনশূন্য হয়ে গেল, কারণ বৃদ্ধ কাজী চোরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন যেখানে এ ধরনের অনেক মামলা ও হস্তান্তর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিদায়ের আগে খোজা নাসিরুদ্দিন কাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ফেরার পথে কত দিন পর তিনি চোরাকে আবার ফিরে আসতে পারবেন।

কাজীর বাঁ চোখটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে ডান চোখটা খুলল যা ইঙ্গিত করছিল 'আগের' অবস্থার।

"চার দিনের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি আমি পাশের গাঁয়ের কাজ শেষ করে নিই তত তাড়াতাড়ি," তিনি উত্তর দিলেন এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চাকার দাঁড়িগুলোতে পা দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

কেরানী গাড়ী ও ঘোড়ার লেজের মধ্যের আগের জায়গায় গিয়ে বসল।

গাড়োয়ান এক পায়ের হাঁটু মুড়ে ও অন্য পা সামনে এগিয়ে দিয়ে জিভ দিয়ে শব্দ করে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল।

গাড়ীটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে, দুলতে দুলতে গড়িয়ে যেতে সুরু করল এবং পপলার গাছগুলোর পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে রাতে খোজা নাসিরুদ্দিন ও আগাবেক কারও চোখে ঘুম ছিল না।

মিশরের রাজপোশাক দেহে ধারণ করার জন্য অধৈর্য হয়ে আগাবেক আর একটা দিনও চোরাকে থাকতে রাজী হলেন না। পরদিন সকালেই তিনি চলে যেতে মনস্থ করলেন।

সন্ধ্যেবেলায় তাঁর বোঁচকা বাঁধা হল, সামান্য একটু জায়গা রাখা হল পাঁচন ভর্তি দুটো বদনা ভরার জন্য। মাঝ রাতের মধ্যেই বদনার মুখ দুটো মোম দিয়ে এঁটে বোঁচকায় ভরে ফেলা হল।

একটা মোটা চীনা কাগজের উপর খোজা নাসিরুদ্দিন যে মন্ত্রগুলো লিখে-ছিলেন সেটা আগাবেক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁর জামার ভিতরের ফতুয়ার পকেটে ভরে নিলেন। সেই পকেটে তাঁর টাকা মামেদ-আলির দেওয়া মণিমুক্তোও ছিল।

দিন সুরু হল।

"সময় হয়ে এসেছে!" আগাবেক বললেন। "বিদায় উজাকবাই, মিশর থেকে দামী উপহার আশা করতে পার। আমি তোমাকে সোনার কাজ করা হুঁকো ও রূপোর তৈরি মদের পাত্র পাঠাব।"

খোজা নাসিরুদ্দিন নিচু হয়ে সেলাম জানিয়ে বললেন:

"ধন্যবাদ, মিশর দেশের ক্ষমতাবান ও মাননীয় উজির। শেষ বারের মত সেবা করার সুযোগ দিয়ে একটু কষ্ট করুন।"

তিনি বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন এবং একটু পরেই নাছোড়বান্দা গাধাটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন।

ভিজে পাথরের ধাপের উপর খুরের শব্দ তুলে গাধাটা বাগানে নেমে এল এবং সোজা ফুলগাছের দিকে ছুটল যার মাথাগুলো ইতিমধ্যেই খেয়ে ফেলা হয়েছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন তার লাগাম ধরে অত্যন্ত নিপুণভাবে তার পিঠের উপর বোঁচকাটা ফেলে দিলেন।

"আরে, কি করছ!" বোঁচকা কেড়ে নিতে আগাবেক চীৎকার করে উঠলেন। "রাজপুত্রের পিঠে বোঝা চাপাচ্ছ! বাস্তবিক, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছে, উজাকবাই!"

"নয় কেন?" অবাক হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরের বদলে আগাবেক তার দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে চাইলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বোঁচকাটা নিজের কাঁধের উপর তুলে নিলেন।

"আপনি ভাবছেন এইভাবে মিশর পর্যন্ত সমস্ত পথ যাবেন?" খোজা নাসিরুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন।

"কোকান্দে আমি একটা মাল-বওয়া ঘোড়া কিনে নেব। শুধু এই মালগুলোর জন্যে। আমি নিজেও হাঁটব, কারণ রাজপুত্র যখন হাঁটছেন তখন আমার পক্ষে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া বিশ্রী দেখায়। আমি রাজপুত্রের জন্য একটা গাড়ী ভাড়া করব, কিন্তু আমার ভয় হয় যে যারা জানে না এই চারপেয়ে জন্তুর রূপে এক রাজপুত্র লুকিয়ে আছেন তারা তাঁকে অপমান করতে পারেন, কারণ তারা তাঁকে গাড়ীতে চড়ে যেতে দেখার চেয়ে তার পিঠে যাওয়াতেই বেশি অভ্যস্ত।"

"সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনার জ্ঞানের সীমা নেই, হে উজির!"

প্রত্যূষের আকাশের নীল রং খুব তাড়াতাড়ি সকালের হালকা রংয়ে পরিণত হল। একটা হালকা গোলাপী আভা দেখা দিল। পাখীরা কিচির মিচির করে সারা বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

গাধা, খোজা নাসিরুদ্দিন ও আগাবেক রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। দূরের পাহাড়গুলো গোধূলিতে ঢাকা ছিল, তাদের নিচের দিকটা ঘন সাদা কুয়াশায় যেন ভাসছিল আর তাদের বরফে ঢাকা চূড়াগুলো একটা স্বচ্ছ আবছা আলো দিয়ে জ্বলছিল—যেন নতুন দিনের প্রথম হাসি। খাদ ও ফাটলের মধ্যের কুয়াশাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল এবং নড়েচড়ে উপর দিকে উঠছিল। নিশ্বাস নেওয়া ছিল কত সোজা!

"যাত্রাপথে, সঙ্গে আরবের দিনার থাকা ভাল," খোজা নাসিরুদ্দিন আগাবেককে উপদেশ দিলেন। "সর্বত্র তাদের পুরো দাম দেওয়া হয়, কারণ অন্যান্য দেশের মত আরবের সোনায় কোন খাদ দেওয়া হয় না। কিন্তু বদল নেওয়ার সময় খুব সাবধান হবেন। মুদ্রা-বিনিময়কারীরা প্রায়ই প্রতারক হয় এবং আপনার হাতে বাজে ধাতু-সংকরের তৈরি মুদ্রা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। যখন কোকান্দে আপনার সব কাজ হয়ে যাবে তখন হে মাননীয় উজির, বিদায় নেওয়ার আগে মুদ্রা-বিনিময়কারী রহিমবাইয়ের দোকানে একবার যাবেন। বাজারের প্রধান জলাশয় থেকে দোকানটা খুব বেশি দূরে নয়, বড় ঝরণাটার ঠিক বাঁয়ে, প্রায় পনের বছর আগে একবার পাথর দিয়ে বাঁধান হয়েছিল, পরে আর কোন দিন বাঁধান হয়নি। রহিমবাইয়ের নাম করলে কোকান্দের যে কোন লোক দেখিয়ে দিবে। প্রত্যেকে জানেন তিনি একজন সৎ ব্যবসায়ী যাঁকে বিশ্বাস করা চলে।"

"তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার মণিমুক্তোগুলোও কিনবেন ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অন্য কোন লোককে বিশ্বাস করবেন না ! তিনি আপনাকে ভাল দাম দিবেন।"

"বড় ঝরণাটার বাঁয়ে বললে, না প্রধান জলাশয়ের পরে ?"

"হ্যাঁ, আল্লা আপনাকে কি সুন্দর স্মৃতিশক্তি দিয়েছেন।"

"বিদায় উজাকবাই !"

"বিদায় মাননীয় উজির !"

"আমার কাছ থেকে উপহার আশা করতে পার।"

"ধন্যবাদ, মহান উজির।"

"তুমি এবার রাজপুত্রকে বিদায় জানাও। তাঁর অধীনে দীর্ঘ দিন কাজ করার সুযোগ তোমার হয়েছিল ; সেই সম্মান ও আনন্দের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাও।"

"মাটিতে নত হয়ে আমি সেলাম জানাচ্ছি, ধন্যবাদ, মহান প্রভু।"

এই বলে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অনেক অনেকক্ষণ ধরে খোজা নাসিরুদ্দিন তাদের দিকে চেয়ে রইলেন। মানুষের প্রকৃতি এতই অদ্ভুত যে আগাবেক তাঁর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চলে যেতে দেখে তিনি দুঃখবোধ করলেন ; কারণ বিচ্ছেদ যখন আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে তখন তার ক্ষমতা এতই তীব্র হয়ে ওঠে।

গাধার কথা কিছু না বলাই ভাল। যখন পঞ্চাশ পা গিয়ে সে থামল এবং মাথা ঘুরিয়ে তার প্রভুর দিকে বিষণ্ণ কিন্তু ভৎ'সনার দৃষ্টিতে চাইল, খোজা নাসিরুদ্দিনের পক্ষে চোখ শুকনো রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। "এই পাঁউরুটি খেকো !" তিনি মনে মনে বললেন। "তুই কি সত্যিই ভাবছিস যে তোর পুরোনো বন্ধু এবং পথের সঙ্গী আগাবেক নামে একজন লোকের কাছে চিরদিনের জন্য তোকে ছেড়ে দিতে পারে ! না আমি এ ধরনের ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হতে পারি না এবং আমরা সামনের আরও বহু বছর এক সঙ্গে কাটাব।"

তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা গোলাপী ভীরু সূর্যের ছটা, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার ও সতেজ, পাহাড়ের উপর থেকে তেরছাভাবে ঠিকরে পড়ে তাদের পথের উপর এসে পড়ল।

খোজা নাসিরুদ্দিন হ্রদের ধারে তাঁর মাটির কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলেন। আগের দিনের ব্যবস্থা মত চোর তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল।

"আমি প্রস্তুত," সে সংক্ষেপে বলল। "আমাকে কিছু টাকা দিন যাতে কোকান্দে নিজের প্রয়োজনের জন্য সংগ্রহ করতে না হয়।"

খোজা নাসিরুদ্দিন কিছু টাকা গুনে বললেন :

"আগাবেকের উপর নজর রাখবে, প্রতি পদক্ষেপে তাকে অনুসরণ করবে। আজ থেকে সাত দিনের আগে সে কোকান্দ ছেড়ে যেতে পারবে না—তাতে কিছু সময় পাওয়া যাবে।"

"যদি তাড়াতাড়ি করা হয়।"

"আমার গাধার উপর বিশেষ নজর রাখবে। যদি তাকে হারাই তবে জানি না কি করে সে আঘাত সহ্য করব।"

"আপনি তাকে হারাবেন না—কারণ সে আমারও খুব প্রিয়—তার সঙ্গে আমার বেশ ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল। এটা খুব আশ্চর্যের যে ঐ লম্বা কানের পেট-মোটা একগুঁয়ে জন্তুটার মধ্যে এমন কি থাকতে পারে যে সে তার হৃদয় জুড়ে বসে আছে?"

"যাও, এখন যাও! সর্বশক্তিমান আল্লা তোমাকে রক্ষা করুন!"

"ভালভাবে থাকবেন! আল্লা যেন উদ্দেশ্য পূরণে সহায় হন।"

এইভাবে সেদিন সুন্দর সকালে খোজা নাসিরুদ্দিন একচোখো চোরকে আবার এক দীর্ঘ ভ্রমণে পাঠালেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

এই গল্পের সুরুতেই এক অসাধারণ চড়ুই পাখীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে তার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরে বলা হবে। সেই কথা বলার সময় এখন হয়েছে। সেই চড়ুই পাখীটাকে আমাদের বইয়ে একটু স্থান দেওয়া যাক, যদিও এই পৃথিবীতে সে অতি তুচ্ছ—কারণ পৃথিবীতে শুধু তাকে বেছে নেওয়ার জন্য কোন্ জীবন্ত প্রাণী এর চেয়ে বেশি প্রশংসা পাবার ন্যায়সংগত দাবী করতে পারে। এই আত্মশ্লাঘা অনেকের কাছে হয়ত অদ্ভুত ঠেকবে, কিন্তু তাদের সম্মানের কোন সাহায্যে আসবে না, বরং তাদের নির্বোধ ও অহংকারে ভরা চিন্তার সাহায্যে আসবে। আমাদের দিক থেকে সব রকম আন্তরিকতার সঙ্গে এটুকু বলতে পারি যে কম পালকপূর্ণ দ্বিপদ, প্রায়ই পালকহীন আত্মশ্লাঘায় ভরা দ্বিপদের চেয়ে আমাদের অনেক প্রিয়। সুতরাং চড়ুইটাকে নিয়ে গল্প বলার সুরুতে আমাদের খানিকটা সৌজন্যমূলক শুভেচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

এই চড়ুইটা সফরের সরাইখানার দুটো কড়ি বরগার মাঝে একটা ছোট্ট গুপ্ত বাসার মধ্যে বাস করত। চোরাকের অন্যান্য চড়ুই পাখীর মতই সেটা একইভাবে জীবনধারণ করত ; সূর্যোদয়ের আগে সে জেগে উঠত, কিচিরমিচির করে মাথা নাড়ত, চারপাশে ঘুরত, পালকের মধ্যে ঠোঁটটা মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দিত, অস্থির হয়ে কখনো শরীর নাড়াত, রাস্তার উপর লাফিয়ে বেড়াত, কখনও ধুলো উড়িয়ে মাখত, পরে ঝরণার জলে ছলাৎ করে নিজেকে ডুবিয়েই উঠিয়ে নিত, পরে নিজের কাজে যেত—খাবার-দানা খুঁটে খাবার জন্য মিলের দিকে যেত, নয়ত আঙুরের খেতে যেত আঙুর নষ্ট করতে। তার একটা চড়ুই-বৌ ছিল আর ছিল অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, যাদের দল বছরে দু'বার করে বাড়ত—একবার বছরের সুরুতে অন্যবার গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। সে ছিল শক্তসমর্থ ও তার মন ছিল খুব ভাল, বেশ প্রফুল্লচিত্ত ও কলহপ্রিয় ; যদিও তার নিজের বাসা ছিল সুন্দর তবুও মাঝে মাঝে অন্যের বাসা দখল করার লোভ সামলাতে পারত না এবং মাঝে মাঝে ময়না ধরনের ডোরাকাটা এক রকম পাখীদের গর্তে ঢুকে পড়ত যখন ভীষণ চেঁচামেচি ও ঝগড়ার মধ্যে তার ডানা টেনে ও তার পালক উপড়ে তাকে বার করে দেওয়া হত। সে বাবুই পাখীদের বাসা এড়িয়ে যেত, কারণ জানত যে সেখানে গেলে অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সুতরাং দীর্ঘ দিন ধরে সে সরাইখানায় বাস করত এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর মত প্রতিদিন অসংখ্য ছোটখাটো পাপ কাজ করত, অবশ্য পৃথিবীতে জন্মান অন্যান্য প্রাণীরা যে সব সুখ সুবিধা ভোগ করত সেগুলো লঙ্ঘন করত না, সেদিক দিয়ে দুই পাখাযুক্ত কোন প্রাণীর উপভোগ্য যেটুকু সুখ তার ভাগ্যে ছিল সে তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। এ ছাড়া অন্যেরা হয়ত খুব কম আশা করতে পারেন যে, সে তার মানসিকতা বা আধ্যাত্মিকতার কোন উচ্চ মার্গে উঠতে পারেনি এবং সময়ের প্রবাহে যখন তার নির্দিষ্ট দিন শেষ হয়ে আসবে তখন চুপে চুপে এই পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে, হয় কোন বাজপাখীর খাবার মধ্যে অথবা মাংসাশী বিড়ালের খাবার মধ্যে পড়ে এবং তার হাজার হাজার জ্ঞাতি ভাইদের মত পৃথিবীতে কোন চিহ্ন না রেখেই নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু ভাগ্য যেন তাকে আলাদা করে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "তুমি!" এবং এই কথার ভিতর দিয়ে সে অমরত্ব লাভ করেছে, আগামী বহু বছরের জন্য মহিমা লাভ করেছে। এই পৃথিবীর কত মানুষ সেই একটি কথা আকস্মিক-ভাবে জয় করার জন্য কত চেষ্টাই না করছে, কিন্তু পারছে না, অথচ সেই

চড়ুই পাখীটা তা জয় করেছে। তার জীবনের সুতো—একটা সরু ধূসর রংয়ের সুতো—খোজা নাসিরুদ্দিনের প্রচেষ্টা ও উত্তমের কার্পেটের সঙ্গে মিশে চিরদিন তার ভিতরেই থেকে গিয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে খোজেণ্টের ধ্বসে যাওয়া গুহর-সাদ মসজিদের সেই দরবেশেরও এতে হাত আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি—পাহাড়ের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া এই দূর গাঁয়ে তিনি কি করছিলেন? আসল কথা হচ্ছে তিনি এসেছিলেন······বরং বলা চলে খোজা নাসিরুদ্দিনের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁরা আলোচনা করেছিলেন বা মানসিক একাগ্রতার মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কারণ বৃদ্ধ দরবেশ কায়াহীন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। খোজা নাসিরুদ্দিন বেশ পরিষ্কার ও সুন্দরভাবেই তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন তা সে স্বপ্নেই হোক আর বাস্তবেই হোক। বলা বেশ শক্ত: কি করে তিনি আবির্ভূত হলেন—নীহারিকার চিন্তায় বিভোর তারকামণ্ডলের মধ্যে বিচরণকারী সেই বৃদ্ধ দরবেশ তার কায়াহীন বা আধো-কায়ার ছদ্মবেশে—কেই বা বলতে পারবে? ইচ্ছামত তাঁর এই আবির্ভাব সমস্ত জিনিষটা বোধগম্য হওয়ার জন্য অন্যত্র আলাদাভাবে বর্ণনা দেওয়া হবে। এই অধ্যায়ের কয়েকটা পাতার পরে চড়ুইয়ের বর্ণনায় আবার আমরা ফিরে আসব।

আগাবেক ও গাধার কাছে বিদায় নিয়ে তারও পর চোরকে বিদায় জানিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর নতুন দখল করা বাড়ীতে এলেন এবং সারাটা দিন সেখানে একা একা চিন্তায় কাটালেন; আগাবেকের ফেলে যাওয়া অন্যান্য জিনিষপত্রের মধ্যে মদের কুঁজোটার সঙ্গে কথা বলে কাটালেন। বুড়ো চাকরটাকে বলে রাখা হয়েছিল কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়, সেচের ব্যাপারে আগ্রহী চোরাকের বৃদ্ধদের নয়, এমনকি সৈয়দকেও না।

চিন্তা করার তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল। সেদিন সকালে হ্রদ নিয়ে একটা সমস্যা তাঁর সামনে দেখা দিয়েছে যা তিনি আগে ভেবে দেখেননি।

আগাবেকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে। তাঁর হাত থেকে হ্রদটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। খোজেণ্টের বৃদ্ধ দরবেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু হ্রদটা নিয়ে এখন কি করা হবে? এর জন্য তিনি তো আর চোরাকে এসে বাস করতে পারেন না। তিনি অবশ্য সৈয়দকে বিয়ের উপহার

হিসেবে সেটা দিতে পারেন। কিন্তু দরবেশ কি বলবেন, তিনি কি এটা অনুমোদন করবেন? হ্রদটা নিয়ে তাঁর নিজেরও কি কোন উদ্দেশ্য আছে? তিনি নিজে কিছু বলেননি কিন্তু সেটা ভেবে দেখা দরকার। বাস্তবিক তিনি অন্যের মনে একটা ধোঁয়াটে ভাবের সৃষ্টি করেছেন, এটাই কি মূক ও বধির সমাজের কাজ?

এক কুঁজো মদ হচ্ছে আনন্দদায়ক সঙ্গী। এটা সব সময়েই বিশ্বাস করতে সাহায্য করে যে বিরাট ও প্রয়োজনীয় সত্য এর ভিতরেই মুক্তোর মত লুকিয়ে আছে এবং প্রত্যেকেই ব্যবধান রেখে এর কাছে এগিয়ে আসে। যখন সাহস নিয়ে এগিয়ে এসে এর তলে পৌছান যায় তখন নির্ভীক ডুবুরি আর মুক্তো দেখতে পায় না, সব সমেত নিয়ে চলে আসে। খোজা নাসিরুদ্দিনেরও তাই হয়েছিল। সেদিন দু বার তিনি কুঁজোর তলে পৌছাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দু বারই তিনি খালি হাতে মুক্তো ছাড়াই ভেসে উঠেছিলেন। এইভাবে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত বসেছিলেন, কোন কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না, এমনকি কুঁজোর সঙ্গে কথাবার্তার আগে তাঁর মনে যে সব চিন্তা-ভাবনা ভেসে বেড়াচ্ছিল সেগুলোও গুলিয়ে ফেলেছিলেন। বাগানের এক প্রান্তে কুঞ্জে বৃদ্ধ চাকরটা তাঁর জন্য অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে যে বিছানা করে রেখেছিল সেখানে ভারাক্রান্ত মন এবং নিরাপদ হৃদয় নিয়ে তিনি বিশ্রাম নিতে গেলেন।

এটি আগের সেই কুঞ্জ যেখানে এক সপ্তাহ আগে তিনি এবং আগাবেক রাজপুত্রকে রাজী করানোর জন্যে গিয়েছিলেন। যাদু-করা মাধবীলতা এবং চোরকাঁটার গাছ সেখানে ছিল এবং যাদু-করা মশাগুলো পাতার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে ভাবছিলেন: "কোন অলৌকিক চিন্তা কি আমাকে বলে দিতে পারে যে আমি এই হ্রদটা নিয়ে কি করব।" খোজেণ্টের সেই দরবেশ যিনি তাঁকে এত বড় বিপদে ফেলেছেন তিনি তাঁকে খোসামোদের কোন ভাষা ব্যবহার না করে স্মরণ করলেন প্রথমে হ্রদের কথা নিয়ে, পরে সেটা বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে। এইগুলোই ছিল তাঁর শেষ চিন্তা, কারণ তার মাথা আরও গুলিয়ে উঠছিল, তাঁর চিন্তা ধোঁয়াটে হয়ে উঠছিল এবং পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

কুঞ্জটা শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজালের উপযোগী বলেই প্রমাণিত হল। খোজা নাসিরুদ্দিন সেদিন রাতে এমনি এক যাদুমন্ত্রে ভর্তি ঘটনা দেখলেন যেন খোজেণ্টের সেই বৃদ্ধ দরবেশ তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছেন।

প্রায় মাঝ রাতের শেষের দিকে তাঁর আবির্ভাব হল। সমস্ত কুঞ্জটা যেন একটা হাল্কা পাণ্ডুর নীল আলোয় ভরে উঠল এবং সেই আলোর মধ্যে নক্ষত্র-পুঞ্জের বর্ণালী দিয়ে তৈরি কুয়াশার মত মিটমিটে আকৃতি নিয়ে বৃদ্ধ দেখা দিলেন। মনে হল খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁকে দেখে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি তা হলেন না! মনে হবে তিনি যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন।

বৃদ্ধ বিপরীত দিকের বেঞ্চির উপর বসেছিলেন এবং অনেকটা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তিনি তাঁর আলোয় উজ্জ্বল দাড়িটায় হাত বুলাচ্ছিলেন।

"কেমন আছ খোজা নাসিরুদ্দিন! তুমি আমায় স্মরণ করেছিলে, আমিও এসে উপস্থিত।"

"হে ঋষি, আপনি শান্তি লাভ করুন," খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, মদ পান করুন।"

"আমি মদ চাই না। তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে আমি একজন দরবেশ এবং কোন রকম ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত নই? তুমি আমার হয়ে যে অপরিসীম শুভ কাজ করেছ তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। নক্ষত্রলোকে নতুন করে আবর্তনের ভয় আর আমার নেই।"

খোজা নাসিরুদ্দিন ভয় পেলেন বৃদ্ধ হয়ত নতুন করে আবার এক দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করবেন।

"এটা বলার মত এমন কিছু নয়," তিনি তাড়াতাড়ি বললেন। "সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আমি এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারিনি। আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, কারণ আমি খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। আমি জানি না হ্রদ নিয়ে কি করব। আমরা এ নিয়ে এখন আলোচনা করব।"

"হ্রদ নিয়ে কি করতে হবে? তুমি জান না?"

"হে মহান ঋষি, আমি কি করে জানব? আমাদের গতবারের আলোচনার সময় আপনি হ্রদের ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেননি, কারণ ভোরের মুরগি ডেকে ওঠায় আমাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল।"

বৃদ্ধ তখন মৃদু হাসলেন, তাঁর সমস্ত শরীরটা আলোর ঢেউয়ে মিটমিটে হয়ে উঠল। মিটমিটে হওয়ার পর তিনি বললেন।

"মনে পড়ছে, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আমার কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আমার সময়ের হিসেবে ভুল হয়েছিল। তার জন্যে রাগ করবেন না খোজা নাসিরুদ্দিন।"

"আমি রাগ করিনি এতটুকু। তবে আমরা যেন সেই ভুল আবার না করি। মাঝ রাত—আপনার সময়—এগিয়ে আসছে। প্রথমে আমাদের আসল জিনিস নিয়ে আলোচনা করার পর গল্প করা যাবে।"

"ঠিক আছে," বৃদ্ধ রাজী হলেন। "আমাদের আসল কাজের কথা বলা যাক। তাহলে তুমি তোমার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছ ?"

"খোঁজার আর সময় পেলাম কই ?" প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ভাব নিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন, কারণ বৃদ্ধের চিন্তা তখনও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "বিশ্বাস খুঁজে বেড়ানর আমার কোন সময় ছিল না। প্রথমে আপনার হ্রদ খুঁজে বার করতে হয়েছে যা কোথায় কেউ জানত না। দ্বিতীয়তঃ আমাকে সেটা উদ্ধার করতে হয়েছে। এখন আমাকে ভাবতে হচ্ছে এটা নিয়ে আমি কি করব। আমরা পরে ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব। হ্রদের ব্যাপারে আপনি আপনার জ্ঞানপূর্ণ মতামত জানান।"

বৃদ্ধ চুপ করে গেলেন ও ভাবতে লাগলেন। আবছা আলোর রূপ, যা ছিল তাঁর শরীর—তার মাঝে ঠিক হৃদপিণ্ডের কাছে একটা হালকা সবুজ আলো দেখা গেল যেটা বেগে নির্গত হওয়ার মত রূপ নিয়ে উপরে ঠোঁটের দিকে এগিয়ে গেল। আর একটা নীল রংয়ের আকৃতির বেগে নির্গত হওয়ার মত মাথা থেকে নিচের দিকে এগিয়ে এল। এ দেখে খোজা নাসিরুদ্দিন মনে করলেন নীল আলোটা হচ্ছে চিন্তার প্রতীক আর সবুজটা আবেগের। দুটো দরবেশের ঠোঁটে এসে মিশে কথার রূপ নেবে।

তাই হল। বৃদ্ধ বলে উঠলেন ঃ

"আমি বলব, খোজা নাসিরুদ্দিন, তুমি সত্যিকারের জ্ঞান থেকে এখনও অনেক দূরে। জেনে রেখ জীবনের যাত্রাপথে তুমি যেসব সন্দেহ ও বিভ্রান্তির মধ্যে এসে উপস্থিত হবে তার সমাধান প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তোমারই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ; হ্রদের ব্যাপারে তোমার সমস্যার সমাধানও সেখানেই আছে।"

"তাহলে হে মহান ঋষি আপনিই সমাধান করে দিন। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছি যে মাঝ রাত খুব কাছে, এবং আমাদের আলাপ-আলোচনার মাত্র কয়েক মিনিট বাকী আছে।"

"এটা কি ঠিক হবে না খোজা নাসিরুদ্দিন," বৃদ্ধ একটা গোলাপী আভা

তুলে মিট মিট করে উঠলেন এবং তাঁর তর্জনি তুলে ধরলেন, "তোমার আত্মার কাছে পবিত্রতার জন্য এটা ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে না, যাতে হৃদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়—শেষে তুমি যে ধর্ম বিশ্বাস অর্জন করবে তারই প্রভাবে আসা কি ঠিক হবে না ?"

সমস্ত জিনিসটাই খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যে কথা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কোন দিনই আর উচ্চারিত হবে না।

"আমি তোমাকে ধর্ম বিশ্বাস খুঁজতে সাহায্য করব—সেইটাই হবে আমার কৃতজ্ঞতা," বৃদ্ধ বলে চললেন, গোলাপী আভা, রূপালি আভায় ও পরে সোনালি আভায় পরিণত হল, শেষে রামধনু রংয়ের বিচিত্র রূপ নিল যার আলোয় খোজা নাসিরুদ্দিনের চোখে ধাঁধা লেগে গেল।

"কোন নাম না করে আমি শুধু পথের নির্দেশ দিব যে পথে খোঁজ করতে হবে।"

"তাহলে খুব ভাল হয়," খোজা নাসিরুদ্দিন ভদ্রতা করে বললেন।

"তোমার ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাত ধর।"

খোজা নাসিরুদ্দিন তাই করলেন এবং একটা ঠাণ্ডা জলীয় ভাব অর্জন করলেন, কিন্তু কোন শারীরিক অনুভূতি বুঝতে পারলেন না। বৃদ্ধের দেহের আকৃতির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেল এবং রামধনুর মত আলো সমস্ত কুঞ্জটা ভরিয়ে তুলল।

"চোখ বন্ধ কর !" গম্ভীর হয়ে বৃদ্ধ ঋষি বললেন। "আমাকে অনুসরণ কর !"

উপরে উঠতে সুরু করলেন, এত দ্রুত ও আকস্মিক যে খোজা নাসিরুদ্দিনের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

"এখন চোখ খোল !" তিনি দরবেশের গলা শুনতে পেলেন অথবা শোনা ছাড়া অন্য কোনভাবে বুঝতে পারলেন।

তিনি চোখ খুললেন।

কুঞ্জ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, এবং চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ঘন নীল কুয়াশা, মনে হল যেন বৃদ্ধ ঋষি বিছিয়ে রেখেছেন।

"দেখ এবং বোঝার চেষ্টা করা," দরবেশ বললেন, বরং বলা চলে মিটমিট করে উঠলেন, কারণ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে তাঁর ঠোঁট থেকে টুকরো টুকরো মেঘের মত একটা আবছা ঢেউ বেরিয়ে এল এবং সেই টুকরো মেঘের মধ্যে রহস্যজনকভাবে কথাগুলো ভেসে উঠল যেগুলো খোজা নাসিরুদ্দিন না শুনেই বুঝতে পারলেন।

"আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না," তিনি উত্তর দিলেন এবং হঠাৎ মনে হল তিনি নিজেও যেন এই ধরনের আবছা আভাস দিয়ে দরবেশের কথার উত্তর দিচ্ছেন। তিনি নিজের দিকে চেয়ে অবাক হলেন: বৃদ্ধের মত তিনি নিজেও যেন স্বচ্ছ এবং আবছা আলোর আভাস মাত্র, শরীরের কোন রকম চিহ্ন ছাড়া কেবল যেন বর্ণালীর মিটমিটে আলো।

খোজা নাসিরুদ্দিন সহজে ভয় পাওয়ার লোক নন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি ভয় পেলেন। নক্ষত্রলোকে বিচরণকারী সেই দরবেশ যেন ভেলকি লাগিয়েছেন —তাঁর মনে হল।

"কি……কেমন করে……এসব কি?" তিনি তোতলাতে তোতলাতে বললেন, অনুভব করলেন যেন আবছা আলোয় মিটমিট করে উত্তর দিচ্ছেন। "আমি কোথায়? আমার কি হয়েছে? অ্যাঁ? বাস্তবিক এর একটা সীমা আছে। আপনি আমাকে নিয়ে কি করছেন?"

বৃদ্ধ দরবেশ একটা সবুজ ঢেউ তুলে আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন:

"ভয় পেও না খোজা নাসিরুদ্দিন, তুমি আমার সঙ্গে আছ। সত্যি বলতে কি তোমার এই ভয়ের কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তোমার দেহকে আবার ফিরে পেতে চাইছ যেন এটা এক মহামূল্যবান জিনিস।"

"হে মহর্ষি, আমাদের মধ্যে এক বিরাট প্রভেদ আছে!" গ্রীষ্মের বজ্র-বিদ্যুতের মত কয়েকটা বেগুনে রংয়ের ঝলক তুলে খোজা নাসিরুদ্দিন আবেদনের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন। "শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তিনি আশা করেছিলেন এই চাটুবাক্যে খুশী হয়ে বৃদ্ধ দরবেশ তাঁকে তাঁর কায়াহীন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার ইচ্ছা করবেন। যখন তিনি এই আশা করছিলেন তখন সেই মিটমিটে আলো ভিন্ন মতের জন্য একটা ঘোলাটে হলুদ রংয়ের রূপ নিল।

বৃদ্ধ দরবেশ সৌভাগ্যবশতঃ কিছুই লক্ষ্য করেননি বা করলেও ভদ্রতার জন্য কিছুই বললেন না। ভর্ৎসনার মিটমিটে আলোয় কোন উত্তর এল না।

"ভয় পেও না, খোজা নাসিরুদ্দিন, তোমার দেহ তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঐ যে ওখানে। দেখ।"

কায়াহীন খোজা নাসিরুদ্দিনের দৃষ্টির সামনে, অনেক নিচে, প্রথমে সেই কুঞ্জ দেখা গেল এবং তার ভিতরে দেখা গেল খোজা নাসিরুদ্দিন ঘুমিয়ে আছেন।

"তোমার দেহ ঠিক জায়গাতেই আছে এবং অন্যান্য প্রাণীদের মত ঘুমে ব্যস্ত, এদিকে তোমার নক্ষত্রলোকে বিচরণরত জাগ্রত পয়গম্বরের অবস্থায় উপনীত," বৃদ্ধ দরবেশ বললেন। "তোমার কাছে আরও অনেক কিছু প্রকাশ করা হবে যদি তুমি তাদের অর্থ বুঝতে পার।"

বৃদ্ধ দরবেশ যে দুর্বোধ্য কুয়াশার সৃষ্টি করেছেন তিনি তা ভেদ করার চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে বা বুঝতে পারলেন না।

সমস্ত কিছুই ছিল আবছা ও অস্পষ্ট। সমস্ত কিছুই মনে হচ্ছিল সম্ভব আবার একই ভাবে মনে হচ্ছিল অবাস্তব অর্থাৎ যে কেউ এই ভাবে, ঐ ভাবে বা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেন; নিরাশ হয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন কোন পার্থিব খোঁজ করতে লাগলেন যাতে সেখান থেকে আবার তিনি চিন্তার সূত্র খুঁজে পাবেন—কিন্তু সে রকম কোন জিনিষ দেখতে পেলেন না।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," তিনি আবার বললেন। "হে মহর্ষি, এখানে কেবল প্রশ্নই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু উত্তর পাচ্ছি না। পৃথিবী কোথায়, কোথায় আনন্দ ও দুঃখে ভরা মানুষের দল, কোথায় সেই শুভ উদ্যম আপনার মতে যার জন্যে আমায় এই পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে? এই দুর্ভেদ্য কুয়াশায় আমি কেমন করে শুভ কাজ করতে পারি, যে কুয়াশায় সব কিছুই অবাস্তব ও অনিশ্চিত আর কার জন্যই বা জনশূন্য স্থানে কাজ করব? অন্যায়ই বা কোথায় যে আমি লড়াই করব? আর কার উদ্দেশ্যেই বা লড়াই করব? তারাদের সঙ্গে? না, মহান ঋষি, তারকালোকের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। দয়া করে আমাকে আমার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন!"

যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন বৃদ্ধের মিটমিটে আলোর উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ কমে এল যতক্ষণ না তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের চোখের সামনে থেকে তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন যা কিছু সব অদৃশ্য হয়ে গেল; কুয়াশা সরে গেল এবং খোজা নাসিরুদ্দিন আবার তাঁর নিজের জগৎ দেখতে পেলেন, যেখানে সব কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, অনুভব করা যায় ও পরখ করা যায়, যেখানে মানুষ বাস করে পরস্পর-বিরোধী ইন্দ্রিয় বৃত্তির মধ্যে, একে অন্যকে সাহায্য করার নিঃস্বার্থপরতার মধ্যে, সামনে এগিয়ে চলার সরল গতিকে, সার্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যপথে, যেখানে সকলেই নিজের নিজের কল্যাণ খুঁজে পাবে।

খোজা নাসিরুদ্দিন জেগে উঠে চোখ খুললেন। চারপাশে ছিল শুধু জলীয়

বাষ্পে ভরা সজীব অন্ধকার; কুঞ্জের ভিতর সুন্দর বাতাস চুপে চুপে এসে তাঁর মুখের উপর একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া দিয়ে বয়ে গেল; লতাপাতার মধ্যে দিয়ে দূরের তারাগুলোকে জ্বলতে দেখা গেল; তখন ছিল রাত্রি, মাঝ রাত ও প্রত্যূষের মাঝামাঝি কোন এক প্রহর।

তাঁর মাথা তখনও একটু একটু বেদনা দিচ্ছিল কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা গতানুগতিক সরলতা থেকে মুক্তি পেল। তিনি মৃদু হাসলেন। না তিনি বৃদ্ধ দরবেশের নক্ষত্রলোকে বিচরণের সঙ্গী হতে পারেন না—তাঁর স্থান, তাঁর আবাস হচ্ছে এই পৃথিবী। মানুষের চিন্তায় ঊর্ধ্বে বিচরণ ভাল জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি পৃথিবীকেই ভালভাবে জেনেছিলেন যেখানে তিনি ছিলেন তাঁর চিন্তা ও কর্মের একমাত্র প্রভু।

হ্রদের চিন্তায় ফিরে এসে তিনি অনুভব করলেন যে এতদিন যে সন্দেহের ভারে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। সব কিছুই এখন পরিষ্কার, সোজা এবং প্রশ্নাতীত। "এ এক আশ্চর্য ঘটনা যা আমি আগে কখনও দেখিনি!" তিনি আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন যে, এই সম্ভব হত না ভুল সঙ্গী বেছে না নিলে—কুঁজো এবং অস্পষ্ট বৃদ্ধ দরবেশ।

এবার আমাদের চড়ুইয়ের গল্পে ফিরে আসা যাক, কেমন করে সে খোজা নাসিরুদ্দিনের দেখা পেয়েছিল এবং কি করেই বা দুজনে কাছে এসেছিল।

কিন্তু তাদের দেখা হওয়ার আধ ঘণ্টা আগেও একে অন্যের কথা ভাবেনি। দুজনেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। চড়ুই পাখীটা সরাইখানার ছাদে বসে সূর্যের লাল আলোয় রোদ পোহাচ্ছিল এবং কিচিরমিচির করে বিদায়ী সূর্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে গান করছিল, এদিকে খোজা নাসিরুদ্দিন নিচে সরাইখানায় বসে চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

হ্রদের রক্ষক ও পরে মালিক হয়ে প্রথম সরাইখানায় আসার পরে যখনই তিনি সেখানে এসেছেন তখনই গ্রামবাসীরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে আলোচনা করত না; তারা ভাবত তিনি এখন তাদের দুঃখময় জীবনের কোন দিক নির্দেশ করবেন। তিনিও হঠাৎ দুম দুম করে আবির্ভূত হতেন যেন সরাইখানার পাশের জোয়ার ক্ষেতের মাঝখান থেকে সাঁতার দিয়ে হাজির হলেন। যেন ইচ্ছেই করেই তিনি সদর রাস্তা দিয়ে না এসে মাঠের মধ্যে দিয়ে আসতেন যাতে তারা আগে থেকে জানতে না পারে।

সফর নড়েচড়ে উঠত এবং গ্রামবাসীরা যাতে তাঁর সঙ্গে চা খেতে না হয় সেজন্য তাড়াতাড়ি বিদায় নিত।

কিন্তু যিনি এখন সরাইখানায় এসেছেন তিনি আগাবেকের সহকারী ও উত্তরাধিকারী উজাকবাই নন, তিনি খোজা নাসিরুদ্দিন।

"চলে যেও না বন্ধুরা!" তিনি জোরে বললেন। "আমি কিভাবে তোমাদের মনে আঘাত দিয়েছি যে তোমরা আমার সঙ্গে এমন কি বসতেও চাও না। সফর এই পঁচিশ টাকা রইল, তুমি ওদের যে যত পারে চা খাইয়ে দাও!"

এত সুন্দর সুন্দর কথা শুনে গ্রামবাসীরা বেশ অবাক হয়ে যেত। ভয়ে ভয়ে ওরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত এবং চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সফর যখন তাদের সামনে চায়ের পাত্র রাখত তখন তারা ছুঁতে সাহস পেত না।

এসব দেখে সহানুভূতির একটা ঢেউ খোজা নাসিরুদ্দিনের মনে বয়ে যেত। তারা এত ভীতু ও নিচু তলার লোক যে তারা চা খেতে বা একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। এমন কি ঐ চড়ুইটা (হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি তার উপর এসে পড়ল —তাদের সম্পর্ক সুরু হল)—সেও জীবনে তাদের চেয়ে বেশী সুখী ও স্বাধীন।

সৈয়দ এল। হতবাক চোরাকবাসীদের চোখের সামনে হ্রদের নতুন মালিক তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তারা কত দিনের বন্ধু। এটা তাদের বোধশক্তির বাইরে। তারা কি করে একে অন্যকে জানল, আর জানলে সৈয়দ এতদিন কেন চুপ করে ছিল?

তাদের ভয় খানিকটা কমে এলে গ্রামবাসীরা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল, আর কেউ কেউ খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে আলাপ আলোচনা সুরু করল।

হ্রদের পাশের মাটির ঘরে খোজা নাসিরুদ্দিন অত্যন্ত একাকী বোধ করতেন, সেজন্য সন্ন্যাসীর মত বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ও এতগুলো লোককে বন্ধুর মত পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের কাজকর্ম ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কলের পাশের সেতুটা ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ে, কুমোর বাবাজানের মাদী ঘোড়াটাকে নিয়ে, যেটা দিন দুয়েক আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আলোচনা করলেন—চোরাকে যা যা ইদানীং ঘটেছিল তিনি প্রায় সব কিছুই জানতেন। তিনি তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে লাগলেন, সুন্দরী জুলফিয়ার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মামেদ-আলিকে ধন্যবাদ জানালেন এবং একই-ভাবে সরাইখানার রক্ষক সফরকেও ধন্যবাদ জানালেন।

শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে, যেটা ছিল সবচেয়ে দরকারী, তিনি কোন কথাই বললেন না—সেটা হচ্ছে খেতের আগামী সেচ নিয়ে। এই চিন্তা সব চোরাক-বাসীদের মাথায় একটা গরম লাল দগদগে পেরেকের মত বসেছিল এবং তাদের জিভও যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

মামেদ-আলিই প্রথম সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন:

"মাননীয় উজাকবাই, একটা কথা জানতে চাইছি, আপনি কখন আমাদের জল দেবেন ঠিক করেছেন এবং তার জন্য কত টাকা লাগবে?"

সরাইখানা যেন চুপ করে গেল, শুধু চড়ুই পাখীটার কিচিরমিচির শব্দ মাঝে মাঝে গম্ভীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করছিল।

অসংখ্য কৌতুহলী চোখের সামনে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

"তোমরা যথাসময়েই জল পাবে, তিন চার দিনের মধ্যে," তিনি বললেন। "সেচের ঠিক আগের দিন আমরা টাকার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস সরাইখানার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল।

"কিন্তু যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা না থাকে তবে কি হবে?" মামেদ-আলি বললেন।

"যা আছে তাই যথেষ্ট," খোজা নাসিরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললেন। "তোমাদের মাঠে জল যাবে—আমি বললাম, তোমরাও শুনলে, বাস।"

আর একটা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। জল পাওয়া যাবে! একটা জগদ্দল পাথর তাদের মন থেকে সরে গেল। সত্যিই এই উজাকবাই বেশ দয়ালু ও উপকারী লোক!

ওপরে ছাদে চড়ুই পাখীটা আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় কিচিরমিচির করে উঠল এবং আবেগে এত জোরে মুখ দিয়ে ফুৎকার দিয়ে উঠল যে তার পালকগুলোই অল্প উড়ে গেল; মাঠে জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তার মনে হল যেন বাড়ীতে সুখ ও দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

নিজেদের আনন্দ জানাতে গিয়ে চোরাকবাসীরা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তাদের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"হ্যা, তোমরা জল পাবে! তোমাদের মাঠে যত জল তোমরা চাও তত জলই পেতে থাকবে!" কিছুক্ষণের জন্য খোজা নাসিরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, একটা কাঁপুনি তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে ছুটে তাঁর মাথা ও দাড়ির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল; তাঁর যদি পালক থাকত তবে সেগুলো হয়ত কেঁপে

খাড়া হয়ে উঠত। "বিশ্বাস কর তোমাদের জীবনের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে!"

তিনি এবার চুপ করলেন। এক সঙ্গে তিনি অনেক কথা বলে ফেলেছেন। গ্রামবাসীরা নড়েচড়ে উঠতে ভয় পাচ্ছিল এবং তাদের চোখের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল।

কিন্তু পৃথিবী তো পৃথিবীই। এর নিজস্ব নিয়ম ও শৃংখলা আছে যার আওতায় মনের পাখায় ভর করা উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো কাজে পরিণত হয়। খোজা নাসিরুদ্দিন নিজেকে স্বর্গের সবচেয়ে উঁচু স্থানে উঠতে দিলেন না। বিতর্কের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে এবং বাস্তব জীবনে ফিরে এলেন যেখানে সব কিছু মিশে গুলিয়ে গিয়েছে—ভাল মন্দের সঙ্গে মহত্ব নীচতার সঙ্গে সুন্দর কুৎসিতের সঙ্গে, আনন্দ দুঃখের সঙ্গে ও পবিত্রতা নোংরামির সঙ্গে। এইসব আদর্শ ও কাজের জগাখিচুড়ির মাঝে তাঁকে কাজের জন্য ডাকা হল, উপস্থিত বুদ্ধি ও চাতুর্যের সঙ্গে কাজ করতে, যেন তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়!

তাঁর দৃষ্টি চোরাকবাসীদের উপর এসে পড়ল। হ্যাঁ, তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও উত্তাপ দিয়ে তাদের ভাল বেসেছিলেন, কিন্তু তাই বলে তাদের মনের অন্ধকারকে—যেখানে তাদের পবিত্রতা ও মহত্বের সঙ্গে পাশাপাশি তাদের নীচতা ও স্বার্থপরতা বাস করত—অনুধাবন করতে ভুলে যাননি। তাঁর ভালবাসা ফলপ্রসূ হয়েছিল এই জন্য যে তিনি তাদের বাস্তবরূপে ভালবেসেছিলেন পরীদের মত কোন কাল্পনিক গুণের অধিকারী হিসেবে নয়।

"আমাকে বল," তিনি বললেন, "গতকাল শিরমতের সঙ্গে ইয়ারমতের কেন ঝগড়া হয়েছিল?"

"একটা শুকনো তুঁতগাছের কাঠ জ্বালানি করা নিয়ে তারা লড়াই করছিল," সফর ব্যাখ্যা করে বলল। "দুজনেই মনে করছিল এটা তার, আর সেইজন্যই ঝগড়া।"

"এটা কি তারা ভাগ করে নিতে পারত না?"

"তারা পারত কিন্তু প্রত্যেকেই গোটাটা দখল করতে চেয়েছিল।"

মানুষের এই প্রবৃত্তি খোজা নাসিরুদ্দিনের ভালভাবেই জানা। কিছুক্ষণ চুপ করে তিনি বললেন:

"আচ্ছা বলত, রাস্তার ধারের ঐ শুকনো পপলার গাছটা কার?"

"আমার !" জুমোর দাদাবাই তাড়াতাড়ি বলল। "সকলেই জানে ওটা আমার।"

তাঁর চোখ ছোট হয়ে এল, ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে এল এবং চোয়াল দুটো সামনের দিকে এগিয়ে এল—মাত্র টাকা দুয়েক দামের ঐ তুচ্ছ গাছটার মালিকানা অন্য কেউ দাবী করলে হয়ত বেশ কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হত।

"ঠিক আছে", খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "ওটা তাহলে তোমারই হল। কিন্তু ঐ যে ওখানে ঝরণার উপর ঝুঁকে যে উইলো গাছের ঝোপটা আছে ওটা কার ?"

"আমার", মাখনওয়ালা রহমান তাড়াতাড়ি বলল।

"কি করে ? চাষী উসমান প্রতিবাদ করে বলল। "কি করে তোমার হল ?"

"এটা আমার জমির উপর আছে, সেইজন্যই আমার।"

"কখনই না !" উসমান চীৎকার করে উঠল। "শুনছেন সকলে ? এটা ওর জমির উপর !"

"বেশ, এটা আমার জমি নয় ?"

"এইটাই দেখতে হবে !" রাগে লাল হয়ে ঝগড়া করার মত কর্কশ গলায় উসমান উত্তর দিল। "এর ডালগুলো শুধু তোমার জমির উপর ঝুঁকে আছে কিন্তু শিকড় আছে আমার জমির উপর—হ্যাঁ, আমার জমির উপর !"

"কি ?" তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চীৎকার করে মাখনওয়ালা ফোঁস ফোঁস করে উঠল। "কবে থেকে আবার তোমার জমি হল, অ্যাঁ ?"

"চুপ কর, কথা কাটাকাটি করবে না !" ঝগড়া থামাতে গিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি বললেন। "থাম, আমি বলছি ! আমি তোমাদের ঐ তুচ্ছ ঝোপটা কিনছি না বা নিয়েও পালিয়ে যাচ্ছি না ; কারও ওটার প্রয়োজন নেই, ওটার দাম এক পয়সাও হবে না। যারই হোক না কেন, ওটাকে বাড়তে দাও। ওখানের ঐ যে বুনো কাঁটাগাছটা—ওটারও কি মালিক আছে ?"

"এটা আমার নিজের জমির উপর," মামেদ-আলি উত্তর দিলেন।

খোজা নাসিরুদ্দিন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গিয়েছে ; এর বিদায়ী কিরণ গাছের মাথায় ম্লান হয়ে এসেছে এবং বেগুনে রংয়ের গোধূলি চারদিক ঢেকে দিয়েছে, এক স্বচ্ছ গোধূলি যার ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া কিছুই নেই। সূর্যের আলো চলে গেলে চড়ুইয়ের গান

শেষ হয়ে এল—পালকপূর্ণ প্রাণীদের দিন শেষ হয়ে এল। শেষবারের মত চড়ুইটা তার পালকগুলো খুঁটল, নিজে নড়ে উঠল, পরে ছাদের নিচের বাসায় লাফ দিয়ে উড়ে গেল। ঠিক এই সময়ে খোজা নাসিরুদ্দিন তার লেজের ডগাটা লক্ষ্য করলেন।

"ঐ যে চড়ুইটা যেটা এইমাত্র হামা দিয়ে বাসায় ঢুকল—সেটাও কি কারও সম্পত্তি ?"

তার কথাটা বিদ্রূপ হিসেবে নেওয়া হল এবং সকলেই হেসে উঠল।

"ওরও কি মালিক আছে ?" খোজা নাসিরুদ্দিন আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"ওর আর কে মালিক হবে ?" মামেদ-আলি উত্তর দিলেন মৃদু হেসে। "তার যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়, আমাদের আঙুর খেতের ফল নষ্ট করে এবং আমাদের খামারের ফসল-দানা খুঁটে খায়। সে সকলেরই সম্পত্তি, একজনের নয়।"

এই ধরনের একটা চড়ুই পাখীরই খোজা নাসিরুদ্দিন খোঁজ করছিলেন, যেটা সকলের সম্পত্তি, একজনের নয়।

"তবে সফরের কি এর উপর একটা বিশেষ দাবী নেই ?"

"না !" ফোকলা মুখে একগাল হেসে সরাইখানার রক্ষক উত্তর দিল। "যে ছাদের নিচে বাস করে ; আমি তাকে ছুঁই না, সেও আমাকে ছোঁয় না। আমি তাকে খেয়ালও করি না, একে অন্যের কাজে কখনই বাধা দিই না। আল্লার চড়ুই পাখী, এক স্বাধীন পাখী।"

"সফর, একটা মই নিয়ে এস।"

মামেদ-আলি কুমোরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন এবং মাখনওয়ালা ঘোড়ার ডাক্তারের সঙ্গে ; একটা দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময় সরাইখানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বয়ে গেল।

সফর অবাক হয়ে একটা মই নিয়ে এল। খোজা নাসিরুদ্দিন সেটা দেয়ালে হেলান দিয়ে তিন ধাপ উঠলেন, ছাদের নিচের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং ভুরু তুলে ও ফুৎকার দিতে দিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন ; পরে ভীত পাখীটাকে বার করে নিয়ে আনলেন।

"একটা খাঁচা !"

সরাইখানার এক পাশে জমা করে রাখা টুকরো ভাঙ্গা জিনিষগুলোর মধ্যে একটা পুরোনো খাঁচা পাওয়া গেল।

"এই যে, সফর এটাকে তোমার জিম্মায় রাখলাম", খাঁচায় চড়ুইটাকে রাখতে রাখতে খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "ওর যত্ন করবে, ভাল করে খেতে দিবে এবং মাঝে মাঝে খাবার জল পালটে দিবে, যদি না অবশ্য ওর অসুখ করে। মনে রেখ—এটা খুব দামী চড়ুই এবং শীঘ্রই তোমরা তা বুঝতে পারবে।"

এইভাবে কথাবার্তায় তিনি সন্ধ্যেটা সরাইখানায় কাটালেন, পরে গ্রামবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

সৈয়দ তাঁকে বিদায় দিতে এগিয়ে পরে সমস্ত চোখে মুখে উপছে পড়া আনন্দ নিয়ে ফিরে এল। সে অবশ্য কোন কিছু বলতে অস্বীকার করল এবং চোরাকের অধিবাসীরা ও হ্রদের নতুন মালিকের কাছ থেকে যে কথা শুনে সৈয়দ এত খুশী হয়েছিল তা জানতে পারল না।

অবশ্য জুলফিয়া নয়। জুলফিয়াকে সব কিছুই বলা হল।

"তিনি বললেন—'সব কিছুই তোমার, বাড়ী বাগান সব।'"

"নিশ্চয়ই তিনি ঠাট্টা করছেন। তাহলে তাঁর আর কি থাকবে?"

"জুলফিয়া, তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষ নন। তিনি যা বলেন সবই পরে সত্যি হয়। ইতিমধ্যেই তিনি আমাকে সবচেয়ে দামী উপহার দিয়েছেন—তোমাকে।"

"বাড়ী ও বাগান ছাড়াই আমরা সুখী হব সৈয়দ। আমরা নিজেরা কি একটা তৈরি করতে পারব না?"

"তবুও আমি মনে করি তিনি ঠাট্টা করছেন না। তাঁর চোখে একটা অদ্ভুত জ্যোতি আছে।"

"হ্যাঁ, সত্যিই তুমি এক আশ্চর্য মানুষের দেখা পেয়েছ সৈয়দ! তিনি চোরাকে এসে আমাদের জীবনধারাকে যেন পাল্টে দিয়েছেন; মনে হচ্ছে মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি মেরে দেখা দিচ্ছে।"

"কে তিনি? কোথা থেকে আসছেন? তিনি কি চোরাকে অনেক দিন থাকবেন?"

রাত্রি যেন তার ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিল। পৃথিবীর চার কোণ থেকে আকাশের দিকে বাতাস উঠে যেন তারাদের মিটমিট করে কাঁপিয়ে দিল; উত্তরের তুষার-ঝড় নীল তারাদের দিকে, দক্ষিণের শুকনো বাতাস লাল তারাদের দিকে, পশ্চিমা বাতাস সাদা এবং পূবের বাতাস সবুজ তারাদের দিকে রইল; নক্ষত্র-লোকের উচ্চতা থেকে ঘুম নেমে এল পৃথিবীর চার কোণে, এবং চার মহাসমুদ্র

নক্ষত্রলোককে গ্রাস করে নিল ; অন্যায় ও অসত্যের জন্য কালো তারাদের, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার জন্য পাণ্ডুর তারাদের, খেটে খাওয়া মানুষদের মেহনত ও নিরানন্দ হৃদয়ের জন্য নীল তারাদের এবং সত্যের পথের সাহসী পথিকদের জন্য পান্না রংয়ের লাল তারাদের গ্রাস করল।

ফেরার পথে চোরাকে এসে বৃদ্ধ কুটিল কাজী আব্দুর রহমান সেই একই সরাইখানাতে উঠলেন, পনেরটা তোষকের একই গদির উপর হেলান দিয়ে বসলেন এবং লোভে তাঁর ডান চোখটা বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; তাঁর কেরানী কোন সময় নষ্ট না করে হ্রদের নতুন মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল—তিনি তার অপেক্ষায় বসেছিলেন।

রাত পড়তে তিনি সরাইখানায় ফিরে এলেন এবং কাজীকে হাতের থাবা দেখালেন—হাতের পাঁচটা আঙ্গুল। এর অর্থ পাঁচশো টাকা।

ধূর্ত বুড়ো হাই তুললেন, তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটা গরম মাখনে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল এবং আনন্দে তিনি দুই চোখই ঘোরাতে শুরু করলেন। যখন পরে তিনি আবার চারপাশে চাইলেন তখন শুধু বাঁ চোখ দিয়েই চাইলেন।

কেরানীর কাছ থেকে টাকার ভারী থলেটা নিয়ে তিনি বোঁচকায় পুরে রাখলেন এবং পরের দিন কাউকে আশ্চর্য না করে যে কোন হস্তান্তরের জন্য নিজের শিলমোহর দিয়ে সই করতে তৈরি হলেন, তা সে শয়তানের লেজের এক-মুঠো চুলের বিনিময়ে যদি কোন বিশ্বস্ত মুসলমানের আত্মাকে হস্তান্তরিত করতে হয় তাও আচ্ছা।

তিনি কিন্তু অবাক হননি। যখন তিনি খোজা নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন যে সমস্ত চোরাকবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি এক চড়ুই পাখীর সঙ্গে তিনি বাড়ী, বাগান ও হ্রদ বিনিময় করতে চান।

খাঁচাটা সেখানেই রাখা ছিল এবং চড়ুই পাখীটাও সেখানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—সে ভিতরে কিচিরমিচির করে লাফাচ্ছিল এবং সফর তাকে খেতে যে ফসলের দানাগুলো দিয়েছিল সেগুলো ঠোকরাচ্ছিল।

কাজীর বাঁ চোখ চড়ুই পাখীটার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল এবং তিনি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। হস্তান্তরে কোন অন্তরায় তিনি দেখতে পেলেন না।

রাস্তায় মানুষের ভীড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল এবং গুঞ্জন উঠতে লাগল। যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই বিশ্বাস করেছিল যে একটা অলৌকিক শুভ কাজ তাদের

চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক যেন তুরাখন বাবা উজ্জাকবাইয়ের রূপ নিয়ে তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

বৃদ্ধ কাজী অত্যন্ত অভ্যস্ত হাতে বিচারের শঠতার পরিচিত স্রোতে নিপুণতার সঙ্গে তার জোয়া বেয়ে চললেন। চড়ুই পাখীর নাম দেওয়া হল 'হীরা' এবং ওজন হল তিন ভরি। এইভাবেই দলিলে নথিভুক্ত করা হল।

কেরানী দুটো দলিল তৈরি করল: একটায় বলা হল খোজা নাসিরুদ্দিন তিন ভরি ওজনের খাঁটি ও অবিকৃত একটা হীরার মালিক এবং অন্যটায় হ্রদটা চিরকাল ব্যবহারের জন্য চোরাকবাসীদের কাছে হস্তান্তর করা হল—প্রত্যেকেরই অধিকার সমান।

খোজা নাসিরুদ্দিন দুটো দলিলেই সই করলেন। চোরাকের অধিবাসীরা একে একে মঞ্চে এগিয়ে এল, কিন্তু কেউ সই করতে না জানায় চীনা কালি দিয়ে তাদের আঙুলের ছাপ দিচ্ছিল। প্রত্যেকটা আঙুলের ছাপের পাশে কেরানী আঙুলের মালিকের নাম লিখে নিচ্ছিল।

"এদিকে এস, ভয় পেও না!" খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তাড়াতাড়ি আমি ঐ চড়ুইটাকে দাঁতে চিবাবার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না, তোমাদের দীর্ঘসূত্রতায় আমার রাতের খাবারের দেরী হচ্ছে।"

সেখানে অনেক নিয়মত, ইয়ারমত, ইউনুস, রসুল, দাদাবাই, জুড়াবাই, খাবাজান, আমিজানের দল ছিল। দুপুরের মধ্যেই অবশ্য সব কাজ হয়ে গেল। দলিলে শেষ সই করল জনৈক উসমানের ছেলে মহম্মদ এবং কাজী শিঙ্গার মত ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘোষণা করলেন যে হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় হস্তান্তর বেশ কম সময় নিল। বাড়ি ও বাগান সৈয়দের নামে লিখে দেওয়া হল গতানুগতিক ভাবে।

চোরাকের অধিবাসীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়েছিল, নড়ছিল না, নিশ্বাসও ফেলছিল না।

কেরানী খাতা বন্ধ করল; কাজী নিচে নেমে এলেন, পনেরটা তোষকের সম্ভ্রমপূর্ণ আসন থেকে তিনি মাটিতে নেমে এলেন ও ছ্যাকরা গাড়ীর দিকে ছুটলেন—তাঁর বেশ তাড়া ছিল।

কোচোয়ান জিভ দিয়ে শব্দ করল, ঘোড়াটা পিছনের পা দুটো ছুঁড়ল এবং গাড়ীটা হেলতে দুলতে ও কোঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে চলতে লাগল। যদিও রাস্তা ছিল একই এবং গাড়ীও ছিল আগের, তবুও চাকাগুলো কিন্তু একবারও

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসেনি, বরং অনেক দিন পর বেশ স্বচ্ছন্দেই সোজা পথে চলছিল। বৃদ্ধ কাজী বরাবর বাঁ দিকে হেলতে থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন, সেইজন্য আজ গাড়ীর ভিতরে বসে থাকতে তাঁর কেন কষ্ট হচ্ছিল বুঝতে পারছিলেন না।

হ্রদের প্রধান নালার ধারে খোজা নাসিরুদ্দিন চোরাকবাসীদের কাছে বিদায় নিলেন।

সৈয়দকে হ্রদের অভিভাবক নিযুক্ত করে খোজা নাসিরুদ্দিন তাকে বললেন :

"নালার একেবারে শেষ প্রান্তে তুমি তোমার ফসল বুনবে যাতে অন্য সকলের মাঠে জলসেচ করার আগে তুমি নিজের মাঠে জলসেচ করতে না পার। রাগ করো না—কারণ এতে রয়েছে সকলের কল্যাণ আর সেইজন্য নিরাপত্তার প্রতিটি পথকেই স্বাগত জানানো দরকার। এই নাও তালার চাবি। ভালভাবে জল পাহারা দিও—এই হচ্ছে তোমাদের জীবন।"

সৈয়দ তালা খুলে সরিয়ে নিল। খোজা নাসিরুদ্দিনের সাহায্যে চড়কিটা ঘুরিয়ে দরজাটা উপরে তুলে ফেলল। জল বেগে প্রধান নালার দিকে ছুটল পাক খেতে খেতে ও ফেনা তুলে। আগের মত প্রচুর জল স্রোত নিয়ে বয়ে চলল ; দুপুর রোদের আলোয় ঝলমল করে উঠল জলের স্রোত, তীরের পাশে উইলো গাছের জলে ডুবে থাকা শাখাগুলো জলের স্রোতে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং শাখাপ্রশাখাগুলো জীবন্ত প্রাণীর মত ছটফট করে লাফাতে লাগল।

"তোমরা জল পেয়েছ!" খোজা নাসিরুদ্দিন চোরাকবাসীদের বললেন। "খিদে, অভাব এবং চিরন্তন অবনমিত ভয় থেকে এই জল তোমাদের মুক্তি দিবে। মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে এই গুণগুলি দরকার, তবে এই শেষ নয়। স্বার্থপরতার নীচ মাকড়সা আমাদের সকলের মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমাদের স্বাধীনতা ও উৎকর্ষতার সেই হচ্ছে অন্তরায়। একে দূর কর, ধ্বংস করে ফেল, নইলে মানুষ নামের উপযুক্ত হতে পারবে না, যে নাম হচ্ছে সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম। লোভের স্বার্থে ভরা শব্দ 'আমি' যেন চোরাকে আর কোন দিন না যায় তার বদলে যেন আরও ভাল ও মহৎ শব্দ 'আমরা' শোনা যায়। বিদায়, তোমাদের খেত ও বাড়ী সুখের হোক, চিরবিদায়!"

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার চীৎকার শোনা গেল ; অনেক লোক কেঁদে ফেলল।

তিনি খাঁচাটা নিয়ে চড়ুইটাকে বার করে আনলেন এবং সেটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। বেশি খাওয়ার ফলে সে ভারী হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় মাটিতে এসে পড়ল, কিন্তু তাড়াতাড়ি বাতাসে ভর করে আকাশের দিকে উড়ে গেল।

"পাখীটা সরাইখানায় চড়ুই-বৌয়ের কাছে উড়ে গেল," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "এই 'হীরাকে' আমি পোষার জন্য তোমাদের কাছে রেখে গেলাম।"

চড়ুইটাকে মুক্তি দেওয়ার পর চোরাকে তাঁর সব কাজ শেষ হয়ে গেল এবং তাঁর সেখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

গ্রামবাসীদের শেষবারের মত সেলাম জানিয়ে এবং তাদের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কামনা জানিয়ে তিনি আমেদ-আলি, সফর, সৈয়দ ও জুলফিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন ; তারা একত্রে দাঁড়িয়ে ছিল।

"তোমরা সকলে আমাকে উজাকবাই নামে ডাক—কিন্তু জেনে রেখ এটা আমার আসল নাম নয়—এ নাম আমার কাছে ঘৃণিত। প্রয়োজনে আমি এ নাম নিয়েছিলাম। যখন আমার কথা তোমাদের মনে পড়বে তখন অন্য কোন নামে ডেক।"

"কি নামে ডাকব ?"

বিদায় দিতে আমার জন্য তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চাইলেন না, নালা দিয়ে বেগে জল ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিদায় নিলেন।

অনেকক্ষণ চোরাকের অধিবাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এবং পাহাড়ের পিছনে এই অদ্ভুত ও চিরস্মরণীয় বিদেশীকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল।

হঠাৎ সৈয়দ চীৎকার করে উঠল :

"আমি জানি ! আমি অনুমান করেছি !"

হঠাৎ জেগে ওঠা মানুষের মত সে হাতটা মুখের উপর বুলিয়ে নিল যেন চোখের উপর আটকে থাকা একটা মাকড়সার জালকে সরিয়ে দিচ্ছে।

"খোজা নাসিরুদ্দিন—তাঁর আসল নাম !"

তখন সকলের কাছে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই খোজা নাসিরুদ্দিন। সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল যে একথা তারা একবারও ভেবে দেখেনি, অবশ্য আবছা ভাবে একথা যেন মনে হয়েছিল।

সৈয়দ তাড়াতাড়ি তীরের দিকে ছুটে গিয়ে চীৎকার করে উঠল, "খোজা নাসিরুদ্দিন ! খোজা নাসিরুদ্দিন !"

একটা ক্ষীণ শব্দ তুলে প্রতিধ্বনি সাড়া দিল, কিন্তু খোজা নাসিরুদ্দিন কোন উত্তর দিলেন না।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কোকান্দে নিরাপদে পৌঁছে আগাবেক মনে করলেন যে এই দীর্ঘ পথ একাকী যাওয়ায় বিপদ আছে, বিশেষ করে বোঁচকায় যখন টাকা আছে। যেসব গাড়ী দল বেঁধে যাবে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং তিনি কোকান্দে কিছুদিন অপেক্ষা করলেন ইতিমধ্যে খোজা নাসিরুদ্দিন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

চোর খোজা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল:

"আর একদিন হলেই আপনি দেরী করে ফেলতেন। আগামী কাল রাতে গাড়ীর দল ইস্তানবুল যাচ্ছে এবং আগাবেকও তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।"

"তাহলে কাল আমাদের অনেক কাজ করতে হবে," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "আমার গাধা কেমন আছে?"

"ভাল আছে অবশ্য বেশ একলা। আপনাকে খুঁজছে।"

"আশ্চর্য হবার কিছু নেই, অনেক দিনের বিচ্ছেদ! যাইহোক কাল আবার আমরা এক সঙ্গে হচ্ছি। আগাবেক তাহলে এখনও রহিমবাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে মণিমুক্তোগুলো দেয়নি?"

"না দেয়নি। আমি তার প্রতি পদক্ষেপ লক্ষ্য রাখছি।"

"আল্লা নিজেই আমাদের সাহায্য করছেন!"

তাঁরা একটা ছোট্ট সরাইখানায় বসেছিলেন, একটা নোংরা জায়গা, কার্পেটের বদলে মাদুর পাতা ছিল, তামার বাসনের জায়গায় ঢালাই লোহার বাসনপত্র এবং তেলের প্রদীপের জায়গায় চর্বির প্রদীপ। প্রধান বাজারের চকে যাবার পথে একটা গলিতে এটা উঁকি মারছিল ঠিক যেন একটা ভীতু নোংরা ভিখারী এক বড়লোকের বাড়ীর ভোজসভায় হঠাৎ এসে পড়েছে, কিন্তু জানে যে সেখানে তার কোন জায়গা নেই। চারপাশের সুন্দর ও বড় বড় সরাইখানার পাশে যেগুলো থেকে খদ্দেরদের লোভ দেখিয়ে চকের চারপাশে আলো জ্বলছিল এবং শিঙা ও ঢাক বাজছিল সেগুলোর পাশে এটা ছিল সত্যিই বেমানান।

আগাবেক এই দামী সরাইখানার একটাতে এসে উঠেছেন—চোর আঙুল দেখিয়ে বলল।

"তিনি একজন উজির, অন্য কোন সরাইখানা তাঁর পদমর্যাদার উপযোগী হবে না," খোজা নাসিরুদ্দিন মন্তব্য করলেন।

সুন্দর নরম বাতাস বইছিল ; সারাদিনের অত্যধিক গরমে ক্লান্ত হয়ে সারা শহরটা রাতের শীতল ও সজীব বাতাসে যেন বিশ্রাম নিচ্ছিল ; অমাবস্যার চাঁদ রাতের আকাশে সুন্দর বাঁকা রেখা টেনে দিয়েছে, হাফিজের কথায় ঠিক যেন "শিরাজের সুন্দরী তুর্কী রমণীর চোখের ভ্রূ।" বড় জনারণ্য শহরের বিশ্রামের মুহূর্তগুলো খোজা নাসিরুদ্দিন খুব ভালবাসতেন—জীবনের প্রাণবন্ত জোয়ার এ যেন ক্ষণিকের ভাটা, যা শক্তি জোগায়—অনেকটা সকালের পুনরাবর্তন। দীর্ঘ দীন ধরে তিনি জীবনের সম্পূর্ণতার রহস্য উদঘাটনে চেষ্টা করে এসেছেন যা হচ্ছে বৈচিত্র্যে ভর্তি—পরিশ্রম ছাড়া বিশ্রামে কোন আনন্দ নেই, বিপদ ছাড়া জয়ে নেই আনন্দ ; সেইজন্য গোধূলির এই থমথমে ভাব, খোজেন্টে যা তাঁর কাছে স্থগিত হতে পারত, এই জনস্রোতে ভাসমান ব্যস্ত বাজারে তা এতই আনন্দদায়ক।

আত্মার পরিপূর্ণতা ও জীবনের প্রশস্তি নিয়ে তিনি বহু বর্ণ ও বৈচিত্র্যে ভরা সকালের দিকে চাইলেন, যার ভিড় ছিল ধাকাধাক্কিতে ভরা এবং ফেনার মত ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে উঠছিল বিভিন্ন দেশের লোক নিয়ে যার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য সব রকমের পার্থিব শব্দ। ধুলো উঠে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিল, দাঁতে কটকট করছিল এবং নাক ভরিয়ে দিয়েছিল ; সূর্যের নিচে গরম হয়ে পৃথিবী নিজেই যেন নিজেকে ছায়ার দিকে টেনে আনছিল এবং কালির মত ঘন অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল ; গম্বুজের টালি জ্বলন্ত উত্তাপ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে যেন নিশ্বাস নেবার মত কোন বাতাস ছিল না।

সবচেয়ে দামী ও জাঁকজমকপূর্ণ সরাইখানাতে আগাবেক সকালের চা পানের পর পালংক থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"রক্ষক, আমার থাকা ও খাওয়ার টাকা শোধ করে নাও এবং বড় বড় কানের চামড়ায় ঢাকা প্রাণীটাকে বার করে নিয়ে এস।"

এমন কি গাধার অনুপস্থিতিতেও অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ পরোক্ষ নাম ছাড়া তিনি অন্যভাবে তাকে ডাকতে সাহস করতেন না যাতে কায়রোর রাজপ্রাসাদে পৌঁছে তাঁকে কোন ভুলের জন্য গোপন কক্ষে না পাঠান হয়।

খোজা নাসিরুদ্দিন এবং চোর খুব সকাল থেকেই সরাইখানা থেকে আগাবেকের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় এক পাশে লুকিয়ে ছিলেন।

মিশরের ভাবী উজির লাগাম ধরে তাঁদের পাশ দিয়ে সদর্পে পা ফেলে চলে

গেলেন। বড় কানের চামড়ায় ঢাকা প্রাণীটাকে বেশ খারাপ দেখাচ্ছিল ; তার পিছন দিকটা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, তার কান দুটো ঝুলছিল, তার লেজটা শক্ত হয়ে নিচে ঝুলে পড়েছিল এবং ডগার চুল প্রায় নড়ছিল না।

"তার দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই," চোর বলল। "সে সত্যিকারের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অনেকেরই কাছে সে উদাহরণস্বরূপ।"

আগাবেককে অনুসরণ করে তাঁরা ভীড়ে ঢুকে পড়লেন, দোকানের সারিগুলোর ভীড় ও চীৎকারের মধ্যে ; এখানে কোন বাতাস ছিল না—মাটি থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্পে বাতাস সরে গিয়েছিল ; ভিস্তিওয়ালার জল ছিটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করায় মাটি ভিজে ছিল। চামড়া, রং, বিদেশী মসলা, পচা আবর্জনা, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জামার ঘামের গন্ধ—এইসব হাজার হাজার গন্ধ মিশে এত বেশি মাত্রায় ঘন হয়ে উঠেছিল যে হাতে ও মুখে সেগুলো যেন চটচটে হয়ে লাগছিল। রং, জুতো ও ঘোড়ার দোকানের পাশ দিয়ে আগাবেক গেলেন এবং বড় বাজারের নালাটার পাশে এসে হাজির হলেন। খোজা নাসিরুদ্দিন চোরকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলেন।

"সে রহিমবাইয়ের দোকান খুঁজছে," তিনি বললেন।

মোটা মুদ্রা-বিনিময়কারী সেদিন এখনও পর্যন্ত কোন বউনি করেননি এবং দোকানে বিরক্ত হয়ে বসে হাই তুলছিলেন। তাঁর মুখ, যা আবার পুরোনো গোল ভাব ফিরে পেয়েছিল, সুন্দরভাবে আঁচড়ান তাঁর কোঁচকান দাড়ি এবং তাঁর চোখের ঢুলু ঢুলু ভাব সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে সিন্দুকের সেই ঘটনার পর তাঁর মানসিক শান্তি আর কোন দিন নষ্ট হয়নি। তাঁর স্ত্রীর মুখের নির্ধারিত সততা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েই যেন তাঁকে ক্ষমা করেছে, তাঁর আরবের ঘোড়া দুটো তিনজন প্রহরীর পাহারায় পরবর্তী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় নিরাপদে আস্তাবলে দাঁড়িয়েছিল, রাজপুরুষ তাঁর অভিবাদনের উত্তরে অত্যন্ত নিরাসক্ত-ভাবে হলেও—অভিবাদন জানাতেন এবং জীবনও আগের গতানুগতিক মসৃণ পথে বয়ে যাচ্ছিল।

সকালের অত্যধিক গরম তাঁর মনের তৃপ্তির ভাব নষ্ট করার চেষ্টা করেনি, বরং তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে রাতের খাবার খেয়ে স্ত্রীর পাশে মধুর বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। বৃথা স্বপ্ন! তাঁর মাথার উপর দুঃখের বাতাস ইতিমধ্যেই বইতে সুরু করেছিল।

একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হাতে একটা লাগাম ধরে তাঁর দোকানের সামনে এসে থামলেন।

"আল্লার বাণী আপনার উপর বর্ষিত হোক, আপনি শান্তি লাভ করুন। আশা করি, আপনার নাম রহিমবাই ?"

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, সকলে আমাকে রহিমবাই নামেই ডাকে। পথিক, কি কাজে আপনি আমার দোকানে এসেছেন ?"

"একজন সৎ বণিক হিসেবে পাহাড়ী অঞ্চলে আপনার নাম শুনেছি এবং সেইজন্য কোকান্দের মুদ্রা-বিনিময়কারীদের মধ্যে আপনাদের খুঁজে বার করেছি।"

অন্যান্য অনেক দুষ্ট লোকের মত রহিমবাইও তাঁর খ্যাতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ; আগাবেকের চাটুবাক্যে অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি মনে মনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন, যদিও স্বাভাবিক দুষ্ট প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি মনে মনে আগন্তুককে ঠকাতে মনস্থ করলেন—অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কোন গণ্ডগোল বা হল্লা না করে এবং প্রয়োজন হলে খানিকটা শুভেচ্ছা দেখিয়ে।

"পথিক, এ ধরনের কথা বলে আপনিই কিন্তু প্রথম আসছেন না," ভুঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আত্ম প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রহিমবাই বললেন। "আল্লাকে ধন্যবাদ, ফরঘানা ও তার বাইরের সকলেই আমাকে সৎ লোক বলে জানে এবং আশা করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ রকমই থাকব।"

"সৎ নাম ধনসম্পদের চেয়েও ভাল," সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে আগাবেক বললেন।

বণিক সেলাম ও অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন জানালেন :

"তার চেয়েও ভাল একজন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া।"

"বাস্তবিক আপনি খাঁটি কথা বলেছেন !" আগাবেক উল্লসিত হয়ে বললেন। "এই ধরনের সাক্ষাতের জন্য আল্লা যেন আজ আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।"

"যে কথা আপনার কাছে শুনছি মহৎ মনেই তার সৃষ্টি," বণিক উত্তর দিলেন।

"এরা ঠিক যেন আয়না, যা দেখে তাই প্রতিফলিত করে," আগাবেক বললেন।

এই ধরনের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় তাঁরা অনেকক্ষণ কাটালেন এবং একে অন্যের প্রশংসায় আকাশে ওঠার অবস্থা, এদিকে মুদ্রা-বিনিময়কারীর গোল চোখ দুটো

—যে ছুটো বাস্তবিক তার মনের আয়না—ক্ষুদ্র ছিদ্রের দিকে ফিরে আগন্তুকের দেহের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং শেষে তাঁর শরীরে বাঁধা কোমর-বন্ধনীর কাপড় ভেদ করার চেষ্টা করতে লাগল।

শেষে তাঁরা কাজের কথায় এলেন। রহিমবাই এক মুঠো সোনার মুদ্রা গুনতে লাগলেন যা কোকান্দের বাজারের মুদ্রা-বিনিময়ের হারের চেয়ে পাঁচ মুদ্রা কম; খেদের সঙ্গে তিনি জানালেন যে আরবের মুদ্রার হার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, যদিও এটা ছিল নির্জলা মিথ্যা। প্রতারণায় আগাবেকও অবশ্য শিশু নন জেনেশুনেই তিনি মৃদু হাসলেন, অবশ্য তর্ক করলেন না। কায়রোর রাজ-প্রাসাদে রাজকোষ যখন তাঁর অপেক্ষা করছে তখন আরবের পাঁচটা দিনারের আর কিই বা দাম!

"এখন মশায়," তিনি বললেন, "আমার আর একটা কাজ বাকী আছে।" তিনি একটা কাল চামড়ার থলিতে দিনারগুলো রাখলেন এবং সেটা সরিয়ে অন্য একটা থলি টেনে আনলেন।

"আমার কিছু মণিমুক্তো আছে—একটা নেকলেস, ব্রেসলেট ও কয়েকটা আংটি। আশা করি আপনি এগুলো কিনবেন?"

"চুপ!" কাউণ্টারের উপর ঝুঁকে ডানে বাঁয়ে কোন গুপ্তচর আছে কিনা দেখে নিয়ে রহিমবাই বললেন। "আপনি কি জানেন না পথিক যে এ ধরনের হস্তান্তর কোকান্দে নিষিদ্ধ, যদি না শাসন কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই তা অনুমোদন করে থাকেন? আমরা বিপদে পড়তে পারি—আপনি মণিমুক্তো হারাবেন আর আমি জেলে যাব।"

"আমিও এসব শুনেছি, কিন্তু আশা করি দুজন দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ······"

"আর সৎও," বণিক তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন।

"সবচেয়ে বেশি, বিচক্ষণ," আগাবেক বললেন।

আলোচনা ক্রমশঃ জিভের শব্দে এসে থামল, কারণ কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রহিমবাই একমুঠো রুপোর টাকা কাউণ্টারে এনে রাখলেন যাতে হঠাৎ প্রহরীরা এসে পড়লে কিছু বুঝতে পারবে না, পরে তিনি থলির সুতো টেনে খুললেন ও থলির পাশ দুটো টানলেন যাতে বার না করেও মণিমুক্তোগুলো দেখতে পারেন।

কোণের এক পাশে লুকিয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন ও চোর দেখল যে মুদ্রা-বিনিময়কারীর মোটা মুখটা রাগে নীল হয়ে গেল এবং তাঁর দাড়ির চুল খাড়া হয়ে উঠল।

"পথিক আমাকে বলুন কেমন করে, কোথা থেকে এবং কখন এই মণিমুক্তা-গুলো আপনার কাছে এসেছে ?"

"বণিক," আগাবেক উত্তর দিলেন, "এই প্রশ্নগুলো শাসন কর্তৃপক্ষের, যাকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাইছি। কেমন করে ও কোথা থেকের উত্তরে আপনার কি যায় আসে ? আপনার কাজ হচ্ছে এগুলো নেওয়া বা না নেওয়া। যদি আপনি নিতে চান তবে আমার টাকা মিটিয়ে দিন—ছ' হাজার টাকা !"

"টাকা দিব ?" বণিক রাগে গরগর করে উঠল। "ছ' হাজার ! আমার নিজের সম্পত্তির জন্য, যা আমার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছিল !"

আগাবেক তখন সাবধান হয়ে উঠলেন। এই বণিক কি তাঁকে বদমায়েসির জালে ধরার চেষ্টায় আছে ?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে তিনি থলিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

বণিকও অবশ্য ঘুমাচ্ছিলেন না, তিনি তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন।

এইভাবে তাঁরা কাউন্টারের দু পাশে থলিটার জন্য একে অন্যের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

একে অন্যকে ঘৃণাপূর্ণ বদমায়েসী চোখ দিয়ে ভেদ করতে চাইলেন, তাঁদের চোখ ছিল স্ফীত, গোল এবং একদিকে নিবদ্ধ, বিবদমান মুরগীর চোখের মত একটা সাদা আস্তরণে ঢাকা। তাঁদের রাগে কোঁচকান মুখ থেকে বাঁশীর মত কর্কশ শব্দ তুলে, বাতাস বার হচ্ছিল।

এদিকে দুজনেই নিজেকে সংযত করে চীৎকার চেপে রাখার চেষ্টা করছিলেন পাছে শহরের প্রহরীরা শুনতে না পায়।

"বেরিয়ে যাও !" বণিক বললেন।

"থলিটা ফেরত দাও," আগাবেক বললেন।

"ঠক !"

"বদমাস চোর !"

একটা ছোটখাটো লড়াই সুরু হল—ভয়ংকর, কিন্তু চুপে চুপে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না বললেই হল। মনে হচ্ছিল দুজন সম্ভ্রান্ত লোক কাউন্টারের উপর ঝুঁকে একটা গোপন আলোচনায় ব্যস্ত, কিন্তু কেবল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে

তাদের ঝগড়া, তাদের জোরে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ, তাদের গোঁঙানি এবং দাঁত কড়মড় করার শব্দ শুনলে আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করা যাবে।

লড়াই কিছুক্ষণের জন্য থামল।

"এই শয়তানের বাচ্চা, এই দুর্গন্ধে ভরা শেয়াল, এই তোর সততা, বেরিয়ে যা বলছি!"

"আমার জিনিষ ফিরিয়ে দে বলছি, মড়া বাপের শরীর থেকো অসাধু বদমাস!"

এক মিনিট আগেও দুজনে দুজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন, এখন একে অন্যের ঘাড়ে রাশি রাশি গালাগালি চাপিয়ে দিচ্ছেন। যখন একটা টাকার থলি পাওয়া যায় তখন লোকেরা এই ভাবেই ঝগড়া করে।

"মসজিদের অবমাননাকারী," রাগে চোখের মণি দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে বণিক গোঁ গোঁ করে উঠলেন, "শয়তানের নোংরা কাজের তুই সঙ্গী।"

"চুপ, লম্পট কোথাকার!" আগাবেক উত্তর দিলেন, নাকের ভিতর দিয়ে তাঁর বাতাস বেরিয়ে এল, কারণ রাগে তাঁর চোয়াল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল।

এদিকে বণিক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় আগাবেক টাকার থলি ধরে এমন এক হেঁচকা টান মারলেন যে তাঁর পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। তিনি অবশ্য সফল হলেন—বণিকের হাত থেকে টাকার থলি কেড়ে নিতে নয় উল্টে কাউন্টারের পিছন দিকে থলি সমেত বণিককে সামনের দিকে টেনে আনতে।

বণিক পেট পর্যন্ত হাঁটু মুড়ে এবং কাউন্টারেব ধারে পা রেখে রাস্তায় ছিটকে পড়া থেকে রক্ষা পেলেন, কিন্তু ছিটকে মাটি থেকে বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়লেন।

এই টানাটানিতে আগাবেকের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগে বণিক কাউন্টারের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে টাকার থলিটা পেটের নিচে নিয়ে আনলেন যেন সেটাকে গ্রাস করছেন। টাকাব থলির সঙ্গে আগাবেকের অসাড় হাতটা প্রায় কাঁধ পর্যন্ত বণিকের পেটের তলায় এসে পড়েছিল।

এই দৃশ্যের দিকে বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ চাইলে কিছুই বুঝতে পারবে না। চোর এবং খোজা নাসিরুদ্দিন অবশ্য প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি এবং প্রত্যেকটি শব্দ লক্ষ্য করছিলেন।

"ও আগাবেকের চোখে থুতু ফেলেছে!"

"আগাবেক বণিকের দাড়ি কামড়ে ধরেছে। দেখুন, দেখুন, বেশ কিছুটা চুল।"

"হ্যাঁ এখন থু থু করে ফেলছে। চুল তার দাঁত ও জিভে আটকে গিয়েছে।"

"দেখুন, বণিক আগাবেকের নাক কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।"

চোর উত্তেজনায় কাঁপছিল এবং তার হলুদ চোখটা জ্বলছিল।

"সময় হয়েছে, খোজা, নাসিরুদ্দিন! আর দেরী করছেন কেন?"

"তারা আর কিছুক্ষণ লড়াই করুক।"

দুজন মারামারি করছিল আর দুজন লক্ষ্য করছিল, এ ছাড়া পঞ্চম আর একজন এই মারামারির মধ্যে ছিল। আসলে সেই প্রধান অপরাধী, সমস্ত গোলমালের মূলে। তাকে নিয়েই এই লড়াইয়ের সুরু এবং তার জন্যই লড়াই চলছিল, কারণ খোজা নাসিরুদ্দিন তাঁর প্রিয় গাধাকে উদ্ধার করার জন্যই আগাবেক ও মুদ্রা-বিনিময়কারীর মধ্যে এই লড়াই বাধিয়ে দিয়েছিলেন।

চুরি নিয়ে এই লড়াই আর একবার জোরে সুরু হল।

আর দেরী করা বিপজ্জনক। বাজারের প্রহরীরা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

খোজা নাসিরুদ্দিন একটা চাপা শিস দিলেন।

গাধাটা অবাক হয়ে তার পিঠটা তুলে ধরল। যে কোন জায়গায় এমন কি চেঁচামেচি ও বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যেও সে এই শিস চিনতে পারত। এ ধরনের শিস ছিল তার কাছে বন্ধুর আহ্বান, প্রভুর আদেশ অথবা ভগবানের কণ্ঠস্বর—কারণ খোজা নাসিরুদ্দিন অবশ্য তার কাছে ছিলেন ভগবানের মত, সর্বশক্তিমান ও শুভাকাঙ্ক্ষী দেবতা।

আর একবার শিস দেওয়া হল এবং পরে খোজা নাসিরুদ্দিন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর ভগবানের রূপ গাধার দৃষ্টির সামনে অল্পক্ষণের জন্য তুলে ধরলেন।

লম্বা কানের জন্তুটার তখনকার ব্যগ্রতা কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সে তার হারিয়ে যাওয়া দেবতাকে আবার ফিরে পেয়েছে, পৃথিবী আবার তার কাছে আলো ও আনন্দে ভরে উঠল! সে তার চারটে পা আকাশে ছুঁড়তে লাগল, লেজ তুলে ধরল এবং এক বিকট চীৎকার করে কোণের যেখান থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি তার চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিকে ছুটে গেল।

ফাঁস দেওয়া দড়িটা টান হয়ে উঠল।

সেই মুহূর্তে আগাবেক হাঁপাতে হাঁপাতে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে বণিকের পেটের

নিচে থেকে থলিটা বার করার চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টার সঙ্গে গাধার আকস্মিক টান যোগ হল।" যুবরাজ নিজেই আমাকে সাহায্য করছেন!" আগাবেক ভাবলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিলেন। এই সমবেত চেষ্টা বণিক সহ্য করতে পারলেন না। টাকার থলি সমেত তিনি দোকানের বাইরে একেবারে রাস্তার উপর এসে পড়লেন, অবশ্য টাকার থলিটা কিছুতেই হাত থেকে ছাড়লেন না।

এইবার প্রহরীদের ডাকা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না।

"ডাকাত!" তিনি চীৎকার করে উঠলেন, হিংসা ও ভয় মিশে একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল। "সাহায্য করুন! ডাকাত!"

আগাবেক বেশ মুস্কিলে পড়ে গেলেন: এক দিকে বণিক তাঁকে টানছেন অন্য দিকে গাধাটা; পাশবিক শক্তির জন্য গাধার সুবিধা ছিল এবং তিনজনেই এইভাবে গড়িয়ে রাস্তায় এসে হাজির হলেন—গাধা, মাথা নিচু করে ও পিছনের পা ছুড়তে ছুড়তে একেবারে সামনে, তার পিছনে আগাবেক এক হাত গাধার দিকে ও অন্য হাতে টাকার থলি ধরে অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এবং সব পিছনে উসকো-খুসকো দাড়ি নিয়ে কর্কশ শব্দে চীৎকার করতে করতে অর্ধশায়িত বণিক যাঁর শরীরের উপর দিকটা আকাশে, এদিকে মোটা ভুঁড়ি ও ছোট ছোট পা ছুটো মাটিতে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে চলেছে। ইয়ারকন্দে তৈরি লাগামের শক্তির খ্যাতি আর একবার প্রমাণিত হল।

লম্বা কানের জন্তুটাকে উদ্ধার করতে হবে। আর একবার খোজা নাসিরুদ্দিন কোণ থেকে তাঁর চেহারাটা দেখিয়ে নিলেন। অত্যন্ত ভয় পেয়ে জন্তুটা তার পিছনের পা ছুটো ছুড়ে ও মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে এক ভয়ানক ধাক্কা দিল। ফাঁস লাগানো দড়িটা ছিঁড়ে গেল।

দাড়ি সমেত বণিক ধুলোয় গড়িয়ে পড়লেন। আগাবেক তাঁর উপর হাত পা ছড়িয়ে পড়লেন। এক সঙ্গে ছুজন গড়াতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ঢালের শব্দ তুলে এবং তলোয়ার, বর্শা ও মুগুরের ঠনঠন শব্দের মধ্যে এবং রক্ত হিম করা চীৎকারের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ও হেঁটে প্রহরীরা বিভিন্ন দিক দিয়ে এসে উপস্থিত হল।

পাছে রাজপুত্র পালিয়ে যায় এই ভয়ে আগাবেক মণিমুক্তার থলি ছেড়ে কোণের দিকে ছুটলেন যেদিকে গাধাটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রহরীরা বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল।

"ছেড়ে দাও!" আগাবেক দারুণভাবে গর্জন করে উঠলেন।

"ছেড়ে দাও, নীচ বদমাসের দল! জান না কে সামনে দাঁড়িয়ে আছে? আমি মিশরের উজির—শুনতে পাচ্ছ মানুষ-বেশী কুকুরের দল! আমি তোমাদের উড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিব!"

"ও একটা চোর! চোর!" বণিক চীৎকার করে উঠলেন। "আমি প্রমাণ করব। মাননীয় কামিলবেক এই মণিমুক্তোগুলো দেখেছেন, তিনি চেনেন।"

"আমাকে যেতে দাও!" হাঁপাতে হাঁপাতে আগাবেক বললেন এই ভেবে যে গাধার সঙ্গে তাঁর মিশরের উচ্চাশাও হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। "ছেড়ে দাও বলছি!" ফাঁদে ধরা পড়া এক চিতাবাঘের মত রাগে গর্জন করতে করতে তিনি বললেন। "বেরিয়ে যাও! নইলে এই মুহূর্তে আমি তোমাদের সকলকে গাধা বানিয়ে ফেলব।"

আর একজন প্রহরী পিছন দিক থেকে লাফ দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল।

রাগে গরগর করতে করতে আগাবেক কোমরবন্ধনী থেকে মন্ত্রপূত পাঁচন বার করলেন।

"লিমচেজু! পুটজুগু! জোমনিহোজ!" প্রহরীদের গায়ে পাঁচনের জল ছিটাতে ছিটাতে যত জোরে পারলেন চীৎকার করে উঠলেন। "কালামাই, দোচিলোজা, চিমোজা, সুফ, কাবাহাস!"

"ধর ওকে ধর! বেঁধে ফেল! টানতে টানতে নিয়ে এস!" তাঁর মন্ত্রের উত্তরে প্রহরীরা বিভিন্ন স্বরে চীৎকার করে উঠল।

দেখা গেল প্রহরীদের মন্ত্র তাঁর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এক মিনিটের মধ্যেই আগাবেককে কাবু করে হাত পা বেঁধে ফেলা হল।

একটা বাঁশ নিয়ে এসে তাঁর বাঁধা হাত ও পায়ের ভিতর ঢুকিয়ে দুজন শক্তিশালী প্রহরী বাঁশের প্রান্ত দুটো তাঁদের কাঁধে তুলে নিল। মিশরের উজির আগাবেক পেটটা উপর দিকে ও শিরদাঁড়া নিচের দিকে ঝুলিয়ে শিকারের পর জন্তুকে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয় সেইভাবে আকাশে ঝুলতে লাগলেন। তাঁর মাথার পাগড়ী মাটিতে গড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা সেটা পায়ে মাড়িয়ে দিল ও পরে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

তিনি থুতু ছিটাতে লাগলেন, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল ও মাঝে মাঝে তাদের ধমক দিতে লাগলেন। প্রহরীদের চীৎকারের মধ্যে, যারা হাত পায়ে বাঁধা বন্দীকে ঘিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আগাবেক খোজা নাসিরুদ্দিনের

দৃষ্টির বাইরে ছিলেন এবং ঢাকের শব্দের মধ্যে মিছিল বাজারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজ দপ্তরের দিকে যেদিকে মাননীয় কামিলবেকের বাড়ী। মুদ্রা-বিনিময়কারীকে দুজন প্রহরী পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন তৃতীয় প্রহরী থলিটা উঁচু করে সকলকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ; এই ছিল তখনকার আইন, কারণ এতে একদিকে মানুষের লোভ কমবে অন্যদিকে প্রহরীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব হবে না।

অনেক লোক জড় হয়ে মিছিলকে অনুসরণ করে চলল।

দোকানের সামনের রাস্তা জনহীন হয়ে পড়ল। ধুলোও সরে গেল।

খোজা নাসিরুদ্দিন চোরের হাতে গাধাটা দিয়ে বললেন :

"একটা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জায়গায় একে লুকিয়ে রাখ। বিধবাকে খুঁজে বার করে বিচারের জায়গায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

প্রহরীদের বাড়ীর সামনে একটা বড় মাঠ ছিল যেখানে মঙ্গলবার ছাড়া অন্য কোন দিন ব্যবসা বা অন্য কোন কারণে জনসমাগম নিষেধ ছিল ; সেখানে মাননীয় কামিলবেক সেই সপ্তাহে ধরে নিয়ে আসা আসামীদের নিজে বিচার করতেন ও শাস্তি দিতেন।

দৈবক্রমে সেই দিনটা ছিল মঙ্গলবার। রাজপুরুষ একটা নতুন তলোয়ার ও অসংখ্য নতুন পদক লাগানো একটা রাজপোশাক পরে (সেই স্মরণীয় সিন্দুকের ঘটনার পর নতুন করে তাঁকে আর কোন বিপদে পড়তে হয়নি) মঞ্চের উপর একটা রেশমের চন্দ্রাতপের নিচে সিংহাসনে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন এবং বিচারের আসন থেকে মাঠের জনতার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। মাঠের দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসের গন্ধ যখন তাঁর মুখে এসে লাগছিল তখন তিনি মুখ বাঁকাচ্ছিলেন ; বাতাসে দুটো গন্ধ স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল—ঘাম ও রসুনের গন্ধ। আসামী আগাবেক নিচে, বরং আরও নিচে বললে ভাল হয়, একটা গর্তের মধ্যে বসেছিলেন যেখানে শুধু তাঁর ন্যাড়া মাথাটা দেখা যাচ্ছিল। এটা সাধারণ মানুষের কাছে একদিকে শাসনকর্তার দুর্গম মহিমার নিদর্শন হয়ে ও অন্যদিকে অনন্ত পাপের জলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে। একটা বাঁশের মাথায় ছেঁড়া কম্বল বেঁধে একজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল যাতে আসামী মাথা তুলে বিচারকের সুন্দর মুখের দিকে পাপ দৃষ্টি নিয়ে চাইতে না পারে। এটা যেন

সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে শাসনের উচ্চপদে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের চিন্তাধারাই অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে যথেষ্ট আনন্দের কারণ। আগাবেক ইতিমধ্যেই মাথায় বেশ কয়েকটা বাড়ি খেয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যেই খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে ঘোলাটে চোখ মেলে মাটির দিকে চেয়েছিলেন।

রাজপুরুষ ও আসামীর মাঝখানে বড় বড় ধাপের সিঁড়িগুলোর উপর কেরানীর দল তাদের খাতাপত্র নিয়ে বসেছিল যাতে দুজনকেই ভালভাবে শোনা যায়। একপাশে দু'পা দূরে একজন বিশেষ প্রহরীর চোখের সামনে বণিক দাঁড়িয়েছিলেন।

অন্য প্রহরীরা—পদাতিক বা অশ্বারোহী—ভীড়ের চাপ কমাবার জন্য দুটো লাইন করে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। জনতার যারা অত্যন্ত কৌতূহলী বা উৎসাহী তাদের মাথার উপর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকের মত বেত বা তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা এসে পড়ছিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন বেশ কষ্টে পথ করে সামনের দিকে এগিয়ে দেখলেন একটা বেত তাঁর মাথার উপর প্রায় এসে পড়ে এই অবস্থায় ঝুলছে; যাইহোক তিনি সেটা এড়িয়ে গেলেন। একটা বিরাট দাড়িওয়ালা লোকের পিছনে তিনি নিরাপদে লুকিয়ে রইলেন যাতে মাননীয় রাজপুরুষের দৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে ও শুনতে পান।

"এবার তুমি, মুরতাজের ছেলে আগাবেক, আমাকে বুঝিয়ে বল", রাজপুরুষ বললেন, "কোথা থেকে এবং কেমন করে এই মণিমুক্তাগুলো চাষী মামেদ-আলির অধিকারে এল যার কাছ থেকে তুমি সেচের জলের বিনিময়ে পেয়েছ বলে দাবী করছ? এবং কেনই বা সে টাকা না দিয়ে তোমাকে মণিমুক্তা দিল!"

"সে গরীব," আগাবেক উত্তরে বললেন, "কোথায় বা সে এত টাকা পাবে?"

"গরীব?" বিদ্রূপ করে রাজপুরুষ বললেন। "গরীব, এদিকে সারা গাঁয়ের লোকের জলের টাকা দিচ্ছে? গরীব, অথচ দাম দিচ্ছে সোনা ও মণিমুক্তায়? লিখে নাও!" তিনি কেরানীদের আদেশ দিলেন। "লিখে নাও এটা নির্জলা মিথ্যা যেটা তার বিরুদ্ধে যাবে!"

"মিথ্যা নয় হুজুর!"

ভুলে গিয়ে আগাবেক তাঁর মাথাটা তুলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় লাঠির আঘাত মাথায় এসে পড়ল এবং তাঁর চিবুকটা গর্তের ধারে লেগে জিভটা কামড়ে

ফেললেন। আঘাত আস্তে হলেও তিনি তাঁর যুক্তির খেই হারিয়ে ফেললেন ও কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে পড়লেন এবং কেবল অসংলগ্ন হয়ে কথা বলতে, চোখ গোল করে ঘোরাতে, মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে ও দাড়িটা মাটিতে ঘষতে পারলেন। পরে কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে তিনি বলতে সুরু করলেন।

"এসব মিথ্যা নয়!" তিনি পিপের মত গর্তের মধ্যে গুন গুন করে বলে উঠলেন। "মামেদ-আলি সত্যিই গরীব এবং তার কোন টাকা ছিল না। যখন সে আপেল গাছের নিচে মাটি খুঁড়ছিল তখন ঐ মণিমুক্তাগুলো দেখতে পায়।"

"চুপ, মিথ্যাবাদী বদমাস!" রাজপুরুষ গর্জন করে উঠলেন, তাঁর গোঁফ ফুটো ফুলে উঠল। "তোমার কথায় এতটুকু সত্যি নেই। আপেল গাছের গোড়ায় খুঁজে পেয়েছিল, সত্যি! পরে আমায় বিশ্বাস করতে বলবে যে সোনা ও পান্না ব্যাংয়ের ছাতার মত মাটিতে জন্মায়?"

"হে মহাজ্ঞানী বিচারক, আমি কোরাণ নিয়ে শপথ করতে রাজী আছি!"

"কোরাণ নিয়ে শপথ! শেষে তোমার অপরাধের তালিকায় ঈশ্বর-নিন্দা স্থান পাবে। লিখে নাও কেরানীরা, এটাও লিখে নাও, এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব।"

কেরানীরা লিখে নিল, রাজপুরুষও পরবর্তী প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেন।

"তোমার কথামত যদি সত্যিই তোমার একটা লোভনীয় হ্রদ ছিল তবে সেটা ফেলে তুমি কেন মিশরে যেতে চাইছ? উদ্দেশ্য কি? হ্রদটাই বা কোথায়?"

"আমি এটা বদল করেছি।"

"বদল করেছ? কেন এবং কার সঙ্গে?"

"আমি মিশরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকার বিনিময়ে বদল করেছি······ অর্থাৎ একটা গাধার সঙ্গে, যে আসলে একজন রাজপুত্র। আমি বলতে চাইছি গাধার রূপে একজন রাজপুত্র······"

"কি?" লাফ দিয়ে রাজপুরুষ চীৎকার করে উঠলেন। "আর একবার বল! না, আর বলতে সাহস করবে না। এত বড় দুঃসাহস যে আমার সামনে মিথ্যা কথা বলছ—চতুষ্পদের রূপে একজন রাজপুরুষ!"

"ঠিক তাই!" আনন্দে আগাবেক চেঁচিয়ে বললেন। "লম্বা-কান ও চামড়ায় ঢাকা চতুষ্পাদ······"

শেষে সকলে তাঁর কথা বুঝতে পারল। প্রহরী লাঠির আঘাত দিতে ভুলে গিয়ে উপরে ও বাইরে চাইতে লাগল। তাঁর মাথার উপর শেষ যে আঘাতটা দেওয়া হয়েছিল তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাকরুদ্ধ হয়ে চুপ করে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি আবছা হয়ে এল, তাঁর যুক্তি ও নির্বুদ্ধিতার অস্পষ্ট আভাস তাঁর কাছ থেকে রাজপুরুষের কাছে এসে পৌছাল।

"আর এক অপরাধ!" রাজপুরুষ গর্জন করে উঠলেন। "শাসন কর্তৃপক্ষের সামনে সে এক রাজপুরুষের নিন্দা করেছে! কেরানীরা, লিখে নাও—অবশ্য রূপক হিসেবে।"

"এখানে কিন্তু কোন রকম নিন্দাবাদ নেই!" হতভাগ্য লোকটা গোঁঙাতে গোঁঙাতে গর্তের মধ্যে থেকে বলল। "আমি মিশরে যাচ্ছিলাম, সেখানকার উজির ও কোষাগারের প্রধান অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার জন্য, বিনিময়ে রাজপুত্রকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে দিব। আমি রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, যাদুমন্ত্রে যিনি এই লম্বা কানের জন্তুতে······"

"চোপরাও, বদমাস মিথ্যাবাদী—চুপ কর বলছি," বজ্রকণ্ঠে রাজপুরুষ বললেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর আসন থেকে উঠতে উঠতে। "বাস্তবিক অনেক দিন ধরেই আমাদের দৃষ্টি দূষিত হয়ে ছিল, তাই এত বড় একটা বদমাস ও কঠিন আসামীকে আমরা দেখতে পাইনি। তার অপরাধের তালিকায় আর একটি অপরাধ যোগ করা হল—উজিরের উচ্চ পদে বসার মিথ্যা আশা, যে পদে আজও আমরা বসতে পারিনি! লিখে নাও কেরানীর দল, সব কিছু লিখে নাও: প্রথমতঃ চুরি, দ্বিতীয়তঃ বাজারে অভদ্র ব্যবহার ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ, তৃতীয়তঃ রাজনিন্দা, চতুর্থতঃ ভণ্ডামি······"

কেরানীর দল তাদের কলমের আঁচড় দিয়ে সব কিছু লিখে নিল আর তাদের কলমের আঁচড়ের শব্দে আগাবেক তাঁর ভয়াবহ ও অপরিবর্তনীয় পরিণতির কথা শুনতে পেলেন।

বৃথাই তিনি রাজপুরুষের করুণা ও বিচারের জন্য আবেদন জানালেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য প্রার্থনা করলেন। রাজপুরুষ ছিলেন একগুঁয়ে, তাঁর সবরকম বদমায়েশী ও পাপে ভরা কান্নার প্রতি তিনি কর্ণপাত করলেন না। তিনি জনতার উপর দিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এবং অনমনীয় ভঙ্গীতে উপর দিকে চাইলেন যেন আল্লার বিচারের দীপ্তি তাঁর একার চোখেই ধরা পড়েছে।

আগাবেক ভয়ে ও ক্লান্ত হয়ে অসহায়ভাবে চুপ করে গেলেন। অবশেষে

তিনি ভূতপূর্ব বিচারক হিসাবে বুঝতে পারলেন যে খাঁটি সত্যিও কেমন করে অনেক সময় বিচারকের দৃষ্টিতে অকথ্য মিথ্যা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে করারও কিছু নেই অথবা নিজের সততা প্রমাণ করারও কোন উপায় নেই : তিনি নিজেই না কত নিরীহ লোককে বিচার করে জেলে পাঠিয়েছেন, কারণ তাদের সত্যি কথাও আপাত দৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। এখন প্রতিফল তাঁর উপরেই এসে পড়েছে !

শাস্তি ভয়ানক—কারাগারে যাবজ্জীবন বাস।

আগাবেক আর্তনাদ করে উঠে এক গোছা দাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন।

প্রহরীরা তাঁকে ধরে টেনে গর্তের বাইরে নিয়ে এল এবং কারাগারের দিকে নিয়ে চলল। সেখানে তিনি দেড়থানা আবদুল্লার হাতে পড়লেন যে একবার পরখ করার জন্যে প্রত্যেক আসামীকেই এক ডজন বেত মারত ও পরে সেই ভয়ংকর আফগানটার হাতে ছেড়ে দিত। যথারীতি লাথি ও ঘুঁষি মারার পর আগাবেককে সিঁড়ির চল্লিশ ধাপ উপর থেকে নিচে গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হল এবং সেখানে অন্ধকারে দাঁত কড়মড়ির মধ্যে তার আর্তনাদ শোনা গেল, পৃথিবীতে এতদিন ধরে যত অন্যায় কাজ তিনি করেছিলেন নিয়তির কাছে তার প্রতিফল অনেক আগেই তাঁর পাওনা হয়েছিল।

আদালতের বিচার তখনও চলছিল। বণিক তাঁর মণিমুক্তাগুলো ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মণিমুক্তাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষে পাঠিয়ে দিলে অনেকেই হয়ত ন্যায্য ও আইনসঙ্গত মনে করতেন এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থানেরও অনুমোদন লাভ করত না। কিন্তু সেগুলো তো আর বণিকের নয়, তার সুন্দরী স্ত্রীর, যার কাছে রাজপুরুষ নিজেকে অপরাধী মনে করতেন এবং সেই সিন্দুকের ঘটনার পর তিনি বরাবর তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছেন, যদিও ত্ দু'বার এক বৃদ্ধার মারফত আরজি-বিবি তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন। আজও তাঁর রাগকে ভয় পেয়ে এবং তাঁর প্রকৃতির উৎসাহ ও উত্তাপ ভালভাবেই জেনে রাজপুরুষ মণিমুক্তাগুলো বণিকের মারফত তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ পাঠাতে মনস্থ করলেন—এবং বণিকের পক্ষে তাঁর রায় দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করতে উদ্যত হলেন।

"দেখ, কেরানীর দল," তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন। "নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে এই মহামূল্য বস্তুগুলো কাদিরের পুত্র বণিক রহিমবাইয়ের,

খাঁর মুদ্রা-বিনিময়কারী দোকানগুলির সারিতে একটা দোকান আছে……"

ঠিক এই সময় জনতার মধ্যে থেকে কেউ একজন অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে তাঁর কথায় বাধা দিল, "রক্ষে করুন, বিচার করুন!"

যেদিক থেকে চীৎকার উঠেছিল প্রহরীরা সেদিকে ভয়ংকর দৃষ্টি নিয়ে ছুটে গেল। রাজপুরুষের কথা হয়ে গেল। আগে জনতার মধ্যে থেকে কেউ কোন দিন বিচারের রায় দেবার সময় বাধা দিতে সাহস করেনি।

অবশ্য আইনের দিক থেকে কোন বাধা ছিল না: রাজপুরুষ সে কথা মনে করলেন। এ ছাড়া এ কথাও তাঁর মনে হল যে রাজদরবারের তাঁর কোন শত্রু কোন গুপ্তচর পাঠিয়ে তাঁর বিচার সভায় একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে খানের কাছে অভিযোগ করার উদ্দেশ্যেও এসব করে থাকতে পারে।

তিনি প্রহরীদের উৎসাহ থেকে নিবৃত্ত করে রাজকীয় ভঙ্গিতে বললেন:

"বল! কে ওখানে? সামনে এগিয়ে এস!"

আর খোজা নাসিরুদ্দিনকে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

"তুমি, জ্যোতিষী! এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার খোঁজে শহরের প্রতিটি কোণ আমরা তন্ন তন্ন করে দেখেছি।"

যদি তিনি বলতেন যে "তোমার মাথার খোঁজে" তবে হয়ত সত্যি বলতেন, কারণ তাঁর আসল এবং অভিসন্ধিমূলক ইচ্ছা ছিল তাই—যদিও তিনি সে কথা উল্লেখ করলেন না।

তিনি অবশ্য প্রহরীদের দিকে চেয়ে ইসারা করলেন এবং তারাও চুপে চুপে পিছন দিক থেকে খোজা নাসিরুদ্দিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল এবং জামার নিচে বইতে থাকা দড়িটা যথাস্থানে আছে কিনা অনুভব করল।

খোজা নাসিরুদ্দিন সমস্ত কিছু দেখেও ধীর ও শান্ত হয়ে রইলেন, কারণ রাজপুরুষের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর কাছে কঠিন ও নির্ভরযোগ্য বর্ম ছিল।

"সেলাম, মাননীয় রহিমবাই," বণিককে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন। "আল্লা আপনার দিন দিন উন্নতি করুন।"

বণিক কোন উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না যে তাঁর দশ হাজার টাকা বদমাস জ্যোতিষীটার হাতে গিয়ে পড়েছিল।

"তুমি কোথায় ছিলে ?" রাজপুরুষ আবার প্রশ্ন করলেন।

"ব্যবসার জন্য আমাকে শহর ছেড়ে যেতে হয়েছিল মাননীয় বিচারক। এখন আমি ফিরে এসেছি এবং ঠিক সময়েই এসেছি যাতে ন্যায় বিচারের খাতিরে এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিতে পারি।"

"তুমি সাক্ষ্য দিতে চাও ? কি ধরনের সাক্ষ্য ?"

"মণিমুক্তো ও তার অবিসম্বাদিত মালিকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ।"

"মালিক আমাদের জানা, তিনি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন," রহিমবাইকে দেখিয়ে রাজপুরুষ বললেন; তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, ভয় পাচ্ছিলেন যে জ্যোতিষী হয়ত আবার একটা নোংরা খেলা সুরু করবে।

"সেইখানেই রয়েছে ভুল," খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এই মণিমুক্তাগুলোর মালিক মাননীয় রহিমবাই নন। এগুলো অন্য আর একজনের।"

"কি করে ?" মুদ্রা-বিনিময়কারী চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠল। "কি বলতে চাও—আমি মালিক নই ? কে তবে মালিক ? তুমি ?"

"না, আমি নই, আপনিও নন, একজন তৃতীয় ব্যক্তি।"

"কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি ?" মুদ্রা-বিনিময়কারী গাঁ গাঁ করে উঠলেন। "কেন এইসব ভবঘুরে ও অবাঞ্ছিত লোককে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া হয় ?"

রাজপুরুষ হাত তুলে চুপ করতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন:

"তোমার ধাঁধার এখানে কোন স্থান নেই, জ্যোতিষী। তুমি কি বলতে চাও ? কে এই মণিমুক্তার মালিক আমি খুব ভালভাবেই জানি, কারণ আমার নিজের চোখেই তা দেখার সুযোগ হয়েছিল—আজ থেকে অনেক দিন আগে—আমার অতি পরিচিত ব্যক্তির দেহে……"

আরজি-বিবির নাম করতে গিয়ে তাঁর গলা ধরে এল, কারণ তিনি চঞ্চল বিবেকের তাড়নায় বণিকের সামনে তাঁর নাম মুখে আনতে ইচ্ছা করলেন না।

"বাস্তবিক আপনি ঠিকই বলেছেন!" খোজা নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন। "কিন্তু তারও আগে আমার মাননীয় প্রভু যখন এই মণিমুক্তাগুলো দেখেন তাঁর পরিচিত ব্যক্তির দেহে—অতি পরিচিত আমার বলা উচিত—তার আগে এগুলো

রহিমবাইয়ের ছিল না, অন্য আর একজনের ছিল যার কাছ থেকে বেআইনী ভাবে এবং জোর করে রহিমবাই এগুলো কেড়ে নেয়।"

"মিথ্যা !" বণিক চীৎকার করে উঠলেন। "নির্লজ্জ মিথ্যা !"

"সেই ব্যক্তি এখানেই আছেন," এতটুকু ভয় না পেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন। বিধবা, সামনে এগিয়ে এস, মহান ও সর্বশক্তিমান বিচারকের সামনে নিজেকে দেখাও।"

বিধবা ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে খোজা নাসিরুদ্দিনের পাশে দাঁড়াল।

রাজপুরুষ হতবাক হয়ে পড়লেন। সবকিছুই অত্যন্ত আকস্মিক—জ্যোতিষীর হঠাৎ আবির্ভাব, তার সাক্ষ্য, এই বিধবা !

ইতিমধ্যে ভীড়ের মধ্যে গোলমাল বাড়তে লাগল। তখনই এটা থামান দরকার।

"জ্যোতিষী !" রাজপুরুষ গম্ভীর গলায় বললেন, "বুঝতে পারছি বণিক রহিমবাইয়ের পবিত্র নামে অপবাদ দেওয়ার জন্য তোমার এসব দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। কি করে তুমি সত্য ঘটনা জানলে ? তোমার প্রমাণ কোথায় ? কি করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব ? কোথা থেকে এই মহিলা এল ?"

"সব মিথ্যা !" বণিক নিচে থেকে তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন। "সব মিথ্যা এবং ধূর্ত বদমায়েসী ছাড়া কিছুই নয় যাতে সাধারণ মানুষের মনে শান্তি বিঘ্নিত হয় !"

"আমরা জ্যোতিষীর কথাবার্তায় যেটুকু অসৎ উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি," রাজপুরুষ বলে চললেন এবং সেই সঙ্গে প্রথমে কেরানীদের ও পরে প্রহরীদের ইসারা করলেন ; তারা তাড়াতাড়ি জামার ভিতর থেকে দড়ি বার করে ক্রমশঃ এগিয়ে এল, "আর এইসব মামলার যোগ্য শাস্তি······"

তিনি কথা শেষ করার সময় পেলেন না।

"আমার প্রমাণ কোথায় ? কি করে জানলাম ?" এক পা এগিয়ে এসে খোজা নাসিরুদ্দিন চীৎকার করে বললেন। "এসব কিছুই আমি ভাগ্য গণনায় জানতে পেরেছি, যার সত্যতা মাননীয় বিচারক অনেক আগেই জেনেছেন, মাননীয় বণিকও সব জানেন ! যাদুমন্ত্রের বই আমার কাছে নেই, তবে সেটা ছাড়াই আমি সব জেনেছি।"

রাজপুরুষকে ধাতস্থ হবার কোন সময় না দিয়েই তিনি ভয়াবহভাবে তাঁর

ভুরু দুটো উপর নিচে ওঠানামা করতে লাগলেন ও জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন যেন একটা বিরাট বোঝা মাথায় তুলেছেন, পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্ত্র পড়ার মত আধিভৌতিক গলায় বলে চললেন :

"দেখুন, আমি একটা সিন্দুক দেখতে পাচ্ছি, ভিতরে দুজন বসে আছে। ওরা কে ? আমার মানসিক দৃষ্টি কি আমাকে প্রতারণা করছে ? হে দীপ্তিমান ও উজ্জ্বলকান্তি পুরুষ, সর্বক্ষমতার অধিকারী—আপনার একি দুর্দশা ? আপনার সম্মানিত রাজপোশাক, আপনার পদক ও তলোয়ার কোথায় ? সিন্দুকে ও তাঁর পাশে ও কে······?"

রাজপুরুষ হাঁপাতে লাগলেন ও মড়া মানুষের মত বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। দিনের জ্বলন্ত উত্তাপ সত্ত্বেও একটা শীতল স্রোত ইস্পাতের ফলার মত তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে নামতে লাগল। রাজদরবারের চিকিৎসকের ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে যেন ভেসে উঠল। একটা কাল অন্ধকার খাদ যেন হাঁ করে আছে তাঁর পায়ের নিচে।

আর এক মিনিট, আর দু একটি কথা, তাহলেই তাঁর সর্বনাশ। একেবারে চূড়ান্ত সর্বনাশ ! এই বদমাস জ্যোতিষী !—ওকে থামাতে হবে, যে কোন মূল্যে তাকে থামাতে হবে !

ব্যাপারটা সৌভাগ্যক্রমে যা ঘটল তাতে জ্যোতিষী নিজে থেকেই থেমে গেলেন যেন ঘন যবনিকার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই একটা মিনিটই তাঁকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, কারণ পরের মিনিট তাঁর পক্ষে হয়ে উঠবে সাংঘাতিক—রাজপুরুষ সেটুকু বুঝতে পেরেছিলেন।

"জ্যোতিষী, কেন তুমি প্রথমেই বলনি যে মণিমুক্তা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তোমার কাছে ভাগ্য-গণনায় প্রকাশ পেয়েছে ?" তিনি খানিকটা সৌহার্দমূলক ভৎর্সনার সুরে বললেন। "যদি তুমি প্রথমেই বলতে তবে এসব বাদানুবাদ এড়িয়ে যাওয়া যেত। তোমার জ্যোতিষ গণনার সত্যতা আমাদের সকলেরই জানা এবং তা সমস্ত রকম সন্দেহের উর্ধ্বে ও সব রকম প্রশ্নের বাইরে।"

"আমার অন্য প্রমাণও আছে," খোজা নাসিরুদ্দিন মন্তব্য করলেন। "আমার মাননীয় প্রভু যেন একবার জনতার বাঁ দিকে চেয়ে দেখেন।"

রাজপুরুষ চেয়ে দেখলেন ও ভয়ে হিম হয়ে গেলেন। দয়াময় আল্লা !—জনতার ভিতরে তাঁর দিকে বিকৃত হেসে ও তার হলুদ রংয়ের চোখ দিয়ে ইশারা করে চেয়ে আছে সেই চেপটা ও ভয়ংকর মুখটা, যেটা সেই সময় তিনি কবর-

খানায় সমাধির পাশে দেখেছিলেন ! সে শুধু হাসছেই না তার পোশাকের নিচে থেকে তাঁরই নিজের সোনার তলোয়ারটা দেখাচ্ছে ।

রাজপুরুষের দম ফিরে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ; তিনি সাদা হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মুখ যেন গলে ঝরে পড়ে গিয়েছিল, কেবল একজোড়া কাল গোঁফ আকাশে ঝুলছিল । তিনি তাঁর চোখ দুটো সেই ভয়ংকর মুখ থেকে কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারলেন না ।

খোজা নাসিরুদ্দিনের কণ্ঠস্বরে তাঁর ধাত ফিরে এল ।

"যদি প্রয়োজন হয় তবে হে মাননীয়প্রভু আরও প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে ।"

"না, এই যথেষ্ট," জড়তা কাটিয়ে উঠে রাজপুরুষ বললেন । "ব্যাপারটা আমার কাছে এখন বেশ পরিষ্কার, এবার আমি বিচারের রায় দিব ।"

কোন গোপন চুম্বক-শক্তি যেন দুর্বার হয়ে তাঁর দৃষ্টিকে জনতার মধ্যের সেই বিশ্রী মুখের দিকে নিয়ে গেল । তিনি বাঁ দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে থর থর করে কেঁপে উঠলেন ।

খোজা নাসিরুদ্দিন বুঝতে পারলেন রাজপুরুষের মনের ভিতর কি ঘটছে এবং গোপন ইসারায় চোরকে চলে যেতে বললেন ।

চোর অদৃশ্য হল ।

রাজপুরুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ।

"কেরানীরা, মণিমুক্তা নিয়ে যা সব লিখেছিলে সব কেটে ফেল," তিনি আদেশ দিলেন । "বরং ঐ কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে সুরু কর । লেখ : সন্দেহের অতীত যে সত্য এখন নির্ধারিত হয়েছে তাতে ঐ দুর্মূল্য মণিমুক্তাগুলো এক বিধবার······"

"সাদাত," খোজা নাসিরুদ্দিন তাড়াতাড়ি বললেন ।

"এক বিধবা মহিলার নাম সাদাত," রাজপুরুষ বলে চললেন । "উপরোক্ত মণিমুক্তাগুলো, ন্যায় ও আইন অনুযায়ী, অবিলম্বে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে······"

ঠিক এই মুহূর্তে মুদ্রা-বিনিময়কারী আর্তনাদ করে উঠলেন ।

"আপনি কি বলতে চান ? মণিমুক্তাগুলো আমার, কোন বিধবার নয় ।"

তখন পর্যন্ত তিনি চুপ করে ছিলেন, কারণ এতক্ষণ কি ঘটছিল তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না, অবশ্য এটুকু আঁচ করেছিলেন যে কোন কিছুই তাঁর

অনুকূলে যাচ্ছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে মণিমুক্তাগুলোর নাম উল্লেখ করা হল তখনই তিনি প্রগলভ হয়ে উঠলেন।

"এ কোন বিচারালয়?" তিনি চীৎকার করে উঠলেন। "এইসব সাক্ষ্যের যথেষ্ট প্রমাণ কই? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার বিরুদ্ধে আর এক দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র! অন্ততঃ একটা প্রমাণ দেওয়া হোক। ভদ্রমহোদয়গণ!" তিনি জনতার দিকে চেয়ে বললেন। "আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন। আপনাদের চোখের সামনে একজন সৎ লোকের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সাক্ষী রইলেন!"

জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল, তারা বিদ্রূপ, হাসি ও উপহাস করতে লাগল, একটি ছেলে কোকিলের ডাক ডাকতে লাগল, অন্য আর একজন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ এবং তৃতীয়জন বিড়ালের মত মিউ মিউ করতে লাগল; একটা অসংযত ভাব, যা শাসন কর্তৃপক্ষের সামনে অসহ্য, মাঠের মধ্যে দেখা গেল।

"বণিক রহিমবাই, চুপ করুন!" রাজপুরুষ গর্জন করে উঠলেন। "আপনি আইন ও শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করছেন!"

"আমি চুপ করব না!" বণিক আর্তনাদ করে উঠলেন। "মণিমুক্তোগুলো আমার, আমি তার দাম দিয়েছি।"

মাঠে উত্তেজনা ও হট্টগোল ক্রমশঃ বেড়ে চলল। বণিককে শান্ত করার জন্য কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু রাজপুরুষ কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। বণিক এত রেগে গিয়েছিলেন যে কোন রকম তোষামোদ বা অনুনয় বিনয়ে তাঁকে শান্ত করা সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় রাজপুরুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্য এক চরম পথ বেছে নিলেন। মাথায় বাড়ি মারার লাঠি নিয়ে যে প্রহরী দাঁড়িয়েছিল তিনি তাকে ইসারা করলেন।

"আমি প্রাসাদে যাব। খান যেন নিজেই এই মামলার বিচার করেন!" বণিক চীৎকার করে উঠলেন, এদিকে সেই বিশালকায় প্রহরী চুপে চুপে তার অস্ত্র উপরে তুলে তাঁর পিছনে এসে হাজির হল।

"খান যেন একবার দেখতে পান কি ধরনের বিচারক তাঁর অধীনে কাজ করেন!" বণিক চীৎকার করে উঠলেন এবং এগুলোই ছিল তাঁর শেষ কথা। লাঠির বাড়ি তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল।

এক হাত লম্বা জিভ বেরিয়ে এল, তাঁর চোখ দুটো উপরে উঠে বেরিয়ে পড়ার অবস্থা। তাঁর মুখ নীল হয়ে গেল, জোরে শব্দ করে কাশির বেগ উঠতে লাগল, পরে পাক খেতে লাগলেন এবং প্রধান প্রহরী সময় মত না ধরলে হয়ত পড়ে যেতেন।

অন্য প্রহরীরা জনতার মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনল।

একটা থমথমে ভাবের সুযোগ নিয়ে রাজপুরুষ তাঁর রায় ঘোষণা করলেন এবং মণিমুক্তার থলিটা নিজে বিধবার হাতে তুলে দিলেন।

সমস্ত কিছু বণিকের চোখের সামনে ঘটল, কিন্তু তিনি আর হট্টগোল করলেন না বা বিচার কাজে বাধা দিলেন না। তিনি নিজে কিছু দেখেছিলেন কিনা সেটাও সন্দেহজনক, কারণ অর্ধ-মুদ্রিত চোখে তিনি পৃথিবীর দিকে চেয়েছিলেন শুধু চোখের সাদা অংশ দিয়ে; চোখের মণিটা তখনও গোল হয়ে উপর দিকে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের মধ্যে হিক্কা তাঁর মোটা শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুলছিল এবং এই অবস্থায় তিনজন প্রহরীর পাহারায় তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল। দুজন বগলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টানছিল এবং তৃতীয় জন ধাক্কা দিতে দিতে চলছিল।

যখন তিনি বাগানের দরজার কাছে এসে পৌছালেন এবং প্রহরীরা তাঁকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাস্তার উপর রেখে চলে এল, তাঁর জ্ঞান কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল এবং তাঁর ধোঁয়াটে চোখ মেলে চারপাশে চেয়ে দেখলেন তখন কিছুই বুঝতে পারলেন না। মাঠ কোথায়, কোথায় সেই বদমাস জ্যোতিষীটা? এসব কি তবে সব স্বপ্ন?

তাঁর চামড়ার থলিটা কোথা?

তিনি বাঁ দিকে হাত ভালি দিলেন।

থলি নেই। বালি ভর্তি হয়ে সেটা জলাশয়ের পাশে পড়ে আছে, এবং ভিতরের টাকা প্রহরীদের পকেটে চলে গিয়েছে।

বণিক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং উদ্বেগে টলতে টলতে বিচার-স্থানে যাবার চেষ্টা করলেন, তাঁর পাগড়ী একদিকে হেলে পড়ল। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না—রাজপুরুষ, জ্যোতিষী এবং বিধবা সকলেই চলে গিয়েছে। বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে এবং জনতাও চলে গিয়েছে। মাঠ উত্তপ্ত রোদে একেবারে ফাঁকা এবং বণিকের চোখের সামনে সেটা ধূ ধূ করছে যেন এখানে আধ ঘণ্টা আগেও যা ঘটেছিল সব স্বপ্ন যা সবেমাত্র মিলিয়ে গিয়েছে।

প্রহরীদের দুজন অলসভাবে পায়চারী দিচ্ছিল এবং তৃতীয়জন পা দুটো ফাঁক করে মঞ্চের উপর ছায়ায় লাঠির মাথায় কম্বল ছেঁড়াটা বাঁধছিল।

"আমার থলি!" বণিক হাউ হাউ করে উঠল। "আমার টাকা ভর্তি থলি কোথায়!"

তাঁর চীৎকারে অট্টহাস্যের সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় উত্তর এল।

"এর আরও চাই," লাঠি-ধারী প্রহরীটা বলল। "তার পক্ষে এক মাত্রা যথেষ্ট নয় দেখছি। এক মিনিট ধরত, ধরবে!"

এই কথাগুলো শুনে বণিক বুঝতে পারলেন কি ব্যাপার ঘটেছিল এবং কেনই বা তাঁর মাথার পিছন দিকটা ব্যথা দিচ্ছে।

"ডাকাত! চোর!" তিনি হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং প্রাসাদের দিকে ছুটলেন, পিছনে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে হাসতে হাসতে প্রহরীরা ছুটল।

পরে তাঁর কপালে কি ঘটেছিল, তিনি রাজপ্রসাদে ঢুকে খানের সামনে তাঁর অভিযোগ পেশ করতে পেরেছিলেন কি না বা রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া কি ভাবে শেষ হয়েছিল আমরা জানি না। অন্যদের ভাগ্যেও কি ঘটেছিল আমরা জানি না—বন্দী আগাবেক, কামুক আরজি-বিবি বা অন্য সকলের ভাগ্যে। এই সঙ্গে তারা বিদায় নিল, কারণ তাদের কথা লেখা হয়েছিল ততক্ষণ যতক্ষণ তারা খোজা নাসিরুদ্দিনের অম্লান জ্যোতির সংস্পর্শে এসেছিল। যে মুহূর্তে তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, আলো ম্লান হয়ে সরে গেল এবং তারা সকলে একসঙ্গে আলোহীন খাদের অতলে তলিয়ে গেল।

কারণ তারা সকলেই তাদের আধ্যাত্মিক মূল্যহীনতার জন্য এই পৃথিবীতে কোন চিহ্নই রেখে যেতে পারেনি।

এইবার বাড়ী ফেরার পথে খোজা নাসিরুদ্দিন পথে যে অসংখ্য বন্ধু লাভ করেছিলেন একে একে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একমাত্র চোর ছাড়া সঙ্গে এখন আর কেউ ছিল না।

পরদিন খুব সকালে দুজনে একসঙ্গে ব্যস্ত ও কোলাহলমুখর কোকান্দ শহর ত্যাগ করলেন।

সদ্যজাগ্রত বাজারের পৈশাচিক চীৎকার অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা শুনতে পেলেন। অসংখ্য গাড়ী, শকটবাহিনী, ঘোড়সওয়ারের স্রোত তাঁদের পাশ দিয়ে কোকান্দের ন'টা তোরণ পথ পেরিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিল; আগের দিনের

মত সেদিনও ছিল একই রকম—লাভ, প্রতারণা ও শঠতায় ভরা ঈশ্বর নিন্দার দিন।

শহরের ওধারে বাগান ও ফলের খেত তখনও ছিল ছায়ায় ভরা। এখানে এক চমৎকার নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, আবছাভাবে আকাশের নীল ও সূর্যের রোদ তাদের চুম্বন করছিল মনে হচ্ছিল যেন আকাশের নীল কুয়াশায় তাদের জন্ম। এইখানেই কোকান্দ থেকে খোজা নাসিরুদ্দিন বিদায় নিলেন—এক ছোট বাগানের ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ছোট ছেলেদের গানের সুর ভেসে এল:

মিষ্টি মধুর বইছে বাতাস দক্ষিণ হতে,
পরশ পেয়ে শুভ্র হল চেরির বাগান।
দিন সুরু হয় উজল আলোর ঝলকানিতে,
উঠল রে ঐ হাজার প্রাণে আনন্দ গান।

শিস দিয়ে যায় নীল কণ্ঠ পাখা মেলে,
বজ্র যেন তুলছে আওয়াজ পরম সুখে,
যাদুর রাজা ঐ তুরাখন দু'হাত তুলে,
ঘুমটি ভেঙ্গে উঠবে বসে বেদির বুকে।

খোজা নাসিরুদ্দিন গাধার পিঠ থেকে নেমে বাগানের দেয়ালের দিকে শ্রদ্ধায় সেলাম জানালেন। তিনি কোকান্দকেও সেলাম জানালেন যে তার সুমধুর গান তাকে পুরস্কার দিয়েছি।

শেষ বাগানটাও পেরিয়ে তাঁরা এক নিচু জায়গায় এলেন যেখানে সূর্যের আলোয় ধানের ক্ষেতগুলো সাদা ঝলক দিচ্ছিল। তুরাখন বাবার সমাধি খুব বেশি দূরে নেই।

খোজা নাসিরুদ্দিন চোরকে আলিঙ্গন করে বললেন:

"এবার আমি বিদায় নিই। তুরাখন বাবাকে আমার সেলাম জানাবে। প্রার্থনা করি বাকী জীবন তুমি যেন ধর্মের পথে কাটাতে পার।"

লম্বা-কানের প্রাণীটার কাছে বিদায় নেওয়ার পালা সুরু হল। চোর তার নাকে চুমু খেয়ে তার লেজের ডগার চুল কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে দিল।

"কখন আবার আপনাদের দুজনের দেখা পাব?" চোর বলল।

"জানি না," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন। "তবে মনে রেখ পৃথিবী আমার

কাছে যেমন মুক্ত, তোমার কাছেও তেমনি। আমরা নিশ্চয়ই আবার মিলিত হব। প্রতিটি বিচ্ছেদেই মিলনের বীজ নিহিত থাকে।"

এখানে একে অন্যের কাছে বিদায় নিলেন। পাশের যে রাস্তাটা তুরাখন বাবার সমাধির দিকে চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে চোর বিদায় নিল।

খোজা নাসিরুদ্দিন গাধার পিঠে চাপলেন; সামনে বড় রাস্তার গুঞ্জন ও চীৎকার শোনা যাচ্ছিল; কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ভীড়ের নোংরা ও পাক খাওয়া স্রোতে মিশে গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

উপসংহার

গল্পের আর অল্পই বাকী—গুলজান কেমন করে ফিরে এলেন এবং তিনি ও খোজা নাসিরুদ্দিন আবার কি ভাবে মিলিত হলেন।

তিনি একদিন গুলজানকে আবার ফিরে পেলেন। রাতে বাড়ী ফিরে সোজা তিনি বিছানায় গেলেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য। বিছানা করেছিলেন ছাদের উপর। সকালে রোদে ঘুম ভেঙ্গে নিচের দিকে চাইতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন:

"কি করছিস্, নোংরা পাঁউরুটি-খেকো! তুই বোধহয় আবার ডুমুর-খেকো হতে চাইছিস?"

এই চীৎকার ছিল গাধার উদ্দেশ্যে। খোজা নাসিরুদ্দিন রাতে বাগানে ঢোকার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং গাধাটা ভিতরে ঢুকে এক নাগাড়ে ডুমুর খেয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যেই সমস্ত ফল ও পাতা মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল।

তখনই লাঠি নিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে খোজা নাসিরুদ্দিন বেশ কিছুক্ষণ গাছগুলোর উদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন। তখনও তাঁর অনেক কিছু দেখার বাকী ছিল—রান্নায় বাসন-পত্র ঝাল দেওয়া, কসাইকে দাম দেওয়া, আঙুর গাছের গোঁড়ার মাটি আলগা করে দেওয়া এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয়—বাগানের দেয়াল সারানো।

এই শেষ কাজটা করার জন্য আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তিনি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অর্ধেক মাটি ও বাকী অর্ধেক খড় মিশিয়ে

নিলেন। রাস্তার মোড়ে একটা গাড়ী দেখা পাবার আগেই সব কাজ সেরে নিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সাতটি বিভিন্ন কণ্ঠের মিষ্টি গলা শুনতে পেলেন এবং সবার উপর অতি প্রত্যাশিত অষ্টম কণ্ঠ শুনতে পেলেন—যা হচ্ছে গুলজানের।

"সেলাম! আমাকে ছেড়ে এখানে কেমন করেছিলে?"

"বেশ ভালই," খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন বাচ্চাদের গাড়ী থেকে নামতে সাহায্য করার সময় এবং নামার সময় প্রত্যেককেই একবার করে চুমু খাচ্ছিলেন। "অনেক দিন তোমাদের সঙ্গ পাইনি এবং এতদিন তোমাদের ফিরে আসার প্রত্যাশায় ছিলাম।"

তাঁর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে গুলজান গাড়ী থেকে নেমে এলেন এবং চারদিকে চেয়ে প্রথম যে জিনিষটা তিনি দেখতে পেলেন তা হচ্ছে বাগানের দেয়ালে গর্ত।

"দেয়ালের কি হল?"

খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে খোজা নাসিরুদ্দিন চোখ নিচে করলেন।

"আমি কোন সময় পাইনি, কেন জানি না সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম……"

"দেখ," গুলজান রেগে চীৎকার করে উঠলেন। "এই লোকটাকে দেখ, পুরো তিন মাসে এই ছোট কাজটা করার সময় পায়নি।"

আমাদের বইয়ের শেষ অধ্যায় শেষ করতে গিয়ে পাঠককে আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করছে এই বলে যে, গল্পের সমস্ত চরিত্রগুলিই—অবশ্যই মূক ও বধির সমাজের সেই শ্রদ্ধেয় দরবেশও বাদ পড়বেন না—তাদের যথাযোগ্য শেষ পরিণতি সুন্দর ও সুখের মনে করতে পারেনি।

চিরন্তন সত্য আমাদের দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে সেই শ্রদ্ধেয় দরবেশ খোজা নাসিরুদ্দিনকে আর একবার দেখার জন্য দীর্ঘ দিন বাঁচেননি। তিনি মারা গিয়েছিলেন বা তাঁর নিজের ভাষায়, আত্মার উচ্চ অবস্থায় গমন করেছিলেন। সম্ভবতঃ না, নিশ্চয়ই তিনি অন্য জগতে যাবার সময় কোন বেদনাদায়ক চিন্তা নিয়ে যাননি, কিন্তু আমরা জ্ঞানের সেই উচ্চ মার্গে উঠতে অসমর্থ, সেজন্য সেই নামহীন কবরের উদ্দেশ্যে আমাদের বেদনাকে চেপে রাখতে পারছি না।

একজন প্রকৃত দরবেশের মতই নিজের স্মৃতি না হারিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং নাম না থাকার জন্যই এক বিনম্র মানবিকতা তাঁর কবরকে ঢেকে

দিয়েছে, অক্ষরহীন ভাষায় যেন লেখা আছে—'এইখানে শায়িত আছেন একজন মানুষ'।

এই ভাবেই খোজা নাসিরুদ্দিন সেই কবরটা চিনতে পারলেন, যখন তিনি এক ভিখারীর কাছে সেই দরবেশের মৃত্যুর খবর শুনলেন ; সেই ভিখারীই তাঁর কবরের ব্যবস্থা করেছিল।

কবর দেখাতে যাবার সময় ভিখারীটা খোজা নাসিরুদ্দিনকে বলল :

"আমি তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিলাম। তাঁর প্রতিজ্ঞা মত শেষ পর্যন্ত তিনি মৌন ছিলেন এবং কেবলমাত্র শেষ দিকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'আমার মাথার নিচ থেকে টাকা নিয়ে অতি সাধারণ একটা কবরের ব্যবস্থা করিও। বাকী যা থাকবে গরীবদের বিলিয়ে দিও......।' তাঁর মুখ থেকে এমন একটা আনন্দের দীপ্তি বেরিয়েছিল যে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

"আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও," খোজা নাসিরুদ্দিন বলতে সে চলে গেল। পরে তিনি কবরের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন যেখানে একটি পাথরও ছিল না। প্রকৃতি নিজেই যেন তাঁর কবর সাজাতে ব্যস্ত : এখানে সেখানে একটা ছুটো ঘাস গজিয়ে উঠছিল এবং একটা ছোট ফুল কবরের মাথার দিকে দেখা দিয়েছিল—যেন একবিন্দু নীল, বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

খোজা নাসিরুদ্দিন সমাধির পাশে অনেকক্ষণ রইলেন এবং মনে মনে মৃতের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অন্ধকার হয়ে এল, বাতাস সজীব হয়ে উঠল এবং অন্ধকার আকাশে তারার দল ফুটে উঠল।

খোজা নাসিরুদ্দিন বললেন :

"বিদায়, শ্রদ্ধেয় ঋষি। আমি কিছুদিনের মধ্যে আবার আপনার কাছে আসব।"

তিনি যেন একটা মিষ্টি উত্তর পেলেন ; উত্তর এল কথায় নয় ঢেউয়ের আকারে হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনে।

"হৃদ নিয়ে নিশ্চিন্ত হোন," খোজা নাসিরুদ্দিন বলে চললেন। "আমি যা উপযুক্ত মনে করেছি তাই করেছি। আমার প্রচেষ্টায় যদি আপনি ঊর্ধ্বলোকে-অমরত্ব লাভ করেন তবে অত্যন্ত আনন্দিত হব। একটা বিষয়ে যদিও আমি অপরাধী, আমি আমার ধর্মবিশ্বাস খুঁজে পেতে সমর্থ হইনি। সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলাম—কিন্তু আপনি চলে গিয়েছেন......অথবা......আমার জন্য অপেক্ষা না করে অন্য লোকে চলে

গিয়েছেন······। এখন, অবশ্য, আমি নিজেই দেখার চেষ্টা করব, তবে জানি না সফল হব কি না।"

জাঁকজমকের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারাদের সঙ্গে পৃথিবী যেন রাতের নীল অন্ধকারে ভাসছিল। গাছের শাখা-প্রশাখায় বাতাস ঝিরঝির করে বইছিল, রাতের পাখীরা চীৎকার করছিল, শিশিরে ভেজা সবুজ ফুল গন্ধ দিচ্ছিল এবং খোজা নাসিরুদ্দিনের হৃদপিণ্ড বুকের মধ্যে জোরে উঠানামা করছিল। এই-সবের মধ্যে তিনি সহসা তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে ফিরে পেলেন; অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে অনুভব করলেন, যদিও তিনি এর কোন নামকরণ করতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁর হৃদয় ভেদ করে সারা পৃথিবীর জন্য অসীম ভালবাসা নির্গত হল এবং সজীব পৃথিবী থেকে একই ভালবাসায় তিনি উত্তর পেলেন, নিজেকে না হারিয়ে তিনি চারপাশের আনন্দময় পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন এবং সেইসব দুমূর্ল্য মুহূর্তের এক সময় তিনি মানব-জীবনের চিরন্তন আবর্তে প্রবেশ করলেন যেখানে মৃত্যুর কোন স্থান নেই।

তাঁর বিশ্বাস, তাঁর আত্মার ভিতর সাড়া তুলল এবং উপচে পড়ল, কিন্তু তার ভাষা একটিমাত্র শব্দ—তাঁকে নিরাশ করল। তিনি জানতেন এ আছে এবং নিকটেই আছে এবং তাঁর আত্মা যাতে মনে আশ্রয় নেয় ও সেই শব্দ তুলে ধরে সেজন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন; এবং শেষে যখন তাঁর চেষ্টার তীব্রতার জন্য প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন, সেই কথাটি তাঁর সামনে ঝলমল করে চোখ ঝলসিয়ে ভেসে উঠল এবং তাঁর ঠোঁটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল।

"জীবন!" তিনি চীৎকার করে কেঁপে উঠলেন, অজান্তে চোখে জল এসে গেল।

তাঁর পাশের সব কিছুই যেন সাড়া দিয়ে কেঁপে উঠল—বাতাস, পাতা, ঘাস এবং দূরের তারারা।

অদ্ভুত—এই সোজা কথাটা তিনি অনেকবার শুনেছেন, কিন্তু তার অতল গভীরতা কোন দিনও তলিয়ে দেখেননি; এখন তিনি যেন তার থই দেখতে গিয়ে এই শব্দটিকে বোধগম্য ও অত্যন্ত মনে করলেন।

বৃদ্ধ দরবেশের সমাধির পাশে সেই স্বর্গীয় রাণী যখন তাঁর কাছে ভেসে এল, সেই স্মরণীয় দিন থেকে তিনি অন্যভাবে জীবনযাপন সুরু করলেন—সহজ, সরল, সমস্যাহীন, পৃথিবীর নিপীড়ন, হট্টগোল ও সন্দেহের বাইরে তিনি জীবন সুরু করলেন, কারণ এখন তিনি সব কিছুতেই সত্য ও বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন।

আমাদের পরে অন্য যারা আসবেন তাঁরা হয়ত তাঁর জীবন নিয়ে আরও নতুন বই লিখবেন।

আমাদের পরিশ্রম এখানেই শেষ হল এবং আমরা খোজা নাসিকদ্দিনের কাছে বিদায় নিচ্ছি। জীবনের যাত্রাপথে অনেক বিষয় নিয়ে কল্পনায় তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য মনে মনে অনেকবার আমরা হয়ত তাঁর কাছে ফিরে আসব, অবশ্য কালি-কলমে আর কোন দিনও ফিরে আসছি না, কারণ আমরা তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানি ও যতটুকু বলতে ইচ্ছা করেছিলাম সবই বলেছি।